অকারাদি বর্ণক্রমে দশম কল্পের প্রথম ভাগের সূচীপত্র

সম্বৎ ১৯৩৫। কলিগতাব্দ ৪৯৮০। ১ চৈত্র শনিবার।

Registerd No 52.

ब्रह्मवा एकमिदमग्रआसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयसर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्य साधनञ्च तदुपासनमेव।

ব্রাহ্মসমাজের বর্ষবৃদ্ধি।

এই পত্রিকার শীর্ষস্থান দেখিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে ব্রাহ্মসমাজের বয়ঃক্রম অর্দ্ধশতাব্দা হইয়াছে। মহাত্মা রামমোহন রায় স্বহস্তে এই বঙ্গভূমিতে যে ধর্ম্মবীজ রোপণ করিয়াছিলেন এই কাল যাবৎ তাহা বর্দ্ধিত হইল। যে বীজ এতদ্দেশের সেই গভীর অন্ধকারগর্ভে অঙ্কুরিত হইয়াছিল এখন তাহা একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষ হইয়া দিক্‌দিগন্তে শাখা প্রশাখা বিস্তার করিতেছে; এখন ইহার আর সে দিন নাই, এখন ইহা দীপ্ত দিবালোকে সুস্পষ্ট নিরীক্ষিত।

পাঠক, আইস এই ব্রাহ্মসমাজের অতীত বৃত্তান্তে একবার প্রবেশ করি। যখন্ হিন্দুকুলসূর্য্য রামমোহন রায় অস্তগত হইলেন তখন এই ব্রাহ্মসমাজের কি অবস্থা। ইহা কর্ণধার-বিহীন নৌকার ন্যায় প্রবল তরঙ্গ মগ্নপ্রায় হইতেছিল। সেই সঙ্কটকালে ভক্তিভাজন প্রধান আচার্য্য মহাশয় আসিয়া ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন। ভাগ্যশ্রীর কোমল ক্রোড়ে প্রতিপালিত প্রিয়দর্শন যুবা অকস্মাৎ বীতরাগ হইয়া ধর্ম্মকামনায় ব্রাহ্মসমাজে উপনীত হন। ইহাঁর নিঃস্বার্থ ধর্ম্ম অর্থ ও সাধু ইচ্ছা ব্রাহ্মসমাজের উপস্থিত দুর্গতি দূর করিতে লাগিল। তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠিত হইল। তত্ত্ববোধিনী প্রতিমাসে দেশ বিদেশে উন্নত চিন্তা, গভীর জ্ঞান ও বিশুদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিল; ঘনীভূত কুসংস্কার দূর করিয়া দিল; নিষ্ঠা ও সদাচার প্রবর্ত্তিত করিল এবং নবজীবনে এই বঙ্গসমাজকে জীবিত করিয়া তুলিল।

রামমোহন রায় ব্রাহ্মধর্ম্মের কেবল কঙ্কাল মাত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া যান; এত কাল কেবল মত ও তর্কের উপর ব্রাহ্মধর্ম্ম দণ্ডায়মান ছিল, কিন্তু নিষ্ঠাবান প্রধান আচার্য্য মহাশয় ব্রহ্মোপাসনা-প্রণালী, ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রহণ রীতি, ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ ও ব্রাহ্ম অনুষ্ঠান প্রচার করিয়া ব্রাহ্মসমাজের একটী মহৎ অভাব দূর করেন। লোকে এত দিন কেবল বিশ্বাসে ব্রাহ্ম ছিলেন এক্ষণে বিশ্বাস ও কার্য্যে ব্রাহ্ম হইলেন। চিরপ্রচলিত হিন্দু অনুষ্ঠান গুলির পৌত্তলিক অংশ ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মসমাজে আর আর সমস্ত রক্ষিত হইল। এমন কি, এক জন প্রকৃত হিন্দু এই ব্রাহ্ম অনুষ্ঠান দেখিয়া কিছুতেই ব্যথিত হইতে পারেন না। সেই ব্রহ্মচর্য্য,

সেই বেদাধ্যয়ন, সেই সমাবর্ত্তন, সেই ব্রহ্ম-প্রতিপাদক গায়ত্রী, সেই বেদমন্ত্র সমস্তই আছে কেবল তাহার পৌত্তলিক অংশটুকু নাই। অধিকন্তু এই অপৌত্তলিক হিন্দু অনুষ্ঠান ব্রাহ্মসমাজে অপেক্ষাকৃত জীবন্ত ভাবে অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল।

যত দিন বিশ্বাস ও কার্য্যে একতার অভাব তাবৎ কোন একটী ধর্ম্মসম্প্রদায়ের স্থায়িতায় সন্দেহ। কিন্তু এত দিনের পর প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের যত্ন ও চেষ্টায় ব্রাহ্মসমাজ দৃঢ় ভিত্তিমূলে দণ্ডায়মান হইল। কিন্তু বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, ব্রাহ্মসমাজের সেই সুস্নিগ্ধ নির্ম্মল উষাকালে অকস্মাৎ একটী বজ্রাঘাত হইল। প্রধূমিত অনল প্রবল বেগে জ্বলিয়া উঠিল। তখন আদি ব্রাহ্মসমাজ ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহারে প্রচলিত হিন্দু-প্রণালী রক্ষা করিতেছেন। যতটুকু ধর্ম্মানুমোদিত ততটুকু গ্রাহ্য এবং যতটুকু ধর্ম্মবিরুদ্ধ ততটুকু ত্যজ্য; আদি সমাজ এই রূপে হিন্দুসমাজকে রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুসমাজের মঙ্গলভূমি ও গম্যস্থান, ইহা নৌযানের ন্যায় প্রতিস্রোতে মন্থর গতিতে সেই গম্যস্থানে চলিয়াছে, তৎকালে অনেকের এই মৃদুগতি সহ্য হইল না। যে সমস্ত যুবকের হস্তে ভারতের উদ্ধার আশা করা যাইত, তাঁহারা আমাদের অন্তরে আঘাত দিয়া এই নৌযান হইতে বহির্ম্মুখী স্রোতে ঝাঁপ দিলেন। প্রতিস্রোতে গতি তরঙ্গ-প্রতিহত কিন্তু বহির্ম্মুখী স্রোতে গতি অত্যন্ত দ্রুত; তাঁহারা যেমন পড়িলেন স্রোত অমনি তাঁহাদিগকে উধাও করিয়া লইয়া চলিল। আমরা দেখিতেছি, তাঁহারা সেই বর্হির্ম্মুখী স্রোতে বিচেষ্টমান হইতেছেন, আজিও তীর পান নাই এবং এক একবার কাতর দৃষ্টিতে পশ্চাৎভাগ নিরীক্ষণ করিতেছেন।

আমরা জাতিতে হিন্দু। ইতিবৃত্ত মুক্তকণ্ঠে কহিতেছে, পৃথিবীর অন্যান্য জাতি যখন অসভ্যতার শিশু-দোলায় ক্রীড়া করিতেছিল তখন এই জাতি সভ্য; এই জাতি পৃথিবীতে ধর্ম্মবুদ্ধির আদিপ্রবর্ত্তক; এই জাতি সর্ব্বাগ্রে গভীর জীবরহস্যের তলস্পর্শ করিয়াছিল; এই জাতি সর্ব্বাগ্রে মনুষ্যের জড় প্রকৃতির মধ্যে বুদ্ধি ও হৃদয়ের প্রাধান্য জ্ঞাত হইয়াছিল; ধর্ম্ম এই জাতির সর্ব্বস্ব ধন; ব্রহ্ম এই জাতির চিরারাধ্য গৃহদেবতা। আমরা এই হিন্দু জাতিতে জন্মিয়াছি; যাঁহারা পৃথিবীর ধর্ম্মবীর তাঁহারা আমাদের পূর্ব্বপুরুষ; যাঁহারা মর্ত্ত্যে অনাস্থা ও অমৃতে আস্থা রাখিয়া "যেনাহং না মৃতাস্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং" এই মহার্থ বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন, আমরা সেই সকল স্ত্রীলোকের স্তনদুগ্ধে মনুষ্য; এক্ষণে এমন কি সত্যের প্রবর্ত্তনা আছে, এমনই বা কি প্রলোভন আছে যে পৃথিবীর এই চিরগৌরবস্থল ধর্ম্মপ্রধান জাতিকে কৃতঘ্নের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া আপনার স্বতন্ত্র জাতিত্ব সমর্থন করিতে হইবে। এই জন্য আদিব্রাহ্মসমাজ ভাবে হিন্দু, জীবনে হিন্দু; আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রাচীন বেদ বেদান্তের উচ্চ ও গভীর ভাবের একটী স্বাভাবিক বিকাশমাত্র; ইহার প্রত্যেক শিরা উপশিরা পবিত্র হিন্দু ভাবে অনুস্যূত।

এখন চতুর্দ্দিকে ইংরাজী বিদ্যার প্রভাব চলিতেছে। বিজাতীয় ধর্ম্ম, বিজাতীয় আচার, আমাদের বাল্য-সংস্কারের সহিত জড়িত ও প্রকৃতিগত হইয়া যাইতেছে। ইহার বলে এখন হিন্দুসমাজে একটী ঘোরতর বিপ্লব উপস্থিত; ইহার বলে সামাজিক বিপ্লব, পারিবারিক বিপ্লব ও আধ্যাত্মিক বিপ্লব উপস্থিত; এখন ভাবের সহিত ভাবের এবং চিন্তার সহিত চিন্তার বিপ্লব। অতীত-

সাক্ষী ইতিবৃত্ত কহিতেছেন, ভিন্ন ভিন্ন দেশে যখন যখন যে সমস্ত বিপ্লব ঘটিয়াছিল অনুসন্ধানে তাহার দুই একটী কারণ অনুভূত হইবে; হয় রাজনৈতিক অত্যাচার নয় পৌরোহিত্য অত্যাচার, কিন্তু হিন্দুসমাজের এই যে বিপ্লব ইহাতে কারণকূট উপস্থিত হইয়াছে। এই সঙ্কটকে অসঙ্গত প্রশ্রয় দেওয়া কোনও মতে কর্ত্তব্য নয়। সত্য বটে মোগোল সম্রাটদিগের যথেস্ট উৎপীড়ন ছিল, কিন্তু তাঁহারা ছলে বলে কৌশলে হিন্দুসমাজে এমন অগ্নি জ্বলাইয়া দেন নাই। এখন এই ইংরাজ রাজত্বে পুত্র পিতার নয়, ভ্রাতা ভ্রাতার নয়; কন্যা মাতার নয় এবং স্বামী স্ত্রীর নয়। প্রত্যেকের স্বার্থ স্বতন্ত্র, এবং আশা স্বতন্ত্র। যদি কিছু দিন হিন্দুসমাজ এই ভাবে চলে তবে আমরা ভবিষ্যৎ বাক্যে কহিতেছি অচিরাৎ ইহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।

যখন এইরূপ বিপ্লবে জনসমাজ সাঙ্ঘাতিক আঘাত পাইবার সম্ভাবনা তখন নিজের ধর্ম্ম ও নিজের ব্যবহারই তাহাকে অটল রাখিতে পারে। হিন্দুকুলকেতু দূরদর্শী রাজা রামমোহন রায় হিন্দুসমাজের এই বিষম বিঘ্ন শান্তিকরিবার জন্য বিশ্বজনীন ব্রাহ্মধর্ম্মে হিন্দুভাব অর্পণ করিয়া যান। আদি ব্রাহ্মসমাজ এই অর্দ্ধশতাব্দী কাল সেই ভাব প্রাণপণে পোষণ করিতেছেন। ঋষিগণসেবিত ভারতের সেই পুরাণ ব্রহ্মই আমাদের পূজ্য এবং ঋষিমুখনির্গত সদাচারই আমাদের সেব্য।

এখন যে যে স্থানে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিতে গেলে সমস্তই এই আদি ব্রাহ্মসমাজের সন্তানসন্ততি। তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সন্তান সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে আজ আমরা সর্ব্বাগ্রে আলোচনা-স্থলে আনিলাম। প্রথমত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এই নামটী অতি উত্তম, কিন্তু তাহার আকৃতি ও প্রকৃতি এমন হওয়া চাই যাহাতে ঐ নামটী সার্থক হয়। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিধি ব্যবস্থা যদি সাধারণের জন্য হইত তবে সাধারণ নাম সার্থক হইত; কিন্তু ফলিতার্থে তাহা নয়। এই হিন্দুজাতির মধ্যে বেদবেদান্তেরই সমধিক সমাদর, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে তাহার তত্তটা আদর ও গৌরব দৃষ্ট হয় না। সুতরাং ব্রাহ্মসাধারণ এই সমাজে যোগ দিতে পারেন না। সাধারণ সমাজের ব্রাহ্মেরা অবশ্য অবতারবাদ আদেশবাদ প্রভৃতি কতকগুলি বাদানুবাদ হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়াছেন কিন্তু আবার নিরীশ্বর বিবাহে অনুমোদন করিয়া প্রকারান্তরে কুসংস্কারকেই পোষণ করিতেছেন। কোন্ ব্রাহ্ম জীবন্ত ঈশ্বরকে অসম্মান করিয়া বিবাহের ন্যায় একটী প্রধান সামাজিক ব্যাপারে এক জন কীটানুকীট মনুষ্যের সাক্ষিতা বলবৎ রাখিতে পারেন। এটী সাম্প্রদায়িক ব্যাপার, সাধারণের নয়। এতদ্ব্যতীত সাধারণ সমাজ বৈদেশিক অনুকরণে সুপটু ও সুশিক্ষিত। সেই অতিরিক্ত ও পূর্ণ মাত্রায় স্ত্রীস্বাধীনতা, সেই বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক কার্য্যে পাশ্চাত্য প্রথার পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসরণ তাঁহাদের মধ্যে বিলক্ষণই আছে, তবে কিরূপে ব্রাহ্মসাধারণ তাঁহাদের সহিত যোগ দিতে পারেন। আমাদের বিবেচনায় সাধারণ নাম গ্রহণ তাঁহাদের অনুপযুক্ত হইয়াছে। এক্ষণে উপসংহারে এই মাত্র উপদেশ যদি ব্রাহ্মসমাজের দ্বারা ভারতবর্ষের কিছুমাত্র উপকার করিবার প্রত্যাশা থাকে তবে ভারতবর্ষীয় উপাদানে তাহাকে প্রস্তুত কর, নচেৎ তদ্দ্বারা এতদ্দেশের বিশেষ কোন উপকার দর্শিতে পারিবে না।

পরকাল।

৪২৫ সংখ্যক পত্রিকার ১৭০ পৃষ্ঠার পর।

মনুষ্যের আদিম অবস্থাতে যখন তাহাদের বুদ্ধিশক্তি নিতান্ত তরুণ ও জ্ঞান-সীমা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ছিল, সেই সময়েই আত্মা সম্বন্ধীয় মূল-ভাব সকল মনুষ্য হৃদয়ে স্বভাবতঃ উদয় হয়। আমাদের আদিম জ্ঞান সকল উপলক্ষ পাইলেই উদয় হইয়া থাকে, অতএব আত্মা সম্বন্ধীয় মূলভাব সকল যে উপলক্ষ পাইয়া অতি প্রথমেই মানব হৃদয়ে উদয় হইবে, ইহা স্বাভাবিকই বটে। কারণ মনুষ্য যখন চিন্তা করিতে সক্ষম হয়, তখন সে যে নিজেই তাহার চিন্তার প্রথম বিষয় হইবে, তাহাতে আর জিজ্ঞাসার কি আছে; নিতান্ত অস্পষ্ট ভাবে হইলেও আত্মবোধই তাহার প্রথম চিন্তার ফল। যাহা হউক মনুষ্যের আত্ম-বোধ প্রবুদ্ধ হইলে পর ইতস্ততঃ বিশাল পরিবর্ত্তন সকল নিয়ত প্রত্যক্ষণ উপলক্ষ পাইয়া তাহার চিন্তা আত্মপরিণাম অবধারণে নিয়োজিত হয়, এবং তাহার ব্যাকুল জিজ্ঞাসার এই উত্তর সে নিজ আত্মার নিকট হইতেই প্রাপ্ত হয় যে সে জড়ের ন্যায় বদ্ধ পদার্থ নহে। সে ইচ্ছা শক্তি অমর। কোন যুক্তি অবলম্বন করিয়া তাহাকে এই তত্ত্বে উপনীত হইতে হয় না। প্রশ্ন তাহার মনে উদয় হইলেই সে এই উত্তর স্বতঃ প্রাপ্ত হয়। যেমন চক্ষু উন্মীলন করিলেই আলোক চক্ষুকে স্পর্শ করে; বিজ্ঞানের উদয়ে এই সত্যও তেমনি আসিয়া তাহার আত্মাকে স্পর্শ করে। যে শক্তি দ্বারা আত্মা এই সহজ সত্য সকল গ্রহণ করে তাহাকে আত্ম-প্রত্যয় বলা যায়। আত্মপ্রত্যয় দ্বারা আমরা কেবল এই মাত্র জানি যে, মৃত্যুতে মানব আত্মা এক কালে ধ্বংশ হয় না। কিন্তু আত্মপ্রত্যয় বলিয়া দেয় না যে মৃত্যুর পর আত্মার কি গতি হইবে। অথচ আবার মানব মনের স্বভাব এই যে সে অসম্পূর্ণ জ্ঞানে সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। সমগ্র তত্ত্ব আয়ত্ত করিব এই উচ্চ আশয়ে সে নিয়ত কণ্ডূয়িত হইতে থাকে। অতএব সে স্বাভাবিক উপায়ে কোন তত্ত্ব আংশিক অবগত হইলে কল্পনাবলে সে যথাসাধ্য আপন অভিরুচি অনুসারে তাহার পূরণ করিয়া লয়। এই জন্য মনুষ্যের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় এই সুযোগ পাইয়া মানব মনে অনেক গুলি স্বাভাবিক কুসংস্কার লব্ধ-প্রবেশ হইয়াছে। তত্তাবৎ সেই সেই অবস্থার এক প্রকার অনিবার্য্য ফল। ভূতে বিশ্বাস এইরূপ স্বাভাবিক কুসংস্কার সকলের অন্যতম।

কিন্তু আমাদের নিরবলম্ব আত্মপ্রত্যয় সকলকে এরূপ কুসংস্কার বলা যাইতে পারে না। তাহারা কেবল সর্ব্বহৃদয়াধিষ্ঠিত বিশ্বজনীন নহে, তাহারা অবশ্য-বিশ্বসনীয় এবং একেবারে অত্যজ্য। যে হেতু তাহারা আত্মার সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষণের অমোঘ ফল। কোন কোন তীক্ষ্ণধী দার্শনিকগণ আমাদের জ্ঞানসমষ্টিকে অর্জ্জিত, শিক্ষিত বা অভ্যস্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য মূল আত্মপ্রত্যয সকলকে স্বাভাবিক কুসংস্কার বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অনেকের পক্ষে তাঁহাদের এই মহান অনর্থকর চেষ্টা নিতান্ত ব্যর্থ হয় নাই। অপরিপক্কবুদ্ধি অনেক যুবকেরা তাঁহাদের যুক্তি সকলকে সারবান জ্ঞান করিয়া ধর্ম্মরাজ্যে বিষম বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছেন। বস্তুতঃ আমাদিগের আত্ম-প্রত্যয়-মূলক আদিম জ্ঞান সকলের সহিত অর্জ্জিত সংস্কার সকল এত বিবিধ প্রকারে আসিয়া মিশিয়াছে যে, তন্মধ্য হইতে সেই মূল জ্ঞান সকল নির্ব্বাচন করিয়া লওয়া

নিতান্ত সহজ হয় না। এবং এই সুবিধা পাইয়া, প্রমানিক পণ্ডিতগণ আদিম জ্ঞান সকলকে স্বাভাবিক কুসংস্কার বলিয়া অদূরদর্শী মোহান্ধ যুবকদিগের মতিভ্রম জন্মাইয়া দিতে সক্ষম হইয়াছেন। কিন্তু আমাদের দেশের কোন শ্রদ্ধেয় তত্ত্বজ্ঞানী, সেই সকল মূল জ্ঞানের যে কয়েকটী সমাচীন সাধারণ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তদ্দ্বারা সেই নিরবলম্ব মূলজ্ঞান সকলকে রাশীকৃত কুসংস্কার সকলের মধ্য হইতেও নির্ব্বাচিত করিয়া লওয়া যাইতে পারে। তিনি যে যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা এই —

১। ২ "যাহার কোন প্রমাণসিদ্ধ যুক্তি দেওয়া যাইতে পারে না অথচ তাহাতে আমরা না বিশ্বাস করিয়া কখনই থাকিতে পারি না, তাহাকে আত্মপ্রত্যয় বলে।" অর্থাৎ আত্মপ্রত্যয় স্বতঃসিদ্ধ এবং অবশ্য বিশ্বসনীয়।

৩। "আত্মপ্রত্যয় সকল দেশের সকল কালের লোকের মনে বিদ্যমান আছে।"

৪। "আত্মপ্রত্যয় মূল প্রত্যয়। সহজ জ্ঞান দ্বারা আমরা যে জ্ঞান লাভ করি তাহা অন্য কোন প্রকারে লভনীয় নহে, তাহাই আমাদের সকল জ্ঞানের পত্তনভূমি।"

(ধর্ম্মতত্ত্ব দীপিকা)

আমাদের জ্ঞানসমষ্টিকে অবহিত হইয়া বিশ্লেষিত করিলে আমরা এমন অনেকগুলি জ্ঞান দেখিতে পাই যাহাদিগকে এই লক্ষণচতুষ্টয়ের অন্তর্নিবিষ্ট করা যায়। দার্শনিকেরা তত্তাবৎকে আদিম-জ্ঞান, মূল-জ্ঞান, মূল-প্রত্যয়, আত্মপ্রত্যয়, স্বতঃসিদ্ধ-বিশ্বাস, স্বাভাবিক-জ্ঞান, প্রতিবোধ বা সংজ্ঞা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। তৎসমূহ আমাদের স্বাভাবিক মূল-জ্ঞান বা বিশ্বাসের সাধারণ নাম। জগতে দুই প্রকার পদার্থের বিদ্যমানতা দেখা যায়, সুতরাং আমাদের স্বাভাবিক জ্ঞানও দুই প্রকার। ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক। এই দুই জাতীয় জ্ঞানের বিষয় মাত্র প্রভিন্ন কিন্তু উহাদের প্রকার বা প্রামাণ্যের কিছু মাত্র তারতম্য নাই। প্রামানিক পণ্ডিতেরা অকারণে, কিম্বা অতি অযুক্তিসহ কারণে মানব মনের লোকাতিগ শক্তি অস্বীকার করিয়া আধ্যাত্মিক জ্ঞানের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। অথবা তাঁহাদের দোষ কি? তাঁহাদের বুদ্ধি এক দেশ-দর্শী হইয়া গিয়াছে। যেমন শারীরিক কোন অঙ্গ দীর্ঘ কাল একভাবে ব্যবহৃত হইলে কি একবারে অব্যবহৃত হইলে সেই অঙ্গের স্বাভাবিক শক্তি সংকীর্ণ হইয়া যায়; নিয়ত ভৌতিক জগতে বিনিবেশিত থাকিয়া ইহাঁদের মনেরও সেইরূপ স্বাভাবিক ব্যাপক শক্তির হ্রাস হইয়া, আধ্যাত্মিক জ্ঞানের প্রতি তাঁহাদের অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছে। সেই জন্যই বলি, দোষ ইহাঁদের নহে। দোষ বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার ও সভ্য সমাজের। মূল ধরিতে গেলে কিন্তু সকল দোষ মহাত্মা লর্ড বেকনের ঘাড়ে পড়ে। তিনিই বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার মূলপ্রতিষ্ঠাতা। সত্য বটে তিনি দার্শনিক জগতের মহান্ ক্ষেমঙ্কর বিপ্লব সাধন করিয়া গিয়াছেন। তিনি মনুষ্যের চিন্তার গতি অলীক বিষয় হইতে সত্যের দিকে আনয়ন করিয়াছেন; গবেষণার অনিশ্চিত অনিয়মিত প্রণালীর পরিবর্ত্তে বিহিত সুপ্রণালী প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন; সংক্ষেপত তিনি বর্ত্তমান ইউরোপীয় উন্নতি ও সভ্যতার সূত্রপাত করিয়াছেন। সুতরাং বেকনের অনুবর্ত্তীরা দম্ভভাবে বলিতে পারেন, "তাঁহার দর্শন দ্বারা মনুষ্যেরা দীর্ঘজীবি হইয়াছে, কষ্টের হ্রাস হইয়াছে; রোগ সকল নিরাকৃত হইয়াছে; ভূমির উর্ব্বরা শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে। উহা

নাবিকগণকে নূতন নূতন আশ্রয় ও অবলম্বন প্রদান করিয়াছে; যোদ্ধাদিগকে নব নব অস্ত্র শস্ত্র আহরণ করিয়া দিয়াছে। সুরলোক হইতে অশনি অবতারণ করিয়া ইহা নির্ব্বিঘ্নে ধবাতলে সংরক্ষণ করিয়াছে, ইহা দিবালোক দ্বারা রাত্রিকে আলোকিত করিয়াছে; মানবদৃষ্টিকে দূরপ্রসারিত করিয়াছে; এবং তাহাদের বাহুবল বৃদ্ধি করিয়াছে। ইহার দ্বারা গতির বেগ ত্বরিত হইয়াছে, দূরত্ব সংকোচিত হইয়াছে। ইত্যাদি অশেষবিধ উপকার সাধন করিয়া বেকনের দর্শন মানবগণকে সুখ ও সুবিধাপূর্ণ বর্ত্তমান সভ্যতায় উন্নমিত করিয়াছে।” স্বীকার করি,—কিন্তু জিজ্ঞাসা করি বেকন-দর্শন প্রাগুক্ত নশ্বর পার্থিব সুখ ও সুবিধা বিস্তার করিয়া অমর মানব আত্মার কি উপকার বা উন্নতি সাধন করিয়াছে? বেকন-দর্শনের লক্ষ্য ঊর্দ্ধ দিকে না অধোদিকে?

মেকলে বলেন “মনুষ্যকে-পূর্ণ করিয়া তোলা বেকনের উদ্দেশ্য ছিল না। অপূর্ণ মনুষ্যকে সুখে সচ্ছন্দে রাখাই তাঁহার বিনত্র উদ্দেশ্য ছিল।” বেকনের এই সঙ্কীর্ণ উদ্দেশ্য সিদ্ধও হইয়াছে। বর্ত্তমান ইউরোপীয় সমাজে লোকের সুখ সচ্ছন্দতার দিকে দৃষ্টি যেরূপ সাগ্রহ, প্রকৃত মনুষ্যত্বের দিকে ধর্ম্মের দিকে সে রূপ নহে। তিনি ধর্ম্মকে মানব লক্ষ্যের প্রধানতম বিষয় বলিয়া উপদেশ না দিয়া সুখ সচ্ছন্দতাকেই প্রাধান্য প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার মতে ধর্ম্ম সুখের সাধন মাত্র; সুখই মূল। যে সমাজ এরূপ মূল-সূত্রে সংরচিত, যে সমাজে বেকনের এই মারাত্মক মত সকল অব্যক্ত বা ব্যক্তভাবে সবিশেষ সমাদৃত সে সমাজের লোকের আধ্যাত্মিক জ্ঞানের প্রতি অশ্রদ্ধা দর্শন করিলে সেই সমাজ ও সমাজরচয়িতার প্রতি দোষারোপ করা উচিত হয়। মনুষ্য সমাজের অনুগত, অভ্যাসের দাস। অতএব ইউরোপে যে প্রামাণিক দর্শনের প্রতি অত্যধিক আদর হইবে এবং প্রামাণিকেরা যে অতীন্দ্রিয় সত্য সকলের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবে তাহাতে আশ্চর্য্যের কি আছে! সুখসচ্ছন্দতার জন্য তাহাদের চিত্তবৃত্তিসকল ভৌতিক জগতেই নিবদ্ধ। আধ্যাত্মিক জগত সম্বন্ধে তাহাদের মনের অতিগ শক্তি একেবারে অসাড় হইয়া গিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তবে যে ইউরোপীয় সমাজে দুই এক জন ধর্ম্মবুদ্ধি মহাপুরুষের আবির্ভাব মধ্যে মধ্যে দৃষ্ট হয় তদ্দ্বারা অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক সত্যের দুর্জ্জয় বলই প্রমাণিত হয়। উদ্গামনশীল আত্মার উপর বেকন-দর্শন স্বীয় পার্থিব প্রভাব সম্পূর্ণ রূপে বিস্তার করিতে পারে না, ইহাই প্রমাণিত হয়। আমাদের বিবেচনায় যত দিন ইউরোপে বেকন-দর্শনের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রহিবে, যত দিন তথায় সুখের জন্য ভৌতিক জগতেরই সমাদর থাকিবে, ধর্ম্মের মূল তত দিন তথায় অব্যাহত রূপে প্রসারিত হইতে পারিবে না এবং অতীন্দ্রিয় সত্য সকলও সমুচিত আদৃত হইবে না।

যাহা হউক, ইউরোপীয় সমাজে আধ্যাত্মিক তত্ত্বের প্রতি লোকের অশ্রদ্ধা দেখিয়া আমরাও যেন সে রূপ অশ্রদ্ধা করিতে শিক্ষা না করি। আমাদের এই ভারতবর্ষ সত্য সনাতন ধর্ম্মের আকরস্থান। ভারতবর্ষে যেন ধর্ম্মের অবমাননা না হয়। এখানে ইউরোপীয় অনুকরণে ভৌতিক তত্ত্ব সকল বিশদ রূপে সমালোচিত হয়, ইহা প্রার্থনীয় বটে। কিন্তু আধ্যাত্মিক তত্ত্বের প্রতি যেন আমাদের অভক্তি না জন্মে। ভৌতিক তত্ত্ব সকল যেমন প্রামাণিক, আধ্যাত্মিক মূল তত্ত্ব সকল তেমনি প্রামাণিক। আধ্যাত্মিক মূলতত্ত্ব সকল যেমন আমরা আত্মপ্রত্যয়

দ্বারা লাভ করি ভৌতিক মূলতত্ত্ব সকলও তেমনি আত্ম-প্রত্যয় দ্বারা লাভ করিয়া থাকি। উভয়বিধ মূল-জ্ঞানের প্রতি আমরা কোন যৌক্তিক প্রমাণ প্রদর্শন করিতে পারি না। তবে একেকে বিশ্বাস করিয়া অকারণ অন্যকে অগ্রাহ্য করিলে কি দার্শনিক বিধি উল্লঙ্ঘন করা হয় না? আমরা ভৌতিক জগতের বাহ্য সত্য সকলকে যেমন বাহ্য ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করি, অন্তর্জগতের অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সকলকেও তেমনই অন্তরিন্দ্রিয় দ্বারা স্বয়ং আত্মার দ্বারা গ্রহণ করিয়া থাকি। প্রতিবোধ বা সংজ্ঞা বাহ্য জগত সম্বন্ধেও যেমন আধ্যাত্মিক জগত সম্বন্ধেও তেমনই বলবৎ প্রমাণ। এই প্রতিবোধ সর্ব্বপ্রকার প্রমাণের চরম আশ্রয়। প্রতিবোধের সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করা ন্যায়ের ব্যভিচার।

কিন্তু ঈশ্বর যে জ্ঞানময় মঙ্গলময় ও সর্ব্বশক্তিমান এক কথায় তিনি যে পূর্ণ পুরুষ তৎবিষয়ে আধ্যাত্মিক প্রতিবোধের সাক্ষ্য অমান্য করিয়া কেহ কেহ যুক্তির দ্বারা তাঁহার পূর্ণত্বের প্রতিবাদ করিয়াছেন। তদ্দৃষ্টে ঈশ্বরপ্রাণ ভক্তদিগকে ব্যথিত হইতে হয়। প্রতিবাদিরা জগতে অমঙ্গলের সম্ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া, আমাদের আধ্যাত্মিক প্রতিবোধের বিপরীত যুক্তি দ্বারা ঈশ্বরের অপূর্ণত্ব প্রতিপাদনে সচেষ্ট হইয়াছেন। তাঁহাদের চেষ্টা কতদূর সফল হইয়াছে এবং তাঁহাদের এরূপ চেষ্টা সঙ্গত কি না, অতঃপর ইহাই দেখা কর্ত্তব্য হয়। কিন্তু আমাদের সংকল্প অতিক্রম করিয়া প্রস্তাবটী অতিশয় দীর্ঘ হইয়া উঠিবার আশঙ্কায় ঈশ্বরের পূর্ণত্ব যে সিদ্ধ সত্য মূল সত্য, অর্জ্জিত সংস্কার নহে, ইহার প্রমাণ জন্য আমরা "ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা" ও "সায়েন্স আব্ রিলিজন" নামক পুস্তক দ্বয়ের উপর বরাত দিয়া সুবিস্তার ঈশ্বরস্বরূপ চর্চ্চায় বিরত হইলাম। উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের প্রণেতা সংশয়বাদীদিগের সর্ব্বপ্রকার সম্ভাব্য আপত্তি খণ্ডন করিয়া ধর্ম্মতত্ত্ব সকল অতি বিশদ রূপে সাব্যস্ত করিয়াছেন। অতএব পাঠক মহাশয়দিগকে উক্ত পুস্তকদ্বয়ের উপর বরাত দিয়া আমরা সংক্ষেপে এইমাত্র বলিতেছি যে প্রতিবোধকে অবহেলা করিয়া শুদ্ধ যুক্তি অবলম্বন পূর্ব্বক প্রতিবোধের বিষয় খণ্ডন করিবার চেষ্টা নিতান্ত হাস্যকর চেষ্টা। প্রমাণ বল, যুক্তি বল এসমস্ত কাহার প্রবোধের জন্য? সত্য তত্ত্ব সকল আমাদের প্রতিবোধকে বিশদরূপে বুঝাইয়া দিবার জন্যই কি এই সমস্ত কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করা হয় না? যদি তাহাই হয় তাহা হইলে প্রতিবোধ স্বয়ং যে সত্য দর্শন করিয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শন করা সুবুদ্ধির কার্য্য নহে। অর্জ্জিত জ্ঞানের সত্যতা প্রতিবোধের প্রতীতি করণ জন্য যুক্তি আদির প্রয়োজন হয়, কিন্তু স্বয়ং প্রতিবোধের দৃষ্ট আত্মপ্রত্যয় মূলক সত্য সম্বন্ধে যুক্তি প্রভৃতি কোন কার্য্যকর নহে।

ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা প্রণেতা অতি স্পষ্টরূপে প্রমাণ করিয়াছেন যে সেই অলৌকিক পদার্থ (ঈশ্বর) আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয়। বাহ্য বস্তু সকল যেমন প্রত্যক্ষ করা যায়, ঈশ্বরকেও সেইরূপ প্রত্যক্ষ করা যায়; এবং ঈশ্বরের ভাব মূল ভাব তাহা সংস্কার বা উপার্জ্জিত জ্ঞান নহে। অপর পক্ষে প্রামাণিক পণ্ডিত মহাশয়েরা ঈশ্বরের ভাবকে অর্জ্জিত মিথ্যাসংস্কার বলিয়া যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করিবার চেষ্টায় কৃতকার্য্য হয়েন নাই। তবে ভক্তের মন তাঁহাদের অসার বাক্যাড়ম্বরে ভুলিবে কেন? তিনি স্বীয় উপাস্য দেবতাকে পূর্ণ স্বরূপ রূপে আপন হৃদয়ে দর্শন করিয়াছেন, কোন যুক্তিই তাঁ-

হার মন হইতে এই ভাব অপসারিত করিতে পারিবে না। আমার সম্মুখস্থ বৃক্ষের প্রতিবোধ কি কোন যুক্তির দ্বারা অপসারিত হইতে পারে? বাহ্য পদার্থ সম্বন্ধে যদি বা কদাচিৎ ইহা সম্ভব হয়, আধ্যাত্মিক পদার্থ সম্বন্ধে কখনই সম্ভব নহে। বাহ্য জ্ঞান সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়ের মধ্যবর্ত্তিতার প্রয়োজন হয়, কিন্তু আধ্যাত্মিক সত্য সকল আত্মাকে অগৌণে স্পর্শ করে। ঈশ্বরের ভাব আধ্যাত্মিক সত্য। আত্মা ঈশ্বরকে জগতের সম্পূর্ণ নির্ভরস্থল পূর্ণ পুরুষ রূপে সাক্ষাৎ দর্শন করে। মন তাঁহাকে ধারণ করিতে না পারুক, বুদ্ধি তাঁহার স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতে সক্ষম না হউক, তাহাতে কিছুই আইসে যায় না। আত্মা তাঁহাকে যে ভাবে দর্শন করে, সেই রূপই বিশ্বাস করে। এই বিশ্বাস অটল, কিছুতেই বিচলিত হইবার নহে। অতএব যুক্তি দ্বারা ঈশ্বরের পূর্ণতাখণ্ডনের চেষ্টা করা নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন।

কিন্তু আমরা ইহাও বলি যে যুক্তির দ্বারাও ঈশ্বরের পূর্ণত্ব খণ্ডন হইবার নহে। যাহা সত্য, তাহা সত্যই। সহস্র পরীক্ষাতেও সত্যের কিছু মাত্র অপচয় হয় না। তবে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আমরা যেমন প্রত্যক্ষ কোন ভৌতিক সত্যকে অন্য কোন সিদ্ধ সত্য দ্বারা অপ্রমাণিত না করিতে পারিলে আমরা তাহাতে বিশ্বাস করিতে বাধ্য হই বস্তুতঃ বিশ্বাস করিয়া থাকি, ঈশ্বর সম্বন্ধেও সেইরূপ করা অবশ্য কর্ত্তব্য হয়। কোন ভৌতিক প্রত্যক্ষ সত্যকে পরীক্ষাকালীন আমরা যেমন তাহাকে অপর অবিসম্বাদিত সত্য সকলের সহিত সমন্বয় করিয়া তাহার নিশ্চয়সিদ্ধি পরীক্ষা করি; ঈশ্বরের ভাব সম্বন্ধেও সেইরূপ করা উচিত হয়। এই জগৎ এক মাত্র অদ্বিতীয় পূর্ণ পুরুষের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে, এই সত্যটি আমরা আত্মার দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতেছি। কিন্তু ইহার প্রতি সন্দিহান হইয়া, (সন্দেহ করিবার অধিকার অবশ্যই আমাদের আছে) যদি আমরা ইহার পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে ইহার সহিত অবিসম্বাদিত অপর কোন সত্যের সমন্বয় করিয়া দেখা উচিত। জগতে অমঙ্গলের সদ্ভাব অবিসম্বাদিত। অতএব আমাদের প্রত্যক্ষীভূত ঈশ্বরের পূর্ণত্ব ভাবের যাথার্থ্য পরীক্ষা যুক্তির দ্বারা করিতে হইলে অবিসম্বাদিত অমঙ্গলের সহিত উক্ত প্রত্যক্ষীভূত পূর্ণত্বের সমন্বয় হয় কি না, ইহারই বিচার করা বিধেয় হয়। তাহা না করিয়া বিলোম প্রণালী অবলম্বন পূর্ব্বক এতৎ বিষয়ের সিদ্ধান্ত করিতে গেলে মহাপ্রমাদে পড়িতে যে হইবে, ইহা বিচিত্র নহে। আমাদের প্রদৃপ্ত প্রামাণিকেরা প্রভৃতি বিলোম প্রণালীই অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহারা বিচারকালে আত্মার প্রত্যক্ষ-সমীক্ষিত ঈশ্বর-ভাব শিক্ষা ও অভ্যাস দোষে বিস্মৃত হইয়া পাপতাপপূর্ণ জগৎ অবলম্বন পূর্ব্বক, জগৎকারণের স্বরূপ নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। অপূর্ণ পদার্থের অনুসরণ করিয়া পূর্ণত্ব নির্দ্ধারণ করণার্থে চেষ্টার পরিণাম বিড়ম্বনা অবধারিত। প্রামাণিক পণ্ডিতদিগের মধ্যে একদল খণ্ড আস্তিক আছেন। তাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন কিন্তু তাঁহাকে পূর্ণ বলিয়া স্বীকার করেন না। সেই খণ্ড আস্তিকেরা জগতে কৌশল দেখিয়া, কৌশলকর্ত্তা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কৌশলাত্মক যুক্তিই (Design argument) শ্রেষ্ঠতম ও সর্ব্বাপেক্ষা প্রবোধদায়ক যুক্তি। অপিচ ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রকৃতি দৃষ্টে অনুমান মাত্র। (God is only an inference from Nature.) এবং জগৎ রূপ অভি-

ব্যক্তির কারণ নির্দ্দেশ করণ জন্যই ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা। (Divine Intelligence is but an assumption to account for the phenomena of the universe.) এই কৌশলাত্মক যুক্তি প্রামাণিকদিগের স্বকপোল-উদ্ভাবিত নহে। ইহা অতি প্রাচীন ও স্বাভাবিক যুক্তি। ইউরোপের অনেকানেক বাস্তবিক আস্তিক দার্শনিক যুক্তির দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ জন্য এই অসম্পূর্ণ যুক্তির উপর বিশেষরূপ নির্ভর করিয়াছেন। স্বভাবের গতি নিরোধ হইবার নয় বলিয়া যদিও তাঁহারা আত্মার অতীন্দ্রিয় শক্তি দ্বারা ঈশ্বরকে অব্যক্ত অনন্ত রূপে দর্শন করিয়াছেন কিন্তু দুর্ব্বল অতিগ-শক্তি-বিশিষ্ট ইউরোপীয় মনে উক্ত ভৌতিক যুক্তি যে বলবত্তর বলিয়া প্রতীত হইবে তাহা এক প্রকার পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, বেকন-দর্শন ইউরোপীয় মনের অতিগ শক্তি আসাঢ় প্রায় করিয়া তুলিয়াছে, অতীন্দ্রিয়-যুক্তি—আধ্যাত্মিক যুক্তি—যুক্তি কেন—আধ্যাত্মিক প্রত্যক্ষ তাহাদিগের নিকট বলবৎ প্রমাণ বলিয়া প্রতীত হয় না। তাহাদের মনের উপর ভৌতিক আকর্ষণের বলই অধিকতর। কিন্তু আমাদের ব্রহ্মদর্শী ব্রহ্ম-প্রাণ আর্য্য ঋষিরা আধ্যাত্মিক প্রত্যক্ষকেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে বলবত্তম প্রমাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। বেকন-শিষ্যদিগের মনে যাহাই হউক আমরা প্রাগুক্ত ভৌতিক যুক্তিকে বলবত্তম বা সম্পূর্ণ বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। প্রত্যক্ষণকেই আমরা সর্ব্বাপেক্ষা বলবৎ প্রমাণ বলিয়া জ্ঞান করি। বস্তুতঃ এ বিষয়ে আমরা প্রত্যক্ষবাদিদিগের অপেক্ষা অধিকতর প্রত্যক্ষবাদী। প্রাগুক্ত যুক্তি ঈশ্বরের কেবল অস্তিত্ব—"অস্তীতি কেবলং" প্রমাণ জন্য বরং বলবৎ প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে, কিন্তু তাঁহার পূর্ণত্বপ্রমাণ পক্ষে উহার কার্য্যকারিতা অতি সঙ্কীর্ণ ও অপ্রচুর। আত্মা শক্তি-বিশেষ দ্বারা ভূমা ঈশ্বরকে দর্শন করে মাত্র তাঁহাকে ধারণ করিবার শক্তি তাহার নাই। তিনি বাক্য মনের অগোচর সুতরাং যুক্তি দ্বারা বিশেষতঃ ওরূপ যুক্তি দ্বারা ঈশ্বরের পূর্ণত্ব ভাবে তাঁহার আয়ত্ত করিয়া দিবার চেষ্টা নিষ্ফল, কাজেই নিস্প্রয়োজন।

ঈশ্বরকেত আমরা সকলেই পূর্ণ পুরুষরূপে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিতেছি। যদি কেহ কেহ তাঁহাকে দেখিতে না পান, স্বভাব-দোষে না পান, শিক্ষা ও অভ্যাস-দোষে না পান, তাহা হইলে তাঁহাদের কি করা কর্ত্তব্য! আমরা বলি বিশ্বস্ত লোকের কথায় প্রথমতঃ বিশ্বাস করিয়া তৎপরে তাহার পরীক্ষার্থে যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য। এবিষয়ে বিশ্বস্তলোক কাহারা না যাঁহারা ঈশ্বরপ্রেমী সাধু আত্মা। উক্ত আধ্যাত্মিক অন্ধেরা এই সাধু পুরুষদিগকে সকল বিষয়ে বিশ্বাস করেন। এমন কি ইহাঁদের হস্তে যথাসর্ব্বস্ব প্রাণ পর্য্যন্ত সমর্পণ করিয়া নিরুদ্বেগ হইতে পারেন, কেবল এই কথাটী বিশ্বাস না করিয়া বিশ্বাসের নিয়ম লঙ্ঘন করেন কেন? অন্ধেরা চক্ষুষ্মাণ ব্যক্তির কথায় বিশ্বাস করিয়া কি নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য করে? অতএব অবিশ্বাসকারিদিগকে বলি, প্রত্যক্ষ ঈশ্বর-বিভূতি তোমরা যদি দেখিতে না পাও এবং শ্রদ্ধেয় লোকের বাক্যেও প্রত্যয় করিতে না চাও, তাহা হইলে প্রতিকূল প্রমাণের ভার তোমাদেরই উপর পতিত হইতেছে। ঈশ্বর-ভাব সম্বন্ধে এরূপ প্রতিকূল প্রমাণ প্রদর্শন করিতে কেহই কখন সক্ষম হয়েন নাই; নিশ্চয় বলা যাইতেছে, কেহ কখন হইবেনও না। এত কাল তাঁহারা যে সমস্ত বিরুদ্ধ মত প্রচার করিয়া আসিয়াছেন, তাহা মতই মাত্র, অনুমান মাত্র। তৎভাবৎ ন্যায়সঙ্গত প্র-

মাণ নহে। আবহমান কাল এইরূপ কল্পিত মতই প্রচার হইয়া আসিয়াছে, যদি মূলের দিকে না দৃষ্টি রাখা যায়, চিরকাল এই রূপই মত প্রচার হইতে থাকিবে। শুদ্ধ মত বা অনুমান দ্বারা প্রত্যক্ষ সত্যের খণ্ডন চেষ্টার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নাই। এরূপ কল্পিত মত মহাধী ব্যক্তিদিগের প্রসবিত হইলে, তাহা আপাততঃ আমাদের সঙ্কীর্ণ বুদ্ধিবৃত্তিকে চমৎকৃত করিতে পারে, কিন্তু বিশ্বাসকে চরিতার্থ করিতে পারে না। বিশ্বাসের প্রসার বুদ্ধিকে অতিক্রম করিয়া বহুদূর বিস্তৃত।

পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, শুদ্ধ যুক্তি দ্বারা প্রত্যক্ষ আধ্যাত্মিক সত্যকে খণ্ডন করিবার চেষ্টা নিষ্ফল। এরূপ প্রত্যক্ষ সত্যকে পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা কর; বাধা নাই। কিন্তু তৎপক্ষে বিলোম প্রণালী প্রশস্ত নহে। পরীক্ষা করিতে হইলে, অবিসম্বাদিত অন্য কোন সত্যের সহিত তাহার সমন্বয় করা উচিত হয়। বস্তুতঃ আমরা এই রূপ প্রণালী অবলম্বন করিয়াই সংশয়বাদিদিগের সন্তোষার্থ, ঈশ্বরের পূর্ণত্বের পরীক্ষা করিব।

ক্রমশঃ।

মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজ।

ষট্‌ত্রিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব।

১৮০০ শক।

এই দৃশ্যমান জগতের এক জন স্রষ্টা আছেন ইহা বিশ্বজনীন বিশ্বাস। সমস্ত জগৎ কৌশল ও সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ। সে কৌশল ও সৌন্দর্য্যের মূল কি জড়শক্তি? এক খানি সুচিত্র দেখিলে আমরা চিত্রকরের জ্ঞানবত্তা ও বুদ্ধিমত্তা স্বীকার করিয়া থাকি। আর যাঁহার হস্তের সুনিপুণ তুলিকায় এই জগচ্চিত্র সুরঞ্জিত হইয়াছে ও সুসজ্জিত হইয়াছে কোন্ মানব তাঁহাকে পূর্ণজ্ঞান ও পূর্ণশক্তিসম্পন্ন বলিয়া স্বীকার না করিবে? যে মানব রজনীতে ঊর্দ্ধে জালনিবদ্ধ সন্ধ্যাতীত দীপালোকের ন্যায় গ্রহতারা চন্দ্রমার প্রতি নেত্রপাত করিয়াছেন; এবং একবার স্থিরচিত্তে তাহাদের স্থিতি, গতি ও শৃঙ্খলার বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন, তিনিই তাহাতে সেই বিশ্বশিল্পীর করতূলিকার জাজ্বল্যমান চিহ্ন অনুভব করিয়া মোহিত হইয়াছেন। যে ব্যক্তি একটী শিরাবিশিষ্ট গলিত অশ্বত্থ পত্র স্থিরনেত্রে নিরীক্ষণ করিয়াছেন, তিনি তাহাতে তাহার রচয়িতার আশ্চর্য্য কৌশল দর্শন করিয়া বিস্ময়ে মগ্ন হইয়াছেন। যে শবব্যবচ্ছেদক পণ্ডিত জীব-শরীর-ব্যাপ্ত শিরা ও ধমনীজালের অবস্থান ও ক্রিয়া নিবিষ্টচিত্তে পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, তিনিই তাহার নির্ম্মাতার জ্ঞান ও কৌশল বুঝিতে পারিয়াছেন। স্থূলভাবেই দর্শন কর, আর সূক্ষ্মরূপেই পর্য্যালোচনা কর এই জগতের মূলে এক জ্বলন্ত জীবন্ত শক্তি দেখিতে পাইবে।

এই জগতের যিনি স্রষ্টা, তিনি আমারও নির্ম্মাতা। যিনি বিশ্বসংসারের মঙ্গলবিধাতা, তিনি আমারও সুখদাতা। আমার অনন্ত কালের সুখমোক্ষদাতা। তিনি আমাদের সকলেরি সুখশান্তিদাতা। তিনি যেমন আমাদিগের বিধাতা তেমনি তিনি আবার আমাদের অন্তরের প্রিয়সখা। সেই অন্তরতম সখার দর্শন ও আলিঙ্গনে পরম সুখলাভ হয়। সেই সুখই মনুষ্য জীবনের প্রকৃত সুখ। তাহাই আমাদের আত্মার অনন্ত কালের উপজীব্য।

ব্রাহ্ম ধর্ম্ম যেমন বলেন যে জগৎকারণ একমাত্র ঈশ্বর আছেন তেমনি ইহাও বলেন যে জড় শরীর হইতে স্বতন্ত্র অভৌতিক জীবাত্মা আছে। সেই আত্মা অনন্তকাল

থাকিবে, তাহার ক্ষয় নাই; উত্তরোত্তর স্বর্গরাজ্যে উন্নত হইবে ও অনির্ব্বচনীয় স্বর্গীয় সুখ উপভোগ করিবে। আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্মে অনন্ত নরকের বিভীষিকা নাই। মঙ্গলময় ঈশ্বর কেবল সংশোধনের জন্য পাপের দণ্ডবিধান করিবেন। স্বর্ণকার যেমন অবিশুদ্ধ স্বর্ণকে দাহাদি প্রক্রিয়া দ্বারা নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ করিয়া লয়, সেইরূপ আমাদের দয়াময় পরমপিতা আপন পাপী সন্তানকে উপযুক্ত দণ্ড দিয়া অনুতাপানলে দগ্ধ করিয়া তাহার পাপমলা ভস্ম করিয়া পুনরায় তাহাকে আপন ক্রোড়ে লইবেন এবং অনন্ত জীবন কত সুখে সুখী করিবেন।

পুস্তকবিশেষে বা ব্যক্তিবিশেষে ব্রাহ্মধর্ম্মের আদেশ ও উপদেশ নিবদ্ধ নহে। সকল ধর্ম্মগ্রন্থের সার বাক্যই ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুমোদিত। ব্রাহ্মধর্ম্মে এরূপ বিশ্বাস করে না, যে, ঈশ্বর ব্যক্তিবিশেষের স্কন্ধে বা ওষ্ঠে আবির্ভূত হইয়া তাঁহার ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় নিগূঢ় তত্ত্ব সকল ব্যক্ত করাইয়া থাকেন। যদি কোন ব্যক্তি ভ্রমে ও অহঙ্কারে মত্ত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের দোহাই দিয়া নিজকৃত সৎ অসৎ অনুষ্ঠানের ঈশ্বরকে নিয়ামক বলিয়া ব্যক্ত করে এবং নিজ দোষ ও কপটতা ঈশ্বরের উপর চাপায়, তবে সে ব্যক্তি ব্রাহ্মনামের অযোগ্য। এরূপ ভ্রান্ত ও গর্ব্বিত লোকের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের কোন সম্পর্ক নাই। যে কোন ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে বা যে কোন ব্যক্তি হইতে যুক্তিসঙ্গত ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব সকল পাওয়া যায়, ব্রাহ্মধর্ম্ম তাহা আদরে গ্রহণ করিয়া থাকেন। বালকেরও যুক্তিযুক্ত বাক্য আমরা শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়া থাকি। কিন্তু জ্ঞানে ও বুদ্ধিতে বৃহস্পতিতুল্য ব্যক্তিরও অযৌক্তিক কথা গ্রহণ করি না। ধর্ম্মগ্রন্থবিশেষকে অথবা ব্যক্তিবিশেষকে ব্রাহ্মধর্ম্ম অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করে না। জগৎগ্রন্থই ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্রান্ত গ্রন্থ। নীল নভস্তল ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশের লেখ্য পত্র। স্বয়ং ঈশ্বর নিজ হস্তে তাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্রান্ত তত্ত্ব সকল সুস্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দিয়াছেন। সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ তারা তাঁহার হস্তের উজ্জ্বল অক্ষর। তিনি কোথায় না তাঁহার তত্ত্ব সকল লিখিয়া রাখিয়াছেন। ময়ূর-শরীরের বিচিত্র বর্ণও তাঁহার হস্তের বর্ণাবলি। তুষারধবল উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গও তাঁহার লেখনীপ্রসূত বৃহদক্ষর। দলিতাঞ্জনসন্নিভ সাগর-নীলিমাও তাঁহার লিখিত। তড়িজ্জড়িত শ্যামল মেঘমালাও তাঁহার হস্তের বর্ণমালা। জগতের সর্ব্বত্র তাঁহার লেখনী-বিনির্গত অক্ষরসকল ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্রান্ত তত্ত্ব প্রকাশ করিতেছে। বিশেষতঃ মনুষ্যের আত্মাতে, মনুষ্যের সহজ জ্ঞানে ঐ সকল তত্ত্ব যেমন প্রকাশিত এমন অন্যত্র নহে।

ব্রাহ্মধর্ম্ম আদেশ করে, ঈশ্বরে প্রীতি সংস্থাপন কর, অন্তর পবিত্র হইবে, অতুল আনন্দ উপভোগ করিবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম যেমন ঈশ্বরে প্রেম করিতে আদেশ করে, সেইরূপ জগতের হিতসাধন-ব্রতপালন করিতে উপদেশ দেয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম আদেশ করে, সর্ব্বজীবে দয়া কর, সকল মনুষ্যের উপর ভ্রাতৃভাব সংস্থাপন কর। ব্রাহ্মধর্ম্ম সরল ও সচ্চরিত্র হইতে আদেশ করে। ব্রাহ্মধর্ম্ম অভিমান ও ক্রোধ ত্যাগ করিতে উপদেশ দেয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম বিনয় ও নম্রতা অভ্যাস করিতে ভূয়োভূয়ঃ উপদেশ করে।

ব্রাহ্মধর্ম্মের আদেশ ও উপদেশ সকল যেন মুখে মুখেই না থাকে। আমরা তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে যেন প্রাণপণে যত্ন ও চেষ্টা করিতে পারি। আমরা কেবল পার্থিব সুখে ও বিষয় বিভবে মুগ্ধ হইয়া না থাকি। এই ক্ষণভঙ্গুর অস্থায়ী সুখে আচ্ছন্ন

থাকিয়া যেন আমরা লক্ষ্যভ্রষ্ট না হই। যিনি আমাদের পিতা মাতা, যিনি আমাদের মঙ্গলবিধাতা, যিনি আমাদিগকে সতত ভয় বিপদে রক্ষা করেন, যিনি আমাদের অনন্ত কালের আশ্রয়, যেন আমরা তাঁহাকে ভুলিয়া না থাকি। তাঁহার পবিত্র চরণ যেন সর্ব্বক্ষণ আমরা হৃদয়ে ধারণ করিতে পারি। তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধনে যেন আমাদের আন্তরিক প্রবৃত্তি হয়। পরোপকার ব্রতে আমাদের চিত্ত যেন পরাঙ্মুখ না হয়। আপন উপার্জ্জিত বিত্তের কিয়দংশ যেন অক্ষম দরিদ্রদিগকে অসঙ্কুচিত মনে দান করিতে পারি। পর-নিন্দা ও পরগ্লানিতে যেন আমাদের জিহ্বা অগ্রসর না হয়। পরাপকারে বা পরপী-ড়নে যেন ভ্রমেও মতি না জন্মে। পাপের প্রলোভনে যেন কদাচ প্রলোভিত না হই। চিত্তের ও চরিত্রের পরিশুদ্ধিসাধনে যেন আন্তরিক যত্ন করিতে পারি। সকল মনুষ্যের প্রতি যেন ভ্রাতৃভাব সংস্থাপিত হয়। গর্ব্ব ও বিদ্বেষ বুদ্ধি যেন স্পর্শ করিতে না পারে। বিনয় ও শিষ্টাচারে যেন কদাচ আমাদের উপেক্ষা না জন্মে।

আজ আমাদের ষট্‌ত্রিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব। ছত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে মাঘমাসের শেষ রবিবারে এই মেদিনীপুরে ব্রাহ্মধর্ম্মের অধিকার-স্তম্ভ নিখাত হইয়াছে। এই দিনটী অত্রত্য ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের বিশেষ স্মরণীয়, আজ আমাদের বিশেষ উৎসবের দিন। সেই উৎসব সাধনার্থে আমরা সকল ভ্রাতায় এখানে সমবেত হইয়াছি। পরব্রহ্মের আরা-ধনাই ব্রাহ্মদিগের উৎসব ও আনন্দ। যিনি আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্মের অধিদেবতা, তাঁহার প্রসন্ন মুখ দর্শন করিতে ও তাঁহার পবিত্র চরণ মস্তকে ধারণ করিতে আমরা আজ এখানে সকলে মিলিত হইয়াছি।

আইস, সকলে সরলান্তঃকরণে তাঁহার দ্বারে উপনীত হই। তাঁহার জন্য লালায়িত হও, তাঁহার প্রেমমুখ দেখিতে ব্যাকুল হও, তিনি দেখা দিবেন। বিষয়চিন্তা বিষয়বাসনা হইতে বিরত হইয়া চিত্ত স্থির কর, তাঁহার মঙ্গল মূর্ত্তি ধ্যান কর, তাঁহার সত্যজ্যোতি তোমার অন্তরে প্রবেশ করিবে। আমাদের মনশ্চক্ষু তাঁহার শান্তশিবমূর্ত্তি দেখিতে পা-ইবে। অন্তরের কুটিলতা ও মলিনতা ত্যাগ করিয়া তাঁহার শরণ লও, তাঁহার অভয় মঙ্গলভাব সম্মুখে জাজ্বল্যমান দেখিতে পাইবে। তাঁহার মঙ্গল মূর্ত্তি প্রতিভাত হইলে হৃদয়ের মোহান্ধকার দূর হইবে। তাঁহার কৃপাবারি নিপতিত হইলে হৃদয়-জ্বালা নিবারণ হইবে। আইস, আমরা সকলে আজ তাঁহার নিকট আত্মনিবেদন করি। তাঁহার নিকট ক্রন্দন করি। নিজ নিজ মানসিক দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলি। সবল ভাবে অনুশোচনা করি। ক্ষমা ভিক্ষা করি। ধর্ম্মবল প্রার্থনা করি।

হে দয়াময় প্রভো! আমাদের প্রতি কৃপা বিতরণ কর। তুমি আমাদিগকে ধর্ম্ম-বলে বলীয়ান কর। পতিতপাবন! আ-মাদের পাপমলা দূর কর। তোমার চরণ-তলে স্থান দেও। ভ্রমান্ধকার ও চিত্তবিকার নাশ কর। আমাদের মনশ্চক্ষু সম্মুখে স-ত্যের জ্যোতি—জ্ঞানের আলোক প্রকাশ কর। হে চিরজীবনসখা! যেন সতত তোমার প্রসন্ন মুখ দেখিতে পাই। হে শান্তিদাতা! তোমার শান্তিবারি সেচন করিয়া আমাদের প্রতপ্ত চিত্ত শীতল কর। ইহ লোক ও পরলোকে তুমি আমাদের একমাত্র গতি। আমাদের যেন আর কুপ্রবৃত্তি না হয়। তোমার অভয় পদ ভুলিয়া না থাকি। যেন কাঞ্চন ত্যাগ করিয়া কাচে আকৃষ্ট না হই। তুমি আমাদের পাপের শাস্তি বিধান কর। সহস্র দণ্ড দেও। কিন্তু নাথ! কদাচ চরণ

ছাড়া করিও না। হে মঙ্গলবিধাতা! জগতের মঙ্গল কর। ভারতের কল্যাণ কর। দুর্ভাগ্য বঙ্গদেশের দুঃখ দূর কর। তোমার সত্য জ্যোতি সর্ব্বত্র প্রকাশিত হউক; পবিত্র ব্রহ্মনাম নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে গৃহে গৃহে ঘোষিত হউক। ব্রাহ্মধর্ম্মের জয়পতাকা সর্ব্বত্র উড্ডীন হউক। ব্রাহ্মভ্রাতাদিগকে আধ্যাত্মিক বল দেও। তুমি আমাদের সকলের মঙ্গল কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

তত্ত্বকৌমুদী ও আদি ব্রাহ্মসমাজ।

গত ১লা চৈত্রের তত্ত্বকৌমুদীতে একস্থানে লিখিত হইয়াছে "আদিসমাজের সহিত যখন উন্নতিশীল দলের প্রথম বিবাদ উপস্থিত হয় তখন লোকে কি দেখিয়া আকৃষ্ট হইয়াছিল? লোকে দেখিল এক দিকে একতন্ত্র-প্রণালী-প্রিয়তা, অপর দিকে সাধারণতন্ত্র-প্রণালী-প্রিয়তা; এক দিকে ব্রাহ্মধর্ম্মের সাম্প্রদায়িক ভাব, অপর দিকে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশ্বজনীন উদারতা; একদিকে অনুষ্ঠান বিষয়ে স্থিতিশীলতা, অপর দিকে বিশ্বাস ও কার্য্যের একতা বিষয়ের জন্য ব্যগ্রতা।" তত্ত্বকৌমুদীর এই উক্তি সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, সাধারণ-তন্ত্র-প্রণালী কাহাকে বলে তাহা আমরা জানি। যাহা সকল লোকের নামে করা হয়, কিন্তু বস্তুতঃ দুই এক জনে করে তাহাই সাধারণ তন্ত্র। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এই বিষয়ের ব্যভিচার-স্থল হইলে হইতে পারেন কিন্তু আমরা উপরে সাধারণ-তন্ত্র-প্রণালীর প্রকৃতি যাহা নির্দ্দেশ করিলাম তাহা সাধারণতঃ সকল সাধারণ-তন্ত্র-প্রণালী সম্বন্ধে খাটে। তত্ত্বকৌমুদী বলিয়াছেন আদি ব্রাহ্মসমাজের ভাব সাম্প্রদায়িক। আদি ব্রাহ্মসমাজ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ অথবা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ন্যায় কোন দলবদ্ধ সমাজ নহে, অতএব ইহার প্রতি সম্প্রদায় শব্দ খাটিতে পারে না। আদি ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মধর্ম্মের ভাব সাম্প্রদায়িক ইহা বলিবার পূর্ব্বে তত্ত্বকৌমুদীর বিবেচনা করা উচিত ছিল, কোথা হইতে ব্রাহ্মসাধারণ ব্রাহ্মধর্ম্ম অসাম্প্রদায়িক এই শিক্ষা প্রথম লাভ করিলেন। বেদবেদান্ত অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিলেই কি তাহা সাম্প্রদায়িকতা হইল? বেদবেদান্তের ধর্ম্ম বিশ্বজনীন। তত্ত্বকৌমুদী বলিয়াছেন "বিশ্বাস ও কার্য্যের একতাবিধানের জন্য ব্যগ্রতা উন্নতিশীল ব্রাহ্ম দলের একটি লক্ষণ"। যখন ভারতবর্ষীয় অথবা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধিকাংশ ব্রাহ্ম গৃহকার্য্যে পৌত্তলিক অনুষ্ঠানের অনুষ্ঠায়ী তখন বিশ্বাস ও কার্য্যের একতা লইয়া এত শ্লাঘা করা হয় কেন? এবিষয়ে নিস্তব্ধ থাকা বিজ্ঞ লোকের কর্ত্তব্য।

যোগাযোগ।

ধর্ম্মপ্রিয় আর্য্যজাতির মধ্যে যেমন সাধন সমাধান-বিষয়ের উদ্‌যোগ ও অনুষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায়, অপরাপর দেশীয় জনগণের মধ্যে প্রায়ই তাদৃশ ভাব বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয় না। আর্য্যসমাজে বাল্যকাল হইতেই বালক বালিকাদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দিবার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, উপর্য্যুপরি বৈজাতিক পরাধীনতা নিবন্ধন লোকের মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া যাওয়াতেই সেই সকল পরমকল্যাণপ্রদ রীতি পদ্ধতি ক্রমে শিথিল হইয়া যাইতেছে এবং সামান্যত তৎপ্রতি লোকে অনাদর ও ঔদাস্য প্রদর্শন করাতে আমাদের অজ্ঞাতসারে ধর্ম্মভাব মন্দীভূত হইয়া জনসমাজের মহা অনিষ্ট সাধন করিতেছে। রজ ও তমোভাবপ্রধান জনগণের সহবাসে আমাদের বৈব-

ষিক ভাবই বৃদ্ধি পাইতেছে—বিলাস-ইচ্ছাই প্রবল হইয়া উঠিতেছে। জীবনের সারতম বিষয়ে আর লোকের তাদৃশ যত্ন চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায় না। কেবল বেশ ভূষা গৃহ উদ্যানের শ্রীসৌন্দর্য্য সম্পাদন বিষয়েই লোক দৃঢ়ব্রত হইতেছে কিন্তু পৃথিবীর উজ্জ্বল অলঙ্কার এবং মনুষ্যের জ্ঞানধর্ম্মোন্নতির অব্যর্থ নিদর্শন স্বরূপ ধর্ম্মমন্দির এবং সাধন সমাধান ক্ষেত্রাদি বিনির্ম্মাণ বিষয়ে আশানুরূপ যত্ন চেষ্টা উদ্যম উদ্যোগ দেখা যায় না। একদিকে যেমন দেশব্যাপী পৌরাণিক ও তান্ত্রিক মতের প্রতি শিক্ষিত দলের ঔদাস্য ও অবিশ্বাস উপস্থিত হওয়াতে মঠ মন্দিরাদি নির্ম্মাণ বিষয়ে বিরাগ উপস্থিত হইতেছে; অন্য দিকে আর সেই পরিমাণে নিজের বা সাধারণের জন্য ধ্যান ধারণা বা ব্রহ্মোপাসনার নিমিত্ত ধর্ম্মমন্দির বা সাধনক্ষেত্র সকল বিনির্ম্মিত হইতেছে না। এটী দেশের পক্ষে মঙ্গলের চিহ্ন নহে।

স্থানে স্থানে বিদ্যালয়াদি প্রতিষ্ঠিত হইলে যেমন জ্ঞান শিক্ষার প্রশস্ত সোপান সকল প্রযুক্ত হয়, তেমনই যথাতথা মঠ মন্দির ও সাধন-গৃহ নির্ম্মিত হইলে লোকের অনায়াসে ধর্ম্মজ্ঞান ও ঈশ্বরপ্রীতি উদ্দীপ্ত হইবার সম্যক সম্ভাবনা। আমারদের দেশীয় লোকের প্রকৃতিই এই যে তাঁহারা আপন আপন যত্ন চেষ্টায় দেবভক্তির ও ধর্ম্মনিষ্ঠার প্রত্যক্ষ নিদর্শন স্বরূপ বহুব্যয়সাধ্য দেব মন্দিরাদি বিনির্ম্মাণ করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান শিক্ষিত দলের মধ্যে শ্রেষ্ঠধর্ম্মাবলম্বী ব্রহ্মোপাসকদিগের দ্বারা এই সার্দ্ধ শতাব্দীকাল অভ্যন্তরে কোন এক ব্যক্তি নিজব্যয়ে একটী মাত্রও উপাসনামন্দির প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই; অথবা বৈজাতিক প্রণালীতে সাধারণের সাহায্যে যে সকল উপাসনালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তৎসমূহ পোষণের জন্য অদ্যাপিও বিত্ত সংস্থান হয় নাই*। এটী আর্য্য সন্তানদিগের পক্ষে সামান্য কলঙ্কের বিষয় নহে।

হিন্দুসমাজ মধ্যে প্রতি গৃহেই দেবালয়, প্রতি পল্লীতেই মণ্ডপ মন্দির সকল গৃহস্থ লোক দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। যাঁহারা ধনশালী তাঁহারা তো আপন আপন সাধন জন্য দেবালয়াদি নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন তদ্ব্যতীত আবার সাধারণের ব্যবহারার্থে নদীতীরে, নিবিড় অরণ্যে নির্জ্জন পার্ব্বত্য প্রদেশে গৃহী উদাসীন এবং যতি সন্ন্যাসী প্রভৃতির নিমিত্ত কতশত দেবগৃহ,মঠ মন্দির, আশ্রম গুহা প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। অদ্যাপিও স্থানে স্থানে সেই সকল বিদ্যমান থাকায় তাঁহাদের ধর্ম্মানুরাগিতার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। গৃহত্যাগী যতি সন্ন্যাসী প্রভৃতির প্রতি তাঁহারদের আস্থা অনুরাগ ও আন্তরিক যত্নের প্রত্যক্ষ পরিচয় দিতেছে। এ দেশের সাধু সন্ন্যাসীগণ যেমন নিঃস্বার্থ ও নিষ্কাম ধর্ম্মসাধনে তৎপর ছিলেন, গৃহী ধনশালী ব্যক্তি বর্গও তেমনই আবার স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহারদের রুচি ও প্রবৃত্তি অনুসারে নিবিড় অরণ্যে, নদীকূলে, নির্জ্জন পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রম গুহা প্রভৃতি নির্ম্মাণ এবং গ্রাস-আচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া তাঁহারদিগকে নির্ব্বিঘ্নে নিরুপদ্রবে ধর্ম্ম সাধনে সক্ষম ও সমর্থ করিয়া দিতেন। যাঁহারা ভারতের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যপূর্ণ প্রদেশাদিতে পরিভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহারা তাহার শত শত নিদর্শন প্রত্যক্ষ সন্দর্শন করিয়া থাকিবেন।

আসাম প্রদেশে ব্রহ্মপুত্র নদের উপকূলে যে কয়েকটী কৃত্রিম গুহা বিদ্যমান আছে,

* আদি ব্রাহ্মসমাজে এরূপ বিত্ত সংস্থান আছে।

বর্ত্তমান প্রস্তাবে তাহারই মধ্যে তিনটীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হইতেছে।

সেই গুহাগুলি "যোগীযোগা" বলিয়াই প্রসিদ্ধ। আসামী ভাষায় "যোগা" শব্দের অর্থ গুহা। গুহা গুলি গোয়ালপাড়া হইতে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে ব্রহ্মপুত্রের উত্তরতীরস্থ পর্ব্বতগাত্রেই খোদিত। তন্মধ্যে যে দুইটী সহজে দেখা যায়, তাহা ব্রহ্মপুত্রের উপকূল হইতে ৬।৭ ফুট উচ্চ। যেটী দুর্গম সেটী প্রায় ৪০।৫০ ফুট উপরে, তদ্‌ভিন্ন আরও কতকগুলি গুহা ইতস্ততঃ বর্ত্তমান আছে। গুহা গুলি কৃত্রিম, মনুষ্যের যত্ন চেষ্টায় ও বহু অর্থ ব্যয়ে পর্ব্বতগাত্রে খোদিত হইয়া নির্ম্মিত হইয়াছে। যে তিনটি গুহার বিষয় উল্লেখ করা যাইতেছে, সে তিনটীই প্রায় দীর্ঘ প্রস্থে ৫।৭ ফুট হইবে। উচ্চও প্রায় পাঁচ ফুট। উপরি ভাগ খিলানের আকারে খোদিত। উহার মধ্যে প্রত্যেকটীর এক এক পার্শ্বে বেদীর মত স্থান আছে এবং গুহার অভ্যন্তরে পর্ব্বত গাত্রে প্রদীপ রাখিবার এক একটী স্থল নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। অর্থাৎ গুহাগুলি এরূপ আকারে নির্ম্মিত যে তন্মধ্যে স্বচ্ছন্দে এক একটী লোক অবস্থান করিতে পারেন। নদী তট হইতে গুহায় উঠিবার জন্য পর্ব্বত কাটিয়া ধাপ সকল নির্ম্মিত থাকিলেও তাহা নিতান্ত সুগম নহে। তন্মধ্যে তৃতীয়টী নিতান্ত দুর্গম। আমাদের যে বন্ধু, তাহা স্বচক্ষে সন্দর্শন করিয়া আমারদিগকে অবগত করিয়াছেন, তিনি লিখিয়াছেন যে "এই গুহাটী দেখিবার জন্য বৃক্ষের সাহায্য লইয়া তাহার উপর উঠিয়াছিলাম। উঠিয়া দেখি যে আজও তথায় একটী সন্ন্যাসী অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার সঙ্গে আর কেহ শিষ্য সেবক বা চেলা নাই। অনুসন্ধান দ্বারা অবগত হইলাম্‌ যে তিনি একজন প্রকৃত যোগা নহেন।

পাহাড়ের উপরে এবং গুহার সম্মুখে জগদীশ্বরের প্রাকৃতিক উদ্যানে আম্র পনস প্রভৃতি শত শত বৃক্ষ যেন তাঁহার অনন্যপরায়ণ তপঃক্লিষ্ট সাধকদিগের ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ জন্য ফলভার মস্তকে করিয়া দণ্ডায়মাণ রহিয়াছে। ব্রহ্মপুত্র আশ্রমদ্বার দিয়া কল কল বেগে প্রবাহিত হইয়া যেন তাঁহারদের স্নান অবগাহনের অনুকুলতা সম্পাদন করিতেছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যপূর্ণ এই পবিত্র স্থানে উপবেশন করিয়া চারি দিকে বিশ্বস্রষ্টা পরমেশ্বরের জ্ঞান শক্তি মহিমার জাজ্বল্যতর নিদর্শন সন্দর্শন করিলে নিতান্ত কঠোর হৃদয়ও বলবৎ প্রেমে বিচালিত হইয়া যায়। একান্ত বিক্ষিপ্ত চিত্তও শান্ত সংযত হইয়া পড়ে। ইংরাজ অধিকারের পূর্ব্বে এখানে অনেক যোগী ব্রহ্মচারী এবং সন্ন্যাসী প্রভৃতি বাস করিয়া সমস্ত সময় কেবল ধ্যান ধারণায় অতিবাহিত করিতেন, বর্ত্তমান রাজপুরুষদিগের আধিপত্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহারা প্রস্থান করিয়াছেন। উল্লিখিত গুহা গুলি কোন্‌ ধনশালী ধর্ম্মনিষ্ঠ মহাপুরুষ দ্বারা কোন্‌ সময়ে খোদিত হইয়াছিল, তাহা নিঃশংসয়ে অবধারণ করা দুঃসাধ্য।

উৎকল প্রদেশে অস্তগিরি ও উদয় গিরি নামক পর্ব্বত শ্রেণীতেও বহুবিধ আশ্রম গুহা অদ্যাপিও বর্ত্তমান রহিয়াছে, তন্মধ্যে রাজপ্রাসাদতুল্য কয়েকটী স্থানও এখনও তথায় দৃশ্যমান রহিয়াছে। সেই সকল গুহা ও আশ্রমাদি প্রথম প্রস্তুত করিবার সময় লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল। গুহাগাত্রে, প্রাসাদস্তম্ভে বৌদ্ধমূর্ত্তি সকল খোদিত থাকাতে অনেকেই অনুমান করেন, যে এগুলি বৌদ্ধ রাজাদিগের দ্বারাই নির্ম্মিত হইয়াছিল।

BUDDHISM AND CHRISTIANITY.

(By a Bengali Professor of Europe)

সত্যান্ন প্রমদিতব্যং

(তৈত্তিরীয়োপনিষদ্)

"Know the Truth and the Truth shall make you free" *Jesus.*

THE object of this paper is rather to provoke further inquiry on an important subject than assert anything.

Introduction.) From the autumn of 1876 to that of the following year, I delivered in Germany a series of Lectures on a variety of subjects bearing on our Hindu Literature a. o., on Buddhism in its relation to Christianity. (Some of these Lectures have in the meantime been published in the "Deutsche Wochenschrift" See. Nos: I. II. XI. XII. and XIII. of 1877.) In these Lectures I tried in the first place to point out the dissimilarities and then the similarities of the two religions. The latter had greatly struck me from the very beginning of my studies on the subject and now this feeling of astonishment seemed to be equally shared by my auditors. In the last Lecture on "Buddhism and Christianity" which I delivered in Leipzig a year ago and in which I dwelt exclusively on the similarities or as it was announced "on the Harmony between Buddhism and Christianity," one of my auditors rose up after I had finished to make some very kind observations about what he had heard that evening and he actually concluded his remarks with: "Now, gentlemen! if this be Buddhism, then I am indeed a Buddhist!"

II.

Such internal correspondence—such striking similarities between the cardinal points of both very naturally induced the belief that

Internal and External Correspondence, there wold be found also an equally striking correspondence between their rites and ceremonies—their, so to say, priestly or ecclesiastical institutions. From a given number of internal functions, the biologist concludes on the existence of a corresponding number of external organs with indubitable certainty and *vice versa*. Has Buddhism then also developed ecclesiastical institutions similar to those of Christianity? Being in Europe and especially on the Continent, those I have rare and daily opportunities to study but how could I study the similar Buddhist institutions? Although proud of being born in Hindustan and indeed not very far from the Holy Land itself (Kosala and Magadha) which was the nativity as well as the principal scene of the labours of the great Founder of Buddhism—where whole herds of pilgrims from all and even the remotest parts of Asia streamed in for 1000 years (from 61 A. C. when Buddhism became the state-religion in China to 954 A. C. when Khi-nee visited India at the head of 300 pilgrims we have about 900 years. Pilgrimage to India must have commenced even a century or two anterior to this date) Yet such is the singular sport of circumstances which great antiquarians are still at a loss to unravel, Buddhism and Buddhistic institutions almost have totally disappeared from the soil of their birth or if they exist at all they have found refuge as it were in a corrupt form in the comparatively unfrequented fastnesses of Nepal and Bhutan or in the far off Isle of Ceylon. To study Buddhism and Buddhist institutions in all the various ramifications of their development, it is necessary therefore to go to China, Japan, Thibet, Burmah or Siam. I was in this mood of mind when amidst new and different studies on Comparative Philology, I met with in the grand *Bibliotheque de L'Institute* in Paris the following work entitled: "Voyage dans le Thibet" par Abe´ Huc. Conceive my astonishment when I read the following passage:—On ne peut s'empecher d'etre frappé de leur rapport avec le Catholicism. La Crosse, la mitre, la dalmatique, la chape ou pluvial que les grands Lamas portent en voyage ou lorsqu'ils font quelque ceremonie hors du temple; l'office á deux choours, la psalmodie, les exorcismes, l'encensoir soutenu par cinq chaines, et pouvant s'ouvrir et se fermer á volonté les cenedictions données par les Lamas en etendant la main droite sur la tete des fideles; le chapelet, le clibat ecclesiastique, les retraites spirituelles, le culte des saints, les jeunes, los processions, les litanies l'eau bénite; voila! autant de rapports que les Buddhistes ont avec nous!"

(CHAPETOR III. P. 110.)

Max Miller quotes this very passage in his Essay on Buddhism (Vide: "Chips" vol. I. P. 190) and adds: "He might have added tonsure, relics and the confessional." We have thus established what we had already inferred from analogy. The *external* correspondence of Buddhism and Christianity is as striking as the *internal*.

III.

Are therere further points of similarity? Says Albrecht Weber in speaking of "The Legends of Sakya Buddha" translated and published by Mr. Beal from the Chinese-Sanskrit.

Buddhist and Christian Legends.

"The peculiar relations which they (the Buddhist Legends) bear to the Christian Legends are extremely striking; which is here the borrowed portion Beal leaves no doubt with justice still undecided *yet probably the very same case lies here before us as in the appropriation of the Christian Legends by the Krishna-worshippers*"

("Indische Litteraturgeschichte." S. 320) The italics are ours. They contain a positive assertion, which we are surprised to see such a cautious Orientalist as Prof Weber make. Is it then so indisputably established that the Krishna-worshippers have appropriated the Christian Legends? What are the grounds of evidence? Because some Christian Missionaries are supposed to have visited India in the first centuries of the Christian era? But how to exclude the possibility that these Christian Missionaries might as well have appropriated the Krishna-Legends which then gradually developed themselves into the Christa, or Khrishta, Legends? (The Greek word is *Christos* or *Khristos* which is curiously alike both in sound and Othography to *Kristo*—the form of the name *Krishna* most popularly and extensively used by the Hindus in India, Besides, it is evident that according to a simple rule of the Sanskrit Grammar, the word in the 3rd P. S. N. would be *Kristos* and therefore still more approaching the Greek: *Khristos*). That *our* Buddhist Legends have been appropriated— that even a cherished Saint of the Christian Church has at last been discovered to be nothing but a sorry mimicry of Buddha or to use the learned Professor's own words: "has been unpuppetted (entpuppt) as the Bodhisatwa himself" Prof Weber himself has proved. (Vide: Albrecht Weber Z. D. M. Gesellschaft XXIV 480; "Indische Litteraturgeschichte" S. 327. See also Beal's "Buddhist Pilgrims" Note: P. 86 and Reinaud: "Memoire sur l' Inde" P. 91.)

Max Muller makes mention of one of the first Portuguese missionaries who was a profound Sanskrit Scholar and who did all he could to accomodate the Gospels and the precepts they inculcate to our Hindu modes of thinking or, in other words, who appropriated as much of our Hindu ways in religious matter as he conveniently could to insinuate himself into the hearts of those he came to convert. (Vide: Max Muller's "Lectures on The Science of Language:" First Series. Could one single instance of the kind might be brought forward to shew that the Hindus have done the same with the Legends of Christianity or of any other religion? Besides, it is of itself highly improbable that the Hindus whose rare genius for poetic images, symbolical representations, legendary or mythical figures has filled at least all the Asiatic Countries with its inexhaustible fertility—which has to their great misfortune breathed a sort of legendary charm even over historical facts, often comingling or confounding the marvellous with the real—the supernatural with the natural into a chaos—has even transformed some of their greatest heroes into "Myths and Myth-makers" whose very existence therelentless critics of modern Europe would put into doubt, it is highly improbable we say that this "dreamy land"—"this well-known Kingdom of traditions, anecdotes and poetry" (Vide: Weber's "Welt-Geschichte" I. B. S. 40) would go to other countries for legends and that again religious legends which make it still more improbable. The antiquity of the Hindu religion, the extraordinary faculty for religious insight and speculation possessed by the Hindus, their deep faith or unshaken orthodoxy, and hence their extreme sensitiveness as well as conservatism in all points which have the slightest relation to religion (a. o. the Cartridge-Question of the Sepoys of 1857 is a glaring instance on the point) increase further the improbability of such an appropriation of the *Yavonic*

Legends by the Hindus. All that we know on the subject points exactly the other way. That the Krishna-Legends date back to a high antiquity is established by the fact that they are all to be found in the 10th Chapter of the Bhagavat Purana—a book which according to all our astronomical, historical traditional dates (Vide: *Yotirvidyabharana, Varahasamhita* and *Rajatarangini*) is one of the most ancient (as indeed the name also implies) that we possess. But as Prof Weber with his utter and, let it be permitted to add, *reactionary* scepticism about everything that savours of the Hindu Chronology (not that we are not at the same time time sensible of the rare services which this scepticism has done for our Literature and for which the worthy Professor would always find us deeply grateful) is not likely to give even a penny for chronological dates emanating from the Hindus, we should refer him to the works of an eminent French Orientalist whom he highly estimates, we mean of course in the present case, to the Introduction of his princely edition of the Bhagavatpurana which Eugene Burnouf has given to posterity. And it is Burnouf who says the following about the antiquity of the Puranas in general:—

(1) "Sayana Acharya qui etait vers 1334 minister et directeur spirituel de Virabukka, roi de Vijayanagara cite dans ses prolegomenes sur le Rigveda un texte ancien (de Rigveda) ou les Puranas sont nominativement indiques.

(2) On parle de Puranas dans le Chhandogya Upanishad. Le Chhandogya nest vraisemblement pas le plus ancien des Upanishads; cependant il peut passer quant au style et quant aux idées pour une des compositions de ce genre qui se rapproachent le plus de l'age Vedique. C'est le meme chose dans le Vrihadaranyaka le plus considerable des Upanishads du Yayurveda.

(3) "Manusamhita" I. III. St. 232.

(4) "Ramayana" T. I. P. 351 texte et t. I. P. 290 trad Lat; ed. Schlegel. (পুরাণবিৎ)

(5) "Le compilateur du Mahabharata ce vaste et precieux recueil des traditions epiques de l' Inde ancienne, cite a chaque instant le nom de Purana, surtout au commencement du premier livre (পৌরাণিক)

(6) Yajnavalkya. au commencement de son premier livre. On sait que Yajnavalkya, est un ancien sage qui passe pour avoir exerce une grande influence sur la classification et l'enseignement du second des Vedas, le Yajas."
("*L'Introduction du Bhagvatpurana*-")

In the above quotation from Burnouf, we have summarised all that the great Orientalist says on the subject to suit strictly our purpose. The details are however very interesting as well as suggestive.

Maurice, an orthodox Christian who took great pains to give an explanation to the striking similiarities that he found between the Krista-Legends of the Bhagavatpurana and the Khrista-Legends of the Gospels observes:

"The age in which Balaam flourished was in the year 1451 before Christ which is nearly 300 years before the Trojan War and above 500 years before Homer flourished *about which period the Bhagavat was composed.*"

"Ancient Hindus" Vol II. 229

Again "*That the name of Krishna and the general outline of his story were long anterior to the birth of our Saviour and probably to the time of Homer, we know very certainly.*"

He then proceeds to give a probable summary of both the Legends.

For the information of those who do not know Sanskrit and who would nevertheless verify the statements we have made, we may declare that there is a nice Hindi, translation of the 10th Chapter of the Bhagavatpurana called *Premsagar* edited and published by Mr. Eastwick with a useful vocabulary.

But this subject of Krista—or Khrista-Legends to which we have been inadvertently led by a positive assertion of Prof. Weber is of itself far too vast to be treated here in further details. If we find time, we should be glad to recur to this highly interesting subject in a future paper.

Let us now see how Mr. Beal whose book "The Legends of Sakya Buddha" indirectly gave rise to the whole of the above discussion treats the question of the correspondence existing between the Buddhist and Christian Legends. We shall quote the very words he says on the subject for every word of

It is important and is likely to excite further interest and investigation. Besides, Mr. Beal's observations commend themselves by a spirit of caution and impartiality which seems to guide all his valuable researches about Buddha and Buddhism. For the sake of convenience we may say once for all that what follows is taken from entirely Beal's *Introduction* to "The Legends of Sakya Buddha :"—"Some of these events (Legends which are both Buddhistic as well as Christian) I do not find in any Christian work within my reach. But others are undoubtedly commonly referred to. The pre-existence of Budhisatva in heaven—his miraculous incarnation—the songs of the Suddhavasa Devas (angels) at his birth—the events of his early childhood—his temptation in the desert—and his life of continual labour and travel—these points of agreement with the Gospel narrative naturally arouse curiosity and require examination.

Note 2 to P. VIII : "The Franciscan Monk Plato Carpini reports that the Cathayans have an Old and New Testament of their own, and Lives of the Fathers and religious recluses and buildings used for Churches &c., (Yule's Cathay.) Andrew Corsalis to Duke Lorenzo de' Medici (do CXLI, n.) In a Chinese work on the "Art of War (under the heading: *Fa-lanke*—gun) it is particularly mentioned that the Portuguese on their first visit to Canton from Malacca spent the greater portion of their time in reading Buddhist books (For other allusion vide : Yule and other writers down to Huc and Gabet.)

"If we could prove that they were unknown in the East for some centuries *after* Christ, the explanation would be easy. *But all the evidence we have goes to prove the contrary.* (The italics are ours) Nor can we dismiss this consideration in the way a later writer has done (Bastian : "Weltauffassung der Buddhisten" P 18) by saying that all these Legends or stories (Erzahlungen) wherever found, are equally worthless, that they are, in fact, exploded myths.'

"How then may we explain the matter ? It would be better at once to say that in our present state of knowledge, there is no complete explanation to offer. We must wait until dates are finally and certainly fixed.

Note 1 to P. IX : "*It would be a natural inference that many of the events in the Legend of Buddha were borrowed from the Apocryphal Gospels* (comp. e. gr. the Gospel of the Infancy cap. XX; Our Lord learning his Alphabet' with the account given in Chapter XI. of this volume) *if we were quite certain that these Apocryphal Gospels had not borrowed from it* (italicised by us.)

"We cannot doubt however, that there was a large mixture of Eastern tradition and perhaps Eastern teaching running through Jewish Literature at the time of Christ's birth and it is not unlikely that a certain amount of Hebrew folk-lore had found its way to the East. It will be enough for the present to devote this intercommunication of thought, without entering further into minute comparisons.

Note 1 to P. X : "Readers will observe several coincidences in the following pages beyond those already referred to. The most singular of these is the aim of Buddha to establish a "Religious Kingdom" (Dharmachakram, i.e. "Kingdom of Heaven" We are told again Lightfoot Exercit Talmud sub. Cap. IX. V. 2, St. Johns' Gospel) that the Jews believed in the pre-existence of souls and a modified form of the metampsychosis. The singular agreement between the Buddhist Mitta" (Maitri) and the "Charity" of the New Testament has called forth a remark from Mr. Alwis that the coincidence is "very remarkable" (*Pali Translations* Part. I. P. 16.)

The account given by St. Peter (Ep. II. Cap 3) of the earth once destroyed by water and about to be destroyed by fire is in agreement with the Buddhist story (Vide : Catena. Sub-voc, Kalpa,) *many other parallelisms might be pointed out.*"

IX.

Buddhist and Christian Saints.

There is at least one more point of similarity which is far too interesting not to be noticed somewhat in details. What sort of men—of *characters* do the internal principles and the internal institutions of Buddhism and Christianity tend to produce ? Men strikingly similar not merely in their virtues but let us be permitted to add also in their vices or rather defects. It is very interesting to make com-

parisons between the Christian Saints of France, Spain and Italy in Europe and those of China, Indo-Chinese Peninsula and India in Asia. We pass over the very interesting geographical correspondences between these European and Asiatics countries which must strike even the most indifferent observer. We must equally forego the delight of pointingout that these countries possess also certain intellectual traits or characteristics which correspond to their geographical situations. The Chinese are admitted to be the very *beau-ideal* of a practical people and M. Nicard—perhaps the greatest historian of the French Literature—seriously contends that "pratique" is verily the characteristic of the French people in contra-distinction to other civilised races (Vide: Nisard "Histori de la Literature Francaise" Vol I.) In a certain sense, Comte might not be inaply compared to Kung-tsze or Confucius. The French Philosopher would dissuade his followers even to occupy themselves with the more abstruse branches of Astronomy (not to say anything of course of studies that belong to "theological or "metaphysical" stages, while the Chinese would admit of no questions about Death or Immortality. Laotzse would find his parallel in Fenelon and Mencius perhaps in Rousseau. But this is a subject which though full of interest does not properly belong to our main theme of discussion. Geographically and intellectually—physically and psychically, how "the cherished Paradise of the whole Aryan Race" corresponds to "The Gard en of Europe" how the History of each in Politics and Literature has passed through stages which are so to say fraternally similar to one another—how both of them "pious and poetic" have produced Saints and Poets who rival each other in the depths of their mysticism and in the wildness of their imagination——all these and many more are points of such absorbing interest that we are afraid of even slightly entering into a subject which might seduce us far away into remote, although it may be extremely charming, digressions. Enough to say that it is impossible to read any *History* of Italy (in the *complete sense* of the word as Macaulay and Buckle meant without being struck at every step with rare points of correspondence and parallelism Vide. a. c Ruth: "Geschichte der Italienischen Poesie Band I and II and Gingueńé: Historie Litteraire d'Italie' V 6. Perhaps similar characteristic shall equally be found on examination between the Iberian Peninsula, Spain and Portugal and the Indo-Chinese Peninsula (Burmah and Siam).

But it is with their *moral aod not physical and intellectual* characteristics that we have to do in this place and moral characteristics indeed that have been developed under the influence of two the distinct religious: Buddhism and Christianity and which could no doubt be best studied in the greatest saints of the respective countries. Of these in continuation.

(To *be continued.*)

সম্বাদ।

আমরা আহ্লাদিত চিত্তে পাঠকবর্গকে জ্ঞাপন করিতেছি যে গত ২৮ ফাল্গুন দিবসে আদি ব্রাহ্ম-সমাজের পদ্ধতি অনুসারে একটি ব্রাহ্ম-বিবাহ হইয়া গিয়াছে। কোননগর নিবাসী শ্রীযুক্ত নীলমণি মিত্রের পুত্র শ্রীযুক্ত জয়কৃষ্ণ মিত্র পাত্র, বয়স ২৪ বৎসর; পাত্রী শ্রীমতী শরৎকুমারী, বয়স ১৩বৎসর মেদিনীপুর কলেজের অন্যতর শিক্ষক শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ বসুর কন্যা। বিবাহস্থলে মেদিনীপুরের অনেক ভদ্র লোক উপস্থিত ছিলেন।

অশুদ্ধ শোধন।

গত পৌষ মাসের ৪২৫ সংখ্যক পত্রিকার ১৬৯ পত্রের প্রথম স্তম্ভের প্রথম পংক্তিতে "অবর্ত্ত লতা" না হইয়া "সচলতা" হইবে। উক্ত পত্রের দ্বিতীয় স্তম্ভের ৪র্থ পংক্তিতে "আমার" স্থলে "অমর" হইবে। ১৬৮ পত্রের ২য় স্তম্ভের ১২ পংক্তিতে "সামার্থ" স্থলে "যাথার্থ্য" হইবে। ১৬৪ পত্রের ১ম স্তম্ভের ৪র্থ পংক্তির শেষ ভাগে "সমস্তত" স্থলে "সমস্ত" হইবে। ঐ পত্রের ঐ স্তম্ভে ৪র্থ পংক্তিতে "মহাতত্ত্বানুরাগী" স্থলে "মহত্ত্বানুরাগী" হইবে।

[illegible]

Registerd NO 52.

ब्रह्मवा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयं सर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्य साधनञ्च तदुपासनमेव।

বর্ষশেষ ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা।

৩০ চৈত্র শনিবার, ১৮০০ শক।

পুষ্টিকর অন্নপান সেবন দ্বারা যেমন শরীর দৃঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ হইয়া কার্য্যক্ষম হয়, তেমনি পবিত্র সত্যজ্ঞান, প্রেমামৃত উপভোগ দ্বারা আত্মা বলবান হইয়া উন্নতি-সোপানে উত্থিত হইবার সামর্থ্য লাভ করে। ভৌতিক দেহের পক্ষে ভৌতিক জগতই যেমন অন্ন পানের একমাত্র আধার, বিজ্ঞানময় আত্মার পক্ষে, তেমনই পূর্ণ-জ্ঞান পূর্ণ-প্রেম অমৃত স্বরূপ পরমেশ্বরই সত্যজ্ঞান প্রেমামৃতের একমাত্র অশেষ ভাণ্ডার। পার্থিব ভোজ্য পানীয় পরিত্যাগ করিলে যেমন কোন ক্রমেই শরীর রক্ষা হয় না, তেমনই সত্যজ্ঞান অমৃত স্বরূপ পরমেশ্বরকে ছাড়িলে কোন রূপেই আত্মার প্রাণপোষণ হইবার সম্ভাবনা থাকে না। সেই সত্যজ্ঞান প্রেমামৃতের অভাবে আত্মা জীর্ণ শীর্ণ রুগ্ন ভগ্ন অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। হস্ত পদ সঞ্চালন পূর্ব্বক ভূমি কর্ষণ, বীজ বপনাদি না করিলে যেমন পার্থিব অন্ন প্রাপ্ত হওয়া যায় না; তেমনই ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ চরিত্র-শোধন পূর্ব্বক আত্মার বৃত্তি সঞ্চালন না করিলে কোন প্রকারেই আত্মার অন্ন, সত্যজ্ঞান প্রেমামৃত লাভেরও প্রত্যাশা থাকে না। সেই সত্যজ্ঞান প্রেমামৃত লাভের উপাসনাই একমাত্র সোপান। উপাসনা দ্বারা যেমন স্রষ্টা পাতা বিধাতার প্রতি সৃষ্ট আশ্রিত ও অনুগত আত্মার শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন-জনিত মহান্ কর্ত্তব্য সংসাধিত হয়, এবং তেমনই তাহার সঙ্গে সঙ্গেই সত্যজ্ঞান অমৃত লাভ দ্বারা আত্মার পুষ্টিবর্দ্ধন হইয়া থাকে।

শারীরিক কার্য্য সম্পাদনার্থ অক্ষত শক্তি সামর্থ্য আবশ্যক বলিয়া করুণানিধান পরমেশ্বর যেমন শরীর পোষণ ও বলবর্দ্ধনের নিমিত্ত ক্ষুৎপিপাসার সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সেই ক্ষুধা তৃষ্ণা শান্তি-বিষয়ে মানব-কুলকে যত্নযুক্ত করিবার জন্য তাহার প্রত্যক্ষ পুরস্কার স্বরূপ তৃপ্তি-সুখ বিধান করিতেছেন, তেমনি সৎকার্য্যে সাধুকার্য্যে ধর্ম্ম কার্য্যে আত্মার অপ্রতিহত বলবীর্য্য অপরাজিত উৎসাহ অনুরাগ প্রয়োজন বলিয়া সেই মঙ্গলময় মহান্ পুরুষ আত্মাতে জ্ঞানক্ষুধা প্রেম-তৃষ্ণা প্রদান পূর্ব্বক সেই ক্ষুৎপিপাসা

নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গেই তাহার অব্যর্থ ফল স্বরূপ সুখ শান্তি আত্ম-প্রসাদ বিতরণ করিয়া মানবকুলকে প্রতিনিয়তই তাঁহার সুখাবহ সন্নিধানে আকর্ষণ করিতেছেন। যে ব্যক্তি আলস্য-পরবশ হইয়া কর্ম্মশ্রম হইতে নিবৃত্ত থাকে, তাহার যেমন ক্ষুৎ-পিপাসার সবিশেষ উদ্রেক হয় না, এবং যথেচ্ছ পান ভোজন করিলেও তাহার তৃপ্তি অনুভূত হওয়া দূরে থাকুক বরং তদ্দ্বারাই যেমন সে রোগাক্রান্ত হয়, তেমনি যে সাধক আত্ম-উৎকর্ষ সাধনে বিরত হয়, তাহার সত্যজ্ঞান প্রেমামৃতে অনভিরুচি উপস্থিত হইয়া থাকে এবং ঘটনা ক্রমে সময়বিশেষে প্রচুর জ্ঞান প্রেম সত্য লাভ করিলেও সে তাহা পরিপাক করিতে পারে না সুতরাং তাহার আত্মা প্রকৃত ভোজ্য উপভোগ্য বিষয়ের অভাবে হীনবল ও হীনবীর্য্য হইয়া ক্রমে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়ে। ঈশ্বরের আদেশ উপদেশের অনুগামী হইলে যে মনুষ্য পশু-রাজ্যে ভৌতিক-জগতে একাধিপত্য করিতে পারে, যে আপনার প্রকৃতি প্রবৃত্তির উপরে কর্ত্তৃত্ব করিতে সামর্থ্য লাভ করত এই অধোলোকে সুখ ঐশ্বর্য্য শান্তি মঙ্গল বিস্তার করিয়া প্রকৃত দেব-প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়, সেই মনুষ্যই আবার ঈশ্বরের ইচ্ছা উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের প্রতিকূলগামী হইলে পশুর পদানত জল বায়ুর অনুগত এবং প্রকৃতি প্রবৃত্তির নিতান্ত শরণাগত দাস হইয়া ভূমণ্ডলে দুঃখ দারিদ্র, অশান্তি অকল্যাণ-স্রোত প্রবাহিত করিয়া চির কষ্ট ক্লেশে অবসন্ন হইয়া থাকে। সত্যের অনাদর ধর্ম্মের অবমাননা করিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব হইতে পরিভ্রষ্ট হয়। সেই জন্যই মনুষ্যসমাজ সংরচিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই শারীরিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনের পদ্ধতি ভূমণ্ডলে স্বতঃপ্রবর্ত্তিত হইয়াছে। যে দেশীয় মনুষ্য সকল যত্ন আগ্রহ সহকারে ঈশ্বরের আদেশ উপদেশ যে পরিমাণে প্রতিপালন করিতেছে, সেই খানেই তাহার প্রত্যক্ষ পুরস্কার স্বরূপ তদনুরূপ দুঃখের হ্রাস সুখের বৃদ্ধি, পাপের অল্পতা পুণ্যের প্রাবল্য দৃষ্ট হইয়া থাকে।

অতএব সেই মঙ্গলময় পরমেশ্বরের জাগ্রত জীবন্ত পরিপালন-প্রণালী—সেই সুখাবহ কল্যাণগর্ভ পদ্ধতি প্রত্যক্ষ সন্দর্শন করিয়াও যদি আমরা তাহা প্রতিপালন করিতে দৃঢ়ব্রত না হই, তবে আর আমারদের জ্ঞানের গৌরব, বুদ্ধির মহত্ত্ব কোথায় থাকে? তবে আর মনুষ্য-নামের প্রকৃত স্পর্দ্ধা কৈ রক্ষিত হয়? কেবল শারীরিক নিয়ম প্রতিপালন-জনিত বৈষয়িক সুখ ঐশ্বর্য্য পরিবর্দ্ধনেই মনুষ্যের প্রকৃত মহত্ত্ব প্রকাশ পায় না, তাহার আত্মোন্নতি সংসাধনেই যথার্থ শ্রেষ্ঠত্ব দেবত্ব লাভ হইয়া থাকে। মনুষ্য এখানে মোহ-নীহারে আবৃত হইয়া, বৃথা জল্পনাতে প্রাবৃত হইয়া, পশু-ভোগ্য বিষয়-সুখে ইন্দ্রিয়-সুখে তৃপ্ত হইয়া যাগ যজ্ঞে সময় অতিবাহিত করিয়া সঞ্চরণ করিতেছে।

"নীহারেণ প্রাবৃতা জল্প্যা চাসুতৃপ উক্থশাসশ্চরন্তি।"

যাহাতে আপনার পরমার্থ সাধন আপনার পরম কল্যাণ সম্পাদন হয়, তাহার প্রতি অনেকেরই দৃষ্টি নাই। ইন্দ্রিয়নিগ্রহ চরিত্রশোধন, আপাততঃ সুখপ্রদ নহে বলিয়া কি তাহার প্রতি উপেক্ষা করা মনুষ্যের কার্য্য? ধর্ম্মতত্ত্ব বিষয়-বিমুগ্ধ চিত্তের পক্ষে দুর্ব্বোধ বলিয়া কি তাহা শিক্ষণীয় নহে? ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া কি তাঁহার সত্তা সন্নিকর্ষ উজ্জ্বলতর রূপে আত্মাতে উপলব্ধি করা নিষ্প্রয়োজন? ধর্ম্ম-নিয়ম সকল, অবৈধ বিষয়-সেবা ও ইন্দ্রিয়-সেবার বিরোধী বলিয়া কি তাহা পালনীয় নহে? আমরা কি অমৃতের প্রতি উদাসীন হইয়া বিষয়-গরল

পানেই মত্ত থাকিব? নিত্য বস্তুর প্রতি উপেক্ষা করিয়া কেবল কি অনিত্য বস্তুর আহরণেই জীবন কাল অতিবাহিত করিব? সত্যজ্ঞান প্রেমামৃতরূপ দেবভোগ্য বল-পুষ্টিকর পদার্থ পরিত্যাগ করিয়া সামান্য পার্থিব পান ভোজনে নিযুক্ত থাকিয়া কি অনন্ত ধামের যাত্রী অমর আত্মাকে চলৎ-শক্তিরহিত করত এই সংসার-পান্থ-নিবা-সেই বদ্ধ করিয়া রাখিব? দুর্লভ মানব-জন্ম কেবল কি বাল্যক্রীড়াতেই অতিবাহিত হইবে? যৌবনের শিক্ষা সাধন, বার্দ্ধক্যের আত্ম-পরিণতি কি আমারদের প্রার্থনীয় নহে? কেবল কি তৃণের ন্যায় মানব আত্মা এখানে দুঃখ শোকে ভয় তাপে আন্দোলিত হইতে থাকিবে? কেবল কি প্রবৃত্তি-স্রোতেই জীবাত্মা এখানে ভাসমান হইবে? বল-বুদ্ধি জ্ঞান-শক্তির অনন্ত উৎস, তাহার অন্তরে থাকিতে কেন সে এখানে দীন ভাবে মুহ্যমান হইয়া রহিবে? আত্মা একান্ত বিকৃত না হইলে আর ঈশ্বর-উপাসনায় লোকের বিতৃষ্ণা উপস্থিত হয় না? মনুষ্য নিতান্ত বিভ্রান্ত না হইলে আর তাহার মুখ হইতে "ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বদর্শী, তাঁহার পূজার্চ্চনা ধ্যানধারণা প্রার্থনার প্রয়োজন নাই" ইত্যাকার দুর্ব্বাক্য বিনির্গত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। দুরারোগ্য আত্ম-বিকার উপস্থিত না হইলে আর কাহারও অমৃতে অনভিরুচি জন্মে না। ভোজ্য পানীয় নিকটে থাকিলেই কি কখন ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ হয়? গাভী-শরীরে দুগ্ধসার ঘৃত রহিয়াছে বলিয়াই কি তদ্দ্বারা তাহার শরীর পুষ্ট হইয়া থাকে? কার্য্যযোগে তাহা নিঃসারণ করত সেবন করিলেই তাহার শরীর পুষ্ট হয় এবং তাহা ঔষধতুল্য কার্য্যকারক হইয়া থাকে তেমনি অমৃতস্বরূপ পরমেশ্বর সর্ব্বভূতে, সকল আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত থাকিলেই তদ্দ্বারা আত্মার পুষ্টি-সাধন হয় না। উপাসনারূপ কার্য্যদ্বারা তাঁহাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়া তাঁহার সহবাসজনিত সত্যজ্ঞান প্রেমামৃত সম্ভোগ করিতে পারিলেই তবে আত্মার ক্ষুধা তৃষ্ণার শান্তি হয়, আত্মার বলবীর্য্য বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

"গবাং সর্পিঃ শরীরস্থং ন করোত্যঙ্গপোষণম্, নিঃসৃতং কর্ম্মসংযুক্তং পুনস্তাসাং তদৌষধম্। এবং সহি শরীরস্থঃ সর্পিবৎ পরমেশ্বরঃ বিনা চোপসনাদেব ন করোতি হিতং নৃষু॥"

সেই আপ্তকাম মহাযোগী যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির এই সুধাময় অমৃতময় পরীক্ষা-সিদ্ধ উপদেশ-বাক্য স্মরণ করিয়া সকলে ব্রহ্মোপাসনায় প্রবৃত্ত হও, যে নিশ্চয়ই অমৃত ফল লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবে। নতুবা যাহারা জীবনে কখনও ধর্ম্মের মাহাত্ম্য অনুভব করে নাই, অমৃতের আস্বাদ প্রাপ্ত হয় নাই, অনন্ত কাল অনন্ত লোকের ছায়াও যাহারদের অন্তরে কখন নিপতিত হয় নাই, জড় উদ্ভিদ পশু-প্রকৃতির অতীত দেদীপ্যমান বিজ্ঞানময় অবিনশ্বর আত্মার সত্তা যাহারা উপলব্ধি করিতে পারে নাই; সেই সকল দীন দরিদ্র কুতার্কিক কৃপাপাত্রদিগের অসৎ দৃষ্টান্তে অসৎ উপদেশে অমৃতের সোপান পরিত্যাগ করিও না। উপাসনাই পরমার্থসাধনের অদ্বিতীয় উপায়, উপাসনাই সংসারের পাপ তাপ, মোহ প্রলোভন হইতে সুরক্ষিত হইবার একমাত্র সাধন। উপাসনাই আধ্যাত্মিক বলবীর্য্য লাভের এবং নবতর কল্যাণতর সত্য জ্ঞান প্রেমানন্দ প্রাপ্তির একমাত্র কারণ।

যাঁহারা উপাসনার প্রকৃত অর্থ তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া কেবল তদ্-বিষয়ক প্রবৃত্তিমূলক উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া কতকগুলি শব্দ উচ্চারণকেই উপাসনা জানিয়া তাহারই আবৃত্তি পুনরাবৃত্তিতেই নিযুক্ত থাকেন, তাঁহারাও উপাসনার প্রকৃত

ফল লাভে বঞ্চিত হয়েন। তাঁহারা কেবল চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় নিয়মের দাস হইয়াই অন্ধ-বিশ্বাস দ্বারাই চালিত হন কিন্তু তদ্দ্বারা তাঁ-হারদের তৃপ্তি লাভ, উন্নতি লাভ হয় না। বস্তুতঃ কি করিতেছি, কি বলিতেছি, যদি তাহা নিজেই বুঝিতে না পারি, তবে তা-হাতে কিরূপেই বা আন্তরিক নিষ্ঠা—অপ্র-তিহত অনুরাগ উপস্থিত হইবে। স্বাধীন ইচ্ছার সহিত ধর্ম্মবুদ্ধির উত্তেজনায় যাহা জ্ঞান-পূর্ব্বক কৃত হয় তাহাতেই প্রকৃত ফল লাভ হইয়া থাকে। যাঁহারা নিত্য উপাসনায় নিযুক্ত থাকিয়াও সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন নাই, তাঁহারা এই ঋষি-বাক্য স্মরণ করুন যে

"মন্ত্রার্থং মন্ত্রচৈতন্যং যোন জানাতি সাধকঃ।
শতলক্ষপ্রজপ্তোঽপি তস্য মন্ত্র ন সিদ্ধতি"।

যে সাধক মন্ত্রার্থ মন্ত্রমাহাত্ম্য না জানেন, তিনি শত লক্ষবার তাহা আবৃত্তি করিলেও তাহাতে সিদ্ধিলাভ হয় না। নিত্য পান ভোজন করিয়াও যদি শারীরিক বলপুষ্টি লাভ না হয়, তাহা হইলে তাদৃশ অন্নপান যেমন শরীরের উপযোগী নহে বলিয়া নিঃশংসয়ে অবধারণ করা যায়; তেমনই যে প্রকার উপাসনায় ত্রিসন্ধ্যা নিযুক্ত থাকিলেও আ-ত্মার বলবীর্য্য উৎসাহ অনুরাগ বৃদ্ধি না পায়, তাদৃশ উপাসনা যে বিশুদ্ধ উপাসনা নহে, তাহা কার্য্য-পরীক্ষাতেই প্রত্যক্ষ উপ-লব্ধি করা যায়। উপাসনা করিতেছি অথচ ধর্ম্মে অনুরাগ, অধর্ম্মে বিরাগ উপস্থিত হইতেছে না; উপাসনা করিতেছি, অথচ সংসার-বন্ধন হৃদয়গ্রন্থি ছেদ করিতে পারি-তেছি না; উপাসনা করিতেছি, অথচ ঈশ্ব-রের জাগ্রৎ জীবন্ত সত্ত্বা দিন দিন অধিকতর রূপে অন্তরে বাহিরে জাজ্বল্যতর রূপে উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না; উপাসনা করিতেছি, অথচ শান্তিমঙ্গল আরাম তৃপ্তি অনুভূত হইতেছে না, উপাসনা করিতেছি, অথচ পক্ষ মাস ঋতু সম্বৎসর অতিবাহিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে আত্মা উন্নত ধামের নি-কটবর্ত্তী হইতেছে বলিয়া আশা আনন্দে উৎফুল্ল হইতেছে না; তবে আর উপাসনার প্রত্যক্ষ ফল কৈ লাভ হইতেছে? অবশ্যই সাধনমূলে কোন না কোন দোষ নিহিত থাকিবেই যদ্দ্বারা সাধক প্রবাসের দিন অতি-বাহিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে পিতার সন্নিহিত—মাতার নিকটস্থ হইতে পারে না। যাঁহারা প্রকৃত সাধন উপাসনায় নিযুক্ত আছেন. তাঁহারদের আত্মা আজ বর্ষশেষ উৎসবে নবতর উৎসাহ ধারণ করিতেছে। এক বৎসরের পথ নির্ব্বিঘ্নে অতিক্রম করিয়া প-রলোক ব্রহ্মলোকের নিকটবর্ত্তী হইলেন, ইহাতে তাঁহারদের আত্মা অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি কৃতজ্ঞতা-ভরে ঈশ্বরসন্নি-ধানে আপনা হইতেই প্রণত হইতেছে।

শিশু যেমন যথাপদ্ধতি পরিশোধিত হইলে দিন দিন দ্রঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ হইয়া কা-লেতে যৌবনশ্রী ধারণ করে, তেমনি আত্মা নির্ম্মল নিষ্পাপ হইয়া ব্রহ্মোপাসনায় নিযুক্ত থাকিলে ক্রমে জ্ঞান প্রেম সত্য মঙ্গল ভাবে অলঙ্কৃত হইয়া উদ্যম উৎসাহের সহিত অতি সহজে পুণ্য-পথে—অমৃত-সো-পানে উত্থিত হইবার শক্তি সামর্থ্য লাভ করিয়া থাকে। কষ্ট-ক্লেশ-সাধ্য বিষয় সকলও তাহার সাধ্যায়ত্ত হইয়া আইসে। কঠোর ব্রত-ধর্ম্ম পুণ্য-কর্ম্ম সকল, তাহার নিশ্বাস প্রশ্বাস কার্য্যের ন্যায় সহজ ব্যাপার হইয়া পড়ে। যাহাতে মোহ-নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া ব্রহ্মোপাসনার জন্য আত্মা উদ্বোধিত হয়, যে সকল বাক্যে ঈশ্বরের সত্যজ্ঞান, অনন্ত মহান্ ভাব, আনন্দ ও অ-মৃতভাব, শান্ত মঙ্গল ভাব, আত্মাতে প্রদীপ্ত হয়; যে সকল কথায় ঈশ্বরের বলবীর্য্য স্নেহ করুণা, অন্তরে মুদ্রিত হওয়াতে আত্মা তাঁ-

হার বরণীয় জ্ঞান শক্তি ধ্যানে নিযুক্ত হয়, এবং স্বতই তাঁহার স্তুতিগানে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে, যদ্দারা মানব-আত্মা অসৎ বিষয় চিন্তা হইতে, অজ্ঞান-অন্ধকার হইতে, হৃদয়-গ্রন্থি ও মৃত্যুপাশ হইতে মুক্তি-ইচ্ছু হইয়া উঠে এবং ঈশ্বরকেই পরম গতি, পরম সম্পদ, পরম লোক, পরমানন্দ জানিয়া সেই মহোচ্চ আদর্শের অনুকরণ ও অনুসরণে প্রবৃত্ত হয়; তাহাই জাগ্রৎ জীবন্ত উপাসনা। তাদৃশ উপাসনা দ্বারাই সাধক সত্যজ্ঞান প্রেমামৃত লাভ করিয়া থাকে। সেই সকল অর্থপূর্ণ ভাব-পূর্ণ অমৃত-গর্ভ মন্ত্র-বাক্যই উপাসনার আশ্রয়-উপাদান। আমরা তাহা অবলম্বন করিয়া কতদূর ব্রহ্মরূপ লক্ষ্যভেদে সমর্থ হইয়াছি, আমারদের আত্মা কি পরিমাণে লক্ষ্য বিদ্ধ করিয়া ভয় তাপ শোক মোহ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া নির্ভয় ও নিষ্পাপ হইয়াছে, আজ তাহা সকলে একবার আলোচনা কর। বর্ষশেষের সঙ্গে সঙ্গে আজ আমারদের পরমায়ু এক বৎসর কাল নিঃশেষিত হইল। আমারদের এখানকার শিক্ষা সাধন অবসর চলিয়া গেল। এই উৎসব-রজনীর সঙ্গে সঙ্গে আমরা মৃত্যু, না হয় অমৃতের সোপানে অগ্রসর হইলাম। দুর্ভাগ্যক্রমে যদি যথার্থই মৃত্যুর অভিমুখীন হইয়া থাকি, আইস সকলে বিনীত ভাবে মৃত্যুপাশ হইতে মুক্ত হইবার জন্য সেই অমৃত স্বরূপের শরণাপন্ন হই। যদি অমৃত-সোপানে অগ্রসর হইয়া থাকি, তাহা হইলে আইস সকলে ধর্ম্মের জয়, সত্যের জয়, ঈশ্বরের জয় ঘোষণা করিয়া তাঁহার নিকটে ভবিষ্যৎ বিঘ্নবিপত্তি বিনাশের জন্য ধর্ম্মবল ও শুভবুদ্ধি প্রার্থনা করি এবং তাঁর প্রদত্ত পুণ্য পবিত্রতা, আত্মপ্রসাদ ও ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগজনিত সকৃতজ্ঞচিত্তে প্রণতমস্তকে তাঁহাকে বার বার প্রণিপাত করি।

হে করুণানিধান! সম্বৎসর কাল আমরা কতশত পাপাচরণ করিয়াছি, কত প্রকার কর্ত্তব্য সাধনে বিমুখ হইয়া তোমার প্রসন্নতা লাভে বঞ্চিত হইয়াছি, তজ্জন্য অনুতাপ-অনলে হৃদয় দগ্ধ হইয়া যাইতেছে। হে অমৃতের অনন্ত উৎস! একবিন্দু অমৃত বর্ষণ করিয়া আমারদের আত্মাকে শীতল কর, পাপমলা প্রক্ষালিত করিয়া আমারদের আত্মাকে শুদ্ধসত্ত্ব পবিত্র করিয়া তোমার অধিষ্ঠানের যোগ্য করিয়া লও। তোমার সদাব্রত-দ্বার সর্ব্বত্র চিরমুক্ত থাকিলেও আমরা নিজ-দোষে যে সকল সত্যরত্ন স্পর্শ করিতে পারি নাই, তুমি তাহা আমারদিগকে উপভোগ করিবার শক্তি সামর্থ্য প্রদান কর। তুমি আত্মার নিভৃত নিলয়ে বিরাজমান থাকিলেও আমরা অজ্ঞানান্ধ হইয়া তোমার যে সত্য সুন্দর অমৃতস্বরূপ দেখিতে পাই নাই, তুমি কৃপা করিয়া আমারদিগের সন্নিধানে তাহা প্রকাশ কর, যে আমরা কৃতার্থ হই। তোমার অভয় মঙ্গলরূপ একবার প্রদর্শন কর, যে আমরা নির্ভয় হই।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

পরকাল।

(৪২৯ সংখ্যক পত্রিকার ১০ পৃষ্ঠার পর।)

ঈশ্বরের সমুদায় বিভূতি এই এক পূর্ণ শব্দ দ্বারাই প্রকাশিত হয়। তাঁহার পূর্ণত্ব নির্ব্বিরোধে প্রমাণিত হইলে তাঁহার সম্বন্ধে সকলই প্রমাণ করা হইল। কিন্তু পূর্ণত্বে সংশয় সমারোপিত করিতে পারিলে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্বই থাকে না এই জন্য একদল সংশয়বাদী ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ অস্বীকার করিতে না পারিয়া তাঁহার পূর্ণত্বের বিরোধী হইয়াছে। তাঁহাদের যুক্তির স্থূল তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ণ-মঙ্গল ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্ হইলে জগতে অমঙ্গলের গন্ধ মাত্র রাখি-

তেন না। অথবা সর্ব্বশক্তিমান হইয়া তিনি পূর্ণ-মঙ্গল হইলেই বা জগতে অমঙ্গল থাকিত কেন? অতএব ঈশ্বরকে পূর্ণ-মঙ্গল বলিয়া স্বীকার করিলে, তাঁহাকে সর্ব্বশক্তিমান বলা যাইতে পারে না; কিম্বা তাঁহাকে সর্ব্বশক্তিমান বলিয়া স্বীকার করিলে, তাঁহার মঙ্গলময়ত্ব অস্বীকার করিতে হয়। আবার তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতার প্রতিও সংশয় প্রদর্শন করা হইয়াছে। জ্ঞানবান লোকেরা আপন শক্তির অসাধ্য কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন না; কিন্তু ঈশ্বর যাহা রক্ষা করিতে পারেন না, এমন অনেক পদার্থের সৃজন করিয়া থাকেন। তাঁহারা অকাল মৃত্যুকে এই উক্তির প্রমাণস্থলে অবতারণ করেন। এই অকাল মৃত্যু প্রাণী ও উদ্‌ভিদ জগতে প্রচুর রূপে বর্ত্তমান। এই উভয় জগতে যত পদার্থ সৃষ্ট হয়, তাঁহারা বলেন, ঈশ্বর সকলকে রক্ষা করিতে পারেন না। অতএব নিরর্থক কার্য্যকারিতা নিবন্ধন ঈশ্বরকে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়াও স্বীকার করা যাইতে পারে না।

যথার্থ বটে যে, জগতে যত পদার্থ উপজাত হয়, তৎসমুদায় তাহাদের নির্দ্দিষ্ট পরিপক্কাবস্থা প্রাপ্তি জন্য সংরক্ষিত হয় না। অধিকাংশ অকালে কাল-কবলিত হয়। কিন্তু এরূপ হয় বলিয়াই কেবল, বিশেষ না জানিয়া শুনিয়া ঈশ্বরের জ্ঞানের প্রতি দোষারোপ করা যার পর নাই ধৃষ্টতার কার্য্য। কর্ত্তার মনের অভিপ্রায় না জানিয়া কেবল মাত্র কার্য্য দর্শন করিলেই কি তাহার বুদ্ধিমত্তার সম্পূর্ণ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গেল? অচিন্ত্যস্বরূপ ঈশ্বরের ত কথাই নাই, সামান্য মনুষ্য সম্বন্ধেও আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি না যে, তাহার বুদ্ধি ও জ্ঞানের পরিচয়-পক্ষে তাহার মনের গূঢ় অভিপ্রায় ও কার্য্যের নিয়ম অবগত হওয়া অনাবশ্যক; কেবল মাত্র তাহার কার্য্যদর্শনই যথেষ্ট। ঈশ্বরের গূঢ় অভিপ্রায় ও কার্য্যের নিয়ম সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান কতটুকু। আমাদের মধ্যে অতিবড় বিদ্বানেরাও স্বীয় অনভিজ্ঞতা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। এমতাবস্থায় প্রতিবাদীদিগের স্পর্দ্ধা নিতান্ত অসহনীয়। কে বলিতে পারে ঈশ্বর কোন্ গূঢ় অভিপ্রায়ে কি কার্য্য করিয়া থাকেন? ফলতঃ এই অকাল-মৃত্যু-মূলক আপত্তিকে নিতান্ত অনধিকার চর্চ্চা বোধে এই প্রস্তাবে আমরা কেবল অমঙ্গল-মূলক আপত্তির বিচারেই বিশেষ রূপ মনোনিবেশ করিব। এই আপত্তি খণ্ডন করিতে পারিলে পূর্ব্বোক্ত আপত্তি দুর্ব্বল ও লঘু বলিয়া প্রতীত হইবে।

সংশয়বাদিরা জগতে অমঙ্গলের সত্তা প্রত্যক্ষ করিয়া, অর্থাৎ জগৎকে অপূর্ণ দেখিয়া ঈশ্বরের পূর্ণত্বের প্রতিবাদ করিয়াছেন তাঁহারা কার্য্য দেখিয়া অনুমান দ্বারা কারণের স্বরূপ অবধারণার্থ সচেষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু এরূপ অনুমান-মূলক যুক্তি-প্রণালী কোন অবিদিত কারণের স্বরূপ নির্ণয় সম্বন্ধে কদাচিৎ সঙ্গত হইলেও, প্রত্যক্ষ মূলকারণ ঈশ্বর সম্বন্ধে কদাপি সঙ্গত হয় না। সুতরাং সংশয়বাদীদিগের পক্ষে এরূপ বলা যুক্তিযুক্ত নহে যে, জগৎরূপ কার্য্য অপূর্ণ, অতএব জগৎ কারণও অপূর্ণ! যেহেতু আমরা ঈশ্বরকে পূর্ণ-স্বরূপ রূপে নিয়ত প্রত্যক্ষ করিতেছি; আমরা সহজ জ্ঞান দ্বারা তাঁহার পূর্ণত্বের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছি। জগৎ অপূর্ণ হউক বা না হউক, তদ্দ্বারা আমাদের এই সহজ জ্ঞানের অন্যথা হইতে পারে না; যেহেতু বাহ্য জগতে নহে, আমরা আমাদের আত্মাতেই ঈশ্বরের অনন্তত্বের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছি। তবে সংশয়বাদিরা যদি এরূপ প্রত্যক্ষ সত্যেরও পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন আমরা বরং তাহাদের প্রবোধার্থ প্রমাণ করিয়া দিতে প্রস্তুত আছি যে, জগৎ

অপূর্ণ হইলেও তাহার অপূর্ণত্ব ঈশ্বরের পূর্ণত্বের সহিত সঙ্গত বটে। বস্তুতঃ আমরা আমাদের অন্তরিন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ ঈশ্বরের এই পূর্ণত্বকে স্বীকার্য্য রূপে গ্রহণ করিয়া ঐ স্বীকার্য্য যে জগতে অমঙ্গল রূপ অপূর্ণত্বের সহিত সমন্বিত হয়, অর্থাৎ জগতে অমঙ্গলের সত্তাতে ঈশ্বরের পূর্ণ মঙ্গলত্বের কোন ব্যাঘাত যে হয় না, ইহা প্রমাণ করিয়া দিতে প্রস্তুত আছি। আমরা এতদর্থে বক্ষ্যমান যুক্তি-ক্রম অবলম্বন করিলাম। (১) ঈশ্বর স্রষ্টা। সৃষ্ট পদার্থ উন্নতিশীল হইলে, উন্নতি-মার্গে অমঙ্গলের সহিত তাহার সাক্ষাৎ অনিবার্য্য। (২) ঈশ্বর পূর্ণ স্বরূপ অতএব তিনি মঙ্গল স্বরূপ। পূর্ণ ও মঙ্গল এই দুইটী শব্দ ফলিতার্থে একই ভাবব্যঞ্জক। অপূর্ণ জগৎ কাজেই অমঙ্গলের আয়তন। (৩) অপূর্ণ চৈতন্যের নিমিত্ত অমঙ্গল প্রয়োজনীয় অতএব অমঙ্গল মঙ্গলেরই নিমিত্ত। পরিশেষে ঈশ্বরের পূর্ণত্বকে স্বীকার্য্য রূপে গ্রহণ করা যে অবৈজ্ঞানিক হয় নাই, অর্থাৎ ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের সহজ জ্ঞানের এই জ্ঞাপন যে বিশুদ্ধ দার্শনিক বিচারেও অবিসম্বাদার্হ সত্য, ইহা প্রদর্শন করিয়া আমরা ঈশ্বরের স্বরূপ চর্চ্চার উপসংহার করিব।

১। ঈশ্বর পূর্ণ অর্থাৎ তিনি মঙ্গলময় জ্ঞানময় ও সর্ব্বশক্তিমান। সর্ব্বশক্তিমান দুইটী পদার্থ থাকিতে পারে না। যে হেতু এরূপ সর্ব্বশক্তিমান পদার্থদ্বয়, পরস্পরের সর্ব্বশক্তিমত্তা সংহরণ করিবে। অতএব জগতে একটী মাত্র পূর্ণ পদার্থ থাকা সম্ভব হয়। পূর্ণত্বে কিছুরই অভাব থাকে না। কাল, কি স্থান, কি সত্তা, কি প্রভাব সকল বিষয়েই উহা পূর্ণ। আবার যাহা পূর্ণ তাহা একমাত্র মূল পদার্থ। কারণ দ্বিতীয় কোন মূল পদার্থ যদি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে পূর্ণত্বকে বিভক্ত করা হইল। অর্থাৎ সম্পূর্ণত্ব ধারণ বিষয়ে প্রথম পদার্থে এই দ্বিতীয় পদার্থের সত্তার মূলত্বের অভাব অবশ্যই রহিল। কিন্তু অভাবের ভাব পূর্ণ ভাবের সংলগ্ন নহে, পূর্ণত্বে আদৌ শক্তির অভাব থাকিতে পারে না। অতএব ঈশ্বরকে পূর্ণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইলে, তাঁহাকে একমাত্র মূল সত্তা এবং ইতর সমূহ পদার্থকে তাহার অন্তর্ভূত ও অপূর্ণ বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। অপিচ এরূপ অপূর্ণ পদার্থকে স্বীয় সত্তার জন্য কাজেই পূর্ণ পদার্থ ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হয়। সুতরাং অপূর্ণ পদার্থ মাত্রেই সৃষ্ট।

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীৎ নান্যৎ কিঞ্চনাসীৎ তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ।"

পূর্ব্বে কিছুই ছিল না, কেবল একমাত্র সৎস্বরূপ পরব্রহ্মই ছিলেন। তিনিই অভাবকে সম্ভাব্য সর্ব্ব প্রকার ভাবে পরিণত করিলেন; অর্থাৎ এই বিশ্ব-জগৎ সৃজন করিলেন—ইহা প্রাগুক্ত স্বীকার্য্যের আনুষঙ্গিক সত্য।

অনন্তর, এই জগৎ-কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে প্রতীত হয় যে উন্নতিই এই জগতের মূল নিয়ম। সকল পদার্থই উন্নতির দিকে ধাবিত হইতেছে। অভাব নিকৃষ্ট ভাবে, নিকৃষ্ট ভাব উন্নত ভাবে পরিণত হইতেছে। এই আরোহ-সোপান-শ্রেণীতে অভাব ও পূর্ণ ভাবের মধ্যে অবশ্যই অপূর্ণ, অর্থাৎ অমঙ্গল ভাবের স্থান থাকা চাই। এই জন্যই জগতে অমঙ্গলের বিদ্যমানতা প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে; ঈশ্বরের অপূর্ণতা হেতু জগৎ সংসারে অমঙ্গলের সদ্ভাব এমৎ নহে। ঈশ্বরের সৃজন-শক্তি জগতে মঙ্গল অমঙ্গল সর্ব্ব প্রকার ভাবের সৃজন করিয়াছে। সৃজনই সে শক্তির কার্য্য। কিন্তু তাঁহার মঙ্গল্য শক্তি অমঙ্গলের উপর মঙ্গলের জয় নিয়ত

বিধান করত এই জগৎকে মঙ্গলময় করিয়া তুলিয়াছে। অমঙ্গল মঙ্গলে পরিণত হওয়াতে ঈশ্বরের অচিন্ত্য মহিমার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মঙ্গল ও পূর্ণ দুই পর্য্যায় শব্দ বলিতে হইবে। যাহা নিরবচ্ছিন্ন মঙ্গল তাহাই পূর্ণ; যাহা পূর্ণ, তাহাই মঙ্গলময়। সুতরাং ঈশ্বর মঙ্গল স্বরূপ যেহেতু তিনি পূর্ণস্বরূপ। পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, পূর্ণ স্বরূপ ঈশ্বর ভিন্ন অন্য সমস্ত সত্তাই অপূর্ণ। কিন্তু অপূর্ণ অমঙ্গল্যের নামান্তর মাত্র। অতএব অপূর্ণ সত্তায় অমঙ্গলের সমাবেশ অনিবার্য্য। সত্তার এই ভাবের অন্যথা হইতে পারে না। সুতরাং জগতে অমঙ্গলের সদ্ভাব দেখিয়া ঈশ্বরের অপূর্ণতা সিদ্ধান্ত যে নিতান্ত অপসিদ্ধান্ত তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যেহেতু এরূপ অমঙ্গলের সদ্ভাব দ্বারা ঈশ্বরের পূর্ণতার কিছু মাত্র অপচয় সিদ্ধান্ত হইতে পারে না; বরং পূর্ণতার নিয়মই এই।

৩। মঙ্গল অমঙ্গল কাহার সম্বন্ধে সার্থক? অচেতন পদার্থের অমঙ্গলই বা কি মঙ্গলই বা কি? অতএব মঙ্গল অমঙ্গল চৈতন্যেরই নিমিত্ত। মনুষ্য এই ধরাধামে সর্ব্বজীব-শ্রেষ্ঠ, অতএব মঙ্গলামঙ্গল মনুষ্যের নিমিত্তই সার্থক।

মনুষ্য চেতনাবান ক্রিয়াশীল জীব। আত্ম-ক্রিয়া-বোধ-সম্পন্ন ক্রিয়াশীলতাই (Conscious energy) মনুষ্যের জীবন। এই ক্রিয়াশীলতার উন্নতিতে মানব জীবনের উন্নতি। কীটাণু হইতে মনুষ্য, এক মনুষ্য হইতে অন্য মনুষ্য যে উন্নত এই ক্রিয়াশীলতার উন্নতিই তাহার কারণ। অর্থাৎ এই সচেতন ক্রিয়াশীলতা, এই জীবন্ত তেজ, এই আত্মক্রিয়াবোধসম্পন্ন শক্তির তারতম্যেই মনুষ্যের উন্নতির তারতম্য নির্ণীত হয়। কিন্তু মনুষ্য একেবারে পূর্ণ প্রভাব লইয়া অবনীমণ্ডলে অবতীর্ণ হয় নাই। উন্নতির উচ্চতর সোপানে উন্নীত হইবার জন্য তাহাকে নিয়ত তেজঃসঞ্চয় করিতে হয়। পরন্তু প্রতিকূলতা ব্যতীত তেজের উপচয় হয় না, প্রত্যুত অপচয়ই হইয়া থাকে। অতএব এই তেজকে এই ক্রিয়াশীলতাকে প্রদীপ্ত রাখিবার জন্য, অন্য কথায় মনুষ্যকে জীবিত রাখিবার জন্য, প্রতিকূলতা একান্ত প্রয়োজনীয়। প্রতিকূলতাই অমঙ্গল অতএব মনুষ্য জীবনে অমঙ্গল একান্ত প্রয়োজনীয়। আবার প্রয়োজনীয় যাহা তাহাই মঙ্গলের নিমিত্ত। সুতরাং অমঙ্গল মঙ্গলেরই নিমিত্ত। ধন্য ঈশ্বর! তোমার কীর্ত্তি তোমাকেই সাজে।

এক্ষণে প্রতিবাদিরা একথা বলিতে পারেন না যে, জগতের ভাব এরূপ কেন হইল যে উহাতে অমঙ্গল প্রয়োজনীয় হয়। যে হেতু, ঈশ্বর পূর্ণস্বরূপ অতএব অন্য সমস্ত পদার্থকে অপূর্ণ হইতেই হইবে, এই সত্য পূর্ণভাবের অবিচ্ছেদ্য সত্তা। ইহা সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের ভাব, ইহার অন্যথা নাই; কেন না ঈশ্বরের স্বভাব অনতিক্রম্য। প্রত্যুত এই ভাবের অনুগত হইয়াই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। জগতের অস্তিত্ব এই সত্যের অনুগত। এতদ্দ্বারা জগৎ বরং লাভবান হইয়াছে। অভাব হইতে উত্থিত হইয়া ভাবে বিরাজ করিতেছে। অতএব জগতে অমঙ্গল প্রয়োজনীয় কেন হইল, এই প্রশ্নের সহজ উত্তর এই যে, জগৎ পূর্ণস্বভাব মঙ্গলময়ের সৃষ্ট বলিয়াই, জগতে অমঙ্গল প্রয়োজনীয় হইয়াছে; জগতের লাভের জন্যই এরূপ হইয়াছে।

এতাবৎ যাহা বলা হইল এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ করা আবশ্যক হইতেছে। বলা হইয়াছে যে জগতে দুই প্রকার পদার্থের বিদ্যমানতা হেতুক আমাদের জ্ঞানও দুই

প্রকারের। আধ্যাত্মিক ও ভৌতিক। সত্তা বা ভাব আত্মার গোচর হওয়ার নাম জ্ঞান। ভৌতিক জ্ঞান, ইন্দ্রিয়ের মধ্যবর্ত্তিতাতে আত্মার গোচর হয়, কিন্তু আধ্যাত্মিক জ্ঞান আত্মার সাক্ষাৎ সমীক্ষিত। অতএব আধ্যাত্মিক জ্ঞানের প্রামাণ্য বলবত্তর বলিয়া স্বীকার করা উচিত। কিন্তু আমাদের চিরন্তন অভ্যাস বশত আমরা রূপ রস গন্ধাদির প্রতিই সমধিক শ্রদ্ধা ও আস্থা প্রদর্শন করিয়া থাকি। ইন্দ্রিয়-গোচর পার্থিব পদার্থই আমাদের অধিকতর বিশ্বাস্য হয়। অতীন্দ্রিয় পদার্থে আমাদের সমুচিত আস্থা নাই। ইন্দ্রিয়-গোচর পার্থিব পদার্থে নিয়ত মনকে সঞ্চারিত রাখিয়া অনেকে এমনি পার্থিব হইয়া গিয়াছেন যে, অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের উপলব্ধি তাঁহাদের মনে স্পষ্ট উদয় হয় না; এমন কি তাঁহারা আদৌ অতীন্দ্রিয় জগতের অস্তিত্বই স্বীকার করিতে চাহেন না। এই অবিশ্বাসকারিদিগের বিকৃত বুদ্ধি যাহাই বলুক তাঁহাদের অন্তরাত্মা কিন্তু অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের প্রভাব হইতে একেবারে বিমুক্ত হইতে পারে না। সুতরাং তাঁহাদের অনিচ্ছাতেও আধ্যাত্মিক ভাব সকল স্বপ্রভাবে তাঁহাদের মনে মধ্যে মধ্যে উদিত হয়। ইহা তাঁহারা অস্বীকার করিতে না পারিয়া সে সকলকে স্বাভাবিক কুসংস্কার বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য নানাবিধ যুক্তি ও কৌশলের উদ্ভাবন করিয়াছেন। ফলতঃ আমরা দেখিয়াছি তাহাতে তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। যত যুক্তিই কর যত কৌশলই কর সহজ জ্ঞানের বিরুদ্ধে তত্ত্বাবতে কোন ফলোদয় হইবার নহে। আমাদের ভৌতিক উপজ্ঞা অর্থাৎ অনুপদিষ্ট আদ্য জ্ঞান যেমন কেবল সহজ জ্ঞানের বিষয় ও যুক্তির অতীত আধ্যাত্মিক উপজ্ঞাও তেমনি কেবল সহজ জ্ঞানের বিষয় ও যুক্তির অতীত। আদিম জ্ঞান সকল যুক্তির দ্বারা লভনীয় নহে। যুক্তির দ্বারা যে জ্ঞান লভনীয় নহে, তাহাকে স্বীকার্য্য রূপে গ্রহণ করিয়া বরং তাহার পরীক্ষা করা সঙ্গত হয়। ঈশ্বরসম্বন্ধীয় আদিম জ্ঞান এই হইতেছে যে, তিনি পূর্ণ স্বরূপ। তাঁহার পূর্ণত্ব আমরা আত্মার দ্বারা প্রত্যক্ষ করি, উহা আমাদের সহজ জ্ঞানের বিষয়। এই সহজ জ্ঞানের সাক্ষ্য আমরা পরীক্ষা করিতে পারি, তাহা অপলাপ করিতে পারি না। এবং পরীক্ষা করিতে হইলে ইহাকে সিদ্ধান্ত রূপে গ্রহণ করত অবিসম্বাদিত অন্যান্য সত্যের সহিত ইহার সমন্বয় করিয়া দেখা সর্ব্ববিধায় কর্ত্তব্য হয়। এবং এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ যে অযৌক্তিক নহে, পরে প্রদর্শিত হইবে। ফলতঃ ইহার পরীক্ষার উপায়ান্তরও নাই। আমরা জগৎ-সংসক্ত অমঙ্গল ভাবের সহিত ঈশ্বরের পূর্ণত্বের সমন্বয় এই রূপে করিয়া দেখিয়াছি, তদ্দ্বারা বরং ঈশ্বরের অচিন্ত্য মহিমাই প্রতিপাদিত হইয়াছে, পূর্ণত্বের কিছু মাত্র ব্যত্যয় হয় নাই।

সহজজ্ঞানলব্ধ ঈশ্বর সম্বন্ধীয় জ্ঞানকে আমরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে দেখিলাম একণে সহজ জ্ঞানের সাক্ষ্য অবিসম্বাদাই বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে আমাদের কিছুমাত্র কুণ্ঠতা বোধ হয় না। বস্তুতঃ সহজ জ্ঞানকে অবিশ্বাস করিলে জগতে বিশ্বাস করিবার কিছুই থাকে না। আমাদের জ্ঞান বিজ্ঞান সকলের মূলেই সহজ জ্ঞান বর্ত্তমান। আমরা কার্য্যক্ষেত্রে যাইয়া বিষয়ের অন্বেষণ করি বা পাঠাগারে বসিয়া তত্ত্বজিজ্ঞাসায় প্রবৃত্ত হই, যে খানে যাই যাহা করি স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানকে অতিক্রম করিতে পারি না; স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের সাক্ষ্য কেবল সাক্ষ্যমাত্র নহে, উহা শেষ সিদ্ধান্ত। তবে ঈশ্বরের পূর্ণত্ব

তাঁহার মঙ্গলময়ত্ব বিষয়ে আমরা যে এত বাক্য ব্যয় করিলাম সে কেবল সংশয়বাদী-দিগের. প্রবোধের নিমিত্ত। আমাদের নি-জের জন্য আমাদের স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানই বল-বত্তম প্রমাণ। পরন্তু কেবল ঈশ্বরবাদিরা নহেন ঘোর তার্কিক সংশয়ীরাও সহজ জ্ঞানের জ্ঞাপন অমান্য করেন না। জন ষ্টুয়ার্ট মিল সমূহ দার্শনিকদিগের সহিত একমত হইয়া বলেন, সহজ জ্ঞানের সাক্ষ্য যদি অবিমিশ্র পাওয়া যায়, তাহা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। আমাদের প্রকৃত জ্ঞান যদি কিছু থাকে, তাহা অগৌণ বা আত্ম-প্রত্যয়-মূলক জ্ঞান। যে হেতু যাহা আমরা গৌণরূপে জ্ঞাত হই, প্রামাণ্য জন্য তাহাকে পূর্ব্ববর্ত্তী অন্য কোন জ্ঞানের উপর নির্ভর করিতে হয়। অতএব আমরা কোন বিষয় অগৌণ রূপে জানিতে না পারিলে আমরা গৌণ ভাবেও কোন বিষয় জানিতে পারিতাম না, কাজেই কিছুই জানিতাম না। ("According to all philosophers, the evidence of consciousness, if we can obtain it pure, is conclusive. ....That we must do so (know something immediately or intuitively) is evident, if we know any thing; for what we know mediately depends for its evidence on our previous knowledge of something else: unless, therefore, we know some thing immediately we could not know anything mediately and consequently could not know anything at all."—An Examination of Sir. W. Hamilton's Philosophy.)

অপিচ আমাদের স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের সাক্ষ্যকে আমরা কোন নামে অভিহিত করি না, আমরা কিন্তু তদ্দারাই আমাদের অন্যান্য জ্ঞানের নিশ্চয়ত, পরিমাণ করিয়া থাকি। উহাই আমাদের নিশ্চয়তার আদর্শ। ("By whatever name this assurance is called, it is the test to which we bring all our other convictions,...............it is our model of certainty."—Ibid.) তিনি ইহাও বলেন—অত-এব স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের সিদ্ধান্তের উপর অর্থাৎ আমাদের অগৌণ বা আত্মপ্রত্যয়-মূলক জ্ঞানের উপর আর অন্য বিচার খাটে না। এবং সহজ জ্ঞানের প্রকৃত বিষয়ের প্রতি সন্দেহ বা তাহা অস্বীকার করা যাইতে পারে না। ("The verdict, then, of consciousness, or in after words, our immediate and intritive communication, is admitted, on all hands, to be a decision without appeal—a real fact of consciousness can not be doubted or denied."—Ibid.

সংশয়বাদিরা স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের সাক্ষ্য অমান্য করেন না বটে, কিন্তু তাঁহারা বলেন সহজ জ্ঞান আত্মবিষয় ব্যতীত অন্য বিষয়ের সাক্ষ্য দিতে পারে না। দিলে অবশ্য বিশ্বসনীয় বটে। বস্তুতঃ সহজ জ্ঞান অন্য তত্ত্ব যাহা কিছু জ্ঞাপন করে তাহা সংস্কার—তাহা মায়া (Illusion) তাহা সামান্য দার্শনিক বিচারেই উৎখাতিত হইয়া যায়। (Is soon destroyed by the slightest philosophy.) সুত-রাং সহজ জ্ঞান ঈশ্বর সম্বন্ধে বিশ্বাসযোগ্য কোন সাক্ষ্য দিতে পারে না।

এতাবৎ কাল আমরা প্রধানতঃ সহজ জ্ঞানের প্রমাণেই এবং সহজ জ্ঞানের সাক্ষ্য-কে স্বীকার্য্য রূপে গ্রহণ করিয়াই ঈশ্বর স্বরূপ নির্ণয়ার্থ চেষ্টা করিয়াছি, এক্ষণে সং-শয়বাদীদিগের এই আপত্তি যদি যথার্থ হয়, সত্য সত্যই সহজ জ্ঞান যদি আত্ম ভিন্ন অন্যতত্ত্বের বিশ্বসনীয় প্রমাণ না হয়, তাহা হইলে আমাদের সকল চেষ্টাই বিফল হই-য়াছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। কারণ প্রতিবাদীদিগের এই নির্দ্দেশ অন্য বিষয়ে স্বীকার করিলেও ঈশ্বরসম্বন্ধে সহজ জ্ঞানের সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করা যায় না। প্রতি-বোধ, চৈতন্য, সংজ্ঞা, সহজ জ্ঞান প্রভৃতি

একই অর্থবোধক শব্দ। আত্মা পরমাত্মাতে (ঈশ্বরেতে) এমনি অনুস্যূত হইয়া আছে যে আত্মাকে দর্শন করিলে ঈশ্বরকে দেখিতেই হয়। যদি আত্মাকে দেখিলাম, ঈশ্বরকে দেখিলাম না—দেহকে দেখিলাম প্রাণকে দেখিলাম না, তবে কিছুই দেখিলাম না। বস্তুতঃ পরমাত্মা ও আত্মাতে আশ্রয় আশ্রিত সম্বন্ধ। অতএব যেমন জড় বস্তুকে দেখিলে তাহার আশ্রয় স্থানকে দেখিতেই হয় আত্মা তেমনি আপনাকে আপনি দর্শন করিলে আশ্রয়ীভূত ঈশ্বরকেও দেখিবেই দেখিবে। সে যখনই স্বকীয় ভাবে চিত্ত নিবেশিত করে, যখনই আত্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়, সে তখনই আপনাকে একটী অলৌকিক পূর্ণ-ভাবের (ঈশ্বরের) আশ্রিত বলিয়া অনুভব করে। তাহার আত্মবোধ ও ঈশ্বর-বোধ একই কার্য্য। এই নির্ভর-ভাবই তাহার আত্মভাব। এই নির্ভর-ভাব সকল মানব আত্মাতে অবিচ্ছেদ্য রূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে; ইহা অর্জ্জিত কুসংস্কার নহে। অতএব তাহার আত্মদর্শন-শক্তি স্বীকার করিলে, ঈশ্বর-দর্শন-শক্তিও স্বীকার করিতে হয়। অপিচ সে যাহা দর্শন করিতে পারে, অনুভব করিতে পারে, তৎবিষয়ে সে বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষ্যও দিতে পারে। সুতরাং আমরা সহজ-জ্ঞান-জ্ঞাপিত ঐশ্বরিক পূর্ণত্বকে স্বীকার্য্য-স্বরূপ গ্রহণ করিয়া তৎ সংস্থাপনার্থ সমন্বয়-প্রণালী যে অবলম্বন করিয়াছি, তাহা অবৈজ্ঞানিক হয় নাই।

অতঃপর আমরা পরকাল-তত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। পরকাল বিষয়ক চর্চ্চাই আমাদের বর্ত্তমান প্রস্তাবের মুখ্য বিষয়। তবে ঈশ্বরের-স্বরূপ লইয়া আমরা এত যে আন্দোলন করিলাম, তাহা কেবল পরলোকের আশা ভরসাকে দৃঢ়তম ভূমিতে সংস্থাপিত করিবার নিমিত্ত। ঈশ্বরের পূর্ণদেবত্ব প্রতিপাদিত হওয়ায় আমাদের সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। আমরা আমাদের ভাবী শুভাশুভকে ক্ষমবান বিশ্বস্ত হস্তে ন্যস্ত করিবার জন্য এমন এক ন্যায়বান করুণানিধান পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়াছি, যাঁহার এক ইঙ্গিতে নিবিড় তমসাচ্ছন্ন নিস্তব্ধ অভাব-ঘন বিদারণ করিয়া, অশেষ-প্রাণি-সঙ্কুল অনন্ত জগৎ জ্যোতির্ম্ময় ভাবাকাশে ভাসমান রহিয়াছে; যিনি দীন কীটাণু হইতে সুভগ উৎকৃষ্ট জীবদিগের অতি সামান্য প্রয়োজন সকলও পূরণার্থ পূর্ব্ব হইতে প্রচুর সুখকর বিধান করিয়া রাখিয়াছেন,; এই বিশাল বিশ্বের অতি নিভৃত প্রদেশ হইতে ক্ষীণতম আর্ত্তনাদও, যাঁহার স্নেহ-জাগরূক সদয় কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, এবং যিনি কৃপাময়ী জননীর ন্যায় সেই দুঃখার্ত্ত প্রাণীদিগকে স্বীয় শীতল ক্রোড়ে আশ্রয় প্রদান করিতেছেন; অনন্ত বিশ্ব মধ্যে একটী দুর্ব্বাদলও যাঁহার অগোচরে শুষ্ক হয় না; যিনি আমাদের মনে নিয়ত উচ্চ আশা সকল প্রেরণ করিতেছেন; যিনি সত্যকাম ও প্রাণীদিগের অকারণ বন্ধু। এরূপ জীবন্ত ঈশ্বর না পাইলে আমাদের আত্মার উচ্চ আশা সকল বিড়ম্বনার নিমিত্ত হইত, এবং পরকালের প্রতি আমাদের কিছু মাত্র আস্থা থাকিত না। ইচ্ছাশূন্য অন্ধ শক্তি বা শক্তিহীন খঞ্জ দেবত্বের উপর আমাদের আগ্রহপূর্ণ পারলৌকিক আশা ন্যস্ত করিয়া কি আমরা নিশ্চিন্ত হইতে [illegible], না, আরাম পাইতাম। শক্তি যত কেন মহাবল হউক না, ইচ্ছাশূন্য জ্ঞানশূন্য হইলে, তৎপ্রতি আমাদের ভক্তি হয় না। তাহাকে বিশ্বাস করিয়া, অনন্ত কালের কথা দূরে থাকুক, আমরা এক মুহূর্ত্তেরও ফলাফলের নিমিত্ত [illegible]

ভয়েরই কারণ। শুভাশুভ জ্ঞান যাহার নাই, বুদ্ধিমান জীবেরা মঙ্গল কামনা করিয়া তাহার উপর নির্ভর করিতে পারে না। মানব আত্মা পূর্ণতার পক্ষপাতী। পূর্ণতার দিকেই তাহার স্বাভাবিক লক্ষ্য। অতএব সে অপূর্ণ দেবেরও উপাসক হইতে পারে না। কিন্তু আনন্দের বিষয় এই যে, আমাদের ঈশ্বর

" সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম "।

ইঁহার উপাসনার দ্বারা আত্মা চরিতার্থ হয়, এবং ঐহিক ও পারত্রিক শুভ লাভ হয়।

পরকালের ভাব আমাদের জীবনের সহিত অতি ঘনিষ্ঠ রূপে জড়িত ও একান্ত স্বাভাবিক। ভাবিয়া দেখিলে ভবিষ্যৎ লইয়াই আমাদের জীবন। আমাদের আশা ভরসা, বিদ্যা বুদ্ধি, ধন সম্পদ সংক্ষেপতঃ আমাদের জীবিত-প্রয়োজন যাহা কিছু সকলই ভবিষ্যতের জন্য। ভূত কালত গতই হইয়াছে, বর্ত্তমান কমনীয় হইলেও তাহার স্থিরতা নাই। ইহা এত অস্থির যে, ইহাকে আমরা মনেও ধারণ করিতে পারি না। ইহার বাস্তবতা কেবল নামমাত্র বলিয়া প্রতীত হয়। বর্ত্তমান কাল প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদিগকে ভবিষ্যতের হস্তে সমর্পণ করিয়া নিম্নে ভূত কালের গর্ভস্থ হইতেছে, অতএব এক মাত্র ভবিষ্যতের আশ্রয়েই আমরা জীবিত রহিয়াছি। প্রত্যুত উন্নতিশীল জীবের ভবিষ্যৎই এক মাত্র অবলম্বন; ভবিষ্যৎকে লইয়াই উন্নতি। ভবিষ্যৎকে পৃথক করিয়া দেও, উন্নতিশীল জীবন অর্থশূন্য হইয়া পড়ে। এ দিকে আমরাও আজীবন ভবিষ্যতের উপর নির্ভর করিতে অভ্যস্ত হইতেছি। অতি সাংসারিক ভাবে দেখিতে গেলেও, আমাদের মধ্যে যাঁহারা ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হইতে অধিকতর সক্ষম হইয়াছেন, তাঁহারাই মান্য গণ্য, তাঁহারাই বড় লোক, সাত্ত্বিক ভাবেরত কথাই নাই। সাত্ত্বিক ভাব ভবিষ্যৎকে বর্ত্তমানে পরিণত করিয়া দিবে বলিয়া আমাদিগকে সেই স্থানে লইয়া যাইবার জন্য নিয়ত আহ্বান করিতেছে, যেখানে কালের অধিকার নাই; যেখানে ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবিতে হয় না; যথায় অক্ষোভিত শান্তি সদা বর্ত্তমান। বুদ্ধি মনের অগোচর সেই সুখময় স্থানে উত্তীর্ণ হইলে জীব সকল তাহাদের চিরাভিলষিত বর্ত্তমান উপভোগ করিতে পায়। তথায় স্থির বর্ত্তমান নিত্য বিরাজ করিতেছে, সম্ভোগই তথাকার এক মাত্র কার্য্য

ক্রমশঃ

শঙ্করাচার্য্যের জীবনবৃত্তান্ত।

দিগ্বিজয়ারম্ভ।

(৯ম কল্প চতুর্থ ভাগ ৫১৯ সংখ্যার ৪৮ পৃষ্ঠার পর)

শঙ্করাচার্য্যের কৈশোর বৃত্তান্ত পূর্ব্ব প্রস্তাবে বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে তাঁহার দিগ্বিজয় বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। তিনি স্বশিষ্যগণ সমভিব্যাহারে চিদম্বরস্থল হইতে দক্ষিণ দিকে যাত্রা করিয়া শ্রীমন্মধ্যার্জ্জুন নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। এই স্থলে শ্রীমন্ মধ্যার্জ্জুনেশ নামে এক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ছিল। শঙ্করাচার্য্য শ্রীমন্মধ্যার্জ্জুনকে বুদ্ধ্যুপচারে পূজা করিয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলেন "হে ভগবন্ মধ্যার্জ্জুন। আপনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বোপনিষদের অর্থভূত এবং আগমনিগমাদির তাৎপর্য্যজ্ঞ, অতএব দ্বৈতনির্ণয় নিগমাদির যথার্থ তাৎপর্য্যগোচর, কি অদ্বৈতনির্ণয় তাৎপর্য্যগোচর, এই সংশয় নিবৃত্তি করুন।" সদাশিব এইরূপে প্রার্থিত হইয়া লিঙ্গাগ্র হইতে স্বাবয়ব রূপে নির্গত হইলেন এবং জলদগম্ভীর স্বরে দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক "সত্যমদ্বৈতং" এই বাক্য তিনবার

ঘোষিত করিয়া দর্শক জনগণের সম্মুখে পুনর্ব্বার লিঙ্গাগ্রে অন্তর্ধান করিলেন। এতদ্দর্শনে সকলে বিস্ময়াপন্ন হইয়া শঙ্করাচার্য্যের উপদেশ গ্রহণ পূর্ব্বক শুদ্ধাদ্বৈত মত অবলম্বন করিল। ক্রমে ক্রমে তদ্দেশস্থিত সর্ব্ব ব্রাহ্মণদিগকে অদ্বৈত মত গ্রহণ করাইয়া শিষ্যসমেত শঙ্করাচার্য্য সেতুবন্ধরামেশ্বরে গমন করিলেন।

প্রসিদ্ধ সেতুবন্ধরামেশ্বরে রামচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত এক শিবমূর্ত্তি আছেন। ইহাঁর নাম রামেশ্বর; কামেশ্বরী দেবী ইহাঁর বামপার্শ্ব ভূষিত করিতেন। শঙ্করাচার্য্য বিবিধ বিধানে রামেশ্বরের পূজা করিয়া সেই স্থানে দুই মাস কাল অবস্থিতি করিলেন। তখন অদ্বৈত-মত-বিরোধী শৈব, রৌদ্র, উগ্র, ভট্ট, জঙ্গম, পাশুপত প্রভৃতি দ্বৈতমতাবলম্বিগণ তাঁহার নিকটে আগমন করিল। শৈবগণ ভুজদ্বয়ে লিঙ্গচিহ্ন ধারণ করিত; রৌদ্রগণ রুদ্রের উপাসক ছিল এবং ফালে (বস্ত্রে) ত্রিশূল-চিহ্ন ধারণ করিত, উগ্রগণ শিবের উগ্রমূর্ত্তির উপাসক এবং ভুজযুগলে ডমরু-চিহ্নধারী; ভট্টগণ ফালে লিঙ্গচিহ্ন ধারণ করিত; জঙ্গমগণ ত্রিশূলচিহ্ন এবং মস্তকে পাষাণলিঙ্গ ধারণ করিত, এবং পাশুপতেরা ললাটে, হস্তে, হৃদয়ে এবং নাভিতে লিঙ্গচিহ্ন ধারণ করিত। এই ষড়্‌বিধ সম্প্রদায় শিবচিহ্নধারণ পূর্ব্বক শঙ্করাচার্য্যের সকাশে আগমন করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল "হে সন্ন্যাসিন্! অশেষ-দোষ-নাশক শিবতত্ত্ব তোমার অরুচিকর কেন? জগৎকারণ শিবের অষ্টমূর্ত্তি অষ্ট লিঙ্গ। যিনি এই শিবাঙ্গ ধারণ করিয়া শিবের আরাধনা করেন তিনি শিবময় হইয়া মুক্ত হয়েন, যেহেতু শিব জ্ঞানময় সত্যময় পরব্রহ্ম শ্রুতিতে দৃষ্ট হয়; দ্যুলোক শিবের মস্তক, আকাশ নাভি, চন্দ্র ও সূর্য্য দুই চক্ষু, দিক্‌সমূহ শ্রবণেন্দ্রিয় এবং বেদাদিশাস্ত্র বাক্যমাত্রে বিস্তৃত। অথর্ব্বশিখার জগৎকারণানুচিন্তন প্রকরণে শিবকে জগৎকারণ বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। অথর্ব্বশিরস্, মহোপনিষদ্, শিবরহস্য, রুদ্রযামল প্রভৃতি গ্রন্থে শিবের বিশ্বরূপতা, জগৎকারণতা, পরব্রহ্মত্ব, শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বরূপতা প্রভৃতি প্রতিপাদিত হইয়াছে। ঈশ্বর-সদ্ভাবে যখন সহস্র সহস্র প্রমাণ রহিয়াছে এবং যখন তিনি বাক্য এবং মনের অগোচর, তখন ঈশ্বরেচ্ছাসম্ভূত, মকার প্রধান, সগুণ রুদ্রের উপাসনা ও তল্লিঙ্গ ধারণ অবশ্য কর্ত্তব্য।" তাহাদের প্রশ্ন শেষ হইলে শঙ্করাচার্য্য উত্তর করিলেন "হে দ্বৈতবাদিগণ! তোমরা যাহা বলিলে তাহা সত্য। তোমরা যে সকল শ্রুতির কথা বলিলে তৎসমস্তই শুদ্ধ অদ্বৈতরূপ অনাদি ব্রহ্মের প্রশংসা করিতেছে। এবিষয়ে আমার ও তোমাদিগের এক মত। কিন্তু তোমরা যে বলিলে "রুদ্রের লিঙ্গধারণ অবশ্য কর্ত্তব্য" তাহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ এবং অপ্রমাণ। "তপ্তলিঙ্গাদ্যঙ্কনং ধারয়িতব্যং" এরূপ উপদেশ কুত্রাপি নাই, ইহা অমূলক। বেদোক্ত-সদ্ধর্ম্ম-সংস্কৃত শরীরের বৃথা তপ্ততা কি প্রকারে শ্রেয়ঃ-পরম্পরার জনয়িত্রী হইবে। ব্রহ্মযামলে এবং শ্রুতিতে উক্ত আছে যে বেদবেদাঙ্গপারগ ব্রাহ্মণের দেহে সকল দেবতা বাস করেন। অতএব জীবদ্দশাতে ব্রাহ্মণ লিঙ্গধারণ জন্য শরীর পরিতপ্ত করিলে দেবগণ তথা হইতে পলায়ন করেন এবং তাহাকে অভিশাপ প্রদান করেন। এইরূপ অনেক প্রমাণ আছে। মনুষ্য সদ্‌গুরুর উপদেশ দ্বারাই ব্রহ্মলক্ষণ জ্ঞাত হইয়া, সকল শুভকর্ম্ম জ্ঞানাগ্নি দ্বারা ভস্মীকৃত করিয়া, সংসার-সাগর পার হইয়া এবং সকল অবস্থাতে আত্মাকে ধ্যান করিয়া মুক্ত হইতে পারে। সুতরাং শরীরের বহির্ভাগে লিঙ্গধারণের কোন ফল নাই, কেবল চর্ম্ম-

হানি মাত্র ঘটে। কেবল রুদ্রের উপাসনা দ্বারা পুণ্যলোক প্রাপ্তি মাত্র ফল হয়, কিন্তু জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্যানুসন্ধান চিন্তা হইতেই মুক্তি হয়। যথা

"তং দুর্দর্শং গূঢমনুপ্রবিষ্টং, গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণং।
অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং, মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি॥
নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যোন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনূং স্বাং॥"

অতএব সদ্গুরুর উপদেশানুসারে শুদ্ধাদ্বৈতবিদ্যা আশ্রয় করিয়া অভেদ-কল্পতরু ফলের রসপান করিয়া তৃপ্ত হও। শঙ্করাচার্য্য এই রূপ উত্তর প্রদান করিলে লিঙ্গধারিদিগের দলপতি বিদ্বেষবীর বলিল "স্বামিন্! ত্বমেব শরণং মম সর্ব্বদাসি" এবং বারংবার শঙ্করাচার্য্যের পাদবন্দনা পূর্ব্বক তদুক্ত আচার-লক্ষণ শিরোধার্য্য করিয়া স্ববংশীয় এবং স্বদেশীয় সকলকে অদ্বৈতমতগ্রাহী করিয়া সুখে বাস করিতে লাগিল।

এই রূপে তদ্দেশ হইতে শিবমত নিরস্ত হইলে পর, পীঠার্চ্চন-তৎপর প্রাণলিঙ্গধারী শুভ্রবিভূতিভূষিতসর্ব্বাঙ্গ মস্তকে কণ্ঠে ও বাহুদেশে রুদ্রাক্ষমালাশোভিত প্রতিপক্ষ চণ্ডভৈরব, বিপক্ষশূল, ভক্তাগ্রগণ্য, পরমতকালানল প্রভৃতি শৈবমতাবলম্বিরা শঙ্করাচার্য্যের সমীপে আগত হইল। তন্মধ্যে প্রতিপক্ষ চণ্ডভৈরব আচার্য্যকে প্রশ্ন করিল "হে সন্ন্যাসিন্! তুমি মায়াবেশধারীর ন্যায় আগমন পুরঃসর ষড়্বিধ শৈবাচার পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিদ্বেষবীর প্রভৃতিকে মতভ্রষ্ট করিয়াছ। আমার নাম প্রতিপক্ষ চণ্ডভৈরব, আমাকে বল দেখি, শৈবমত কি নাই?" তদনন্তর প্রতিপক্ষ চণ্ডভৈরব স্বমত সমর্থনার্থে নানা শাস্ত্র হইতে বিবিধ যুক্তি উদ্ধৃত করিয়া শিবের সর্ব্বোত্তমত্ব, জগদুপাদানকারণত্ব, সর্ব্বাত্মকত্ব, হরিব্রহ্মেন্দ্রাদি কর্ত্তৃত্ব, সর্ব্বপাপনাশকত্ব প্রভৃতি প্রমাণিত করিল। তৎপরে বিপক্ষশূল উপনিষদাদি শাস্ত্র হইতে রুদ্র বিষয়ক নানাবিধ বচন দ্বারা রুদ্রের সর্ব্বাত্মকত্ব, সর্ব্বান্তর্যামিত্ব, সর্ব্বোৎকৃষ্টত্ব, সর্ব্বাধিপতিত্ব প্রভৃতির প্রমাণানন্তর রুদ্রোপাসনা দ্বারাই মোক্ষসিদ্ধি হয় সিদ্ধান্ত করিল। যেহেতু রুদ্রের উপাসনা মোক্ষপ্রদ অতএব রুদ্রাক্ষধারণাদি অযুক্ত হইতে পারে না। সুতরাং ব্রাহ্মণদিগের বিভূতি প্রভৃতি চিহ্নধারণ অবশ্য কর্ত্তব্য। কালাগ্নিরুদ্রোপনিষদে লিখিত আছে

"যো বিদ্বান্ ব্রহ্মচারী গৃহী বানপ্রস্থো যতির্বা ত্রিপুণ্ড্রং ভস্মনা করোতি স সমস্তমহাপাতকোপপাতকেভ্যঃ পূতো ভবতি, স সর্ব্বেষু তীর্থেষু স্নাতো ভবতি, স সর্ব্বান্ দেবান্ ধ্যাতো ভবতি, স সর্ব্বান্ বেদানধীতো ভবতি, স সকলভোগভুগ্দেহং ত্যক্ত্বা শিবসাযুজ্যং আপ্নোতি ন স পুনরাবর্ত্ততে ন স পুনরাবর্ত্ততে।"

আর রুদ্রাক্ষলিঙ্গধারণের প্রমাণ অগস্ত্যসংহিতাতে দৃষ্ট হয়।

"সশীর্ষে কণ্ঠে কর্ণয়োশ্চ বাহ্বো রুদ্রাক্ষধারণাৎ।
নীলকণ্ঠো ভবেন্মর্ত্ত্যো ব্রাহ্মণশ্চেৎ পরাৎপরঃ॥"

এতদ্ভিন্ন শ্রুতি আছে যে "অতপ্ততনুর্ন তদা মোক্ষমশ্নুতে" শরীরের তাপব্যতীত মোক্ষ হয় না। অতএব লিঙ্গাঙ্কন অবশ্য কর্ত্তব্য।

ইহা শুনিয়া শঙ্করাচার্য্য বলিলেন "তপ্ত লিঙ্গাদিধারণ দ্বিজাতিদিগের কর্ত্তব্য নহে, যেহেতু তৎপক্ষে প্রমাণ নাই; অতপ্ততনুরিত্যাদি শ্রুতির অর্থ অগ্নির দ্বারা শরীরের তাপ নহে, কিন্তু তপস্যা দ্বারা তাপ। বৃহন্নারদীয় এবং মার্কণ্ডেয় পুরাণে লিখিত আছে যে লিঙ্গাঙ্কিত শরীর দর্শন করিলে পাতক হয় এবং লিঙ্গচক্রাদিচিহ্ন কেবল পাষণ্ডেরাই ব্যবহার করে। অতএব লিঙ্গাঙ্কন

যুক্ত নহে। রুদ্রের উপাসনা দ্বারা মোক্ষ-লাভ হইতে পারে, যেহেতু রুদ্র পরব্রহ্মের অবতার। রুদ্রের প্রীতিসাধনার্থ বিভূতি রুদ্রাক্ষ ধারণ করা যাইতে পারে কিন্তু ত্রিশূল, লিঙ্গ, ডমরু প্রভৃতি ধারণ করা যাইতে পারে না, যেহেতু তৎপক্ষে প্রমাণ নাই।

এইরূপে প্রতিপক্ষ চণ্ডভৈরব এবং বি-পক্ষশূল পরাস্ত হইলে ভক্তাগ্রগণ্য অগ্র-সর হইল এবং রুদ্রের ত্রিপুরসংহারকালে ব্রহ্মাদি দেবগণ রুদ্রের লিঙ্গ ত্রিশূলাদি চিহ্ন ধারণ করিয়াছিলেন, এই বৃত্তান্তের উল্লেখ করিল। ইহা হইতে ভক্তাগ্রগণ্য প্রমাণ করিল যে আমরা রুদ্রের ভক্ত উপাসক, সুতরাং আমাদিগের রুদ্রাক্ষ ধারণ অবশ্য করণীয়। ইহার প্রতিবাদকালে শঙ্করাচার্য্য বলিলেন যে রুদ্রকর্ত্তৃক ত্রিপুরসংহার কা-লীন লিঙ্গাদ্যঙ্কন অনুপপন্ন, কারণ তাহার প্রমাণাভাব। রুদ্রভক্ত নারদাদি মুনিগণে আমরা বিভূতিরুদ্রাক্ষস্ফটিক ধারণ দেখিতে পাই, কিন্তু লিঙ্গাঙ্কন দেখিতে পাই না। আর মুনিদিগের শরীরে কদাপি তপ্তত্রিশূল-লিঙ্গাদি চিহ্ন দৃষ্ট হয় না এবং তপ্ত লিঙ্গাদির নিন্দাব্যতীত প্রশংসা কুত্রাপি নাই। অত-এব লিঙ্গাঙ্কন সর্ব্বথা অযুক্ত। এক্ষণে তো-মরা পামরবুদ্ধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক লিঙ্গাদি-চিহ্ন ত্যাগ করিয়া বেদোক্ত কর্ম্ম সকল ঈশ্বরে সমর্পণ করিতে শিক্ষা কর এবং জীব ও ঈশ্ব-রের ঐক্যানুসন্ধান করত জন্ম মরণ প্রবা-হের হেতুভূত অজ্ঞান নিবৃত্তি করিয়া লিঙ্গ শরীর ভঙ্গ দ্বারা মুক্তিলাভ করিতে চেষ্টা কর।

ইহা শ্রবণ করিয়া ভক্তাগ্রগণ্য এবং তদনুসারী পরমতকালানল প্রভৃতি শৈব-গণ পরমগুরু শঙ্করাচার্য্যকে বন্দনা পূর্ব্বক নিজ বন্ধু, পুত্র, মিত্র সকলের সহিত লিঙ্গ-চিহ্ন ত্যাগ করিয়া সম্যক্ উপদিষ্ট শুদ্ধ অদ্বৈত মত অবলম্বন করিল। এবম্প্রকারে আচার্য্যের শৈব মত নিবর্হণ সমাপ্ত হইল।

শৈবমতনিবর্হণানন্তর শঙ্করাচার্য্য অনন্ত-শয়ন নামক স্থানে যাত্রা করিলেন। সে স্থানে অনন্ত নামে এক বিষ্ণুমূর্ত্তি স্থাপিত ছিল। আচার্য্য নিজ শিষ্যবর্গের সহিত তথায় এক-মাস বাস করিলেন। তথায় ষড়্‌বিধ বৈষ্ণব সম্প্রদায় ছিল। ভক্ত, ভাগবত, বৈষ্ণব, পাঞ্চরাত্র, বৈখানস এবং কর্ম্মহীন এই ষড়্-বিধ বৈষ্ণব। ইহারা জ্ঞান ও ক্রিয়াভেদে আবার দ্বাদশবিধ। ইহাদিগকে শঙ্করাচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমাদিগের লক্ষণ কি, তাহা বল"। প্রথমতঃ ভক্তগণ বলিল "স্বামিন্! বাসুদেব পরমপুরুষ, সর্ব্বদা জগদ্রক্ষণ-তৎপর, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদেব-কারণ এবং তিনি দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের নিমিত্ত ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হয়েন। এইস্থলে বাসুদেব কৈণ্ডিন্য মুনির প্রতি প্রসন্ন হইয়া অনন্ত নাম ধারণ পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতে-ছেন। আমরা অনন্তদেবের চরণ প্রতিদিন সেবা করি এবং তীর্থপ্রসাদ প্রভৃতি দ্বারা তৃপ্তি লাভ করি। হে যতিবর! জ্ঞান ও ক্রিয়া-ভেদে আমাদিগের আচার দ্বিবিধ। আমরা জ্ঞানশীল এবং বিষ্ণুগুপ্ত প্রভৃতি কর্ম্মশীল। আমার নাম বিষ্ণুশর্ম্মা।" এতৎ-শ্রবণে শঙ্করাচার্য্য বলিলেন হে জ্ঞানশীল বিষ্ণুশর্ম্মন্! তোমরা জ্ঞানশীল, অতএব জ্ঞানের লক্ষণই বা কি, ফলই বা কি এই প্রশ্নের উত্তর দেও। বিষ্ণুশর্ম্মা কহিল "শ্রীমদনন্তপাদকমলই আমাদিগের শরণ এবং আশ্রয়, স্থিরভাবে অবস্থানের নাম জ্ঞান। অনন্তদেবের আদেশ ব্যতিরেকে তৃণচলন পর্য্যন্ত সম্ভবে না" অতঃপর শঙ্ক-রাচার্য্য ইহাকে বলিলেন "হে মূঢ় বিষ্ণু-শর্ম্মন্। আশ্রমধর্ম্মের অনুকূল কর্ম্ম সকলে-

রই আছে, কর্ম্ম না করিলে পাতিত্য হয়। সন্ধ্যোপাসনা প্রভৃতি বেদবোধিত ব্রাহ্মণোচিত নিত্য কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য। মনু বলিয়া গিয়াছেন।

"জীবন্ কর্ম্মপরিত্যাগং যঃ করোতি নরাধমঃ
স মূঢ়ো নরকং যাতি যাবদাভূতসংপ্লবং।"

যে পাপিষ্ঠ জীবদ্দশায় কর্ম্ম পরিত্যাগ করে, সে প্রলয়কাল পর্য্যন্ত নরকে বাস করে। তোমরা স্বকর্ম্মভ্রষ্ট, সুতরাং তোমাদিগের ব্রাহ্মণ্যহানি হইয়াছে। আর তোমরা যে বলিয়াছ "আমরা জ্ঞানমার্গবর্ত্তি," তাহাতে তোমাদিগের অধিকার নাই। যদি অধিকার থাকে তাহা হইলে সৎ ও অসতের লক্ষণ, ব্রহ্মনাড়ীর ভেদ এবং ষট্‌চক্রমার্গ প্রদর্শন কর। ইহা শুনিয়া বিষ্ণুশর্ম্মা বলিল "যতিনাথ! আমরা জানি যে কর্ম্ম এবং জ্ঞান ত্রিকাল অনন্তদেবের চরণ দর্শন ব্যতীত আর কিছুই নহে।" শঙ্করাচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন কতদিন তোমরা এরূপ রহিয়াছ। বিষ্ণুশর্ম্মা উত্তর করিলেন, সপ্ত পুরুষ। তখন শঙ্করাচার্য্য বলিলেন "রে ব্রাত্য, সকল ধর্ম্মের বহিষ্কৃত, দূর হও, তোমার সংসর্গে আমরাও দূষিত হইব।" তখন বিষ্ণুশর্ম্মা করুণস্বরে বলিল "আমাদিগের সকল অপরাধ ক্ষমা করুন" এই বলিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া স্থাণুর ন্যায় নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান হইয়া রহিল। বিষ্ণুশর্ম্মাকে শরণাগত দেখিয়া তাহাকে দুর্মার্গ হইতে রক্ষা করিতে হইবে এই বলিয়া শঙ্করাচার্য্য হস্তামলক প্রভৃতি স্বশিষ্যদিগের নিকটে তাহাকে অর্পণ করিয়া বলিলেন, শিষ্যগণ! তোমরা ইহার এবং ইহার দলের প্রায়শ্চিত্তবিধান কর। অনন্তর তাহাদিগের প্রায়শ্চিত্ত সম্পন্ন হইলে শঙ্করাচার্য্য তাহাদিগকে সদুপদেশ প্রদান পূর্ব্বক অদ্বৈত মতাবলম্বী করিলেন। তদনন্তর ব্রহ্মগুপ্ত, কৃষ্ণদাস, কমলাভক্ত প্রভৃতি কর্ম্মশীল ভক্তগণ শঙ্করাচার্য্যের শরণাগত হইয়া অদ্বৈতমত গ্রহণ করিল। এবম্প্রকারে ভক্তমত নিরাকৃত হইলে ভাগবতমতাবলম্বী বিপ্রদেব নামে জনৈক ব্যক্তি আচার্য্যের সমীপে উপস্থিত হইল। তাঁহার মত এই যে

"সর্ব্ববেদেষু যৎপুণ্যং সর্ব্বতীর্থেষু যৎফলং।
তৎ ফলং সমবাপ্নোতিস্তুত্বা দেবং জনার্দ্দনং॥"

সর্ব্ববেদ পাঠ করিয়া যে পুণ্য লাভ হয় এবং সর্ব্বতীর্থে ভ্রমণ করিলে যে ফল লাভ হয়, জনার্দ্দন দেবের স্তুতি করিলে সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কলিযুগে কেশবের নাম সংকীর্ত্তন করিলেই মুক্তি করস্থ হয়। সুতরাং নারায়ণভক্তি বশতঃ উর্দ্ধপুণ্ড্র, শঙ্খ-চক্রগদাপদ্ম প্রভৃতি চিহ্ন ধারণ পূর্ব্বক গলদেশে তুলসী মালা বন্ধন পূর্ব্বক সর্ব্বক্ষণ উচ্চৈঃস্বরে নারায়ণের স্তব অবশ্য কর্ত্তব্য। বিপ্রদেব এই রূপে স্বমত ব্যক্ত করিলে, শঙ্করাচার্য্য উত্তর করিলেন "হে বিপ্রদেব! তোমার মত যথার্থ নহে যেহেতু তদ্বিষয়ে বিরোধ এবং চক্রাদির অঙ্কন বিষয়ে নিন্দা দৃষ্ট হয়। সুতরাং পাষণ্ডবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া স্ব কর্ত্তব্য নিত্যকর্ম্ম সকল যথাশক্তি সম্পাদন পূর্ব্বক তৎফল ভগবানকে সমর্পণ করিতে শিক্ষা কর এবং শুদ্ধঅদ্বৈতবাদী সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক তদুপদেশানুসারে কর্ম্ম বন্ধন বিনষ্ট করিয়া মুক্তি লাভ করিতে চেষ্টা কর। আর তুমি যে বলিয়াছ স্তুতি মাত্রেই মুক্তি হয় তাহা অত্যন্ত অসঙ্গত, যেহেতু স্তুতি বাক্য, কিন্তু ব্রহ্ম বাক্যের অগোচর ও অতীত; সুতরাং জ্ঞান ব্যতীত মুক্তির আর অন্য কোন উপায় নাই। আচার্য্যের এই উপদেশ শ্রবণানন্তর বিপ্রদেব অভিবাদন পূর্ব্বক তাঁহাকে বলিল, "স্বামিন্ শত পুণ্য বলে আপনার পাদদর্শন ঘটিয়াছে, এক্ষণে

আমাকে উপদেশ দ্বারা কৃতার্থ করুন; আমি আমার মত পরিত্যাগ করিলাম।” ইহা শুনিয়া আচার্য্য বলিলেন “হে বিপ্রদেব চিহ্নাঙ্কন প্রভৃতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক যথাকালোচিত নিত্যকর্ম্ম করিয়া ব্রহ্মভাবনাতে রত হও, ভাবনা সিদ্ধ হইলে মুক্তিলাভ করিবে।”

অনন্তর শাঙ্গর্পাণি নামে আর একজন বৈষ্ণব আচার্য্যকে বলিল যে নারায়ণের নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক যোগিরা জন্ম-সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হয়। অতএব ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তি বৈকুণ্ঠলোকে বাস করিবার নিমিত্ত অবশ্য শঙ্খচক্রাদি, চিহ্ন ধারণ করিবে। তাহার প্রমাণ স্বরূপ পুরাণাদিতে উক্ত আছে।

“ যে বাহুমূলপরিচিহ্নিতশঙ্খচক্রা
যে কণ্ঠলগ্নতুলসীনলিনাক্ষমালাঃ।
যে বা ললাটফলকে লসদূর্দ্ধপুণ্ড্রা-
স্তে বৈষ্ণবা ভুবনমাশু পবিত্রয়ন্তি॥”

আচার্য্য বলিলেন “মূঢ়! তপ্ত শঙ্খচক্রাদিধারণ পরিহার করা উচিত, কারণ তদ্বোধক শ্রুতি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তপ দ্বারা শরীর তপ্ত করিলে মুক্তিলাভ হইতে পারে। এস্থলে তপঃশব্দের অর্থ মহাপাতকনাশের হেতুভূত কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি কর্ম্ম, অথবা আশ্রমোচিত কর্ম্মানুষ্ঠান, কিম্বা সকল বেদবিদিত পরব্রহ্মের ধ্যান ও জ্ঞান। তপোমূলই ব্রহ্মজ্ঞান, সুতরাং চক্রাদি চিহ্নের অবকাশ কোথায়? আর বৃহন্নারদীয় প্রভৃতি পুরাণে তপ্তচক্রলিঙ্গের নিষেধ আছে। অতএব সর্ব্বজ্ঞ নিত্য শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বরূপ সত্যজ্ঞান স্বরূপ অনন্ত স্বরূপ অণুমহত্ত্বাদিলক্ষণলক্ষিত পরব্রহ্মের অনুসন্ধান কর। এই অনুসন্ধান দ্বারা ভেদগন্ধ নিরস্ত হইলে জীব পরমব্রহ্ম প্রাপ্ত হইবে।” এই প্রকারে উপদিষ্ট হইয়া শাঙ্গর্পাণি শঙ্করাচার্য্যকে দণ্ডবৎ প্রণাম পুরঃসর তদীয় মতগ্রহণ করিল এবং স্বকুলস্থ, স্বগ্রামস্থ ও স্বদেশস্থ বহুসংখ্যক লোকদিগকে অদ্বৈতমতাবলম্বী করিল।

অতঃপর পাঞ্চরাত্র আগমে দীক্ষিত জনৈক ব্যক্তি আচার্য্যের নিকট আসিয়া বলিল “স্বামিন্! আপনি এস্থানে আগমন করিয়া ভক্ত, ভাগবত ও বৈষ্ণব মত নিরাকরণ পূর্ব্বক স্বমত স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু আমি পাঞ্চরাত্র, পরম বৈষ্ণব মত অবলম্বন করিয়া বহুদিন অনন্তদেবের পাদপদ্ম আরাধনা করিয়া ভগবানের প্রিয় হইয়াছি। স্বয়ং ঈশ্বরও পাঞ্চরাত্র মতের নিন্দা করিতে অসমর্থ। অতএব ভগবানের পূজা ও মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠাদি অবশ্য কর্ত্তব্য, যেহেতু তৎ সমুদয়ই সেই অনুষ্ঠান-মূলক। সুতরাং ব্রাহ্মণগণের পাঞ্চরাত্র-আগম অনুসারে কার্য্য বিধেয়।” এতদুত্তরে আচার্য্য বলিলেন “তুমি যাহা যাহা বলিয়াছ তাহা সকলই সত্য; কিন্তু তন্মধ্যে যাহা বেদবিরুদ্ধ তাহা পরিত্যাজ্য এবং যাহা বেদবোধিত তাহা পরিগ্রাহ্য। বৈষ্ণব বিষ্ণুদেবনিরত, বিষ্ণুমন্ত্রশত উপদেশ দ্বারাও ব্রাহ্মণ্যভাব উৎপন্ন হয় না, কিন্তু গায়ত্রী উপদেশ দ্বারা ব্রাহ্মণ্যসিদ্ধি হয়। গায়ত্রীর অভাবে পাতিত্য দোষ ঘটে। অতএব মন্ত্রান্তরের সদ্ভাববশতঃ বৈষ্ণবত্বহানি হয়। আর সূর্য্য, অগ্নি প্রভৃতি অন্যান্য দেবগণের সেবাহেতু বৈষ্ণব মত আরও অসত্য হইয়া পড়ে। যদি তুমি বল যে গায়ত্রী বিষ্ণুশক্তি, যেহেতু গায়ত্রী সবিতৃদেবের বরণীয় শ্রেষ্ঠ তেজ এবং নারায়ণ সূর্য্যমণ্ডলে বাস করেন; তাহা হইতে পারে না। গায়ত্রী সূর্য্যদেবের তেজঃ এবং সূর্য্যদেব রুদ্রের অন্যতম মূর্ত্তি। গায়ত্রীকে রুদ্রশক্তি ব্যতীত বিষ্ণুশক্তি বলিতে পার না। দেবতান্তর বলিয়া গায়ত্রী তোমাদিগের অবশ্য উপাসনীয়। এই সমস্ত উপাসনা না করিয়া তোমাদিগের ব্রাহ্মণ্য নিবৃত্তি হইয়াছে।

আর তোমরা নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছ এবং কর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া মুক্তিলাভের অনুপযুক্ত হইয়াছ।” এইরূপে বৈষ্ণব মতের দৌর্ব্বল্য প্রদর্শিত হইলে মাধব নামে এক জন বৈষ্ণব বলিল “স্বামিন্! পাঞ্চরাত্র শাস্ত্রে বলে দ্বিভুজে তপ্ত শঙ্খ ও চক্র ধারণ করিলে পরমলোকপ্রাপ্তি হয়। বৈষ্ণব মত অপ্রমাণ হইলে সুতরাং পাঞ্চরাত্র শাস্ত্র অপ্রমাণ হয়। অতএব বৈষ্ণবমত অবশ্য অঙ্গীকার করিতে হইবে।” আচার্য্য মাধবকে বলিলেন বেদবিরুদ্ধ বলিয়া তোমাদিগের শাস্ত্রোক্ত তপ্ত শঙ্খ চক্রধারণ অযুক্ত, কারণ

“অতীন্দ্রিয়ার্থবিজ্ঞানে প্রমাণং শ্রুতিরেব হি।
শ্রুত্যুক্তাচারতোগ্রাহ্যা হ্যাগমানাং প্রসজ্যতা॥”

অতঃপর মায়াকল্পিত চক্রাদিচিহ্ন পরিত্যাগ পূর্ব্বক শুদ্ধ অদ্বৈতবৃত্তি দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যানুসন্ধান করিয়া মুক্তিলাভ কর।” আচার্য্যের এই সদুপদেশ শ্রবণানন্তর তাহারা সৎ পথগামি হইয়া অদ্বৈতমত অবলম্বন করিল। তদনন্তর বৈখানসমতাচারী ব্যাস নামে জনৈক ব্যক্তি শঙ্করাচার্য্যের সমীপে আগমন করিয়া তাঁহাকে বলিল “স্বামিন্! আপনি ভক্ত প্রভৃতিকে নিরস্ত করিয়াছেন। আমার নাম ব্যাসদাস। আমি বৈখানসমতবাদিদিগের নেতা। ব্রহ্মাও আমার পক্ষ নিরসন করিতে পারেন না। আমার মতে নারায়ণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট. সর্ব্বোত্তম এবং শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ। যাঁহারা নারায়ণের ভক্ত উপাসক তাঁহাদিগের তদঙ্কধারণ অতীব কর্ত্তব্য; যে হেতু শঙ্খচক্রাদি দ্বারা শরীর পবিত্র হয় এবং বিষ্ণুর প্রতি ভক্তি প্রদর্শিত হয়।” শঙ্করাচার্য্য বলিলেন “হে ব্যাসদাস! নারায়ণ পরব্রহ্ম, সর্ব্বদেবময়, সর্ব্বোত্তম সত্য। তুমি নারায়ণের ভক্ত উপাসক, অতএব নারায়ণের প্রীতি সাধনের জন্য নিত্যকর্ম্ম কর, ব্রাহ্মণদিগের কর্ম্মই প্রধান কর্ত্তব্য। কিন্তু তপ্ত চক্রাদি ধারণ কখন করিও না, কারণ তৎ সমস্ত অপ্রমাণ এবং অমূলক।” ব্যাসদাস বলিল “স্বামিন্! আমাদিগের আগমাচার প্রমাণ; পূর্ব্বকালে পরমযোগী দত্তাত্রেয় স্ব দেহে শঙ্খচক্রাদি ধারণ করিয়াছিলেন, অতএব মহদ্ব্যক্তিদিগের পরিগৃহীত পথ অবশ্য স্বীকর্ত্তব্য। আর পুরাণে যে যে স্থলে বৈষ্ণব ধর্ম্মের কথা আছে সেই সেই স্থলে চক্রাদ্যঙ্কনের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, ভগবচ্চিহ্ন না থাকিলে বৈষ্ণবত্বের হানি হয়, অতএব চক্রাদ্যঙ্কনের অঙ্গীকার সিদ্ধ হইল। সুতরাং লোকে ভগবচ্চিহ্ন অবশ্য ধারণ করিবে।” ব্যাসদাস এই কথা বলিলে আচার্য্য উত্তর করিলেন “দত্তাত্রেয় স্বশরীর মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছিলেন একথা তুমি কোথায় শুনিয়াছ, তিনি পরমযোগী, তাঁহার মুদ্রাঙ্কনের কি প্রয়োজন ছিল? এক্ষণে চক্রাঙ্কন অবশ্য কর্ত্তব্য এই মন্দ বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া বিগতচিহ্ন হইয়া সুখী হও। পুরাণে ভগবদ্ভক্তদিগের ভগবচ্চিহ্ন ধারণ যাহা শুনিয়াছ তাহা ভ্রান্তিমূলক। প্রহ্লাদের কে চক্রাঙ্কন করিয়াছিল? গজেন্দ্র, বিভীষণ, ধ্রুব প্রভৃতিকে লিঙ্গচিহ্নাদি ধারণ কে করাইয়াছিল? অতএব মূঢ়বুদ্ধি পরিত্যাগ কর এবং লিঙ্গাদি পরিহার পূর্ব্বক অহংভাবে আসক্তচিত্ত হও। অহংভাব দ্বারা ভেদাদিপাপ বিদূরিত হইলে মোক্ষ প্রাপ্তি হইবে।”

তদনন্তর ব্যাসদাস বিনীতভাবে নিবেদন করিল “হে যতিবর! কৃপা পূর্ব্বক আমাকে অদ্বৈত মত শিক্ষা দান করুন।” শঙ্করাচার্য্যও তাহাকে কৃতার্থ করিলেন। বৈখানসমতাবলম্বিগণ সকলে অদ্বৈত মত গ্রহণ করিল। পঞ্চবিধ বৈষ্ণব সম্প্রদায় পরাজিত হইলে পর কর্ম্মহীন ষষ্ঠতম সম্প্রদায়ের অগ্রণী নামতীর্থ নামে জনৈক বৈষ্ণব শঙ্করাচার্য্যের সকাশে

উপস্থিত হইল এবং আচার্য্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিল "হে স্বামিন্! আমি এতাদৃশ বিষ্ণুভক্ত যে কর্ম্মকে তৃণজ্ঞান করি। আমি বিশ্বাস করি যে বিষ্ণুই আমাদিগের গতি এবং আশ্রয়। আমাদিগের অন্য কোন সাধন, মন্ত্র, গুরু বা দেবতার আবশ্যক নাই। সকল জগৎ বিষ্ণুময়। বিষ্ণুতে বিশ্বাস কর, তাহা হইলেই মুক্তিলাভ করিতে পারিবে। অনন্তদেবও আমার এই মত অন্যথা করিতে সমর্থ হয়েন না।" এতৎশ্রবণানন্তর শঙ্করাচার্য্য উত্তর করিলেন "রে মূর্খ! তুমি বলিলে যে তুমি কর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া জীবন্মুক্ত হইয়াছ—ইহা তোমার বিষম ভ্রান্তি। জগতে কর্ম্মমার্গ ও জ্ঞানমার্গ এই দুই পথ। স্বর্গাদি কামনা করিয়া বেদ ও স্মৃতিবোধিত কর্ম্মাচরণ কর্ম্মমার্গ। বেদবোধিত সকল কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া তৎফল পরমেশ্বরে সমর্পণ করার নাম জ্ঞানমার্গ। তুমি এই দুই মার্গ হইতেই ভ্রষ্ট হইয়াছ। 'ব্রাহ্মণঃ কর্ম্ম কুর্ব্বীত' এই প্রামানিক বচনানুসারে ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম কদাপি পরিত্যাগ করা উচিত নহে। বহুদিন তুমি কর্ম্মহীন হইয়া রহিয়াছ; সুতরাং ব্রহ্মণ্য সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। যে ব্যক্তি কর্ম্মহীন, তাহার বিষ্ণু ভক্তির অধিকার নাই। যে ব্যক্তি ভগবদ্বাক্যভূত শ্রুতি ও স্মৃতির আদেশ উল্লঙ্ঘন করে, সে ভগবানের আজ্ঞাভঙ্গ করে এবং নরকে পতিত হয়। অতএব ব্রাহ্মণ্য অব্যাহত রাখিবার জন্য মন্ত্র, সাধন, কর্ম্ম, গুরু, দেবতা প্রভৃতির একান্ত আবশ্যক। অতএব তুমি সর্ব্ব সমক্ষে দ্বাদশবার প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক নমস্কার করিয়া নিজকৃত সমস্ত অপরাধ ক্ষমার জন্য প্রার্থনা কর এবং ব্রাহ্মণ্য সম্পাদন করিয়া কৃতার্থ হও।" আচার্য্য কর্ত্তৃক এবম্প্রকারে উপদিষ্ট হইয়া নানাতীর্থ শতবার প্রণাম পূর্ব্বক শ্রীগুরুকে প্রীত করিয়া স্বগণসহিত ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্মশীল হইল। তন্মতাবলম্বিরা শঙ্করাচার্য্যকর্ত্তৃক স্বস্বসিদ্ধান্ত নিরস্ত দেখিয়া প্রায়শ্চিত্ত পূর্ব্বক পঞ্চযজ্ঞ পঞ্চপূজাপরায়ণ হইয়া অদ্বৈত মত গ্রহণ করিল এবং নিগমাচারপরতন্ত্র হইয়া বাস করিতে লাগিল।

তদনন্তর শঙ্করাচার্য্য অনন্তশয়ন হইতে পশ্চিম দিগভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং পঞ্চদশ দিবস পর্য্যটন করিয়া স্বশিষ্যবর্গের সহিত সুব্রহ্মণ্য নামে এক স্থানে উপনীত হইলেন।

(ক্রমশঃ)

জ্ঞানী বাক্য।

(গ্রীকগ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত ও অনুবাদিত।)

৪২৩ সংখ্যক পত্রিকার ১৩৮ পৃষ্ঠার পর।

(১৪০)

এমন এক বস্তু আছে যাহা জগদন্তর্গামী, এবং যাহা এই সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, এবং যাহা দ্বারা দ্রষ্টব্য পদার্থ সৃষ্ট হইয়া থাকে; ইহা সকল অপেক্ষা দ্রুতগামী সূক্ষ্ম পদার্থ।

প্লেটোক্ত হিরাক্লাইটস মত।

(১৪১)

তোমার চিন্তারূপ ভ্রমণের চরম সীমা দ্যুলোক কিম্বা দ্যুলোকস্থিত উজ্জ্বল জ্যোতিষ্মণ্ডল নহে। ইহারা অতি সুন্দর এবং ঈশ্বরের সর্ব্বোত্তম দেবোপম সৃষ্টি হইলেও তথাপি তাহা অতিক্রম পূর্ব্বক নক্ষত্রের উপরেও তোমার মস্তক উত্থিত করিয়া তোমার গমন করা কর্ত্তব্য অর্থাৎ দ্যুলোক অপেক্ষা দ্যুলোকবেষ্টনকারী ঈশ্বর তোমার চিন্তনীয় পদার্থ।

মেক্সিমস টাইরিয়াস্

(১৪২)

ঈশ্বর যখন এই জগৎ সৃজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন তখন তিনি একেবারে প্রীতিতে পরিণত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

ফেরিসাইডিস সাইরস।

ক্রমশঃ

কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ।

সভাপতি।

শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু

কর্ম্মাধ্যক্ষ।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পাতুরেঘাটা)

শ্রীযুক্ত নীলমণি চট্টোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত নবগোপাল মিত্র

শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত রাজারাম মুখোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত চন্দ্রসেখর বসু

শ্রীযুক্ত ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ দত্ত

শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ মিত্র

শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

সহকারি সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বিশ্বাস

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যা[illegible]

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৫ জ্যৈষ্ঠ রবিবার প্রাতে ৭ ঘটিকার সময়ে মাসিক ব্রাহ্মসমাজ হইবে।

আয় ব্যয়

ফাল্গুন ও চৈত্র ১৮০০ শক।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	...	৬৬৯৸৫
পূর্ব্বকার স্থিত		...	২৫১॥১৫
সমষ্টি	...	...	৯২১।/০
ব্যয়	...	...	৭৩১৸১০
স্থিত	...	...	১৮৯॥১০

আয়

ব্রাহ্মসমাজ		১১০॥৵১০
দান প্রাপ্তি।		
শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৫	
„ কালীকৃষ্ণ ঠাকুর	২৫	
„ রাখালচন্দ্র সেন	১২	
„ হরিমোহন রায়	১০	
„ তারাপ্রসন্ন রায়	৪	
„ ভুমেশচন্দ্র বসু	২	
„ তারিণীকান্ত ভট্টাচার্য্য	১	
„ বৈকুণ্ঠনাথ সেন	১	
„ যদুনাথ মিত্র	১	
	৮১	
দানাধারে প্রাপ্ত	২৪।০	
সঙ্গীতের কাগজ বিক্রয়	৫।৵১০	
	১১০॥৵১০	

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৯৯৶/০
পুস্তকালয়	...	২৯।/০
যন্ত্রালয়	...	৪১১৶৫
গচ্ছিত	...	১৮॥১০
সমষ্টি		৬৬৯৸৫

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	...	...	১৬৪॥৶৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা		...	২২২৸৶০
পুস্তকালয়	...	...	৩৬ ৶১০
যন্ত্রালয়	...	...	৩০১।৵৫
গচ্ছিত	...	...	৬॥৶১০
সমষ্টি			৭৩১৸১০

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সম্পাদক।

Registerd NO 52.

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।
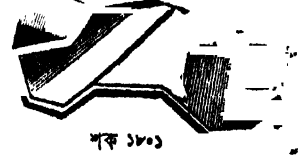
প্রকৃত ধর্ম্মসাধন।

প্রকৃত ধর্ম্মসাধন কি তাহা অনেকে অবগত নহেন অথবা অবগত হইয়া সর্ব্বদা বিস্মৃত হয়েন। অনেকে ধর্ম্ম বিষয়ে সর্ব্বদা আলোচনা, বিচার ও তর্ক করিতে ভাল বাসেন এবং তজ্জন্য আপনাকে ধার্ম্মিক বলিয়া মনে করেন। কিন্তু বস্তুতঃ প্রকৃত ধর্ম্মসাধন বিচার অথবা তর্ক নহে। অনেকে নিয়মিত সময়ে উপাসনা-স্থলে উপস্থিত থাকেন ও তজ্জন্য আপনাকে ধার্ম্মিক বলিয়া মনে করেন কিন্তু উপাসনা-স্থলে নিয়মিত রূপে উপস্থিত থাকিলেই যে প্রকৃত ধর্ম্ম সাধন হইল তাহা নহে। কেহ কেহ ধর্ম্ম বিষয়ে সর্ব্বদা উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন এবং তজ্জন্য আপনাকে ধার্ম্মিক মনে করেন কিন্তু কেবল ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিলেই যে প্রকৃত ধর্ম্মসাধন হইল এমত নহে, নিজের ধর্ম্মসাধনের প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। কেহ কেহ যেখানে ধর্ম্ম বিষয়ে বক্তৃতা হউক না কেন সেই খানে উপস্থিত হইয়া তাহা শ্রবণ করেন এবং তজ্জন্য আপনাকে ধার্ম্মিক মনে করেন কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্মসাধন কেবল ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণের উপর নির্ভর করে না। অনেকে ধর্ম্মবায়ু মধ্যে চিরকালই সঞ্চরণ করিতেছেন তথাপি প্রকৃত ধর্ম্ম হইতে বহুদূর। তাঁহারা উৎসব, বক্তৃতা, সমাজ লইয়া সর্ব্বদা ব্যস্ত কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্মসাধন হইতে বিরত। ধর্ম্মা-লোচনা, সামাজিক উপাসনা, ধর্ম্মোপদেশ প্রদান, ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ, ধর্ম্মোৎসব সকলই আবশ্যক কিন্তু তাহা প্রকৃত ধর্ম্মসাধন নহে। আমরা যদি একটি সামান্য রিপু দমন করিতে সমর্থ হই তাহা সহস্র ধর্ম্মোৎ-সব-সম্ভোগ অপেক্ষা শ্রেয়স্কর। এদিকে রিপু সকল প্রবল রহিল, কেবল ধর্ম্মোৎসবে মাতিলে কি হইবে? যদি আমরা চিরজীবন ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করি এবং রিপুদমনে কিছু মাত্র অগ্রসর না হই তবে সে উপদেশ শ্রবণে কি ফল? যদি আমরা ধর্ম্মোপদেশ প্রদানে পটু হই ও নিজে বালকবৎ ক্রোধ কিংবা লোভের বশবর্ত্তী হই তবে ধর্ম্মোপদেশ প্রদানে আমরা কি প্রকারে অধিকারী হইতে পারি? যদি উপাসনা দ্বারা হৃদয় সংশোধিত না হয় তবে নিয়মিত সময়ে প্রত্যহ উপা-সনা করিলে কি হইবে? যদি আমরা ধার্ম্মিক

লোকের কথা লইয়া সর্ব্বদা জল্পনা করি আর নিজে ধার্ম্মিক না হই তবে তাহা কেবল জল্পনা মাত্র। যদি আমরা ধর্ম্ম-মতের বিষয় সর্ব্বদা আন্দোলন করি এবং নিজে ধার্ম্মিক না হই তবে সে আন্দোলনে কি লাভ? প্রকৃত ধর্ম্ম তিনটি কথার অন্তর্ভুক্ত। ইন্দ্রিয়দমন, পরোপকার ও ঈশ্বরের সহিত যোগ। প্রকৃত ধর্ম্ম অতি সংক্ষেপ কিন্তু ধর্ম্মাড়ম্বর অতি বিস্তীর্ণ। লোকে ধর্ম্মাড়ম্বর, ধর্ম্মামোদ, ধর্ম্মজল্পনা লইয়াই ব্যস্ত থাকে কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্মের প্রতি অতি অল্প মনোযোগ প্রদান করে। সামাজিক উপাসনা, ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ ও উৎসব ধর্ম্ম-সাধনের উপায় মাত্র কিন্তু কেবল উপায়ে বদ্ধ থাকা কর্ত্তব্য নহে। অন্তরঙ্গ সাধনের প্রতি সম্যক মনোযোগ প্রদান করা আমাদিগের অতীব কর্ত্তব্য। অন্তরঙ্গ সাধনই স্বর্গের সোপান; অন্তরঙ্গ সাধন দ্বারা আমরা মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হই।

ধর্ম্মবিষয়ে ভারতবর্ষে ইওরোপীয় ভাবের প্রবেশ।

হিন্দুজাতি ধর্ম্মভাবের প্রবলতা জন্য চিরকাল প্রসিদ্ধ। ইঁহারা সকল কার্য্যে ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া থাকেন। ইঁহারা শয়নে স্বপ্নে ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া থাকেন। কোন স্থানে যাত্রা করিতে হইবে ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া তাহা করা হয়। একটি সামান্য পত্র লিখিতে হইবে অগ্রে ঈশ্বরের নাম লেখা হয়। ইহাই প্রকৃত হিন্দুভাব। ইওরোপীয়েরা কেবল সপ্তাহ মধ্যে একবার গির্জায় গমন করেন তাহার পর ধর্ম্মের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখেন না। ব্রাহ্মেরা ইওরোপীয়দিগের দৃষ্টান্তে ধর্ম্মবিষয়ে হীন হইয়া পড়িতেছেন। অধিকাংশ ব্রাহ্ম নিয়মিত রূপে প্রাত্যহিক উপাসনা করেন কি না সন্দেহ। প্রচলিত ধর্ম্মাবলম্বীরা গৃহস্থিত বিগ্রহের উপাসনা না করিয়া জল গ্রহণ করেন না। এপ্রকার ধর্ম্মভাব ব্রাহ্মদিগের মধ্যে কোথায়? তাঁহারা ইওরোপীয়দিগের অনুকরণে সপ্তাহে একবার মাত্র ব্রাহ্মসমাজে গিয়া ধর্ম্মসাধন বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়েন। সামাজিক উপাসনা অতীব কর্ত্তব্য কর্ম্ম। সামাজিক উপাসনার আবশ্যকতা বিষয় আমরা এই পত্রিকায় অনেকবার লিখিয়াছি। অতএব বর্ত্তমান উপলক্ষে তদ্বিষয়ে বাহুল্যরূপ লিখিবার আবশ্যকতা নাই। কিন্তু কেবল সামাজিক উপাসনাতে বদ্ধ থাকা উচিত নহে। প্রচলিত ধর্ম্মাবলম্বীরা ব্রাহ্মদিগের অনুকরণে ধর্ম্ম-সভা ও হরি-সভা সকল স্থাপন করিয়াছেন। শুনিতে পাওয়া যায় এই সকল সভার অধিকাংশ সভ্য কেবল নিয়মিত সময়ে সভায় উপস্থিত হইয়া সংকীর্ত্তনাদি যাহা করেন তাহার পর ধর্ম্মের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখেন না। সুতরাং সাধারণতঃ ভারতবর্ষে ক্রমশঃ প্রকৃত ধর্ম্মভাবের হ্রাস হইতেছে। ইহা অপেক্ষা শোচনীয় ব্যাপার আর কি হইতে পারে? ধর্ম্ম প্রত্যেক মনুষ্য-জাতির প্রাণ। কোন দেশে ধর্ম্মভাবের হ্রাস হইলে তাহার আর নিস্তার নাই। এই সত্যের প্রতি সমস্ত পুরাবৃত্ত এক বাক্যে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। প্রচলিত ধর্ম্ম পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত ধর্ম্মভাব যাহাতে আমাদিগের মধ্য হইতে অন্তর্হিত না হয় তাহাতে আমাদিগের সম্যক যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য। আমাদিগের যাহা ভাল আছে ইওরোপীয় অনুকরণের স্রোতে তাহা যদি ভাসিয়া যায় তাহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কিছুই নাই।

বেহালা ব্রাহ্মসমাজ।

১ লা বৈশাখ রবিবার।

'যে ব্যক্তি উন্নতির প্রার্থী, নববর্ষ তাঁহারই পক্ষে আদরণীয়। বিষয়-ক্ষেত্রেও যাঁহারা বিষয়ের শ্রীবৃদ্ধি আকাঙ্ক্ষা করেন, বিষয়-বিস্তারের অভিলাষ করিয়া থাকেন, নববর্ষের সমাদর তাঁহারাও বিশেষরূপে অবগত আছেন। তাঁহারা সম্বৎসর কাল এই শুভ দিনেরই গণনা করেন, যে কবে নববর্ষ সমাগত হইবে যে দিনে তাঁহারা তাঁহাদের আয়বৃদ্ধি সন্দর্শন করিয়া হর্ষোৎফুল্ল হৃদয়ে আবার নবতর লাভজনক ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়া বিষয়-বিস্তারে সমর্থ হইবেন। যাঁহারদের শিক্ষার প্রতি—শরীর মনের বলবর্দ্ধনের প্রতি বিশেষ যত্ন অনুরাগ আছে, তাঁহারা সস্পৃহ নেত্রে এই শুভ দিনেরই প্রতি দৃষ্টি করেন, যে কবে বর্ষচক্র ঘূর্ণিত হইয়া আমারদিগকে নবতর ক্ষেত্রে লইয়া যাইবে, যে কাল যে অবসর প্রাপ্ত হইয়া শরীর যৌবনশ্রী ধারণ করিবে, মন উচ্চতর শিক্ষালাভ করিয়া বহুবিধ অমূল্য জ্ঞান-রত্ন আহরণে সমর্থ হইবে। প্রাণহীন মৃৎ পাষাণ সকল আর নববর্ষের মর্য্যাদা কি অনুভব করিবে? যাহাতে প্রাণ আছে, মন আছে, আত্মা আছে, উন্নতিই তাহারদের শ্রী সৌন্দর্য্য, উন্নতিই তাহারদের লক্ষ্য। অবস্থাভেদে শ্রেণীভেদে তাহারা নববর্ষের প্রকৃত গৌরব ব্যক্ত করিতে সমর্থ হউক বা না হউক, তাহারা উন্নতির নবতর ক্ষেত্র প্রাপ্ত হইয়া স্বাভাবিক নিয়মেই শোভা সৌন্দর্য্য, স্ফূর্ত্তি উদ্যম ধারণ করিয়া থাকে। কল্যাণতর শ্রীলাবণ্যে শোভিত হইয়া অব্যক্ত মধুর নিনাদে যেন নববর্ষের অভ্যর্থনা করিতে থাকে। এই নবপল্লবশোভিত তরুরাজি এই নবমুকুলফলধারী বৃক্ষলতা সকলই তাহার সাক্ষ্যস্থল। কলকণ্ঠ বিহঙ্গদলের মনোহর মধুর সঙ্গীত-আলাপই তাহার প্রত্যক্ষ নিদর্শন। প্রাণি জঙ্গমের উন্নতি-প্রণালীই তাহার জাজ্বল্যতর প্রমাণ। উন্নতিশীল আত্মাবিশিষ্ট মনুষ্য-সমাজের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর—ধর্ম্মপ্রধান আর্য্যভূমির আচার ব্যবহার একবার আলোচনা করিয়া দেখ, যে নববর্ষের অভ্যুদয়ে মর্ত্ত্যলোকে কি এক আনন্দ উৎসবদ্বার প্রমুক্ত হইয়াছে। আজ ভারতের কর্ম্মক্ষেত্র বাণিজ্যশালা তীর্থভূমি দেবগৃহ সকলই পবিত্র ধর্ম্মক্ষেত্রের ভাব ধারণ করিয়াছে। গৃহ-পরিবারের মধ্যে আজ নবতর কল্যাণতর ব্রতকর্ম্ম দানধর্ম্মের অনুষ্ঠান আরম্ভ হইয়া সংসার-আশ্রমের প্রকৃত গৌরব বর্দ্ধিত করিতেছে। আজ সাধকদল দেবালয়ে উপাসনাক্ষেত্রে ঈশ্বরের ধ্যান ধারণা পূজার্চ্চনার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া মর্ত্ত্যের মহত্ত্ব সাধন করিতেছেন। ধর্ম্মই যাহারদের জীবন, উন্নতিই যাহারদের লক্ষ্য, সেই উদ্যম উৎসাহশীল অমৃতধামের যাত্রী সাধু সদাশয় মহাপুরুষগণই নববর্ষের প্রকৃত মর্য্যাদা যথার্থ মাহাত্ম্য অবগত হইতেছেন। অনিত্য ধনরত্নের ক্ষতি বৃদ্ধি যাঁহারা কেবলই গণনা করেন, সেই সকল বিষয়ী অপেক্ষা নিত্যধন-আকাঙ্ক্ষী, উন্নতিপ্রার্থী ধর্ম্মপরায়ণ সুধীর সজ্জনদিগের হর্ষ আনন্দমাত্রা আজ যে কত উদার ভাব ধারণ করিয়াছে তাহা বাক্যেতে বুঝাইবার উপায় নাই। যে স্বদেশ-প্রেমী মহাপুরুষ স্বীয় জন্মভূমির শল্য-উদ্ধারে প্রবৃত্ত হইয়া কারাগৃহে অবস্থান করত কারামুক্ত হইবার দিন গণনা করিতেছেন, তাঁহাকে যাইয়া জিজ্ঞাসা কর, যে আজকার দিন তাঁহার পক্ষে কেমন আনন্দকর। যে বিদ্যার্থী যুবা, পরিমিত কালের জন্য স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেশ দেশান্তরে

গমন করিয়াছেন, তাঁহার নিকট যাইয়া অনুসন্ধান কর, যে অদ্যকার শুভ সূর্য্য তাঁহার সন্নিধানে কেমন সুখকর উৎসাহকর। যে বীরপ্রধান মহাতেজা পুরুষ স্বীয় জন্মভূমির কোন কালসাপেক্ষ দুঃসাধ্য ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়া স্থানান্তরে অবস্থান করিতেছেন, সেই কৃতকর্ম্মা বীরপুরুষকে জিজ্ঞাসা কর যে, নববর্ষের প্রথম প্রাতঃকাল কেমন আদরণীয়। যে শিক্ষা-সাধন-পরায়ণ ধর্ম্মাত্মা পরলোক অনন্ত লোকের সম্বল আহরণে প্রবৃত্ত থাকিয়া ক্রমে কৃতকার্য্য হইতেছেন, তাঁহার নিকট যাইয়া নববর্ষের প্রথম প্রাতঃকালের নিগূঢ় তত্ত্ব অবগত হও। পাপশৃঙ্খল সংসার-বন্ধন ছেদ করিবার জন্য যে ব্রতপরায়ণ সাধু যত্ন ও চেষ্টা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাঁহার আনন্দ উৎসাহ দেখিয়া এই পবিত্র দিনের প্রকৃত মাহাত্ম্য উপলব্ধি কর। সেই অমৃত ধামের যাত্রী, যিনি দুর্গম সংসার-পথের দুঃসহ কষ্ট ক্লেশ সহ্য করিয়া বর্ষশেষের সঙ্গে সঙ্গে আজ পরলোকের নিকটতর নবতর পান্থনিবাসে আসিয়া উপনীত হইলেন, তাঁহার সুখাবহ সন্নিধানে যাইয়া নববর্ষের গূঢ় মাধুর্য্য সম্ভোগ কর। যে ঈশ্বরপ্রাণ সদাশয় সাধু, সম্বৎসর কাল ঈশ্বরের নবতর কল্যাণতর প্রেমে পরিপালিত হইয়া আজ আবার তাঁহার উচ্চতর সদাব্রত-দ্বার উদ্‌ঘাটিত দেখিয়া শ্রদ্ধাভক্তি প্রীতি কৃতজ্ঞতা-ভরে অশ্রু-পূর্ণ নয়নে ঈশ্বরের যশোগান করিতেছেন, তাঁহার সন্নিধানে যাইয়া এই পুণ্য দিনের প্রকৃত মাহাত্ম্য অবগত হও।

যাঁহারা উন্নতির প্রার্থী—যাঁহারা মুক্তি-ইচ্ছু, তাঁহারাই পক্ষ মাস ঋতু সম্বৎসর অতিবাহিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে উন্নতি-পথের দুর্লঙ্ঘ্য সমুদ্র-সেতু অতিক্রম করিয়া আজ নববর্ষের প্রথম প্রাতঃকালে উপনীত হওত ইহার যথার্থ শ্রীসৌন্দর্য্য প্রত্যক্ষ প্রতীতি করিতেছেন, তাঁহারাই ঈশ্বরের স্নেহ করুণা মূর্ত্তিমতী দেখিয়া অন্তঃস্ফূর্ত্ত বাক্যে আনন্দমনে আজ তাঁহার মহিমাগানে প্রবৃত্ত হইতেছেন। যাহারা প্রবৃত্তির দাস, যাহারা বিষয়-শৃঙ্খলকে চুম্বন করত সংসার-কারাগৃহকেই চিরনিবাসভূমি জানিয়া তন্মধ্যে বাস করিতে ইচ্ছা করে, ইন্দ্রিয়-সুখকেই সর্ব্বস্ব জানিয়া তাহাতেই চিরমুগ্ধ থাকে, যাহারা বিষয়ের অতীত পদার্থের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত উপলব্ধি করিতে পারে না, যাহারদের ক্ষীণ-দৃষ্টি মোহঅন্ধকার ভেদ করিয়া উন্নতি-পথের রেখামাত্রও দেখিতে পায় না, তাহারা আর নববর্ষের প্রথম দিনের কি মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিবে? নক্তশির পশুরা যেমন সৌর জগতের শোভা সৌন্দর্য্য দেখিতে পায় না, তেমনি যাহারদের ইচ্ছা অভিলাষ কেবল বহির্ব্যাপারেই ব্যাপৃত, যাহারদের লক্ষ্য কামনা কেবল সংসারের নীচ বিষয়েই আবদ্ধ, তাহারা তেমনি আধ্যাত্মিক জগতের দেবস্পৃহনীয় মাধুর্য্য অনুভব করিতেই পারে না। বর্ষের পর বর্ষ আগমনে তাহারদের শরীর জীর্ণ হইতেছে, ভোগ্য বিষয় সকল পুরাতন হইয়া যাইতেছে, জীবনকাল সংক্ষেপ হইয়া পড়িতেছে, ইহাতে তাহারদের আনন্দ উৎসাহ বর্দ্ধিত হওয়া দূরে থাকুক, বরং কালান্তক মৃত্যুকে ক্রমে নিকটবর্ত্তী দেখিয়া দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনায় তাহারদের শরীরের শোণিত শুষ্ক হইয়া যাইতেছে; মন অবসন্ন হইতেছে। তাহারদের অবস্থা কি শোচনীয়। ধার্ম্মিক বিষয়ী উভয়েই ঈশ্বরের আনন্দ-রাজ্যের প্রজা। উভয়েই তাঁহার স্নেহের ধন। উভয়েরই সম্মুখে উন্নতির পথ—মুক্তির সোপান প্রমুক্ত রহিয়াছে। শিক্ষা-সাধনগুণে এক জন আজ নববর্ষের অভ্যুদয়ে প্রেমানন্দে উৎফুল্ল হইতেছেন,

আর এক জন কর্ম্মদোষে চারি দিক অন্ধকার দেখিয়া সন্তাপ-অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন। এক জন ব্রহ্মানন্দের নবতর আস্বাদ প্রাপ্ত হইয়া উৎসাহ সহকারে সংসার-বন্ধন ছেদ করিতে অগ্রসর হইতেছেন আর এক জন একবিধ বিষয়-সুখ-ভোগে বিতৃষ্ণা-জনিত ক্রমে অবসন্ন হইয়া পড়িতেছেন।

হে সুধীর সাধু সজ্জন সকল! তোমরা আলোক অন্ধকারের, অমৃত গরলের প্রভেদ সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছ। যাঁর প্রসাদে আজ এই পবিত্র ব্রাহ্মসমাজে আগমন করিয়া তোমরা সংসারের অতীত সুখ, বিষয়ের অতীত আনন্দ উপভোগ করিতেছ, কৃতজ্ঞ হৃদয়ে আজ সেই সর্ব্বসুখদাতা অখিল-বিধাতাকে প্রণিপাত কর। যিনি সম্বৎসর কাল পাপ তাপ, বিঘ্ন বিপত্তি হইতে উদ্ধার করিয়া আজ এই উন্নতির নবতর সোপানে আনয়ন করিলেন, ভক্তিভরে সেই সর্ব্ব-সিদ্ধিদাতা পরমেশ্বরকে প্রীতি-উপহার প্রদান কর। যিনি অকাতরে অন্ন জল জ্ঞান ধর্ম্ম বিতরণ করিয়া এই শরীর এই মন এই আত্মাকে আজন্মকাল পোষণ করিলেন—

অনন্ত জীবনের উপজীবিকা। বর্ষবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যদি সেই আত্মপ্রসাদ ও ব্রহ্মানন্দের মাত্রা বৃদ্ধি না হইয়া থাকে—গত বর্ষে বৈশাখের প্রথম দিবসে যে ভাবে এই ব্রাহ্মসমাজে উপস্থিত হইয়াছিলাম, তাহা হইতে অধোগতি লাভ না হউক যদি সেই রূপ উৎসাহ অনুরাগের সহিত, সেই প্রকার পবিত্র ভাবে আজও এখানে উপস্থিত হইয়া থাকি, তাহা হইলেও আমারদিগের দুর্গতি ও অবনতি বলিতে হইবে। দিবা রাত্রি পক্ষ মাস ঋতু সম্বৎসর পরিবর্ত্তিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই আমারদিগকে উন্নতি-পথের উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতেই হইবে। যদি দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহার ব্যতিক্রম হইয়া থাকে, তবে আইস সকলে এখনই তাহার প্রতিকার সাধন জন্য ঈশ্বর-সন্নিধানে অনুতপ্ত হৃদয়ে অশ্রুপূর্ণ নয়নে প্রার্থনা করি। সেই দুর্ব্বলের বল ভক্তবৎসল পরমেশ্বর আমারদের আশা পূর্ণ করিবেন। তিনি বিনা আর আমারদের গতি মুক্তির উপায়ান্তর নাই।

করুণানিধান! সম্বৎসর কাল তোমার

গের জন্য আজ নিত্য উদার সদাব্রত-দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দিলেন, সর্ব্বাগ্রে সেই সর্ব্ব-সম্পদ-বিধাতাকে প্রণিপাত করিয়া সুখ-ঐশ্বর্য্য সম্ভোগে প্রবৃত্ত হও। পৃথিবীর ধন সম্পদের ক্ষতি লাভের গণনায় আমারদের প্রয়োজন নাই। ঈশ্বরের প্রসন্নতাই আমারদের সর্ব্বস্ব। তাঁহার প্রসাদে তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিয়া কি পরিমাণ আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারিয়াছি, নির্ম্মল ও নিষ্পাপ হইয়া কতদূর তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভে কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহাই গণনা কর, তাহাই আলোচনা কর। তাহাই ইহ কাল পরকালের সম্বল, তাহাই আমারদের

হইয়াছি। যদি কিছু সংসারের আকর্ষণ ও পাপের প্রলোভন অতিক্রম করিয়া পুণ্য-পদবীতে আরোহণ করিয়া থাকি, তবে সে তোমারই করুণা, কেবল তোমারই করুণা-বল ভিন্ন আর কিছুই নহে। মোহে অন্ধ হইয়া যাহা কিছু পাপ মলিনতা সঞ্চয় করত অধোগতি লাভ করিয়াছি, তাহা কেবল তোমার স্নেহের অপব্যবহার-জনিত আমারদের দুর্ব্বলতা—শুদ্ধ কেবল আমারদেরই দুর্ব্বলতা। হে দুর্ব্বলের বল! তুমি সেই দুর্ব্বলতা পরিহার কর। তোমার সন্নিধানে আর কি যাচ্ঞা করিব, তুমিতো আমারদের জন্য এই বিশ্বভাণ্ডার উন্মুক্ত

করিয়া দিয়াছ। তুমি জ্ঞান দাও, প্রীতি দাও, ধৈর্য্য বীর্য্য তিতিক্ষা সন্তোষ দাও, বিবেক বৈরাগ্য দাও; আমায় আশ্রয় প্রদান কর, যে তোমার বলে বলীয়ান্ হইয়া তোমার মহিমা মহীয়ান্ করি। তোমার যশ ঘোষণা করি। তোমাকে প্রীতি ও তোমার প্রিয় কার্য্য সাধন করি, এই আমারদের কামনা; নাথ! কেবল এই আমারদের অন্তরতম প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

নববর্ষের ব্রাহ্মসমাজ।

১লা বৈশাখ ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫০

কি পবিত্র কি রমণীয় সময়! নববর্ষের এই প্রথম মুহূর্ত্তের শোভা কি হৃদয়প্রফুল্লকর! চতুর্দ্দিকে কি প্রশান্ত কি মধুময় ভাব! আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখি, আকাশ নির্ম্মল। যেন তথা হইতে অমৃত-বারি বর্ষণ হইতেছে। স্নিগ্ধকর বায়ু-হিল্লোলে শরীর পুলকিত হইতেছে। সুরভি কুসুমের গন্ধে চারি দিক আমোদিত। ঐ দেখ বিহঙ্গম সকল জাগ্রত হইয়া মধুর স্বরে গান করিতেছে। এমন পবিত্র সময়ে ব্রাহ্মগণ সেই অমৃত-সাগরে নিমগ্ন হও। "গেল বিভাবরী আইল শুভ্রবসনা ঊষা, মগ্ন হওরে অমৃত সাগরে। তাঁর সমান কেহ চক্ষে দেখে নাই শুনে নাই শ্রবণে।"

আজ যেমন উৎসাহ সহকারে বলিতেছি "গেল বিভাবরী আইল শুভ্রবসনা ঊষা, মগ্ন হওরে অমৃত সাগরে" আবার কবে সে শুভ দিনের উদয় হইবে যখন পুনর্ব্বার বলিতে পারিব, "গেল বিভাবরী আইল শুভ্রবসনা ঊষা, মগ্ন হওরে অমৃত সাগরে" সে দিন এখানকার শেষ দিন। তখন এই অন্ধকারময় সংসার স্বপ্নের মত আমাদের সম্মুখ হইতে অবসৃত হইবে এবং জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম-ধামের অমৃত-জ্যোতি আত্মার সম্মুখে প্রকটিত হইবে। এই আশা যাঁহার অবলম্বন, তিনি কি পরম সুখী। পবিত্র যাঁহার জীবন তিনিই কেবল এই আশার সুশীতল ছায়া লাভ করিতে পারেন। অদ্য হইতে—এই পবিত্র মুহূর্ত্ত হইতেই কি আমরা পবিত্র জীবন ধারণ করিবার প্রতিজ্ঞা করিব না? ঈশ্বরবিহীন জীবন কি মৃত্যুসমান নহে? কে সে ভারবহ জীবন বহিতে চায়? সেই অমৃতস্বরূপকে ইহ জীবনেই হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। তিনি বিনা যে হৃদয় সে শ্মশানসমান। তাঁহাকে চক্ষে চক্ষে বক্ষে বক্ষে রাখিতেই হইবে।

যিনি তাঁহাকে চক্ষে চক্ষে বক্ষে বক্ষে রাখিতে পারেন তিনি ইহ লোকে থাকিয়াই পরলোকের অমৃত-জ্যোতির আভাস প্রাপ্ত হন। যে আনন্দময়ের আনন্দ-কিরণে স্বর্গধাম জ্যোতির্ম্ময়, সেই নির্ম্মল জ্যোতিই তাঁহার হৃদয়ে বিরাজমান। যিনি তদ্গতপ্রাণ, যিনি তাঁহাকে ভুলিয়া থাকিতে পারেন না, তাঁহার হৃদয়ে ঈশ্বরের জ্যোতি নবতর আশ্চর্য্যতর শোভা বিস্তার করে। যিনি তাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল—যিনি তাঁর জন্য পিপাসু, ঈশ্বর যে কি অমৃতবারি দিয়া তাঁহার পিপাসা শান্তি করেন, কি আশ্চর্য্য কৌশলে যে তিনি তাঁহার নিকটে প্রকাশিত হন, কেমন করিয়া আমি তাহা ব্যক্ত করিব? তাঁহার ভক্ত তাঁহাকে সর্ব্বত্র দর্শন করেন। নির্ম্মল গঙ্গার জলে—পদ্মের নিরুপম রূপলাবণ্যে—বালক বালিকার মধুর হাস্যে—পতিব্রতার প্রেমে—ধর্ম্মাত্মার অনুরাগ-রঞ্জিত আননে তিনি তাঁহাকে উপলব্ধি করেন। তাঁহার গৃহ-প্রাঙ্গণে যখন ক্রীড়াশীল বালক বালিকাগণ আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে, তখন তার মধ্যে তিনি সেই,

ঈশ্বরেরই করুণাকে শতধা বিভক্ত হইয়া বিরাজ করিতে দেখেন। ঈশ্বরপরায়ণ যেমন সর্ব্বদাই তাঁহাকে চক্ষে চক্ষে রাখিতে ভাল বাসেন, ঈশ্বরও তেমনি তাঁহার সেবককে তাঁহার চক্ষে চক্ষে রাখিতে ইচ্ছা করেন। ঈশ্বর তাঁহার প্রিয় পুত্রের বক্ষের ভিতরে ও চক্ষের সম্মুখে সততই বিরাজমান থাকেন। ঘোর বিপদের সময়েও তিনি তাঁহার হৃদয়ের ভিতর থাকিয়া তাঁহাকে বৈরাগ্যের উপদেশ দিয়া শান্তি দান করেন। তাঁহার করুণার তুলনা কোথায়; আমরা তাঁহার নিকটে তাঁহাকে প্রার্থনা করিলেই তাঁহাকে পাইতে পারি। সকল প্রার্থনার মধ্যে আমরা তাঁহার নিকটে তাঁহাকে প্রার্থনা করিতেই ভাল বাসি। এবং তিনিও সকল প্রার্থনার মধ্যে ঐ প্রার্থনা শ্রবণ করিতে ভাল বাসেন। ইহা আমরা পরীক্ষা দ্বারা জানিতে পারিয়াছি। তবে কেন না আমরা তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিব? আন্তরিক প্রার্থনা কখন নিস্ফল হয় না। তিনি আমাদের হৃদয়ের প্রার্থনা শ্রবণ করিবেন। তিনি আমাদের অন্ধকার হৃদয়ের আলো হইয়া, বিপদ-অন্ধকার মোহ-অন্ধকার দূর করিবেন। আত্মাকে পবিত্র করিবেন। সেই পবিত্রতার বলেই সংসার-রজনী যখন প্রভাত হইবে, মৃত্যু যখন উপস্থিত হইবে, তখন বলিতে পারিব, "গেল বিভাবরী আইল শুভ্রবসনা উষা, মগ্ন হওরে অমৃতসাগরে।"

হে অমৃতস্বরূপ। আমরা তোমার শরণাপন্ন হইতে আসিয়াছি। আমাদিগকে তোমার অভয় পদে স্থান দাও। পাপ-তাপ—মৃত্যুজ্বালা ও মৃত্যুপীড়া হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর। চির জীবন তুমি আমার হৃদয়ের আলোক ও কণ্ঠের হার হইয়া থাক। পরিশেষে যাহাতে মৃত্যুরূপ দ্বার দিয়া আনন্দ মনে তোমার অমৃত নিকেতনে উপস্থিত হইতে পারি তুমি তাহার উপায় বিধান কর।

"অপনা প্রতি নিরখি না দেখি নিস্তার।
এক মাত্র ভরসা হে করুণা তোমার॥
ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

আমিষ ভক্ষণ।

(প্রাপ্ত)

ধর্ম্ম তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; শারীরিক ধর্ম্ম, মানসিক ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মত্রয় সাধন করাই প্রকৃত ধর্ম্মসাধন। শরীরের স্বাস্থ্যরক্ষা ও প্রকৃষ্ট উপায় সকল দ্বারা তাহাকে দৃঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ করা শারীরিক ধর্ম্ম, মনের বৃত্তি সকলের নিয়মিত চালনা ও তাহাদিগের উন্নতি সাধন করা মানসিক ধর্ম্ম, এবং আত্মার গুণ সকলের পরিচালনা ও তাহাদিগের উৎকর্ষ সম্পাদন করা আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম বলা যায়। শরীর মন ও আত্মার সহিত পরস্পর এরূপ নিকট ও নিগূঢ় সম্বন্ধ বর্ত্তমান রহিয়াছে যে শারীরিক ধর্ম্ম সাধনের প্রতি কিছুমাত্র অবহেলা করিলে আমরা মানসিক ও আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে পালন করিতে পারি না, মানসিক ধর্ম্ম সাধনের প্রতি কিছুমাত্র অবহেলা করিলে শারীরিক ও আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে পালন করিতে পারি না, এবং আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম সাধনের প্রতি কিছুমাত্র অবহেলা করিলে আমরা শারীরিক ও মানসিক ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে সাধন করিতে পারি না। অতএব প্রকৃত রূপে ধার্ম্মিক হইতে গেলে আমরা শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক এই তিন প্রকার ধর্ম্মই সমানরূপে পালন করিব। অনেকে শারীরিক ধর্ম্ম সাধনের প্রতি অতিশয় বিমুখ।

তাঁহারা শারীরিক স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম সকল যথারূপে পালন না করিয়া তাঁহাদিগের মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের প্রতি যে নানা ব্যাঘাত উপস্থিত করেন তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন না।

এই পৃথিবীতে আহার আমাদিগের শরীর রক্ষার প্রধান উপায়। আহার দ্বারা আমরা জীবন ধারণ করিয়া রহিয়াছি। আহারই আমাদিগের অবিনশ্বর আত্মার নশ্বর আধার এই শরীরের পোষক ও রক্ষক। আহারের উপর আমাদিগের শারীরিক স্বাস্থ্য সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর করিতেছে। যে সকল দ্রব্য আহার করিলে আমাদিগের শরীরের স্বাস্থ্য সুন্দর রূপে রক্ষিত হয় ও তাহা দ্রঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ হইয়া থাকে সেই সকল বস্তুই আহার করা আমাদিগের অতীব কর্ত্তব্য এবং যে সকল দ্রব্য আহার করিলে আমাদিগের শরীরের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, আমরা রোগে আক্রান্ত হই, সে সকল বস্তু আহার করা আমাদিগের পক্ষে নিতান্ত অনুচিত এবং তাহা অধর্ম্ম শব্দের বাচ্য ইহা বলিলে অসঙ্গত হয় না।

মাংসাহার আমাদিগের শরীরের স্বাস্থ্যকর নহে, উহা নানা রোগ উৎপাদন পূর্ব্বক আমাদিগের শরীরকে দুর্ব্বল, রুগ্ন ও অসুস্থ করিয়া ও আমাদিগের পরমায়ুর হ্রাস করিয়া আমাদিগের মানসিক ও আধ্যাত্মিক ধর্ম্মপালনে ব্যাঘাত উপস্থিত করে। অতএব মাংসাহার একটি গর্হিত কার্য্য। সর্ব্বাঙ্গীন ধর্ম্ম সাধনেচ্ছুক ব্যক্তিগণের ঐ কার্য্য সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।

মাংসাহার যে মনুষ্য-শরীরের অস্বাস্থ্যকর ও নানা বিষম রোগোৎপাদক তাহা বহু লোকের অভিজ্ঞতা এবং সুবিখ্যাত ও সুবিজ্ঞ শারীরতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতদিগের প্রগাঢ় অনুসন্ধান ও পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে।

"Mysteries of Man" নামক গভীর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাপরিচায়ক শারীর বিদ্যা সম্বন্ধীয় সুন্দর পুস্তক প্রণেতা আমেরিকা নিবাসী কোন বিচক্ষণ ভিষক বলেন "ফল ও [illegible], দাল, গম প্রভৃতি শষ্য মনুষ্যের প্রকৃতিসিদ্ধ ও স্বাস্থ্যকর আহার। ঐ সকল আহার্য্য বস্তু মনুষ্যকে শারীরিক ও মানসিক বলে বলীয়ান করিতে বিশেষরূপে সক্ষম। ঐ সকল খাদ্য ব্যবহার করিলে মনুষ্য পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় থাকে এবং রোগাক্রান্ত হইলে সহজে রোগ হইতে মুক্ত হইতে পারে। শারীরিকস্বাস্থ্য রক্ষার্থ যে সকল পদার্থ আবশ্যক ঐ সকল বস্তুতে তাহা প্রচুর পরিমাণে ও বিশুদ্ধ অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। উদ্ভিদাহার বল, উৎসাহ ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে। ইহা সকল কালের, সকল অবস্থার ও সকল ব্যবসায়ের ব্যক্তিদিগের পক্ষে সমান রূপে উপযুক্ত। ইহা সামান্য মজুর ও ব্যবসায়ীর পক্ষে যেরূপ উপযুক্ত, জ্ঞানী, শিল্পী ও অধ্যয়নশীল ছাত্রের পক্ষেও সেই রূপ উপযুক্ত। উদ্ভিদাহারে শরীরের বর্ণ পরিস্কার হয়, গণ্ডদেশ রক্তবর্ণ হয়, চক্ষু উজ্জ্বল হয়, বুদ্ধি প্রখর হয়, আধ্যাত্মিক বৃত্তি সকল গভীর ও পবিত্র হয়; পরিপাক-কার্য্য সুন্দর রূপে সম্পাদিত হয়, শরীরস্থ সকল যন্ত্র নিয়মিত রূপে কার্য্য করিতে থাকে, রিপুগণ অনায়াসে বশীভূত হয়, মনের অবস্থা সর্ব্বদাই স্নিগ্ধ ও শান্ত থাকে, সংক্ষেপেতঃ আমাদিগের সমস্ত প্রকৃতি উন্নত, পবিত্র ও সুন্দর হয় এবং আমরা নূতন বল ও উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়া পূর্ণ স্বাস্থ্য ভোগ করিতে থাকি।" তিনি আরও বলেন "নিয়ম পূর্ব্বক উদ্ভিদাহার করিলে এবং স্বাস্থ্যরক্ষার অন্যান্য নিয়ম সকল পালন করিলে আমরা জ্বর, উলাওঠা এবং প্লীহা ও যকৃতের বিকৃতাবস্থা হেতু উদরের যে অসংখ্য

ভয়ানক কষ্টকর রোগ সকল উৎপন্ন হয় সে সকল কখনই আমাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে না।” “মনুষ্য স্বভাবতই নিরামিষাশী জীব। উদ্ভিদ-রাজ্যেই তাহার স্বাভাবিক ও স্বাস্থ্যকর খাদ্য প্রচুর রূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়। মৎস্য কিম্বা মাংস মনুষ্যের স্বাভাবিক আহার নহে। অতএব কেবল নিরামিষাহার করিয়া মনুষ্য পূর্ণ স্বাস্থ্য উপভোগ করিতে পারে এবং যথোপযুক্ত শক্তি ও বল প্রাপ্ত হইয়া জীবনের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারে।” “যে সকল ব্যক্তি ফল ও অন্যান্য উদ্ভিদ্ ভোজন করিয়া জীবন ধারণ করে এবং স্বাস্থ্যরক্ষার সাধারণ নিয়ম পালন করে তাহারা সংক্রামক জ্বর ও অন্যান্য রোগে আক্রান্ত হয় না।” “যদ্যপি সকলে ফলাহার ও বিশুদ্ধ উদ্ভিদ আহার করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারিত তাহা হইলে আমি নিশ্চয় বলিতে পারি কোন ব্যক্তিই গণ্ডমালা প্রভৃতি নানা দুশ্চিকিৎস্য রোগে অকালে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইত না।” “যে সকল বালক বালিকা রুটি, দুগ্ধ, ফল ও আলু প্রভৃতি উদ্ভিদ আহার করিয়া থাকে তাহাদিগের অপেক্ষা অধিক সুস্থ ও সুশ্রী আমি কখন দেখি নাই।” “উদ্ভিদাহার পাকস্থলীকে সুস্থ অবস্থায় রক্ষা করিয়া থাকে তজ্জন্য নিরামিষ ও উদ্ভিদাহারীরা কখন কোন উদরের পীড়া দ্বারা আক্রান্ত হয়েন না, হইলেও উহা হইতে সহজে আরাম লাভ করেন। কিন্তু মাংসাহার পাকস্থলীকে অসুস্থ করে এবং তজ্জন্য মাংসাহারী ব্যক্তিগণ অজীর্ণ-দোষে নানা প্রকার কষ্ট পায়।”

ইংলণ্ডের কোন চিকিৎসক রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা দেখিয়াছেন যে আপেল প্রভৃতি ফল যে সকল বস্তু বা উপকরণে নির্ম্মিত সে সকল বস্তু বা উপকরণ আমাদিগের শরীরকে রক্ষা করিতে ও উহার পরিপুষ্টি সাধন করিতে সম্পূর্ণরূপে উপযুক্ত এবং উহা আমাদিগের শরীরের মাংসপেশী, শিরা ও মস্তিস্ক প্রস্তুত করিতে বিশেষ রূপে পারগ।

ইংলণ্ডনিবাসী ডাক্তার নিকল্‌স সাহেব বলেন “মাংস অতিশয় শোণিতোত্তেজক খাদ্য। ইহা প্রায় পরিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায় না। ইহা শরীরের নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর। ইহা রক্তকে দূষিত করে এবং পশুবৃত্তি সকল অপরিমিত রূপে উত্তেজিত করিয়া মনুষ্যকে ধর্ম্মপথ হইতে ভ্রষ্ট করিতে চেষ্টা পায়। বালক বালিকারা মাংস ব্যবহার করিলে অকালে তাহাদিগের পশুবৃত্তি সকল উত্তেজিত হইয়া উঠে। অতএব তাহাদিগের সম্বন্ধে মাংস অপেক্ষা দূষণীয় খাদ্য আর নাই।” “অপরিশুদ্ধ মাংস বিষতুল্য।” “মাংস ও তাহার সঙ্গে অন্যান্য অস্বাস্থ্যকর দ্রব্য ভক্ষণ করা ক্ষয়কাশ প্রভৃতি দুশ্চিকিৎস্য রোগের কারণ।” “যে সকল ব্যক্তি মাংসাহার করিয়া জীবন ধারণ করে ও অপরিষ্কার থাকে তাহাদিগের বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। এই সকল ব্যক্তিদিগের ঐ রোগ হইলে তাহা প্রায় আরাম হয় না। অনেক নিরামিষভোজী উদ্ভিদাহারী ব্যক্তি যাঁহারা স্বাস্থ্যের অন্যান্য নিয়ম সকল পালন করিয়া থাকেন তাঁহারা বসন্ত-রোগে প্রায় আক্রান্ত হয়েন না—এবং তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকের সংস্পর্শ-দোষ ঘটিলেও ঐ রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়েন না।”

লণ্ডন নগরের “এলেকজাণ্ড্রা প্যালেস বিজ্ঞান বিদ্যালয়” নামক শিল্পাগারের শারীর তত্ত্ববিদ্যা ও স্বাস্থ্য রক্ষার শিক্ষয়িত্রী ফেন্‌উইক্ মিলর নাম্নী এক বিদ্যাবতী ললনা

সম্প্রতি-প্রকাশিত 'House of Life' নামক শারীরতত্ত্ব বিদ্যা সম্বন্ধীয় পুস্তকে লিখিয়াছেন "যে সকল ব্যক্তি মাংসাহার করেন না তাঁহারা শরীরে কীটাধিক্য প্রযুক্ত যে সকল ত্বক্‌রোগ জন্মিয়া থাকে সেই সকল রোগ দ্বারা কখন আক্রান্ত হয়েন না।" তিনি আরও বলেন "রুগ্ন শূকরের মাংস আহার করিলে উদরে টেপওয়ারম নামক বৃহদাকার কৃমি উৎপন্ন হয় এবং তজ্জন্য অনেক রোগ আসিয়া আক্রমণ করে*।"

কোন কোন শারীরতত্ত্ববিৎ বলেন যে প্রায় সকল জন্তুর দন্তের আকার দেখিয়া তাহার স্বাভাবিক আহারের বস্তু কি তাহা বলিয়া দেওয়া যায়, অতএব মনুষ্যের কয়েকটি দন্ত যখন মাংসাহারী পশুদিগের ন্যায় গঠিত তখন মাংসই মনুষ্যের স্বাভাবিক আহার্য্য বস্তু। যাঁহারা এই পুরাতন ভ্রমাত্মক মতে বিশ্বাস করিয়া থাকেন তাঁহারা বর্ত্তমান কালীন বিচক্ষণ শারীরতত্ত্ববিদ্যাবিৎ পণ্ডিত ডাক্তার নিকল্‌স সাহেব এই বিষয়ে কি বলেন তাহা পাঠ করুন। "প্রত্যেক জন্তুর দন্তের আকার দেখিয়া তাহার স্বাভাবিক খাদ্য বস্তু কি তাহা নিশ্চয় করা যায়। মনুষ্যের দন্তের আকার সম্পূর্ণরূপে উদ্ভিদাহারী পশুদিগের ন্যায়, এবং ভূমিজাত উদ্ভিদ অর্থাৎ ফল, মূল, শস্য প্রভৃতি বস্তুই যে মনুষ্যের স্বাভাবিক ও স্বাস্থ্যকর খাদ্য সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।" ইহার অব্যবহিত পরে নিকল্‌স সাহেব বলিতেছেন, "This is the testimony of all the most distinguished anatomists and physiologists" ইহা সকল শ্রেষ্ঠ ও সুবিখ্যাত শারীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের পরীক্ষাসিদ্ধ মত।

* The House of life by Mrs Fenwick Miller 1878, P. 66.

অনেকের বিশ্বাস আছে যে কেবল উদ্ভিদাহার ও নিরামিষ ভোজন করিলে শরীর শ্রেষ্ঠ ও বলিষ্ঠ হয় না, অথবা উদ্ভিদে এমন কোন পদার্থ নাই যাহা মাংসের ন্যায় শরীরকে বলিষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ করে। যাঁহারা এরূপ বিশ্বাস করেন তাঁহারা নিতান্ত অজ্ঞ বলিতে হইবে। শারীরতত্ত্ববিদ্যা ও স্বাস্থ্যরক্ষায় শিক্ষয়িত্রী ফেনউইক মিলার তাঁহার প্রণীত পূর্ব্বোক্ত শারীরতত্ত্ববিদ্যা সম্বন্ধীয় পুস্তকে বলেন যে কেবল উদ্ভিদাহার করিয়া পূর্ণ স্বাস্থ্য ও প্রচুর শারীরিক বল অনায়াসে প্রাপ্ত হওয়া যায়*। ডাক্তার ব্রাউন বলেন "আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি উদ্ভিদাহার করিয়া মনুষ্য অশ্বের ন্যায় বলশালী ও তেজঃসম্পন্ন এবং দীর্ঘজীবী হইতে সমর্থ হয়।" আমাদিগের পাঠক মাত্রেই দেখিয়া থাকিবেন নিরামিষাহারী হিন্দুস্থানিদিগের শরীর কিরূপ দৃঢ় ও বলবান। ভারতবর্ষে নিরামিষাহারী দৃঢ় ও বলবান পুরুষ প্রায় সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। আয়রলেণ্ডদেশীয় কৃষকদিগের ন্যায় সাহসী, বলবান, সুদৃঢ়কায় ও সুন্দর মনুষ্যদল প্রায় আর দেখা যায় না। কিন্তু ইহারা আলু ও রুটি ব্যতীত অন্য কোন বস্তু আহার করিতে পায় না। ইংলণ্ড দেশীয় মজুরেরা প্রায় মাংস আহার করিতে পায় না। তাহাদিগকে উদ্ভিদ ও রুটি আহার করিয়াই জীবন ধারণ করিতে হয়, কিন্তু তাহাদিগের ন্যায় কর্ম্মিষ্ঠ, বলবান, কষ্টসহিষ্ণু মনুষ্যদল অতি বিরল। পোর্ত্তুগেল প্রবাসী ফ্রান্স দেশীয় মজুরদিগের অসঙ্গতি নিবন্ধন তাহারা কিছু মাত্র মাংস আহার করিতে পায় না, কেবল নানা প্রকার উদ্ভিদ বস্তু আহার করিয়া প্রাণ ধারণ করে; কিন্তু তাহারা সাহি-

* The House of Life by Mrs. Miller P 69.

শয় বলবান, পরিশ্রমী ও দীর্ঘায়ু বলিয়া সর্ব্বজনবিদিত*। ইংলণ্ডের অন্তঃপাতি লেঙ্কেশায়ার ও চেশেয়ার নামক প্রদেশের কৃষকেরা অতি বলিষ্ঠ বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ আছে। ইহারা দুগ্ধ, মাখন ও আলু ব্যতীত কদাচ অন্য কোন খাদ্য সামগ্রী ব্যবহার করে না। গ্রীক-দেশবাসীরা সম্পূর্ণরূপে নিরামিষভোজী ও উদ্ভিদাহারী ছিলেন। থরমপলি রক্ষা-কারী শূরেরা এবং সালামিস ও মারাথন যুদ্ধক্ষেত্রের বীরেরা বাল্যকাল হইতে অতি সামান্য উদ্ভিদাহারেই জীবন ধারণ করি-তেন। গ্রীসের নানা স্থানের মল্লক্রীড়াতে যে সকল বলবিক্রমশালী মল্লযোদ্ধা জয় লাভ করিতেন তাঁহারা সকলেই উদ্ভিদাহারী ছিলেন। গ্রীসে ব্যায়াম-বিদ্যা-শিক্ষার্থ যে সকল শিক্ষাগার সংস্থাপিত ছিল তথা-কার ছাত্রেরা উদ্ভিজ্জ ভিন্ন মাংস কখন স্পর্শও করিতে পারিত না। পুরাকালীন গ্রীকদিগের ন্যায় শারীরিক বল, কষ্টসহি-ষ্ণুতা, উৎসাহ ও উদ্যম প্রায় কোন মাংসাশী জাতির মধ্যে দেখা যায় না।

উদ্ভিদে কোন বলকর পদার্থ নাই ইহা বিজ্ঞানসিদ্ধ কথা নহে। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে "শারীরিক উত্তাপ (Animal Heat) যাহা না থাকিলে আমরা মুহূর্ত্তকাল জী-বন ধারণ করিতে পারি না তাহা আমরা যে সকল দ্রব্য আহার করি তাহাতে যে জল জবাক্ষরজান Hydrocarbon নামক রাসায়নিক পদার্থ আছে তাহা হইতে উৎপন্ন হয়। দেখা গিয়াছে যে Hydrocarbon নামান্তর্ভূত সমস্ত পদার্থ উদ্ভিদ্ হইতে বহুলরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়*। কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে যদ্যপি উদ্ভিদে বলকারক, শরীর-দৃঢ়-কারক স্বাস্থ্যকর পদার্থ আছে তবে আমাদিগের দেশে যে সকল লোক উদ্ভিদাহারে জীবন ধারণ করেন তাঁহারদিগের মধ্যে অনেকে দুর্ব্বল কোমল-শরীর ও রুগ্ন হয়েন কেন। ইহার উত্তর এই যে কেবল উদ্ভিদাহার করিলে শরীর সুস্থ দৃঢ় ও বলবান হইবে এমন নহে, শরীর রক্ষার্থ অন্যান্য যে সকল নিয়ম আছে তাহাও উহার সঙ্গে সঙ্গে বিশেষরূপে পালন করা আবশ্যক। উদ্ভিদাহার করিয়া যাঁহারা বলশূন্য ও রুগ্ন তাঁহারা অবশ্যই শরীর-রক্ষার কোন না কোন বিশেষ নিয়ম পালন করেন না। বয়েনি নামক একজন ভিষক বলেন "উদ্ভিদাহারের সঙ্গে অঙ্গ পরিচালন, বিশুদ্ধ বায়ু সেবন প্রভৃতি নিয়ম পালন করিলে শরীর বলবান ও দৃঢ় হয় এবং পূর্ণ স্বাস্থ্য উপভোগ করিয়া থাকে।" আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে যদ্যপি একটি শিশুকে তাহার জন্মদিন হইতে যৌবন কাল পর্য্যন্ত এরূপ যত্ন করিয়া রাখা যায় যে তাহার সম্বন্ধে স্বাস্থ্যরক্ষার কোন নিয়ম ভঙ্গ না হয়, যদ্যপি সে তাহার পিতা মাতা হইতে কোন রোগ বা ব্যাধি না প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং যদ্যপি সে উদ্ভিদ অর্থাৎ ফল মূল ও শস্য এবং দুগ্ধ ব্যতীত অন্য কোন খাদ্য সামগ্রী ব্যবহার না করে তাহা হইলে সে যেরূপ দৃঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ ও সুস্থকায় হইবে, আর একজন ঐ প্রকার শিশু যে যৌবনকাল পর্য্যন্ত ঐ প্রকারে থাকিয়াছে কিন্তু বাল্যকাল হইতে মাংস আহার করিয়া আসিয়াছে সে কখনই সেরূপ দ্রঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ ও সুস্থকায় হইবে না।

মাংসাহার কেবল আমাদিগের শারীরিক অস্বাস্থ্য সাধন করিয়া ক্ষান্ত থাকে না, তাহা

* Boyne's Remarks on the Physical and Moral History of the Human Species. P. 183.

* Curiosities of Science, Second Series, by I. Timbs P. 149.

আমাদিগের আধ্যাত্মিক উন্নতিরও বিশেষ ব্যাঘাত উপস্থিত করিয়া আমাদিগের সমূহ অমঙ্গল সম্পাদন করে। মাংসাহার করিলে আমাদিগের কাম ক্রোধ প্রভৃতি পশুবৃত্তি ও পাপ প্রবৃত্তি সকল অতিশয় উত্তেজিত হইয়া উঠে ও তাহা আমাদিগকে অধর্ম্ম ও পাপ কার্য্যে প্রবৃত্ত এবং অস্বাস্থ্য, অসুখ, অশান্তি, কষ্ট ও যন্ত্রণা আনয়ন করিয়া আমাদিগের জীবনকে বিষময় করিয়া তুলে। কিন্তু উদ্ভিদ ও নিরামিষ ভোজন আমাদিগের রিপু সকলকে উত্তেজিত করে না। ইহা শারীরিক স্বাস্থ্য, মানসিক স্বাস্থ্য ও আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্য সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিয়া থাকে। শারীর তত্ত্ববিৎ নিকল্‌স বলেন যে ব্যক্তির আধ্যাত্মিক বৃত্তি সকলের উন্নতি সম্পাদন করা প্রধান লক্ষ্য তাঁহার পক্ষে উদ্ভিদ্ ও নিরামিষ আহার সুন্দররূপে উপযুক্ত।

পরকাল।

৪৩০ সংখ্যক পত্রিকার ৩২ পৃষ্ঠার পর।

এতদ্দারা স্থিরীকৃত হইতেছে যে, সংসার ও ধর্ম্ম উভয়ে আমাদিগকে ভবিষ্যতের দিকে প্রেরণ করিতেছে; উভয়ে আমাদিগকে ভবিষ্যতের উপদেশ দিতেছে; এবং উভয়ে আমাদিগকে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করিতেছে। বাহ্য বিষয় পরমার্থের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়াও এই বিষয়ে পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করিয়া থাকে। বর্দ্ধিত মাত্রায় ভোগাভিলাষ চরিতার্থ জন্য বাহ্যবিষয় সকল এ দিক হইতে আমাদিগকে ভবিষ্যৎ বিষয়ে প্রবর্ত্তিত করিতেছে; ওদিক হইতে পারমার্থিক ভাব সকল আমাদিগকে পরম শান্তির প্রলোভন প্রদর্শন করিয়া অবিরত ভবিষ্যতের দিকে আকর্ষণ করিতেছে। অতএব এ বিষয়ে প্রামাণিক (সুতরাং সংশয়ী) বিষয়ীরাও যেমন বিশ্বাসী, পরমার্থ পরায়ণেরাও তেমনি, ভবিষ্যতের অভিসারী। উভয় পক্ষই ভবিষ্যতের স্রোতে সন্তরণ করিতে কুণ্ঠিত বা পরাঙ্মুখ নহে। তবে বিশেষের মধ্যে এই যে, সংশয়ীদিগের ভবিষ্যতের ভাব অতি সংকীর্ণ, এবং তাহাদের লক্ষ্য অতি হীন। তাহারা মহান্ ভবিষ্যতের ভাব তাহাদের ক্ষুদ্র হৃদয়ে ধারণ করিতে না পরিয়া, মর্ত্ত্য লোকেই তাহার চরম সীমা নির্দ্ধারণ ও মৃত্যুকেই তাহাদের জীবনের শেষ ঘটনা স্থির করিয়া রাখিয়াছে। তাহারা আপনাদিগকে অনন্তকাল ও অনন্ত ভাব হইতে বিচ্ছিন্ন জ্ঞান করে। তাহাদের আশা ভরসা, উৎসাহ বিশ্বাস সকলই এই অধম ধরাধামে নিবদ্ধ যেখানকার সকলই মৃত্যুর প্রতিকৃতি, যেখানে সমস্তই অস্থির, যেখানে অনিশ্চিত মৃত্যুই অবধারিত সত্য। এই মৃত্যুতে স্বীয় জীবনলীলার পরিসমাপ্তি বিবেচনা করিয়া ইহাদের মনে প্রফুল্লতা নাই, শান্তি নাই; ইহাদের জীবনের স্থায়িতর উচ্চতর উদ্দেশ্যও কিছুই নাই। কিন্তু অপর পক্ষে পরমার্থপরায়ণ সাধুদিগের বিশ্বাস্য ভবিষ্যতের ভাব অতীব মহৎ। সে ভবিষ্যতের সীমা নাই। তাহা অনন্ত উত্তর কালের সমদূরবাহী অনন্তত্বই তাহার সীমা। তাহা চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্রাদির উদয়াস্ত দ্বারা নিয়মিত হয় না, দণ্ড, ক্ষণ, বার, তিথি, শীত গ্রীষ্মাদি ঋতুচক্র দ্বারা বিভাজিত নহে, তাহাতে অব্দ গণনা নাই, যুগ কল্পাদি পরিচ্ছেদও তাহাতে নাই। সাহারা ও হিমালয় সম্বলিত বিশালা ধরণীর সহিত একটী ক্ষুদ্র বালুকা কণাকে,অথবা গ্রহপতি সূর্য্যের সহিত ক্ষুদ্রতম কিরণাণুকে বরং তুলনা করা যাইতে পারে, কিন্তু মানব মন, কল্পনার নিরতিশয় প্রসারণ দ্বারা যতটা কাল চিহ্নিত করিতে সক্ষম হয়, তাহা এই অনন্ত ভবি-

ষ্যতের সহিত আদৌ তুলনীয়ই হয় না। আবার কেবল পরিমাণ লইয়াই উহা মহান নহে, উহার প্রকার আরো মহত্তর। এই ভবিষ্যতের গর্ভেই বিশ্বাসীদিগের শাশ্বত সুখ নিহিত রহিয়াছে; সেই সুখের প্রত্যাশায় তাঁহারা শোক-তাপ-পূর্ণ এই মর্ত্ত্য লোকের অশেষ ক্লেশ-পরম্পরা প্রফুল্ল ও অপরাজিত চিত্তে বহন করিয়া থাকেন।

সত্য বলিতে কি, মানব জীবন যে কালাংশ টুকু অঙ্কিত করিয়া যায়, তাহা দুঃখেরই আলেখ্য! তাহাতে কদাচিৎ শুভ যোগ ক্রমে যদি কিছু সুখভোগ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা সহস্রগুণ অধিকতর যন্ত্রণা ও ক্লেশ নিষ্পীড়ন করিয়া নিঃসারণ করিতে হয়, কয়েক বিন্দু মধুর রসের জন্য শুকাবরণ কঠিন ইক্ষুদণ্ড পেষণ করিতে হয়। এবং এই দুঃখময় সংসারে ভয়াল প্রতিকূলতা সকলও দণ্ডে দণ্ডে মানব জীবনের গতি রোধ করিতেছে। প্রত্যুত পরকালের সহিত বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখ, মানব জীবন দুঃসহ যন্ত্রণাময় বলিয়া প্রতীত হয়; মনুষ্যকে অনন্তত্বের অধিকার হইতে বিচ্যুত কর, তাহার তুল্য অতি দীন কৃপাপাত্র জীবরাজ্যে আর দ্বিতীয় পাইবে না। বিপুল প্রভাবশালী মনোবৃত্তি সকল তাহার আছে সত্য, কিন্তু যদি বিরত শ্বাসক্রিয়ার সহিত তাহার আত্মার শেষ হয়, তাহা হইলে তাহার তৎসমূহ চরিতার্থ করিবার অবসর থাকিতেছে না। "চারি দিনের জীবন" লইয়া সে তাহার অনন্ত আশা, উন্নত অভিলাষ, অপ্রতিহত-প্রভাব চিত্তবৃত্তি সকলকে চরিতার্থ করিতে পারিবে, ইহা কি কখনই সম্ভব হইতে পারে? অতএব তাহার সেই উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তি সকলই তাহার অশেষ ক্লেশের কারণ হইয়া উঠে। তাহার প্রীতিবৃত্তি রহিয়াছে, প্রীতি করিয়া তাহার সাধ মিটিল না; ভক্তি আছে, কিন্তু তাহার উদ্রেক মাত্রেই তাহা ধূলিময় দেহের সহিত ধূলিতে মিশাইয়া গেল। তাহার জীবন্ত স্বাধীন আত্মা রহিয়াছে, কিন্তু সে সবে মাত্র যেই স্বাধীনতার সুস্বাদ বুঝিতে পারিল, আধ্যাত্মিক উন্নতির মহান ভাব সকল উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইল অমনি নিপাত! একবারেই বিনাশ! "মহতী বিনষ্টিঃ"!! তাহার তেজস্বিনী কল্পনা—স্ফূর্ত্তিমতী আশা অচিরাৎ এককালে নির্ব্বাণ হইবার জন্যই প্রজ্বলিত হয়। এতাদৃশী চিন্তা সকল অবিশ্বাসীদিগের তাপিত হৃদয়ে অল্প যন্ত্রণাদায়ক নহে।

লোকে কেন তবে, ইচ্ছা পূর্ব্বক এরূপ যন্ত্রণাদায়ক সংশয়কে মনে স্থান প্রদান করে? সুভদ পারলৌকিক বিশ্বাসকে অলীক জ্ঞান করে? আত্মার অমরত্ব ও পরকাল বিষয়ক যুক্তি সকল তাহাদের মনে প্রতীতিজনক না হউক্ দেহাবসানে আত্মা একেবারে বিনষ্ট হইবে, ইহাই কোন্ তাহারা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন? আমরা এখন যেমন বর্ত্তমান রহিয়াছি, অনন্ত উত্তর কালে সেরূপ যে থাকিব না, কেন? স্বাধীনশক্তি আত্মাকে ধ্বংশ করিতে পারে, জগতে এমন কি শক্তি কে প্রত্যক্ষ করিয়াছে? মৃত্যু নিজে শক্তি নহে, উহা একটী ঘটনা মাত্র। উহা বরং শক্তির বিরতি-ভাব। প্রত্যুত আত্মার নশ্বরত্ব বিষয়ে শুদ্ধ সংশয় ব্যতীত এতাবৎ কেহ কোন যৌক্তিক প্রমাণ প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। পক্ষান্তরে ইহাও যদি স্বীকার করা যায় যে, আত্মার অমরত্ব বিষয়েও কোন ন্যায়সঙ্গত প্রমাণ নাই, তাহা হইলে এরূপ সংশয়স্থলে কোন্ পক্ষ অবলম্বন করা সুবুদ্ধির কার্য্য হয়? এক পক্ষে নৈরাশ্য, বিষাদ ও চিত্তবৈক্লব্য, অপর পক্ষে অনন্ত আশা, অপার

আনন্দ ও সুগভীর শান্তি। এক পক্ষে আত্ম-বিনাশ-চিন্তাতে আমাদের মনোবৃত্তি সমুদায়ের সঙ্কোচ ও কাতরতা, অপর পক্ষে ক্রমোন্নত অনন্ত জীবনের আশ্বাসে হৃদয় মনের অনুপম উৎফুল্ল ভাব। ইহার কোন্ পক্ষ অবলম্বন শ্রেয়স্কর? আবার এই পারলৌকিক বিশ্বাসের, সাংসারিক প্রয়োজনীয়তাও অল্প নহে। লোক-স্থিতি-রক্ষার জন্য নৈসর্গিক ও কৃত্রিম যত প্রকার বন্ধন আছে, ধর্ম্ম বন্ধন সর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়তম ও ফলোপধায়ক; এবং ঈশ্বর ও পরকালের ভাবই ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ। যে সমাজে পরকালের শাসন অনাদৃত হয়, তাহার দুর্দ্দশার সীমা থাকে না, তাহা একেবারে উৎশৃঙ্খল হইয়া পড়ে। এতদ্ব্যতীত এই বিশ্বাসের ব্যক্তিগত উপকারিতাও যথেষ্ট। আমাদিগকে সমূহ অমঙ্গলের মধ্যে বাস করিতে হইয়াছে। আজীবন অমঙ্গলের উপর জয় লাভ করিয়া আমাদিগকে এই দুর্লভ জীবনের সার্থক্য সাধন করিতে হইবে। অমঙ্গল সর্ব্বদাই মানব সুখের প্রতিদ্বন্দ্বী। অনেক সময় অমঙ্গলের গুরুতর পরাক্রম আমাদের দুর্ব্বল আত্মাকে বিহ্বল করিয়া ফেলে। সে সময় তাহার সহায়তা করে, সংসারে এমন কিছুই নাই। পারলৌকিক আশ্বাসই কেবল সে সময় আমাদিগের এক মাত্র আশ্রয় ও অবলম্বন। অতএব এরূপ মহোপকারি বিশ্বাসের পক্ষ অবলম্বন করা কি বুদ্ধিমান লোকের কর্ত্তব্য নহে? কিন্তু পুরাবৃত্তে ইহার বিপরীত দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। সমাজের মধ্যে যাঁহারা অপেক্ষাকৃত চতুর ও যাঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তি সমধিক তেজস্বিনী, দেখা যায়, প্রায় তাঁহারাই সংশয় পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত জন্য ভিন্ন জাতীয়দিগের ইতিবৃত্ত অন্বেষণ করিতে হইবে না, আর্য্যগুরু বৃহস্পতিই ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। তাঁহার বুদ্ধিমত্তা আর্য্য সন্তানদিগের মধ্যে অতি প্রসিদ্ধ। আর্য্য ভূমিতে তিনি মূর্ত্তিমান বুদ্ধি রূপে পূজিত ও সমাদৃত হয়েন।

"ন স্বর্গোনাপবর্গোবা নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ"

তিনি এই নাস্তিক মত কেবল বিশ্বাস করিতেন না, যত্ন সহকারে তাহা প্রচারও করিয়া গিয়াছেন। অতএব জিজ্ঞাসা করি, ইতিহাসে এরূপ বিসদৃশ ঘটনা দেখিতে পাওয়া যায় কেন?

পক্ষান্তরে ইহাকে বিসদৃশ ঘটনা বলা যাইতেও পারে না। ইহা নৈসর্গিক নিয়ম বিশেষের অভিব্যক্তি মাত্র। এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মানব আত্মা সত্যের এমনি পক্ষপাতী ও স্বাধীন চিন্তার এমনি অনুরাগী যে, বিশ্বাসের অনুরোধে, স্বাধীনতা-ঔৎসুক্যে সে বিনাশমুখে আত্ম বিসর্জ্জন করিতে কাতর হয় না। বরং মরিব, সে যাহা সত্য বলিয়া জানে তাহা অপলাপ করিবে না। সত্যেতে, স্বাধীনতাতে যে কি এক অনুপম মহত্ত্ব আছে, তাহা আস্বাদন করিয়া সে অক্লেশে অনন্তত্বের প্রলোভন অবহেলা করিতে কিঞ্চিন্মাত্রও পরাঙ্মুখ নহে।

অতি পুরাকালে যখন সমাজ-গঠনের আদিম সূত্রপাত হয় ও যখন মানবগণ দলবদ্ধ হওয়ার উপকারিতা প্রথম প্রতীতি করিয়া আপনাদিগকে সামাজিক নিয়মের অধীন করিতে সম্মত হয়; যখন অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান ও প্রতিভাসম্পন্ন লোকদিগের উপদেশ বাক্যে তাহাদের হৃদয়ের অপরিস্ফুট স্বাভাবিক ধর্ম্মভাব সকল বিকাশোন্মুখ হইলে বিশ্বাস তাহাদের তরুণ হৃদয়ে একাধিপত্য করিতে থাকে; সেই প্রাচীনকালে কবি ও ধর্ম্মযাজকেরা প্রথমতঃ ঐ অজ্ঞ নবীন সমাজ মধ্যে পারলৌকিক মত প্রচার আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহাতে অনেক

কাল্পনিক মত যে পারলৌকিক সত্যের সহিত মিশ্রিত হইয়া প্রচারিত হইবে ইহা অবশ্যই প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। কারণ কবিরা কল্পনা-ব্যবসায়ী; এবং যাজ্ঞকেরা প্রথমতঃ সদিচ্ছা-প্রেরিত হইয়া সমাজের যজনভার গ্রহণ করিলেও পরে তাহারা যে অর্থলোলুপ ও স্বার্থপর হইয়া সমাজে নিরঙ্কুশ আধিপত্য স্থাপন করিয়া ছিলেন ইহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। অতএব এরূপ কল্পনা-প্রধান ও স্বার্থলুব্ধদিগের দ্বারা প্রচারিত হইলে পারলৌকিক সত্য সকলের সহিত অনেক বিকট অসত্য সকল মিশ্রিত যে হইবে ইহা এক প্রকার নিশ্চিত। বাস্তবিকও তাহাই ঘটিয়াছিল। উক্ত আদিম প্রচারকেরা অন্যদীয় বিশ্বাস স্বীয় কর্তৃত্বাধীনে প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে আপনাপন অভীষ্ট সিদ্ধির উপায় স্বরূপে ব্যবহার করিয়াছিলেন, এই কারণেই হউক অথবা তাঁহাদের নিজের ভ্রম প্রমাদ বশতই বা হউক প্রচলিত পারলৌকিক মত সকলের সহিত এক ভয়ানক ও উপহাসজনক অলীক মত সকল সাধারণ লোকদিগের বিশ্বাস অধিকার করিয়াছিল ও তৎসহকৃত সমাজ মধ্যে এত পৌরহিতিক প্রভুত্ব ও অত্যাচারের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল যে, শীঘ্রই তৎপ্রতীকারের আবশ্যকতা অনুভূত হয়। অতএব দেখা যায় যে প্রায় সর্ব্বদেশে অতি প্রাচীন কাল হইতেই মধ্যে মধ্যে এক দল স্বাধীন চিন্তাশীল ব্যক্তি সমাজমধ্যে পৌরোহিতিক প্রভুত্ব, ভ্রান্তি, নিষ্ঠুরতা ও প্রতারণার প্রতিকূলে ব্যক্তিনিষ্ঠ বিবেকের স্বত্ব উদ্ধারার্থ উদয় হইয়া আসিতেছেন। এই সমস্ত ভ্রান্তি ও ভণ্ডতাকে সমাজ হইতে উৎসারিত করাই ইহাঁদিগের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু পরকাল সম্বন্ধীয় একটু মূল সত্যের সহিত রাশি রাশি অলীক মত সকল ঘনিষ্টরূপে জড়িত থাকায় আবর্জনা মুক্তকালে এই মহদাশয় স্বাধীন চেতাগণ ঔৎসুক্যের আবেগে ত্যাজ্য গ্রাহ্যের প্রভেদ নির্ণয় করিতে না পারিয়া সর্ব্বসংহার আরম্ভ করিলেন। মাধবাচার্য্য আপন সংগ্রহ গ্রন্থে বৃহস্পতির বচন বলিয়া যে সমস্ত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা সমালোচনা করিয়া দেখিলেই এই অনুমানের সারবত্তা স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে। তিনি কতকগুলি ক্রিয়া কাণ্ডের অলীকতা প্রদর্শন করিয়া একবারে পারলৌকিক আত্মার অস্তিত্বই অস্বীকার করিয়াছেন। মাধবাচার্য্যের উদ্ধৃত শ্লোক গুলি এই—

"ন স্বর্গোনাপবর্গোবা নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ।
নৈব বর্ণাশ্রমাদীনাং ক্রিয়াশ্চ ফলদায়িকাঃ॥
অগ্নিহোত্রং ত্রয়োবেদাস্ত্রিদণ্ডং ভস্মগুণ্ঠনম্।
বুদ্ধিপৌরুষহীনানাং জীবিকা ধাতৃনির্ম্মিতা॥
পশুশ্চেন্নিহতঃ স্বর্গং জ্যোতিষ্টোমে গমিষ্যতি
স্বপিতাঃ যজমানেন তত্র কস্মান্ন হিংস্যতে॥
মৃতানামপি জন্তূনাং শ্রাদ্ধং চেত্তৃপ্তিকারণম্।
গচ্ছতামিহ জন্তূনাং ব্যর্থং পাথেয়কল্পনম্॥
স্বর্গস্থিতা যদা তৃপ্তিং গচ্ছেয়ুস্তত্র দানতঃ।
প্রাসাদস্যোপরিস্থানামত্র কস্মিন্ন দীয়তে॥
যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণংকৃত্বা ঘৃতংপিবেৎ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ॥
যদিগচ্ছেৎ পরং লোকং দেহাদেষ বিনির্গতঃ।
কস্মাদ্ভূয়ো নচায়াতি বন্ধুস্নেহসমাকুলঃ॥
ততশ্চ জীবনোপায়ো ব্রাহ্মণৈর্ব্বিহিতস্ত্বিহ।
মৃতানাং প্রেতকার্য্যাণি নত্বন্যদ্বিদ্যতে কচিৎ॥
ত্রয়ো বেদস্য কর্ত্তারো ভণ্ডধূর্ত্তনিশাচরাঃ।

স্বর্গ নাই, অপবর্গ নাই, পারলৌকিক আত্মাও নাই এবং বর্ণাশ্রমাদির কোন ফলদায়িকা ক্রিয়াও নাই। অগ্নিহোত্র, বেদত্রয়, ত্রিদণ্ড ও ভস্মগুণ্ঠন বুদ্ধিপৌরুষহীনদিগের ধাতৃনির্ম্মিত জীবিকা। যদি জ্যোতিষ্টোমে নিহত পশু স্বর্গে গমন করে, যজমান কেন তবে আপন পিতাকে ঐরূপ নিহত না করে? শ্রাদ্ধ দ্বারা যদি মৃত ব্যক্তির তৃপ্তি সাধন হইতে পারে তাহা হইলে ভ্রমণ

শীল ব্যক্তিদিগের জন্য পাথেয় কল্পনা করা ব্যর্থ। এখানে দান করিলে যদি স্বর্গস্থ ব্যক্তি দিগের তৃপ্তি বিধান হইতে পারে, তবে প্রসাদোপরিস্থিত ব্যক্তিদিগের নিমিত্তও কেন ভূতলে দান না দেওয়া হয়? যত দিন জীবিত থাক সুখে থাক, ঋণ করিয়াও ঘৃত পান কর! ভস্মীভূত দেহীর পুনরাগমন কোথায়? দেহ হইতে বিনির্গত হইয়া যদি কেহ স্বর্গে গমন করে, তবে বন্ধুস্নেহে সমাকুল হইয়া পুনরায় ফিরিয়া না আইসে কেন? ব্রাহ্মণদিগের জীবনোপায় জন্য মৃতদিগের প্রেতকার্য্যের বিধান করা হইয়াছে, অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। ভণ্ড, ধূর্ত্ত ও নিশাচর ইহারাই তিন বেদের রচয়িতা।"

উপরি উল্লিখিত শ্লোকার্থ পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীয়মান হয় যে, যে সময় ভারতবর্ষে যাগ যজ্ঞের আড়ম্বর বিশেষরূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল, আচার্য্য বৃহস্পতি সেই সময়েই আবির্ভূত হয়েন। তাঁহার আবির্ভাব কালে ভারতবর্ষে পৌরোহিতিক দৌরাত্ম্য ও প্রতারণা সমধিক প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। তিনিই হিন্দুধর্ম্ম ও বেদের বিরুদ্ধে প্রথম অস্ত্র ধারণ করিয়া ভারতবর্ষে সংশয়বাদ প্রচার করেন। এমন কি, বোধ হয় পৃথিবী মধ্যে বৃহস্পতি ঠাকুর সংশয়বাদের প্রথম গুরু। গ্রীক পণ্ডিত পিরোঁঃ (Pyrrho) খৃষ্টের ৩৪০ বৎসর পূর্ব্বে জন্ম গ্রহণ করিয়া ইউরোপ মধ্যে প্রথম সংশয়বাদ প্রচার করিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে যে, পিরোঁঃ ম্যাসিডনীয় রাজা সেকেন্দর সাহের দিগ্‌বিজয়ী সৈন্যদলের সঙ্গী ছিলেন, এবং সেই দিক্‌বিজয় উপলক্ষে তাঁহার সহিত ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণদিগের সাক্ষাৎ হয়। বোধ হয় সাংখ্য মতাবলম্বী ব্রাহ্মণদিগের সহিত আলাপ করিয়া তিনি সংশয়াত্মক মত সংগ্রহ করেন। তাহাই মূলসূত্র করিয়া তিনি স্বদেশে ফিরিয়া যাইয়া সংশয়বাদ প্রচার করিয়াছিলেন। তিনিই প্রথম উহা প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া ইউরোপে সংশয়বাদের পর্য্যায়ান্তর নাম "পিরোঁঃনিজম্" (Pyrrhonism) হইয়াছে। কিন্তু বৃহস্পতি ইহার বহু পূর্ব্বে আর্য্য-ভূমিতে আচার্য্যত্ব লাভ করিয়াছিলেন। অতএব বৃস্পতিকে সংশয়বাদিগের আদি গুরু বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে আমরা সঙ্কোচ বোধ করি না। আমরা এই স্থলে তাঁহারই মতের সমালোচনা প্রসঙ্গে পারলৌকিক বিশ্বাসের প্রতি সংশয়ের সাধারণ কারণ নির্ণয়ার্থ সচেষ্ট হইব।

ক্রমশঃ

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ও তত্ত্বকৌমুদী

১৬ বৈশাখের তত্ত্বকৌমুদী "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ও তত্ত্ববোধিনী" শীর্ষক প্রস্তাবে যে কএকটি বিষয়ের প্রতিবাদ করিয়াছেন আবশ্যক বোধে আমরা তাহার দুই একটী খণ্ডন করিতে বাধ্য হইলাম।

তত্ত্বকৌমুদী বলেন, আমরা আদি সমাজের ন্যায় বেদবেদান্তেই বদ্ধ থাকিতে চাহি না; সত্য বিদেশীয় বা স্বদেশীয় হউক সাধারণ সমাজ তাহা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত। তত্ত্বকৌমুদী আদি সমাজকে যে অনুদারতা দোষে দূষিত বলিয়া লোকের সমক্ষে প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন এইটি তাঁহার ভ্রম। আদি সমাজ ঈশ্বরের সত্য বিদেশীয় বা স্বদেশীয়ই হউক তাহা গ্রহণ করিতে অবশ্য প্রস্তুত, কিন্তু ইহার মধ্যে একটু বিশেষ বক্তব্য আছে; স্বগৃহে অন্নের অভাব হইলে পরগৃহে ভিক্ষার্থী হইয়া দণ্ডায়মান হওয়াই সঙ্গত। কিন্তু আমাদের কিসের অভাব, বেদ বেদান্ত

হিন্দু জাতির ধর্ম্মশাস্ত্র, এক সময়ে এই পবিত্র ভারতবর্ষে ধর্ম্মসংক্রান্ত সত্য সকল আবিষ্কার করিবার জন্য একটী স্বতন্ত্র শ্রেণী নির্দ্দিষ্ট হয়। এই শ্রেণী ব্রাহ্মণ। ইহাঁরা বহুকাল যাবৎ মুক্ত ভাবে চিন্তা করিয়াছেন। এই অগাধ ও অনন্ত জ্ঞান-সমুদ্র বেদ বেদান্ত তাঁহাদেরই চিন্তার ফল। তাঁহারা ঈশ্বরকে করতলন্যস্ত আমলকবৎ প্রতীতি করিতেন। এই জন্য বেদ বেদান্তে যেরূপ ঈশ্বরের স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা সকল দেশের সকল ধর্ম্মশাস্ত্র অপেক্ষা উদার। খৃষ্ট ও মহম্মদ প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের ন্যায় ঈশ্বর-প্রেরিত বলিয়া তাঁহাদের কোন নিগূঢ় স্বার্থ চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্য ছিল না, এই জন্য তাঁহাদের চিন্তা অসঙ্কুচিত, যে চিন্তা অসঙ্কুচিত তাহার ফল অবশ্যই বিশ্বজনীন, আমরা বংশ-পরম্পরায় সেই বিশ্বজনীন রত্নভাণ্ডার অধিকার করিয়া আসিতেছি, তবে আমাদের দরিদ্রতা কিসের ?

কোন ইউরোপীয় বিচক্ষণ পণ্ডিত কহিয়াছেন যে, যে দেশে বেদ বেদান্তের ন্যায় ধর্ম্মশাস্ত্র আছে সে দেশে খ্রিষ্টান ধর্ম্মের প্রচার-প্রয়াস বিড়ম্বনা মাত্র। হিন্দুজাতির ধর্ম্মশাস্ত্রে সত্যের যে কিছুমাত্র অভাব নাই তিনি বস্তুত তাহাই বুঝিতে পারিয়া ছিলেন। ফলত হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রে ধর্ম্ম ও নীতি যেমন উচ্চ ও উদার ভাবে পাওয়া যায় এরূপ আর কুত্রাপি পাওয়া যায় না। তবে কথা এই যে বাইবল প্রভৃতির ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম্মগ্রন্থে এক স্থানে হয়ত কতকগুলি সত্য সহজেই আসিয়া চক্ষে পড়ে, কিন্তু হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্র অগাধ ও অনন্ত; অনেক পরিশ্রম ও অনেক অনুসন্ধান করিতে হয় তবে তাহা হইতে রত্নোদ্ধার হইতে পারে। হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রে সত্যের অভাব আছে এই যে কলঙ্ক ইহা বাস্তব সত্যের অভাব নিবন্ধন নহে, এখনকার স্বদেশ-বিদ্বেষী যুবকদিগের শ্রমকাতরতাই তাহার মুখ্য কারণ। ভক্তিভাজন প্রধান আচার্য্য মহাশয় অনন্যকর্ম্মা হইয়া বহুদিনে হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্র হইতে বর্ত্তমান ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ উদ্ধার করিয়াছেন। বয়োধর্ম্মে এখন তাঁহার শরীর ও মন ক্রমে অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে, ব্রাহ্মেরা কোন শ্রমসাধ্য কর্ম্ম তাঁহার নিকট আর প্রত্যাশা করিতে পারেন না। এক্ষণে যদি কোন উৎসাহশীল যুবক তাঁহার ন্যায় হিন্দুশাস্ত্র হইতে অনাবিষ্কৃত সত্য সকল সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করেন তাহা হইলে ব্রাহ্মসমাজের একটি চিরস্মরণীয় উপকার সাধন করা হয় এবং সংগ্রহের আধিক্যে সত্যের অভাব নিবন্ধন হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের অপকলঙ্ক ও ক্ষালিত হইতে পারে।

তত্ত্বকৌমুদী বলেন "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে এমন অনেকগুলি লোক আছেন যাঁহারা বিবাহ রেজিষ্টরি করা ভাল বাসেন না, এ বিষয়ে সাধারণ সমাজের সভ্যগণের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা।" যখন সাধারণ ব্রাহ্মদিগের বিবাহ প্রচলিত অপৌত্তলিক হিন্দু রীতিক্রমে নির্ব্বাহ হয় না, তখন তাহা অসিদ্ধ। সম্প্রদান পাণিগ্রহণ ও সপ্তপদীগমন হিন্দু প্রণালীতে বিবাহের এই তিনটি প্রধান অঙ্গ। এই সমস্ত অঙ্গ রক্ষা করিয়া অপৌত্তলিক বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক কার্য্য নির্ব্বাহ করা হিন্দুরীতি। সাধারণ সমাজ এই হিন্দুরীতি রক্ষা করিতে অনিচ্ছুক, সুতরাং এতদ্দেশীয় নিয়মানুসারে তাঁহাদের বিবাহ অসিদ্ধ। অসিদ্ধ বিবাহের সিদ্ধি এবং সন্তান সন্ততির দায়াধিকারে অব্যাঘাত এই জন্যই আইনের সৃষ্টি। তত্ত্বকৌমুদী যাহাই বলুন না, কিন্তু কোন্ ব্রাহ্ম সাধারণ সমাজের নূতন উদ্ভাবিত পদ্ধতিক্রমে বিবাহ করিয়া এবং ঐ অসিদ্ধ বিবাহ রেজেষ্টরি না করাইয়া সন্তান

সন্ততিকে যে বিপদস্থ করিতে পারেন আমরা তাহা বুঝি না, ফলত আমরা এ কথায় আস্থা প্রদর্শন করিতে পারিলাম না। এক হয় আদি ব্রাহ্মসমাজের ন্যায় বিবাহ-কার্য্যে প্রচলিত দেশীয় প্রণালীর পৌত্তলিক অংশ ত্যাগ করিয়া চল, না হয় রেজেষ্টরি করাইয়া বিবাহ সিদ্ধ করিয়া লও; এই দুইটি পথ ভিন্ন ব্রাহ্মসমাজের আর যে কোন পথ আছে আমরা ত তাহা দেখিতেছি না। মাঝামাঝি ত্রিশঙ্কুর স্বর্গ প্রস্তুত করা বিষম বিপদেরই কারণ বলিয়া বোধ হয়।

আমরা রেজেষ্টরি বিবাহে নিরীশ্বর উপাধি দিয়াছি। প্রতিবাদ-স্থলে তত্ত্বকৌমুদী কহিয়াছেন যে ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া যে কার্য্য কৃত হয় তাহাতে নিরীশ্বর উপাধি কিরূপে সম্ভবিতে পারে। আমরাও স্বীকার করি যে মুখ্যত ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া যে কার্য্য অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে নিরীশ্বর উপাধি সম্ভবিতে পারে না। কিন্তু এস্থলে একটী জিজ্ঞাস্য উপস্থিত হইল। সাধারণ সমাজ বিবাহকালে ঈশ্বরের উপাসনা ও রেজেষ্টরি দুইটী রক্ষা করিতেছেন, কিন্তু এই দুইয়ের মধ্যে মুখ্যই বা কে গৌণই বা কে? ঈশ্বরোপাসনা না রেজেষ্টরি? যেটি না হইলে কার্য্য অসিদ্ধ হয় অবশ্য তাহাই মুখ্য এবং যাহা না হইলেও কার্য্য অসিদ্ধ হয় না অবশ্য তাহাই গৌণ, কিন্তু দেখা যাইতেছে ঈশ্বরের উপাসনা করিয়াও এক রেজেষ্টরী ব্যতীত বিবাহ সিদ্ধ হইতেছে না, দম্পতী ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া পরস্পর বিবাহ-সূত্রে বদ্ধ হইলেন বটে কিন্তু কেবল রেজেষ্টরি না হওয়াতে তাঁহাদের সন্তানসন্ততি দায়াধিকারে এককালে বঞ্চিত হইলেন। এস্থলে বিবাহে রেজেষ্টরিকেই অবশ্য মুখ্য বলিব। কিন্তু আবার দেখিতেছি ঈশ্বরকে সাক্ষী করিলাম না এবং অন্যান্য অঙ্গ রক্ষা করিয়া বিবাহ রেজেষ্টরি করাইয়া লইলাম, সে স্থলে বিবাহ অবশ্যই সিদ্ধ হইল। কারণ আমি মুখ্য অঙ্গ যে রেজেষ্টরি, যাহা না হইলে বিবাহ আদৌ সিদ্ধই হইবে না, তাহা করাইয়াছি, সুতরাং এস্থলে উপাসনা বা ঈশ্বরের সাক্ষিতা অবশ্যই গৌণ। অতএব ব্যবস্থা যখন এইরূপ দাঁড়াইল তখন আমরা কিরূপে স্বীকার করিব যে সাধারণ সমাজের বিবাহ সেশ্বর। আমাদের বিশ্বাস এই যে ঈশ্বরের হস্তের উপর অন্য হস্ত নাই, ঈশ্বরের নিয়মের উপর অন্য নিয়ম নাই, কিন্তু এখানে দেখিতেছি ঈশ্বরের হস্ত ও নিয়ম সমস্তই পরাস্ত। তত্ত্বকৌমুদী বিবাহ রেজেষ্টরি করাইবার যে কোন গূঢ় উদ্দেশ্যই দেখান না কিন্তু আমরা বলিব যে ঈশ্বরের সাক্ষিতা সত্ত্বেও যখন রেজেষ্টরির অভাবে বিবাহ অসিদ্ধ হইল, অর্থাৎ ঈশ্বরের সমক্ষে পরিণীত দম্পতীর সন্তানসন্ততি কেবল রেজেষ্টরি না হওয়াতে দায়াধিকারে বঞ্চিত হইল তখন তাঁহাদের বিবাহে রেজেষ্টরীই মুখ্য, ঈশ্বরোপাসনা গৌণ, এই জন্যই আমরা এই বিবাহে নিরীশ্বর উপাধি দিয়াছি।

আরও একটি কথা আছে। রেজেষ্টরি সাধারণ সমাজের বিবাহ-সম্পাদক একটী বিশেষ অঙ্গ। হিন্দুরীতিতে সম্প্রদান পাণিগ্রহণ প্রভৃতি না হইলে যেমন বিবাহ সিদ্ধ হয় না, এই গুলি যেমন হিন্দু-বিবাহের প্রণালীভুক্ত ও অঙ্গ রেজেষ্টরিটিও ঠিক্ সেইরূপ। রেজেষ্টরি না হইলে বিবাহ প্রণালী-পরিশুদ্ধ ও পূর্ণাঙ্গ হইল না, সুতরাং পাণিগ্রহণাদির ন্যায় ইহা সর্ব্বথা দুস্ত্যজ্য। যিনি মনে করেন রেজেষ্টরি করা না করা বিষয়ে তাঁহার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে, তিনি গভর্ণমেণ্টের রেজেষ্টরি আইনের

মর্ম্মই বুঝিতে পারেন নাই। হিন্দু-বিবাহে সম্প্রদানাদি কার্য্যের ন্যায় প্রণালী-পরিশুদ্ধ ও অঙ্গপূর্ণ করিবার জন্য বাধ্য হইয়া তাঁহাকে এই রেজেষ্টরি করিতে হইবে। এক্ষণে যখন রেজেষ্টরিটি বিবাহের মুখ্য অঙ্গ ও দুস্ত্যজ্য হইয়া উঠিল তখন রেজেষ্টরি আইনের ব্যাখ্যানুসারে সাধারণ সমাজের বিবাহ চুক্তি বিবাহ ব্যতীত আর কিছুই নয়। এই চুক্তি বিবাহের একটী বিশেষ দোষ আছে। এখন ইহাতে গৌণ কল্পে ঈশ্বরোপাসনা রহিয়াছে, ভবিষ্যতে উপাসনা না থাকিবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, কারণ এইটী মুখ্য অঙ্গ নয়, যেটি মুখ্য অঙ্গ নয় তাহার আদর চিরকাল থাকে না। সুতরাং নিরীশ্বর বিবাহের যে সমস্ত দোষ সমাজমধ্যে সেইগুলি দলবল সহিত একে একে দেখা দিতে থাকিবে। তখন হইবে এই, আজ একটী যুবা কোন রমণীর রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া তাহার পাণিগ্রহণ করিলেন, কিছু দিন পরে আর একটী অপেক্ষাকৃত রূপবতী তাঁহার অদৃষ্টে জুটিয়া গেল। যুবা ধর্ম্মনিয়মে নহে মুখ্যত রাজনিয়মে বদ্ধ, সে নিয়ম-ভঙ্গে পারলৌকিক ভয় আর কি আসিবে? তিনি স্বচ্ছন্দে ছলে বলে পূর্ব্বপরিণীত রমণীকে ত্যাগ করিলেন এবং হিন্দুসমাজ চৌদ্দপুরুষে যাহা কখন দেখে নাই সেই সকল লীলা দেখাইতে লাগিলেন। সুতরাং ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুসমাজে এই রূপ জঘন্য বিবাহ যে বহু অনর্থের মূল হইয়া উঠিবে সে বিষয়ে কিছু মাত্র সংশয় থাকিতেছে না। এক্ষণে রেজেষ্টরির পক্ষপাতীদিগকে সানুনয়ে বলি তাঁহারা এই নীচ প্রথাটি পরিত্যাগ করুন, যদি না করেন, যদি মুখ্য অঙ্গ রেজেষ্টরি দ্বারাই বিবাহ সম্পন্ন হইয়া যায় তবে ঈশ্বরকে মাঝখানে আনিয়া বধ করিবার আর প্রয়োজন কি।

তত্ত্বকৌমুদী বলিতে পারেন যে ব্রাহ্ম হইয়া কোন কালেই ব্রহ্মকে ত্যাগ করিয়া অর্থা উপাসনা না করিয়া বিবাহ করিতে পারেন না। আমরা বলি সাধারণ সমাজের বিবাহ-প্রণালী আদৌ ব্রাহ্ম-প্রণালীই নয়, কারণ এখন হইতেই দেখিতেছি উহাতে নাস্তিকেরাও যোগ দিতেছে। যে প্রণালীতে নাস্তিকেরা স্বচ্ছন্দে যোগ দিতে পারে তাহা ব্রাহ্ম-বিবাহ-প্রণালী বলিয়া কিরূপে গ্রহণ করিব।

তত্ত্বকৌমুদী হৃদয়ের বিবাহ উল্লেখ করিয়া কহিয়াছেন যে দশ জনের সমক্ষে বিবাহ না হইলে সমাজ তাহা বিবাহ বলিয়া স্বীকার করেন না। হৃদয়ের বিবাহ যে কি এতদ্দেশে তাহা প্রচলিত নাই। সুতরাং এস্থলে তাহা লইয়া একটা বিচার চলিতে পারে না, তবে তাঁহার মোট কথা এই যে দশ জন সামাজিক লোক না থাকিলে আদৌ বিবাহ সিদ্ধ হয় না, সুতরাং যখন বিবাহে দশ জনের সাক্ষিতা আবশ্যক হইল তখন রেজিষ্টরকে সাক্ষী করায় এত আপত্তি কেন। প্রত্যুত্তরে আমরা এই বলিতে পারি যে এতদ্দেশে দশ জন না থাকিলেও স্থল-বিশেষে বিবাহ সিদ্ধ হয় এবং সমাজ তাহা বিবাহ বলিয়া স্বীকার করে। এমন অনেক স্থল আছে যে বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষ উভয়-পক্ষই অসমর্থ, দশজনকে আনিয়া সম্মান রক্ষা করিতে পারেন তাঁহাদের এরূপ সমাবেশ নাই; অথবা এমনও হইতে পারে যে দলাদলি সূত্রে কেহ কাহারও সহিত ভোজ্যান্নতা রক্ষা করিতে চান না, সেস্থলে কেবল বর কন্যা ও পুরোহিত ব্যতীত সমাজের দশ জন বিবাহস্থলে উপস্থিত হন না। কিন্তু সমাজ সেরূপ বিবহকে অস্বীকারও করেন না। আর বিবেচনা করিতে গেলে সমাজিক দশ জনের সাক্ষিতা এক স্বতন্ত্র কথা এবং রেজিষ্টারের সাক্ষিতা এক স্বতন্ত্র কথা। সামাজিক দশ জনের সাক্ষিতা বিবাহ-

সিদ্ধির প্রামাণ্য কল্পে দাঁড়ায়, কিন্তু রেজিষ্টরের সাক্ষিতা মুখ্যত বিবাহের সিদ্ধি কল্পে দাঁড়ায়। প্রথমটী সিদ্ধির প্রমাণ এবং দ্বিতীয়টী সিদ্ধির নিদান। এস্থলে এই বিষয়টি আরও বিশদ করিয়া দেওয়া আবশ্যক হইল।

মনে কর রামচন্দ্র একটী জমি ক্রয় করিলেন। কিন্তু তিনি দশ জন মজলিসি সাক্ষী না রাখিয়া বিক্রয়-কয়লা লিখাইয়া তাহা রেজেষ্টরি করাইয়া লইলেন। এখন ঘটনাসূত্রে বিক্রয় অসিদ্ধির জন্য এক জন প্রতিবাদী তাঁহার নামে আদালতে নালিস করিল। এদিকে বিক্রয় কয়লায় মজলিসি সাক্ষী নাই এই কারণে জজের মনে তাহার প্রামাণ্য বিষয়ে হঠাৎ সন্দেহ উপস্থিত হইল। কিন্তু তিনি দেখিলেন যে, রামচন্দ্রের ন্যায় এক জন সম্ভ্রান্ত ও সত্যনিষ্ঠ লোক কোনরূপ প্রতারণার কাজ করিতে পারেন না, সুতরাং মজলিসি সাক্ষী অসত্বেও তিনি তাঁহাকে ডিক্রী দিলেন। এস্থলে দেখ, সাক্ষীর অসদ্ভাবেও কেবল ব্যক্তিগত চরিত্র বিক্রয় পত্রের প্রামাণ্য বিষয়ে একটি বিশিষ্ট প্রমাণ হইল। কিন্তু এক ব্যক্তি মৃত্যুকালে ঐ রামচন্দ্রের নামে আপন স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি উইল করিয়া গেল। উইলে প্রামাণ্য সাক্ষী আদবেই থাকিল না। আইনের একটী স্পষ্ট ধারা দেখিতে পাওয়া যায় যে উইলে দুইটী সাক্ষী না থাকিলে তাহা কিছুতেই আদালতের গ্রাহ্য হইবে না। এখন সেই উইল অসিদ্ধ করিবার জন্য আদালতে নালিস উপস্থিত হইল। সে স্থলে রামচন্দ্রের মান সম্ভ্রম ও সত্যনিষ্ঠতা আর প্রমাণস্থলে গৃহীত হইল না, কারণ আইন স্পষ্টত দুইটি সাক্ষী রাখিবার জন্য ধনী বা উইলকর্ত্তাকে বাধ্য করিতেছে, কাজেই উইলটি অসিদ্ধ হইয়া গেল। এক্ষণে এই বিক্রয় কয়লা ও উইলের স্থলে যেমন দেখা গেল যে একটীতে সাক্ষী না থাকিলেও বিশেষ ক্ষতি নাই, অপরটীর সাক্ষীমুখেই প্রামাণ্য ও সিদ্ধি, সেই রূপ বিবাহে সামাজিক লোকের সাক্ষিতা ও রেজিষ্টরের সাক্ষিতাকে বুঝিতে হইবে। বিবাহে সামাজিক সাক্ষী থাকিলেও হয় না থাকিলেও হয়, কিন্তু আইন রেজিষ্টরের সাক্ষিতা বিবাহসিদ্ধিকল্পে বিশেষ আবশ্যক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছে। এই জন্যই এই বিষয়ে আমাদের আপত্তি। আর যদি তর্কবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া বুঝিতে হয় তাহা হইলে এই মাত্র বলিতে পারি যে ইহা একটি বৈলাতিক অনুকরণ, সুতরাংই ইহাতে আপত্তি।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে বিবাহস্থলে দশ জন সাক্ষীস্বরূপ থাকিলে যদি ঈশ্বরের অবমাননা না হয় তবে রেজিষ্টর থাকিলে ঈশ্বরের অবমাননা কেন হইবে? আমরা এতক্ষণ প্রতিপন্ন করিলাম যে বিবাহস্থলে দশ জন সাক্ষী কেবল বিবাহসিদ্ধির প্রমাণ কিন্তু রেজিষ্টরের সাক্ষিতা বিবাহ-সিদ্ধির নিদান। দম্পতী ঈশ্বরকে গৌণ কল্পে রাখিয়া রেজিষ্টরের সাক্ষিতায় বিবাহ সিদ্ধ করিয়া লইল। এস্থলে স্বয়ং রেজিষ্টার ঈশ্বরের স্থান অধিকার করিতেছে, সুতরাং ইহাতে ঈশ্বরের অবমাননা ভিন্ন আর কি হইতে পারে।

বিবাহ একটী পবিত্র ব্যাপার, ইহার প্রভাবে মনুষ্যের ভাব পবিত্র, কার্য্য পবিত্র এবং জীবন পবিত্র থাকে, ইহা লোকের উপর আস্থা আনিবার কারণ, সংসারে যদি ধর্ম্মকার্য্য করিতে হয় তবে ইহাই তাহার মূল, স্ত্রীজাতি যে পতিদেবতা ও পতিরতা হইয়া থাকে সে কেবল ইহারই প্রভাব, জনসমাজে যে সর্ব্বাঙ্গীন একটী শৃঙ্খলা রক্ষিত হইতেছে তাহা ইহারই বলে; ইহা মনুষ্যের একটী পবিত্র স্বার্থ এবং জনসমাজের পবিত্র প্রাণ, সুতরাং এই কার্য্য পবিত্র ভাবে সম্পন্ন হওয়াই উচিত। কিন্তু যদি পবিত্রতার অনন্ত উৎস ঈশ্বরকে—সেই শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ দীপ্ত জ্যোতিকে এই কার্য্যের সাক্ষিত্বে বরণ না করিয়া এক জন কীটানুকীট কলঙ্কিত মনুষ্যকে তদ্বিষয়ে আবাহন করি তবে ইহার পবিত্রতা আর কোথায় থাকে। ব্রাহ্মের প্রত্যেক কার্য্যে ব্রহ্মকে প্রতিষ্ঠা করা কর্ত্তব্য, ব্রহ্মের অবমাননা করা ব্রাহ্মের উচিত হয় না।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৯ আষাঢ় রবিবার ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের সপ্তবিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব হইবেক।
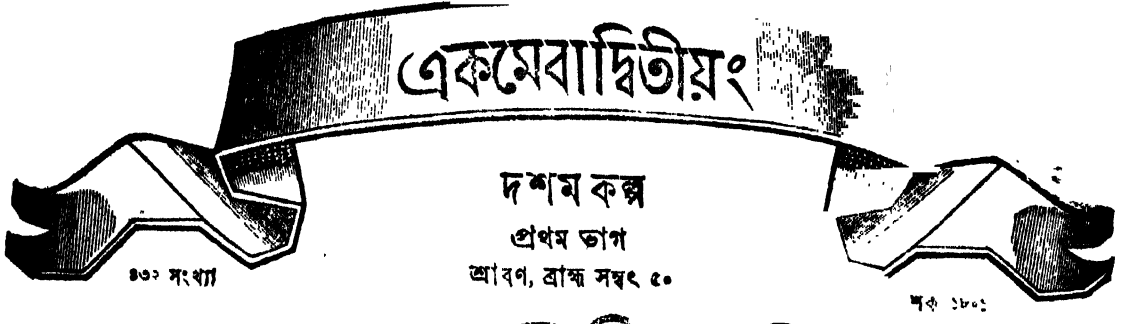
সম্বৎ ১৯৩৫। কলিগতাব্দ ৪৯৮০। ১ আষাঢ় শনিবার।

Registerd NO 52.

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজত। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

৫ আষাঢ় বুধবার ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫০।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।

আমাদের যিনি উপাস্য দেবতা তিনি সত্য স্বরূপ—অনন্ত জ্ঞান স্বরূপ। তিনি আনন্দ ও অমৃত রূপে প্রকাশ পাইতেছেন। তিনি যেমন দূর হইতে দূরে তেমনি আবার নিকট হইতে নিকটে, তিনি আমাদের অন্তরতম ধন। সেই সত্য স্বরূপ অনন্ত জ্ঞান স্বরূপ ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ের আলোক হইয়া অমৃত রূপে তথায় বিরাজ করিতেছেন। ঈশ্বরের সাধক জ্ঞানযোগে ও ধ্যানযোগে যতবার তাঁহাকে আত্মস্থ করিয়া দেখেন তত তাঁহার তাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছা বলবতী হয়। জ্ঞান-চক্ষু—বিশ্বাস-চক্ষু—ভক্তি-চক্ষু তিনি তাঁহা হইতে ফিরাইয়া লইতে অত্যন্ত ব্যথিত হন। শিশু যেমন তাহার মাতাকে সর্ব্বক্ষণ চক্ষে চক্ষে রাখিতে ভাল বাসে, সাধকও তেমনি তাঁহার পরম মাতাকে সর্ব্বদা জ্ঞানচক্ষে ও ভক্তিচক্ষে দর্শন করিতে ভাল বাসেন।

পুনঃ পুনঃ সেই সত্যস্বরূপকে হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়া সত্যের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মে। সত্য কথা কহা—সত্য মনন করা—ও সত্য ব্যবহার করা তাঁহার জীবনের ব্রত হয়। কারণ তিনি জানেন যে সত্য দ্বারাই কেবল সেই পরম সত্যকে লাভ করা যায়। "সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষআত্মা সম্যক্ জ্ঞানেন।" এবং এই সত্য হইতে বিচ্যুত হইলে—রেখা মাত্র বিচ্যুত হইলে ঈশ্বর হইতে বিচ্যুত হইতে হয়। তাঁহা হইতে বিচ্যুতিকে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক বিপদ মনে করেন। কারণ ঈশ্বরই তাঁহার পরম গতি ও পরম সম্পদ। "এষাস্য পরমা গতিরেষাস্য পরমা সম্পদ্।" তিনি তাঁহার বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারেন না।

সত্য ঈশ্বরের সহিত আমাদের সম্মিলন করিয়া দেয়। এক সত্যের বলেই ঈশ্বরের প্রসন্ন মুখ দেখিতে পাই। ঈশ্বরের প্রসন্ন-মুখ দর্শন করাই সাধকের প্রধান উদ্দেশ্য। এই নিমিত্তই তিনি আপনার হৃদ্গত বিশ্বাসকে গোপন করিতে পারেন না। এই নিমিত্তই তিনি লোক-ভয়ে ভীত হন না। লোকের চক্ষের সহিত সেই বিশ্বতশ্চক্ষুর

তুলনা কি? লোকে কি অন্তর দেখিতে পায়? যিনি অন্তর দেখিতে পান তাঁহার চক্ষের সমক্ষে ঈশ্বর-পরায়ণ ব্যক্তি জীবন ধারণ করেন। তাঁহারি প্রসাদের জন্য—তাঁহারি প্রসন্ন মুখ দেখিবার জন্য তিনি সকল প্রকার নির্যাতন সহ্য করিতে প্রস্তুত। যে মত প্রচার করিলে, যে কথা—যে হৃদ্গত বিশ্বাস প্রকাশ করিলে আত্মীয় স্বজন প্রতিবেশী ও দেশের লোক শত্রু হইতে পারে, সে মত সে কথা সে হৃদ্গত বিশ্বাস তিনি সাধারণ-সমক্ষে প্রকাশ করিতে কিছুমাত্র ভীত হয়েন না। 'আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন'।

মনুষ্য যদি তাঁহাকে শুভ দৃষ্টিতে না দেখে তাহাতে তাঁহার ক্ষতি কি? ঈশ্বর ত তাঁহাকে স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখিবেন। মনুষ্য যদিও তাঁহাকে হৃদয় দান না করে তবে যাঁর আলিঙ্গনে হৃদয় চির দিনের নিমিত্ত শীতল হয়; তিনি ত আলিঙ্গন দিয়া সকল দুঃখ নিবারণ করিবেন। ঈশ্বরই যাঁর প্রাণ—ঈশ্বরের প্রসন্ন মুখ দর্শন করাই যাঁর সম্বল—ঈশ্বরের প্রীতি চাহিয়া কার্য্য করা যাঁর অভ্যাস, পরদ্বেষী শঠ অসৎ মিথ্যাবাদী নিন্দাপ্রিয় লোককে ভয় করিবার তাঁর অতি অল্পই আছে। মনুষ্য—নিষ্ঠুর মনুষ্য দুর্ব্বুদ্ধির বশীভূত হইয়া সরল সাধু ব্যক্তির অশ্রু আকর্ষণ করে। কিন্তু সে জানে না যে দয়াময় ঈশ্বর সেই অশ্রু মোচনে সান্ত্বনা করেন। অজ্ঞান মনুষ্য মোহ বশতঃ তেজস্বী সত্যপরায়ণ লোকের শরীরকে খণ্ড খণ্ড করিয়া মনে করে যে সে তাহার সর্ব্বনাশ করিয়াছে। কিন্তু সে জানে না যে তাঁহার অমর আত্মা মৃত্যুর পর ঈশ্বরের অমৃতময় ক্রোড়ে পরম শান্তি লাভ করে। ঈশ্বরে যাঁর নির্ভর তিনি কি ইহ জীবনের দুই দিনের সুখ দুঃখের উপর নির্ভর করেন। চির দিন রবে যে ধন, সেই ধনকে হৃদয়ে আবদ্ধ রাখিতেই তাঁর প্রাণগত যত্ন—সেই ধন রক্ষার জন্য তিনি সহজে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করেন। আহা! ব্রহ্মানুরাগ কি অনুপম পদার্থ! কি ভাগ্যবান সেই ব্যক্তি যাঁর হৃদয়ে এইরূপ অনুরাগের আলোক দিন রাত্রি জ্বলিতেছে—সত্য—এই আলোকে থাকিতে ভাল বাসে, সত্য ব্রহ্মানুরাগীর সহচর অনুচর। সত্য অনুরাগীর জীবনকে অলঙ্কৃত করে। সেই অলঙ্কৃত জীবনের শোভা দেবতারাও দেখিতে স্পৃহান্বিত হন।

আমরা যেন অতি সাবধানে এই ব্রহ্মানুরাগকে পোষণ করি। তাহা হইলে সত্য অতি সহজেই আমাদের করতলন্যস্ত হইবে। সত্য ইহ লোকে বন্ধু—সত্য ব্রহ্মনিকেতনের পথ-প্রদর্শক; কে এ সত্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে!! হে সত্য শিব সুন্দর পরমেশ্বর! আমরা তোমার মত সুন্দর ও প্রিয় বস্তু আর কোথাও দেখিতে পাই না। তুমি পুত্র হইতে প্রিয়—তুমি বিত্ত হইতে প্রিয়—তুমি আর আর সকল বস্তু হইতে প্রিয়। তুমি স্নেহের আকর—প্রেমের আকর—তুমি হৃদয়ের প্রিয়ধন—তুমি সন্তাপ-হরণ। আমরা তোমায় ছাড়িয়া আর কোথায় যাইব। আমাদের এই মলিন হৃদয়কে তোমার পদতলে প্রত্যর্পণ করিতেছি তুমি ইহাকে গ্রহণ কর। তুমি ইহাকে তোমার সহবাসের উপযুক্ত কর। যাহাতে তোমার প্রতি অনুরাগ দিন দিন বৃদ্ধি হয়—যাহাতে তোমার সত্য হৃদয়ে ধারণ করিতে ও নির্ভয়ে প্রচার করিতে পারি তুমি কৃপা করিয়া তাহার উপায় বিধান কর

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

ভবানীপুর সপ্তবিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

৯ আষাঢ় রবিবার ব্রাহ্মসম্বৎ ৫০।

ঈশ্বরের সঙ্গে মানব আত্মার এমনই নিকটতর নিগূঢ়তর সম্বন্ধ যে, মনুষ্য বহির্জ্জগতে তাঁহার জ্ঞানশক্তি মহিমা অহর্নিশি সন্দর্শন করিয়াও পরিতৃপ্ত হয় না। চিরদিন চিরকালই তাঁহাকে নিকটে প্রত্যক্ষ সন্দর্শন করিবার জন্য যত্ন চেষ্টায় নিযুক্ত রহিয়াছে। তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভের জন্য কালে কালে কত উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। কত কল্পনার পথ আবিষ্কৃত হইয়াছে। মানবকুল কত নিদারুণ কষ্ট ভোগে কত কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। পরে তপঃসিদ্ধ আর্য্যঋষিগণ সর্ব্ব প্রথমেই গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া ঈশ্বরকে আত্মাতে দেখিয়াই ভূমণ্ডল মধ্যে এই সত্যটি আবিষ্কৃত করেন।

"বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপং সূক্ষ্মাচ্চ তৎ সূক্ষ্মতরং বিভাতি। দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ পশ্যৎস্বিহৈব নিহিতং গুহায়াম্॥"

তিনি মহৎ, প্রকাশবান্ ও অচিন্ত্যস্বরূপ এবং সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম। তিনি দূর হইতেও বহুদূরে আছেন এবং এই নিকটেও তিনি বর্ত্তমান। তিনি এখানেই যাবৎ বুদ্ধিজীবী জীবদিগের আত্মাতে স্থিতি করিতেছেন। তিনি যেমন চন্দ্র সূর্য্য, গ্রহ তারা-পূর্ণ সৌর জগতে থাকিয়া তাহাদিগকে নিয়মিত করিতেছেন, তেমনই তিনি আমারদের আত্মার অভ্যন্তরে থাকিয়া আত্মাতে ধর্ম্মবল ও শুভ বুদ্ধি প্রেরণ করিতেছেন। সমগ্র বিশ্বসংসার যেমন তাঁহার বল বুদ্ধি, জ্ঞান-শক্তি মহিমা প্রকাশ করিতেছে; আমারদের আত্মাও তেমনই তাঁহার সত্য সুন্দর মঙ্গলভাব প্রদর্শন করিতেছে। ব্রহ্মসাক্ষাৎকার পক্ষে আত্মাই নির্ম্মল ও স্বচ্ছ দর্পণ। আত্মার তুলনায় শরীরও আমারদের দূর। সেই আত্মার মধ্যে অজর অমর মহান্ আত্মা পরমেশ্বর বিরাজ করিতেছেন। সেই আত্মাতে দেখিতে গেলেই তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা নিকটতর করিয়া দেখা যায়।

যিনি আমারদের শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, বাক্যের বাক্য, প্রাণের প্রাণ, যাঁর সমান প্রিয় বস্তু আমারদের আর দ্বিতীয় নাই, তাঁহাকে দূরস্থ করিয়া জানিলে কি জ্ঞান তৃপ্ত হয়, না প্রেম তৃপ্ত হয়, না প্রাণই শীতল হইয়া থাকে? প্রিয় বস্তুকে—প্রাণাপেক্ষা প্রিয় বস্তুকে নয়নে নয়নে রক্ষা করা মনুষ্য মাত্রেরই প্রকৃতিগত ইচ্ছা। যিনি

"প্রেয়ঃপুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়োহন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতম।"

যিনি পুত্র হইতে, বিত্ত হইতে, আর আর সকল প্রিয়বস্তু হইতে প্রিয়তম; সেই অন্তরতম প্রিয়তম ঈশ্বরকে অন্তরে—আত্মার মধ্যে দেখাই প্রার্থনীয়। তাঁহাকে আত্মস্থ করিয়া দেখিতে না পাইলে আমরা এখানে কোনরূপেই নির্ভয় ও নিঃশঙ্ক হইতে পারি না।

"উদরমন্তরং কুরুতে অথ তস্য ভয়ং ভবতি।"

'যিনি আপনা হইতে তাঁহাকে অল্পও দূরে দেখেন, তাঁহারও ভয় হয়।'

আমার ঈশ্বর স্বর্গে, আমার রক্ষক অন্তরীক্ষে আমার পালক পর্ব্বত-শিখরে, আমার বন্ধু নদ নদী সাগর পারে অবস্থান করিতেছেন জানিয়া লোকে যেমন কখনও ভয় বিপদে অটল থাকিতে পারে না, তেমনই ঈশ্বরকে দূর দূরস্থিত করিয়া জানিলে সাধক কখনও নির্ভয় ও নিঃশঙ্ক হইতে সমর্থ হন না। আমার ঈশ্বর আমার আত্মাতে, আমার সখা আমার সঙ্গে সঙ্গেই, আমার গুরু আমার হৃদয়ে, আমার সাধনের ধন আমার

অন্তরেই বর্ত্তমান রহিয়াছেন ইহা যখন স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতে পারি তখনই শোক তাপ বিঘ্ন বিপত্তি পাপ মোহ হইতে বিমুক্ত হইয়া নির্ভয় হই। তিনি আমাতে, আমি তাঁহাতে সংস্থিত রহিয়াছি, ইহা যখন জাজ্বল্যতর রূপে সাধক প্রতীতি করিতে পারেন, তখন গুরুবিপত্তিও তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না।

'যস্মিংস্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে।'

আত্মাই ঈশ্বরের নিভৃত-নিকেতন। এই শরীরই তাঁহার মন্দির, এই হৃদয়ই তাঁহার আসন। শরীর-মন্দিরে হৃদয়াসনে ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া তাঁহার সঙ্গে অধ্যাত্ম-যোগে আবদ্ধ হইয়া সংসারের দুর্ম শোক হইতে মুক্ত হওয়াই সাধকের প্রধান কার্য্য। বাহ্য জগৎ তাঁহার জ্ঞান-প্রেম-লাভের উপায়, সাধুসঙ্গ ও সদুপদেশাদি ব্রহ্মজ্ঞান-উদ্দীপনের উপলক্ষ মাত্র, কিন্তু ব্রহ্মই আত্মার লক্ষ্য। সেই পরম লক্ষ্য ভেদ করিয়া—তাঁহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া—তাঁহার দ্বারা সম্পূর্ণ রূপে আবৃত হওয়াই শিক্ষা সাধন ও তপস্যাদির চরম ফল।

'তদেতৎ সত্যং তদমৃতং তৎ বেদ্ধব্যং সৌম্য বিদ্ধি'

তিনিই সত্য, তিনিই অমৃত, তিনি আত্মার দ্বারা বেধনীয়। অতএব হে প্রিয় শিষ্য! তোমার আত্মার দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ কর, ব্রহ্মবাদী আপ্তকাম ঋষিদিগের এই উপদেশ। একাগ্রচিত্ত দ্বারা সেই পরমাত্মাকে বিদ্ধ কর এবং জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিয়া তাঁহাকে আত্মাতে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়া পরমানন্দ উপভোগ কর। ঈশ্বরের কেবল জ্ঞানশক্তি মহিমার পরিচয় পাইলে—কেবল তাঁহার অস্তিত্ব মাত্রে বিশ্বাস করিলেই ধর্ম্ম-শিক্ষার শেষ হয় না। তাঁহাকে আত্মস্থ করিয়া জানিতে পারিলেই জীবন সার্থক হয়।

ঈশ্বরের সৃষ্টির প্রণালীই এই যে, যে বস্তু যাহার যত প্রয়োজন, সেই পদার্থকে তিনি তাহার তত নিকটেই স্থাপিত করিয়া রাখিয়াছেন। অন্ন জল বিনা মনুষ্যের প্রাণ রক্ষা হয় না, করুণাপূর্ণ পুরুষ সেই জন্যই তাহার চতুর্দ্দিকে তাহা অজস্ররূপে স্থাপন করিয়াছেন। ঔষধ বিনা রোগমুক্ত হইবার উপায়ান্তর নাই, সেই নিমিত্ত যে দেশে যে রোগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব, সেই দেশে তিনি, সেই ঔষধই প্রচুর পরিমাণে প্রেরণ করিয়াছেন। আলোক বায়ু ব্যতীত উদ্ভিদ রাজ্য ও জীব জন্তু জগৎ মুহূর্ত্তের জন্যও জীবিত থাকিতে পারে না, সেই কারণেই মঙ্গলস্বরূপ পরমেশ্বর তাহা সকলেরই পক্ষে অনায়াস-লভ্য করিয়া দিয়াছেন। সেই ভূমা ঈশ্বর ব্যতিরেকে আত্মার প্রাণরক্ষা হয় না, আত্মার ক্ষুৎ-পিপাসা নিবারণ হয় না—তাহার বর্দ্ধন পোষণ, সুখোন্নতি সংসাধন এবং গতি মুক্তি লাভের কোন সম্ভাবনাই থাকে না, সেই জন্যই সেই ভূমা পরমেশ্বর আত্মার সযুজা সখা হইয়া আত্মার মধ্যেই অবস্থান করিতেছেন। তিনি জীবাত্মার দ্বারা উপকৃত বা পোষিত হইবেন এ প্রত্যাশাতে যে আত্মার মধ্যে বিদ্যমান্ রহিয়াছেন তাহা নয়। তিনি স্রষ্টা পাতা হইয়া স্বীয় সৃষ্ট ও আশ্রিত আত্মাকে পালন ও পোষণ করিবার নিমিত্ত, নেতা ও নিয়ন্তা হইয়া আত্মাকে শোধিত ও শিক্ষিত করিয়া কল্যাণ-পথ প্রদর্শনের জন্য, রক্ষক হইয়া তাহাকে পাপ তাপ শোক মোহ হইতে উদ্ধার করিবার উদ্দেশে, মুক্তি-দাতা হইয়া মুক্তি-ইচ্ছু আত্মার হৃদয়-গ্রন্থি ও সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিবিধান করিবার জন্যই তিনি আত্মার মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছেন। জননী যে জন্য স্নেহের ধন শিশু-সন্তানকে আপনার ক্রোড়ে যত্নের সহিত রক্ষা করেন, সেই পরম মাতা পরম পিতা পরমেশ্বর তাহা অপেক্ষা অনন্ত গুণ

হিত-কল্যাণ সাধনের নিমিত্ত——ঐহিক-পারত্রিক মঙ্গল-কামনায় সেই অনুপম স্নেহের পুত্তলিকা জীবাত্মাকে দিন-যামিনী আপনার সুদৃঢ় প্রেমালিঙ্গনের মধ্যে রক্ষা করিতেছেন। পদচালনা শিক্ষার সময় মাতা যেমন সন্তানকে ছাড়িয়া দেন, এবং ভয়-প্রাপ্ত হইয়া শিশু রোদন করিলে যেমন দূর হইতে বলেন যে "ভয় নাই, এই যে আমি এখানে রহিয়াছি" ঈশ্বর তাঁহার সন্তান স্বাধীন-জীবাত্মাকে তেমনি এই সংসারক্ষেত্রে শিক্ষার জন্য ছাড়িয়া দিয়া তিনি তাহার সঙ্গে সঙ্গেই থাকেন, যখনই সে সংসারের বিঘ্ন বিপত্তি সন্দর্শন করিয়া ভীত হয়, ঈশ্বর তখনই আত্মার অভ্যন্তর হইতে সস্নেহে বলিতে থাকেন "বৎস! ভয় নাই, "অহং ব্রহ্মাস্মীতি" এই যে আমি তোমার পিতা-মাতা অভয়দাতা ব্রহ্ম তোমারই সঙ্গে, তোমারই আত্মাতে রহিয়াছি।

এখন পরম মাতার ক্রোড়-শায়ী হইয়া যদি আত্মা, সেই জননীকে দেখিতে না পায়, তাঁর জ্ঞান-প্রেম অমৃত রসে পরিপুষ্ট হইয়াও যদি সে তাঁহার অকপট স্নেহ উপলব্ধি করিতে না পারে, যদি আত্মা তাঁহার নিকটে থাকিয়াও ভয়-তাপ দুঃখ বিপদে সেই অভয় মঙ্গল স্বরূপকে সন্দর্শন করত অটল থাকিতে সমর্থ না হয়, তবে আর তাহার নির্ভরের স্থান, উদ্ধারের উপায়, শান্তি ও আরামস্থল কোথায়? মাতাকে নিকটে দেখিতে না পাইলে শিশু যেমন ভীত হয়, রোদন করে, ঈশ্বরকে তেমনই আত্মাতে দেখিতে না পাইলেই আত্মা, শোকতাপে মুহ্যমান হয়। যখন সে স্বীয় আত্মাতে সেই "সর্ব্বসেব্য ঈশ্বরকে ও তাঁহার মহিমাকে দেখিতে পায়, তখন তাহার আর শোক থাকে না।"

"সমানে বৃক্ষে পুরুষোনিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ। জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ

কেবল ঈশ্বরকে বিশ্বের স্রষ্টা পাতা বিধাতা বলিয়া জানিলে কি হইবে, তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া—তাঁহাকে প্রত্যক্ষ সন্দর্শন করা চাই। সমুদ্রের অমুক স্থানে মুক্তারাশি নিমগ্ন রহিয়াছে, অমুক আকরে রজত কাঞ্চন ও উজ্জ্বল হীরকখণ্ড সকল নিহিত রহিয়াছে, ইহা বিশদ রূপে কেবল জানিতে পারিলে আমার কি দারিদ্র দুঃখ বিদূরিত হয়? যখন সেই সকল বস্তু আমার হস্তগত হয়,—আমি প্রাপ্ত হই, তখনই আমার দুঃখ দূর হয়, আমি ধনবান্ হই। তেমনি কেবল ঈশ্বরকে দূর-দূরস্থিত করিয়া জানিলে আত্মার গভীর অভাব অন্তরিত হয় না; যখন সেই অমৃত-খনিকে আত্মার-অভ্যন্তরে দেখিতে পাই—যখন তাঁহাকে "করতলন্যস্ত আমলকবৎ" প্রাপ্ত হই, তখন সকল অভাব দূর হয়, সকল দুঃখ চলিয়া যায়। তখন তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মবান্ হই। তখন জ্ঞান তৃপ্ত হয়, প্রেম চরিতার্থ হয়, আশা পূর্ণ হয়। তখনই প্রত্যক্ষ জানিতে পারি যে, "তাঁহাকে যে ধীরেরা স্বীয় আত্মাতে সাক্ষাৎ দৃষ্টি করেন, তাঁহারদেরই নিত্য শান্তি হয়, অপর ব্যক্তিদিগের তাহা কদাপি হয় না।

"তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্।"

ঈশ্বর আত্মার এমনই প্রিয়-ধন, যে তাঁহাকে দেখিতে পাইলে—তাঁহাকে সম্যক্ রূপে লাভ করিতে সমর্থ হইলে, ধন-সম্পদ প্রভৃতি অন্য-লাভ, লাভের মধ্যেই গণ্য হয় না। তিনি এমন দুর্লভ রত্ন না হইলে সৃষ্টি কাল হইতে মনুষ্য-জাতি কেন তাঁহার জন্য এত লালায়িত হইবে? সেই অমৃত ধনের নিমিত্ত কেন সাধু সজ্জন-সকল অকাতরে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে অগ্রসর হইবে?

শূন্যের জন্য কেহ কি কখন ত্যাগস্বীকার করিতে পারে? অকারণ কেহ কি কখন ইন্দ্রিয়-সুখ বিষয়-সুখে জলাঞ্জলি দিতে সমর্থ হয়? কেবল কল্পনা প্রভাবে উত্তেজিত হইয়া মনুষ্য কি কখন কঠোর তপস্যায়—নিষ্কাম ও নিঃস্বার্থ ধর্ম্ম সাধনে প্রবৃত্ত হইতে পারে? ব্রহ্মানন্দের আস্বাদ প্রাপ্ত না হইলে কি কেহ কখন এরূপ বাক্য উচ্চারণ করিতে পারে যে

"যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।"

অনেকেরই নিকটে এরূপ বাক্য শ্রুত হওয়া যায় যে অরূপী অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরকে কেমন করিয়া প্রত্যক্ষ কর, তাহা যদি এখনই বুঝাইয়া দিতে পার, তাহা হইলে তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হই। কিন্তু যদি কোন নিরক্ষর ব্যক্তি কোন জ্যোতির্বেত্তা, ভূতত্ত্ববেত্তা বা রসায়নবেত্তা কিম্বা কোন গণিত শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতকে সৌর-জগৎ, বা ভূগর্ভ অথবা রসায়ন ও গণিত-শাস্ত্র সম্বন্ধীয় কোন শিক্ষা ও পরীক্ষা-সাপেক্ষ গূঢ় তত্ত্ব মুহূর্ত্তের মধ্যে প্রত্যক্ষ জানিবার জন্য প্রশ্ন করেন, তাহা হইলে, তাঁহারা তাঁহাকে কি বলিবেন? যে অধ্যয়ন কর, সোপান-পরম্পরায় শিক্ষিত হও, তাহা হইলে তুমি তোমার জিজ্ঞাসিত বিষয় বিশদ রূপে বুঝিতে পারিবে। নতুবা বহু কালের বহু শিক্ষার ফল যদি এক নিমেষের মধ্যে বুঝাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে তো আর পৃথিবীতে কেহ অবিদ্বান্ বা মূর্খ থাকিত না। তেমনি ব্রতহীন স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তিকে যদি সকল বিদ্যার সার, সকল শাস্ত্রের নিগূঢ়-তত্ত্ব, সকল ধর্ম্মের প্রধান লক্ষ্য, সকল শিক্ষা সাধনের শেষ পুরস্কার যে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার তাহা যদি একটি বাক্যে, এক মুহূর্ত্তে বুঝাইয়া দেওয়া যাইত, তাহা হইলে তো ধর্ম্মের গুরুত্ব এবং ঈশ্বরের মহত্ত্ব থাকিত না। শিক্ষা-সাধন ও তপস্যার কোন প্রয়োজনই হইত না। পৃথিবীতে বেদ বেদান্ত প্রভৃতি ধর্ম্ম শাস্ত্রের নাম-মাত্রও শ্রুত হওয়া যাইত না। নিতান্ত বাতুল একান্ত মদগর্ব্বিত না হইলে আর কাহারও মুখ হইতে এপ্রকার প্রশ্ন নির্গত হয় না। তাহার এই প্রশ্নের উত্তর কি?

"তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরং"

'একাগ্র-চিত্ত হইয়া ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর, ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন।" শান্ত দান্ত উপরত তিতিক্ষু সমাহিত হইয়া ব্রহ্মদর্শনে যত্নশীল হও, দর্শন শ্রবণ, মনন-নিদিধ্যাসন দ্বারা ঈশ্বরের সত্ত্বা স্বরূপে নিঃসংশয় হইয়া তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভের উপযুক্ত হও, সর্ব্বত্র তাঁহাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেখিবে।

"ব্রহ্মশ্রোতা ব্রহ্মমন্তা ব্রহ্মান্বেষণমানসঃ।
যতাত্মা দৃঢ়বুদ্ধিঃস্যাৎ সাক্ষাদ্ব্রহ্মেতি ভাবয়ন্।"

ব্রহ্মশ্রোতা ব্রহ্মমন্তা ব্রহ্মান্বেষণ-তৎপর দৃঢ়বুদ্ধি সংযতআত্মা সাধকই ব্রহ্মকে অন্তরে বাহিরে, দূরে নিকটে সর্ব্বত্রই প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করেন।

ঈশ্বর, জড় কি জীব বা অপর কোন ভৌতিক পদার্থ সদৃশ নহেন, যে, অঙ্গুলি নির্দ্দেশ দ্বারা কেহ তাঁহাকে দেখাইয়া দিবে এবং চর্ম্ম-চক্ষুতে লোকে তাঁহাকে সন্দর্শন করিবে।

"তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়ব মেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি।"

সেই অপ্রতিম পূর্ণ পুরুষ চক্ষুর গম্য নহেন, বাক্যের গম্য নহেন এবং মনেরও গম্য নহেন,

"অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি।"

তিনি বিদিত কি অবিদিত তাবৎ বস্তু হইতে ভিন্ন। জ্ঞানশুদ্ধি দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব

ব্যক্তি ধ্যানযুক্ত হইয়া সেই নিরবয়ব ব্রহ্মকে দর্শন করেন।

"জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্বস্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ

যদি তাঁহাকে দর্শন করিবার ইচ্ছা থাকে, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও চরিত্র শোধন করিয়া শুদ্ধ-সত্ত্ব পবিত্র হও। জ্ঞানকে উজ্জ্বল কর, প্রীতিকে প্রশস্ত কর, মঙ্গল ভাবকে উদীপ্ত কর। অপ্রমত্ত ভাবে চাতকের ন্যায় কায়-মনোবাক্যে প্রার্থনা কর "আবিরাবীর্ম্মএধি" "হে স্বপ্রকাশ! আমার নিকট প্রকাশিত হও।"

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যোন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষবৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনূং স্বাম।'

অনেক উত্তম বচন দ্বারা, বা মেধা দ্বারা অথবা বহু শ্রবণ দ্বারা এই পরমাত্মাকে লাভ করা যায় না; যে সাধক তাঁহাকে প্রার্থনা করে, সেই তাঁহাকে লাভ করে। পরমাত্মা এরূপ সাধকের সন্নিধানে আত্ম-স্বরূপ প্রকাশ করেন। এই আশাপূর্ণ বেদ-বাক্যের প্রতি নির্ভর করিয়া আইস আমরা সকলে তাঁহার প্রার্থী হই। আমরাও প্রার্থনা করি, "আবী-রাবীর্ম্মএধি।" হে স্বপ্রকাশ! আমারদের নিকট প্রকাশিত হও।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

পরকাল।

(৪৩১ সংখ্যক পত্রিকার ৫৬ পৃষ্ঠার পর।)

ধর্ম্মভাব সকল অন্যদীয় শিক্ষা-সাপেক্ষ নহে। প্রথমতঃ উহারা স্বতঃই আমাদের মনে উদয় হয়। পরম কারুণিক পরমেশ্বর যদি অগ্র হইতে ধর্ম্মের বীজ আমাদের হৃদয়ে রোপণ করিয়া না রাখিতেন, তাহা হইলে সহস্র শিক্ষাতেও সুদীর্ঘ কালের উপদেশ দ্বারাও এই পবিত্র ভাব আমাদের মনোমধ্যে লব্ধপ্রবেশ হইতে পারিত না। শোভানুভাবকতা শক্তি না থাকিলে আমরা যেমন পরকীয় উপদেশ দ্বারা সৌন্দর্য্যের ভাব কখনই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতাম না, ধর্ম্ম বিষয়েও সেই রূপ। উহার বীজ স্বয়ং ঈশ্বরের হস্ত দ্বারা আমাদের হৃদয়-ক্ষেত্রে রোপিত হইয়াছে। ধর্ম্মোপদেষ্টারা আমাদের মনের সেই স্বাভাবিক ধর্ম্মবীজকে অঙ্কুরিত, পোষিত, উন্নত করিতে পারেন বটে, তাঁহারা তাহাতে নূতন কিছু মূলভাব সংযোগ করিয়া দিতে পারেন না। বস্তুতঃ আদিম ধর্ম্মভাব সকলকে প্রদীপিত ও সুনিয়মিত রাখাই উপদেষ্টাদিগের প্রকৃতি-নির্দ্দিষ্ট কার্য্য। তাঁহারা যত দিন এই নি-র্দ্দেশ অতিক্রম না করেন, অনুশিষ্টদিগের স্বাভাবিক ধর্ম্মভাবের সহিত স্বকপোল-কল্পিত কোন কৃত্রিম বিজাতীয় ভাব সন্নিবেশিত না করেন, তত দিনই তাঁহাদের দ্বারা জন-সমাজের বিশেষ উপকার সাধিত হইবার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, আমাদের অসৌভাগ্যক্রমে আ-দিম আচার্য্যগণ স্বভাবজ ধর্ম্মভাবের উপর কল্পনা-প্রসূত এত অলীক ভাব সকল সম-বেত করিতে লাগিলেন যে, ঐ কোমল মূলভাব একেবারে চাপা পড়িয়া গেল; অনুশিষ্টদিগের স্বাধীন বিবেক, কল্পিত কঠোর ধর্ম্ম-শাসনে নির্জ্জিত হইয়া তাহা-দিগকে পশুতুল্য করিয়া ফেলিল; ধর্ম্মের নামে কত নৃশংস, কত ঘৃণিত দুষ্কার্য্য সকল অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল; কত নরাধম পাপ-মতি ধর্ম্ম-পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া, সমাজের ধর্ম্ম-রক্ষা-ব্যপদেশে, অত্যুচ্চ সামাজিক আসন অধিকার করিল, এবং স্বর্গীয় ধর্ম্মকে তাহাদের অতি জঘন্য নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল চরিতার্থের উপায় রূপে পরিণত করিয়া

তুলিল। পবিত্র ধর্ম্মের আকার এমনি বিকৃত হইয়া উঠিল যে, সহৃদয় ব্যক্তিদের আর তৎ প্রতি আস্থা রহিল না। প্রত্যুত ধর্ম্ম একটী সাংসারিক জঞ্জাল বলিয়া পরিগণিত হইল। কিন্তু ইহা বৈজ্ঞানিক সত্য যে, জগতে কোন অনিষ্টই অপ্রতিকৃত থাকে না। সর্ব্ব প্রকার অনিষ্টের প্রতিকার পূর্ব্ব হইতে বিধান করা হইয়া আছে। সুতরাং মহান্ অনর্থকর এই প্রচলিত ধর্ম্মমত সকলের বিরুদ্ধে অচিরাৎ স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল। সংশয়বাদিরা দেখা দিলেন এবং এই সময়ে আর্য্যভূমিতে মহাত্মা বৃহস্পতির উদয় হইল।

প্রাচীন আর্য্যসমাজে ধর্ম্মাচার্য্যদিগের প্রতি লোকের যেরূপ নির্ভর-ভাব, ধর্ম্মের প্রতি যে রূপ অনুরাগ, পারলৌকিক সুখের জন্য যেরূপ ব্যাকুলতা ও ত্যাগস্বীকার ছিল তাহা প্রসিদ্ধই আছে। এস্থলে তাহার বিশেষ উল্লেখ প্রয়োজন হইতেছে না। বৃহস্পতি এই সমাজ মধ্যে লালিত, পালিত ও শিক্ষিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রাথমিক ধর্ম্মভাব এই জাতীয় ভাবেই সংরচিত হইয়াছিল। হয়ত তিনি দিবা নিশি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মানুতৎপরতা (religious scrupulosity) সহকারে কত বৈদিক মন্ত্র আবৃত্তি করিয়াছেন; পরলোক সাধন জন্য আগ্রহ পূর্ব্বক কত কষ্টসাধ্য বৈদিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়াছেন; পারলৌকিক কুশলকামনায় কত ঐহিক ত্যাগস্বীকার করিয়াছেন; মনে মনে ব্যগ্রভাবে কত প্রত্যাশা করিয়াছেন, এক গুণ ত্যাগস্বীকার করিয়া দিব্যধামে সহস্র গুণ সুখলাভ করিবেন। এমন সময় কোন সুযোগ ক্রমে তাঁহার মনে সংশয় ভাব প্রতিভাত হইল, তিনি বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের অলীকতা প্রতীতি করিলেন। যে বেদের প্রত্যেক বাক্য আপ্ত বাক্য ও প্রত্যেক অক্ষর পবিত্র বলিয়া লোকের অটল বিশ্বাস; একটী অক্ষরও ব্যত্যয় না হইয়া যে বেদকে অবিতথ ভাবে রক্ষা করিবার জন্য কত মুনি ঋষির মস্তিষ্ক বিনিয়োজিত হইয়াছে; যাহা বিশুদ্ধ ও এক কালে ভ্রমপ্রমাদশূন্য বলিয়া লোকের ঐকান্তিক ধারণা; কি ভয়ানক কথা! এক্ষণে বৃহস্পতির মনে সেই বেদের একটী প্রধান অংশ, কর্ম্মকাণ্ড-বিধানের প্রতি অবিশ্বাস জন্মিল!! প্রথমত স্বয়ং বৃহস্পতিকেও বোধ হয়, এরূপ চিন্তা করিয়া অভিভূত হইতে হইয়াছিল। যাহা হউক, কোন বন্ধু যাহাকে আমরা আবাল্য অনুকূল চক্ষে দর্শন করিয়া আসিয়াছি, ও চিরকাল অতি বিশ্রব্ধ ভাবে প্রীতি দান করিয়া চিত্তের অনুপম প্রফুল্লতা অনুভব করিয়াছি, হঠাৎ যদি সেই হৃদয়ের বন্ধুর প্রতি সামান্য কারণেও আমাদের আন্তরিক বিরাগ ও সন্দেহ উপস্থিত হয় তাহা হইলে যেমন তাঁহার অন্যান্য সহস্র সদ্গুণ সত্ত্বেও তাঁহাকে আমরা একবারে নিতান্ত অসার ও যার পর নাই অশ্রদ্ধেয় বিবেচনা করিয়া থাকি এবং তাঁহার নাম স্মরণ করিলেও যেমন আমাদের বিজাতীয় ক্রোধের উদয় হয়, এবং হয়ত সমূহ মনুষ্য জাতির প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মে কর্ম্মকাণ্ডের অলীকতা উপলব্ধি করিয়া বৃহস্পতিরও বেদের প্রতি ও বৈদিক ধর্ম্মের প্রতি সেইরূপ ভাবের উদয় হইয়াছিল। তিনি সহসা বলিয়া বসিলেন, স্বর্গ নাই, নরক নাই, বেদবিধি কিছুই নাই; সকলই মিথ্যা। যে হেতু ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া, পরলোক সাধনের উপায় বলিয়া, বেদে যে সমস্ত কর্ম্মকাণ্ডের বিধান আছে, সামান্য পরীক্ষাতে তাহার সারবত্তা তিরোহিত হইয়া যায়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, পরকালের প্রতি

সংশয় মানব মনের সেই উগ্র অবস্থার ফল, যখন পৌরোহিতিক কঠোর শাসন হইতে তাহার স্বাধীন বিবেক সদ্য বিমুক্ত হইয়া উদ্দৃপ্ত ভাবে প্রচলিত উপধর্ম্ম সকলের প্রতি আক্রমণ দ্বারা, প্রতিশোধ গ্রহণার্থ ব্যগ্র হয়। মনের এরূপ অবস্থা তত্ত্বনির্ণয় পক্ষে সুপ্রশস্ত নহে। এরূপ অশান্ত আকুল মনে পরলোক প্রকাশ পায় না; তাহাতে আবার বিষম "বিত্তমোহ" অন্তরায় রহিয়াছে।

সত্য বটে আমরা সেই শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বরূপ পরমেশ্বরের সন্তান 'অমৃতস্য পুত্রাঃ।' "আধ্যাত্মিক জগত আমাদের প্রকৃত বাসগৃহ। এ পৃথিবী কেবল পান্থ-নিবাস মাত্র।" পরকাল আমাদের ভোগ্য সুখের অক্ষয় ভাণ্ডার এবং ঈশ্বরের দিকে ধর্ম্মের দিকে আমাদের স্বাভাবিক লক্ষ্য। কিন্তু বর্ত্তমানে আমাদিগকে জড় জগতের মধ্যে বাস করিতে হইয়াছে। এক্ষণে আমাদের আপাতত দুর্ব্বল মনের উপর বিষয়াকর্ষণ অত্যধিক প্রবল। ভৌতিক বিষয় সকল মোহন সজ্জায় সজ্জিত হইয়া আমাদের পুরোভাগে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, বিষয়েরই সহিত আমাদের প্রথম পরিচয় এবং বিষয়ের এমনি বন্ধনাত্মক গুণ যে সে একবার আমাদিগকে আয়ত্তাধীনে আনিতে পারিলে আর আমাদের সহজে নিস্তার নাই। অধিকন্তু আমাদের এরূপ কতকগুলি শারীরিক অভাব ও প্রবৃত্তি রহিয়াছে যাহারা ভৌতিক জগতের সহিত আমাদের দুশ্ছেদ্য সংযোগ ঘটাইয়া দেয়। এই জন্য আধ্যাত্মিক অপেক্ষা ভৌতিক উপলব্ধি সকলই আমাদের মনে উজ্জ্বলতররূপে প্রকাশ পায়। আধ্যাত্মিক জগৎ আমাদের হৃদয়ের অলক্ষিত পশ্চাৎভাগে পড়িয়া থাকে। (In the background of our consciousnes.) কিন্তু বিষয়-সুখেই যদি আমরা প্রমত্ত থাকি, সংসার ভিন্ন যদি আমাদের নিকট আর সকলই অসার হয়; তবে আমরা আমাদের মহত্তর শ্রেষ্ঠতর অধিকার হইতে প্রচ্যুত হই। ঈশ্বরের সহিত আমাদের যে সকল সম্বন্ধ, তাহা অননুভূত থাকে। ধর্ম্মের যে সকল মহান ভাব, তাহা অব্যক্তরূপে স্থিতি করে। সুখই আমাদের ধর্ম্ম এবং দুঃখই পাপ, নিঃস্বার্থ ভাব [illegible] কি, তাহা তাহারা কি প্রকারে বুঝিবে? ব্রহ্মপরায়ণ ব্যক্তি যে ধর্ম্মের জন্য অনায়াসে প্রাণ দান করিতে উদ্যত তাঁহাদের নিকট সে কেবল ভ্রান্তি মাত্র। ঈশ্বরপ্রীতি যে মনুষ্যকে দেবত্বে স্থাপিত করে, সে কল্পনা মাত্র। সেই পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিগণ অশেষ শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করিয়া এই স্থির করেন যে মনুষ্যের সকল কর্ম্মের সমুদায় ধর্ম্মের লক্ষ্য কেবল স্বার্থপরতা। তাহারা মনুষ্যের সদ্ভাব সকলকে পশুভাবের তুল্য করিতে চাহে এবং তাহারা জ্ঞান-ধর্ম্ম-বুদ্ধি সম্পন্ন আত্মাকে জড় করিতে চাহে। তাহারা মনুষ্যের আশা ভরসা জ্ঞান ধর্ম্ম সকলই এই সঙ্কীর্ণ স্থান ও সঙ্কীর্ণ কালেই বদ্ধ করিতে চাহে এবং মৃত্যুর সঙ্গেই তাহার আত্মার ধ্বংশ ও বিনাশ ঘোষণা করে।" আমাদের আত্মার উপর বিষয়ের ত এইরূপ প্রভাব তাহাতে যদি আধ্যাত্মিক সংশয়ের সহায়তা পায় তাহা হইলে বিষয়মোহ দ্বিগুণতর পরাক্রমে আমাদিগকে অধঃপাতিত করে। আমাদের মস্তক উত্তোলন করিবার শক্তি থাকে না। আমাদের সম্ভোগের জন্য ঊর্দ্ধদিকে যে "স্বর্গাৎ স্বর্গং সুখাৎ সুখং" আয়োজন হইয়া আছে তৎপ্রতি আমাদের লক্ষ্য থাকে না।

অপিচ অতি প্রাচীন কাল হইতে দেখা যাইতেছে যে ধর্ম্মব্যবসায়ীরা জ্ঞানের প্রতি অত্যধিক আশঙ্কা ও ধর্ম্ম-বিচারের প্রতি বিমুখতা প্রদর্শন করিয়াছেন; সাধারণ্যে বহুলরূপে জ্ঞানের চর্চ্চা হয়, ধর্ম্মতত্ত্ব সকল প্রকাশ্য

বিচারে আনীত হয়, ইহা তাঁহাদিগের ইচ্ছা নহে। অতএব তন্নিবারণ জন্য তাঁহারা যত্ন সহকারে নানাবিধ কৌশলজাল বিস্তার করিয়াছেন; ধর্ম্মতত্ত্ব সকলকে আপ্তবাক্য বলিয়া প্রচার করিয়াছেন; তর্কের সহিত নরকভয় সংযোগ করিয়া দিয়াছেন। এরূপ জ্ঞান-ভীতি ও বিচার-কুণ্ঠতা সংশয়বাদের সামান্য উদ্দীপক নহে। স্বাধীন চিন্তার নিমিত্ত প্রখ্যাত এই ঊনবিংশ শতাব্দির লোকের মন হইতেও এরূপ ভয় ও সঙ্কোচ এখনও সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয় নাই। অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের কথা দূরে থাকুক আজিও অনেক চিন্তাশীল ব্রহ্মবাদী ধর্ম্মকে বিবেকের বিচারাসন-সম্মুখে উপস্থিত করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন। ধর্ম্মতত্ত্ব-নির্ণয় জন্য বিবেকের বিচারের উপর নির্ভর করিতে ইচ্ছা করেন না। "Nor is it desirable to treat on mere intellectual grounds the errors which have arisen from the neglect of the supremacy of our moral nature. To argue the existence of a God with a disciple of the Positive Philosophy is to involve him and ourselves in a maze of metaphysical subtleties out of which our mental powers afford us no means of egress. We must move the trial into another court and urge our suit in that of the Conscience, instead of that of the Intellect." Religious Duty, by F. P. Cobbe. সত্য নির্দ্ধারণ করা যদি বুদ্ধির কার্য্য হয়, এবং ধর্ম্মতত্ত্ব সকল যদি সত্য তত্ত্ব হয় তাহা হইলে এরূপ অকারণ সঙ্কোচ দ্বারা সংশয়বাদিদিগের প্রশ্রয় বৃদ্ধি করা বিশ্বাসী ভ্রাতাদিগের পক্ষে কোন ক্রমে বিধেয় নহে। বুদ্ধি আমাদিগের মনোরাজ্যে নিয়ামক রূপে অবস্থাপিত হইয়াছে। আমাদের সমুদায় মনোবৃত্তিকে—পাপপ্রবৃত্তি ব্যতীত নহে—সমুদায় মনোবৃত্তিকে যুক্ত ভাবে পরিচালন করা উহার কার্য্য। কিন্তু বুদ্ধিকে যদি ধর্ম্মের পবিত্র অঙ্গ স্পর্শ করিতে না দেও, বুদ্ধি যদি ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ হইয়া কার্য্য করে, তাহা হইলে, মনের ধর্ম্ম-বিরোধী বৃত্তি সকল যে প্রবল হইয়া উঠিবে, অথবা ধর্ম্ম যে প্রবঞ্চনা ও প্রতারণার প্রশস্ত আশ্রয় রূপে পরিণত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি। অতএব আমরা একথা স্বীকার করিতে পারি না যে, যেহেতু বুদ্ধি আমাদিগকে ধর্ম্মের মূলভাব সকল সংগ্রহ করিয়া দেয় নাই আমরা তদ্ভাবৎ অন্য সূত্রে লাভ করিয়াছি, অতএব ধর্ম্ম-বিষয়ে উহার নিয়ন্তৃত্ব সঙ্গত হয় না। এ যুক্তি যদি স্বীকার করা যায় তাহা হইলে আমাদের জ্ঞান-রাজ্যেও এক মহান্ বিপ্লব উপস্থিত হয়। ভৌতিক মূলতত্ত্ব সকলও ত বুদ্ধির উদ্‌গ্রহণীয় নহে, তা বলিয়া কি আমরা ভৌতিক তত্ত্ব সম্বন্ধেও তাহাকে অধিকারচ্যুত করি। বস্তুত তাহা হইলে ঊনবিংশ শতাব্দির এত গৌরব ঘোষণা হইত না, জ্ঞানরাজ্যের এত শ্রীবৃদ্ধি হইত না। কিন্তু বুদ্ধিকে এক বিষয়ে নিয়ন্তৃত্ব প্রদান করিলে, অপর বিষয়েও তাহার প্রাধান্য স্বীকার যুক্তিযুক্ত হয়। বুদ্ধি আমাদিগকে ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব সকল আহরণ করিয়া না দিলেও তৎসমূহকে পরীক্ষা করিবার অধিকার অবশ্যই তাহার আছে। ধর্ম্ম কেবল নির্ব্বোধদিগের জন্য যে নহে, ইহা বোধ হয়, কেহই অস্বীকার করিবেন না। বুদ্ধি যদিও ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব সকল আহরণ করিতে না পারে, কিন্তু সেই মূলতত্ত্ব গুলি হস্তে পাইয়া সে ধর্ম্মকে গৌরবান্বিত আকার প্রদানে ক্ষমবান বটে। হৃদয় সৌন্দর্য্য মধ্যে যে প্রভুর কমনীয় কান্তি সন্দর্শন করিয়া বিমোহিত হয়, বুদ্ধি তাঁহাকেই সর্ব্বত্র মহা মহিমান্বিত রূপে প্রত্যক্ষ করিয়া পূজা করে।

পরকালের বীভৎস ও ভয়াল বর্ণন দ্বারাও লোকের মনে সহজেই অমরত্বে বিতৃষ্ণা জন্মে। খৃষ্টিয়ানদিগের মতে পাপীদিগের গতি বর্ণন শ্রবণ করিলে অতি কঠিন ও সাহসিকেরও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। জোনাথন্ এডওয়ার্ডস্ অতি গম্ভীর ভাবে ও বিশ্বাসের সহিত এইরূপ লিখিয়াছেন "বোধ হয়, অন্তকালে পৃথিবী অগ্নিময় হ্রদ রূপে বা তরল অগ্নির বর্ত্তুল আকারে পরিণত হইবে; এই আগ্নেয় মহার্ণবে পাষণ্ডগণ নিক্ষিপ্ত হইবে, উহা নিয়ত বাত্যাকুলিত সুতরাং তাহারা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া দিবারাত্রিতে ক্ষণমাত্রও শান্তিলাভ করিতে পাইবে না। উত্তুঙ্গ অগ্নিময় তরঙ্গ সকল অনবরত তাহাদিগের মস্তকোপরি গতাগতি করিবে ও তাহাদের তজ্জনিত আন্তরিক ও বাহ্য ক্লেশানুভূতি চিরকালই সমভাবে রহিবে; তাহাদের মস্তক, চক্ষু, জিহ্বা, হস্ত, পদ, কটিদেশ ও সমুদায় মর্ম্ম স্থান আবহমান কাল অগ্নিপূর্ণ হইয়া থাকিবে, সে অগ্নির প্রভাবে প্রস্তর ও মৌলিক পদার্থ সকলও দ্রবীভূত হইতে পারে; এবং তাহাদের এই সমস্ত যাতনা-অনুভবকারি ইন্দ্রিয় সকল অনন্ত কাল পর্য্যন্ত একই রূপ ক্লেশবোধক্ষম থাকিবে; এক মিনিটের জন্য নয়, এক দিনের জন্য নয়, এক যুগের জন্য নয়, দুই যুগের জন্য নয়, শত যুগের জন্য নয়, কিম্বা উপর্য্যুপরি সহস্র কোটি যুগের জন্যও নয়, অনন্ত কাল তাহাদিগকে এই রূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে, কোন কালে যন্ত্রণার শেষ হইবে না তাহাদের মুক্তি কোন কালেও নাই।" এডওয়ার্ডসের চরিতাখ্যায়কগণ বলেন যে যৎকালে ভজনালয়ের বেদি হইতে তাঁহার প্রমুখাৎ এই বাক্য নিঃসৃত হইয়াছিল, তখন "শ্রোতৃবর্গের হৃৎকম্প উপস্থিত হয় ও তাহারা হৃদয়বেদনায় অধীর হইয়া বিলাপ ও ক্রন্দন করত যুগপৎ আসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইয়াছিল।" পৃথিবীতে কয় জন লোক বলিতে পারে, যে আমি কোন কালে কোন পাপাচরণ করি নাই, কোন পাপচিন্তাকে মনে স্থান দিই নাই। যাহাদের মুক্তির জন্য কথিত ঈশ্বরের প্রিয় পুত্রের শোণিত-পাত-সংঘটন পৃথিবীময় প্রচারিত হইতেছে, সেই খৃষ্টীয়ানেরাই কি সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারেন যে, কোটি খৃষ্টীয়ানের মধ্যে এমন এক জন প্রকৃত খৃষ্টীয়ান প্রাপ্ত হওয়া যায়, যাহার মুক্তি বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই। সুখের আশয়ে লোকে স্বভাবতঃ পরকালের প্রতি লক্ষ্য করে, কিন্তু যখন দেখে সেই পরকালেও সুখের আশা বিড়ম্বনা তখন আর পরকালের প্রতি বিশ্বাস করিতে কাহার ইচ্ছা হয়? নিরতিশয় যন্ত্রণা ভোগ করিতে, অমরত্ব কে চায়? টিপ্‌সিরা কোন খৃষ্টিয়ান ধর্ম্মবক্তা সাহেবকে যাহা বলিয়াছিল তাহা অসঙ্গত নহে। খৃষ্টীয় পরকালের বিষয় বর্ণন করায় তাহারা কহিয়াছিল 'কি! ইহ জীবনের কষ্টভোগ কি যথেষ্ট হইল না যে আবার অমর হইয়া পরকালে কষ্ট ভোগ করিতে হইবে!" বস্তুত এই ক্ষণভঙ্গুর জীবনের দুর্ব্বলতা জন্য দুষ্কৃতি নিবন্ধন যদি অনন্ত কাল তীব্র নরকাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইতে হয় তাহা হইলে অমরত্ব মঙ্গলের নিমিত্ত নহে, এরূপ অমরত্বের বিষয় চিন্তা করিতেও হৃদয়বেদনা উপস্থিত হয় এবং এরূপ অমরত্বে সংশয় আরোপ ও তাহার অপ্রামাণিকতা সংস্থাপন করণার্থ মানব মন সহজেই ব্যগ্র হয়। তদ্বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ কৃতকার্য্য হইলে আপনাদিগকে সম্পূর্ণ রূপে কৃতকৃত্য ভাবিয়া চিত্তে আরাম বোধ করে। অপিচ অনন্ত নরক বিষয়ক মত যদি সত্য হয় তাহা হইলে সাধু ব্যক্তিরা স্বর্গে যাইয়াও সুখী

হইতে পারিবেন না। যে হেতু তাঁহাদের মর্ত্ত্য-সহচর অভিন্নহৃদয় আত্মীয় স্বজনদিগের অভাবনীয় নরকযন্ত্রণা স্মরণ করিয়া তাঁহাদিগকে নিয়ত ব্যথিতহৃদয় হইতে হইবে। পরদুঃখে বিশেষতঃ আত্মীয়গণের দুঃখে কাতর হওয়া মানব মনের স্বভাব ধর্ম্ম। ইতিহাসে এ বিষয়ের একটী সুন্দর আখ্যায়িকা পাঠ করা যায়। স্ক্যাণ্ডিনেবীয় রাজা র‍্যাডহ্যাড় খৃষ্টীয় যাজকদিগের বহু যত্নের পর ব্যাপ্‌টাইজ হইতে সম্মত হইয়াছিলেন। অনন্তর তিনি জলে এক পা রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে স্বর্গে তাঁহার পিতৃপুরুষদিগের সহিত তাঁহার সম্মিলন হইবে কি না। যখন শুনিলেন যে তাহারা ব্যাপ্‌টাইজ হয় নাই সুতরাং তাহাদের ভাগ্যে অনন্ত নরক-যন্ত্রণা অনিবার্য্য, তিনি অমনি জল হইতে তাঁহার পদ অপসারিত করিয়া লইয়া কহিলেন, যে, তিনি তাঁহার বীর্য্যবান সাহসী পিতৃপুরুষদিগের সহিত একত্রে থাকিয়া নরক-যন্ত্রণা সহ্য করিতে সম্মত আছেন, কিন্তু একা খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজকদিগের সহিত স্বর্গবাস ইচ্ছা করেন না। র‍্যাড়হ্যাডের এরূপ ব্যবহার অতি স্বাভাবিকই হইয়াছে! হৃদয়বান কোন ব্যক্তি এরূপ পরকালে বিশ্বাস করিয়া সুখী হইতে পারেন না। অতএব এরূপ অবস্থায় অনেকে যে সংশয়বাদের আশ্রয় গ্রহণ করিবে ইহা আশ্চর্য্যের নহে।

অনেকে সমাজমধ্যে বিশেষত্ব প্রদর্শন করিয়া খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ কামনায় সংশয়-পক্ষ অবলম্বন করেন এবং কেহ কেহ বা আপনাদিগের দুর্ব্বিনীত দুষ্প্রবৃত্তি সকল অবাধে চরিতার্থ করিয়া সমাজ মধ্যে আপনাদিগের নির্দ্দোষিতা সমর্থনার্থ সংশয়বাদ ঘোষণা করিয়া থাকে। আমরা ইহাদের বিষয় আলোচনা করিয়া প্রস্তাবের অবয়ব বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করি না। ফলতঃ পরকালের প্রতি সংশয় যে কারণেই উদয় হউক, দেখা যাইতেছে, তাহা কখনই মনের সুস্থ অবস্থার ফল নহে।

আমাদের আত্মা দেহ হইতে যে স্বতন্ত্র ও স্থায়িতর পদার্থ এ বিশ্বাস মানব মনের স্বাভাবিক ও আদিম বিশ্বাস। এমন জাতি নাই যাহারা একবার এ বিশ্বাস বিরহিত। প্রত্যুত এ বিশ্বাস সর্ব্ব কালের সকল দেশের মানব মনকে অধিকার করিয়াছে। কোন বিশেষ সময়ে উৎকৃষ্টতর কোন লোকনিবাসী জীব আসিয়া আমাদিগকে এ বিশ্বাসে দীক্ষিত করিয়া যায় নাই এবং এতদ্বিষয়ে উপদেশ দিবার জন্য সেই চিন্ময় ঈশ্বরকেও মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে হয় নাই। মানব জাতির অতি শৈশবাবস্থাতেই তাহারা আত্মার স্বতন্ত্র উপলব্ধি করিয়াছিল এবং অতিশয় আশান্বিত মনে পরলোকের প্রতীক্ষা করিত। কামস্কাটকা-নিবাসিরা কসকে ও রুষদিগের অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া পরলোকে গুটি কয়েক হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ শিকারী কুক্কুর প্রাপ্তির জন্য এত ব্যগ্র যে, তাহারা স্বাভাবিক মৃত্যুর অপেক্ষা না করিয়া আত্মহত্যা সাধন করিয়া থাকে। নিতান্ত নির্ব্বোধ অশিক্ষিত মনেও যে প্রগাঢ় পারলৌকিক বিশ্বাস সমুদিত হয়, ইহার ভূরিভূরি নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। আফ্রিকা, নবজিলণ্ডে ও ফিজিদ্বীপ-নিবাসীদের মধ্যে মৃত ব্যক্তির দেহ সহিত তাহার স্ত্রী ও দাস দাসী এবং পালিত পশু পক্ষী ও অস্ত্রশস্ত্রাদিও সমাধিস্থ করিবার রীতি প্রচলিত আছে। তাহাদের বিশ্বাস এই যে, পরলোকে তাহারা উক্ত মৃত ব্যক্তির পরিচর্য্যা ও প্রয়োজন সাধন করিবে। উইলসন সাহেব বলেন "A native African would as soon doubt his present as his future state of being." আদিম আফ্রিকা

বাসিরা বিশ্বাস করে যে, নিদ্রিতাবস্থায় তাহাদের আত্মা যদৃচ্ছ বিচরণ করে এবং মধ্যে মধ্যে প্রবলতর কোন আত্মার দ্বারা প্রহার প্রাপ্ত হয়। এই জন্য নিদ্রোত্থিত হইয়া তাহারা কখন কখন গাত্রবেদনাদি অনুভব করিয়া থাকে। গ্রীনল্যাণ্ড দেশীয়-দিগের মধ্যে কোন শিশু সন্তান মৃত হইলে তদ্দেহসহ একটী কুক্কুর প্রোথিত করিবার রীতি দৃষ্ট হয়। গন্তব্য পথ নির্দ্ধারণ বিষয়ে কুক্কুরদিগের স্বাভাবিক জ্ঞান প্রসিদ্ধ আছে। অতএব তাহারা এই ভাবিয়া এরূপ করে যে, কুক্কুর সেই শিশুর আত্মাকে ঈপ্সিত স্থানে লইয়া উপস্থিত করিবে। গল জাতীয়দিগের মৃত ব্যক্তিকে কোন বিষয় অবগত করা আবশ্যক বোধ হইলে, পত্র লিখিয়া তাহার চিতায় তাহা নিক্ষেপ করিবার রীতি দেখা গিয়াছে। এবং তাহাদের মধ্যে পরকালে পরিশোধ্য ঋণ আদান প্রদানের প্রথাও প্রচলিত ছিল। এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে,আদিম অবস্থায় মনুষ্যেরা আত্মার পার্থক্য ও স্থায়িত্বের প্রতি প্রগাঢ়রূপে বিশ্বাস করিত। কর্জ্জ আদান প্রদান বিষয়ে মনুষ্যেরা যে অতিশয় সাবধানতার সহিত ও বিশ্বস্ত হৃদয়ে কার্য্য করিয়া থাকে, ইহা কে অস্বীকার করিবে? কিন্তু মনুষ্যের এই সাবধানতা-বৃত্তিও আত্মার পার্থক্য ও স্থায়িত্ব বিষয়ে সন্দিহান নহে।

পারলৌকিক বিশ্বাসের স্বাভাবিকতা ও সর্ব্বজনীনতা প্রতিপাদন জন্য অসভ্য জাতীয়দিগের বৃত্তান্ত হইতে আরও অনেক কৌতুকজনক নিদর্শন সকল প্রদর্শন করা যাইতে পারে। কিন্তু এরূপ আধ্যাত্মিক তত্ত্বের প্রতি বিশ্বাসের প্রামাণিকতা সংস্থাপন জন্য আজিকার কালে শুদ্ধমাত্র ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত দ্বারা সংশয়ী ও কুতার্কিক দিগের নিকট কৃতকার্য্য হওয়া যায় না। বর্ত্তমান কালে সকল বিষয়েরই তন্ন তন্ন বিচার আরম্ভ হইয়াছে। অতি সহজ ও স্বাভাবিক তত্ত্ব সকলও বিচার দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে না পারিলে লোকে তাহাতে বিশ্বাস করিতে সম্মত নহে। এমন সহজ ও স্পষ্ট বিষয় যে আত্মার অস্তিত্ব তৎবিষয়েও অনেক বিদ্বন্মন্য ব্যক্তিরা সংশয় প্রকাশ করিতে পরাঙ্মুখ নহেন। ফলতঃ সংশয়বাদিদিগের হস্তে বরং কতক নিস্তার ছিল। তাঁহাদের নিজের সিদ্ধান্ত মত (Dogma) কিছুই নাই। অপরের বিশ্বাসের উপর সংশয় আরোপ করাই তাঁহাদের কার্য্য। কিন্তু শুদ্ধ সংশয়ের দ্বারা মানব মনকে পরিতৃপ্ত রাখা যায় না দেখিয়া, বর্ত্তমান এক দল প্রামাণিক উপাধিধারী পণ্ডিতের অভ্যুদয় হইয়াছে। ইহাঁরা প্রামাণিকতা ভান করিয়া সেই পূর্ব্বের সংশয়বাদেরই পোষকতা করিতেছেন। তাঁহাদের যুক্তির ছটায় তরলমতি অনেকের চিত্তবিভ্রম জন্মিয়াছে। তাঁহারা বাহ্য ও অন্তর্জ্জগৎ সম্বন্ধে আমাদিগের আত্মার লোকাতিগ (transcendental) শক্তি অস্বীকার করেন। এবং ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ্য জ্ঞান সহায় করিয়া তাঁহারা তৎ তৎ বিষয়ক মূল-বিশ্বাস সকলের উৎপত্তি ও তাহারা যে স্বাভাবিক কুসংস্কার, ইহা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা তাঁহারা বিশ্বাসিদিগের বিরুদ্ধে যত দূর কৃতকার্য্য হউন বা না হউন, সংশয়বাদিদিগের বিলক্ষণ পৃষ্ঠপোষক হইয়াছেন। তাঁহাদের মতে বাহ্য সত্তা "অনুভূতির স্থায়ী সম্ভাব্য" মাত্র। (Permanent Possibility of Sensation) এবং আত্মা বা মন "অনুবোধের স্থায়ী সম্ভাব্য।" (Permanent Possibility of Feeling)। পরকাল প্রসঙ্গে ইহাদের সহিত অতি সত্বরই আমাদের সাক্ষাৎ হইবে, আমরা সেই স্থলেই ইহাঁদের এই মতের সারবত্তা পরীক্ষা করিব। ক্রমশঃ

আবেস্তা।

আবেস্তা পারসীকদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ। ইহা জেন্দ নামক প্রাচীন পারস্য ভাষায় লিখিত। কিছুকাল হইল ইহা ইংরাজী, ফরাসী, জর্ম্মেণ প্রভৃতি ইউরোপীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। এই ধর্ম্মগ্রন্থ অতি বিস্তৃত। ইহা প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগ বেন্দিদাদ; দ্বিতীয় ভাগ বিস্পরদ ও যক্ষ; এবং তৃতীয় ভাগ খোর্দাআবেস্তা নামে পরিচিত। পারসীকদিগের মতে এই গ্রন্থ জোরাস্তারের লিখিত। জোরাস্তার পারসীক ধর্ম্মের জন্মদাতা ও প্রবর্ত্তক। তিনি কোন্ সময়ে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন সে বিষয়ে নিশ্চয় কিছু জানা যায় না। সুবিখ্যাত ইংরাজ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত মনিয়র উইলিয়মস্ বলেন, যে জোরাস্তার খ্রীষ্টের জন্ম গ্রহণের পঞ্চশতাব্দী পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি বলেন যে সময়ে ভারতবর্ষে বুদ্ধ, গ্রীসে পিথাগোরাস, ও চীন দেশে কংফুচ স্বস্ব জ্ঞানজ্যোতি বিকীর্ণ করিতে ও ধর্ম্ম প্রচারে নিযুক্ত ছিলেন তৎকালে পারস্য দেশে জোরাস্তার নিজধর্ম্ম প্রচার করিতে ছিলেন। জোরাস্তারের ধর্ম্ম বহুকাল পারস্যবাসীদিগের ধর্ম্ম ছিল। পরে খ্রীষ্টীয় সপ্ত শতাব্দীতে যৎকালে সুপ্রসিদ্ধ আরব সেনাপতি ও মুসলমান ধর্ম্ম প্রচারক কালিফ ওমার ও তাঁহার বশম্বদ অনুবর্ত্তীরা পারস্য দেশে মুসলমান ধর্ম্ম প্রচার করেন তৎকালে কতকগুলি স্বধর্ম্মপ্রিয় পারস্যবাসী স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিম ভারতবর্ষের সুরাট নগরে আসিয়া বাস করে। ইহাদিগের সন্তান সন্ততিরা অদ্যাপি জোরাস্তারের ধর্ম্মানুবর্ত্তী হইয়া আছে। ইহারা এক্ষণে বোম্বাই ও পশ্চিম ভারতবর্ষের নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। [illegible] বর্ত্তমান সংখ্যা প্রায় সত্তর হাজার হইবে। বর্ত্তমান সময়ে পারস্যদেশে জোরাস্তারের ধর্ম্মাবলম্বী অতি অল্প সংখ্যক আছে। তাহারা 'ঘবর' নামে আখ্যাত। আমাদিগের এই প্রস্তাবের আলোচ্য ধর্ম্মগ্রন্থ আবেস্তা পারস্য-দেশ নিবাসী ঘবরদিগের এবং ভারতবর্ষনিবাসী এই সত্তর হাজার নরনারীর ধর্ম্ম গ্রন্থ।

এই স্থলে বলিয়া দেওয়া আবশ্যক যে পারসীরা এক মঙ্গলময় পবিত্র পুরুষ অর্থাৎ ঈশ্বর এবং এক অমঙ্গল-বিধাতা অপবিত্র পুরুষ অর্থাৎ শয়তান আছেন এইরূপ বিশ্বাস করে। জেন্দ ভাষায় ঈশ্বরকে অহুরমজ্দ ও শয়তানকে আহরিমান কহে। পারসীক ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক জোরাস্তার অহুরমজদ্-প্রেরিত একজন মহাপুরুষ বলিয়া পূজিত হইয়া থাকেন।

আবেস্তার প্রথম ভাগ বেন্দিদাদ দ্বাবিংশ ফার্গাদ অর্থাৎ অধ্যায়ে বিভক্ত। জেন্দ ভাষায় বেন্দিদাদ শব্দের অর্থ ধর্ম্মনিয়ম। কিন্তু এই বেন্দিদাদে ধর্ম্ম-নিয়ম ব্যতীত নানা বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে। বেন্দিদাদের প্রথম অধ্যায়ে সৃষ্টির সংক্ষেপ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়; ইহাতে পৃথিবী কি প্রকারে সৃষ্ট হইয়াছিল তাহার কোন বৃত্তান্ত নাই; অহুরমজদ কি প্রকারে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ সৃষ্টি করিয়া ভিন্ন ভিন্ন গুণসম্পন্ন মনুষ্যগণকে তত্তৎ প্রদেশে বাস করিতে দিলেন তাহারই উল্লেখ আছে। অহুরমজদ্ যাহা কিছু সৃষ্টি করিতেন আহরিমান তাহার বিপরীত বস্তু সৃষ্টি করিয়া অহুরমজদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য সংসাধিত হইতে দিত না। অহুরমজদ্ মুরু * নামক প্রদেশ সৃষ্টি করিলেন এবং তাহা বলবান বিশুদ্ধ-

* মার্ব্ব (Merv) যাহা এক্ষণে আমাদিগের ইংরাজ রাজপুরুষ ও রুষদিগের মধ্যে প্রধান আক্রোশের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে।

স্বভাব মানবগণে পরিপূর্ণ করিলেন, আহরিমান তাহাদিগকে বিবাদ ও যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইল। অহুরমজদ্ বাখদি * নামক সুন্দর প্রদেশ সৃষ্টি করিলেন এবং তাহা সুখী ও সন্তোষপূর্ণ মানবগণে পরিপূর্ণ করিলেন, আহরিমান ঐ প্রদেশে হিংস্র জন্তু ও বিরক্তকারী কীট সকল সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগের সুখ ও সন্তোষ হরণ করিল। অহুরমজদ্ হোরুনামক প্রদেশ সৃষ্টি করিলেন এবং তাহা বহু সংখ্যক শ্রমশীল মানবগণে পরিপূর্ণ করিলেন, আহরিমান তাহাদিগকে আলস্য-পরতন্ত্র করিল, ও তাহাদিগের মধ্যে দরিদ্রতা আনয়ন করিল। অহুরমজদ্ হপ্ত হিন্দু † নামক সুবিস্তৃত প্রদেশ সৃষ্টি করিলেন এবং তাহা মনুষ্যবর্গে পূর্ণ করিলেন, আহরিমান তাহাদিগের মধ্যে নানা প্রকার অমঙ্গল ও রোগের সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে চিরশঙ্কাযুক্ত ও দুঃখভাগী করিল। এইরূপে অহুরমজদ্ সর্ব্বোত্তম ও পরমোৎকৃষ্ট ষোড়শটি প্রদেশ সৃষ্টি করিলেন এবং সেই সকল প্রদেশ বিবিধ-গুণ-সম্পন্ন মনুষ্যগণে পূর্ণ করিলেন, আহরিমান সেই সকল প্রদেশনিবাসী মনুষ্যগণের মধ্যে নানা প্রকার অমঙ্গল সৃষ্টি করিয়া অহুরমজদের উদ্দেশ্য সাধন করিতে বাধা দিতে লাগিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রথম মনুষ্যের বিবরণ বিবৃত হইয়াছে। জোরাস্তার জিজ্ঞাসা করিলেন "হে পবিত্র স্বরূপ সর্ব্বস্রষ্টা অহুরমজদ্! তুমি ইতিপূর্ব্বে আমি ভিন্ন অন্য কোন্ মনুষ্যের সহিত কথোপকথন করিয়াছিলে?" অহুরমজদ্ উত্তর করিলেন "আমি ইতিপূর্ব্বে প্রথম মনুষ্য যিমার ‡ সহিত কথোপকথন করিয়া ছিলাম। আমি সর্ব্বপ্রথমে সেই আদি মনুষ্য যিমাকে ধর্ম্ম-নিয়ম সকল জ্ঞাত করি।" অহুরমজদ্ যিমাকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে পৃথিবীর রক্ষাকারী শ্রীবৃদ্ধিকারী ও শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত করিলেন। যিমা পৃথিবীকে কিছু কালের মধ্যে বিস্তৃত ও শষ্যশালী করিয়া তুলিলেন। তাঁহার শাসনকালে পৃথিবীতে দারুণ শীতল বায়ু, কিম্বা অসহ্য গ্রীষ্ম ছিল না এবং রোগ ও মৃত্যু দৃষ্ট হইত না। অহুরমজদ্ পৃথিবীরক্ষার্থ ও উহার শ্রীবৃদ্ধিসংসাধনার্থ যিমাকে সুবর্ণনির্ম্মিত একটি লাঙ্গল ও একটি বড়শা প্রদান করিয়া ছিলেন। যিমার তিন শত বৎসর বয়ঃক্রম হইলে নানা প্রকার দ্বিপদ ও চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্ট হয়।

তৃতীয় অধ্যায়ে, পৃথিবীর পক্ষে সুখকর বস্তু কি ও তাহার পক্ষে দুঃখকর বস্তুই বা কি, প্রভৃতি কএকটি বিষয়ে জোরাস্তার কর্ত্তৃক প্রশ্ন ও অহুরমজদ্ কর্ত্তৃক তাহার উত্তর বিবৃত হইয়াছে। জোরাস্তার কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হওয়াতে অহুরমজদ্ বলিলেন যে পৃথিবীর পক্ষে পাঁচটি বস্তু অতীব সুখকর। প্রথম, ধার্ম্মিক ব্যক্তি; দ্বিতীয়, স্ত্রীপুত্র-পরিবৃত হইয়া ধার্ম্মিক ব্যক্তির সুখে বাস; তৃতীয়, উর্ব্বরা ভূমি; চতুর্থ, সেই দেশ যে দেশে বহু সংখ্যক সুস্থকায় গাভী ও ভারবাহী পশু উৎপন্ন হয়; পঞ্চম, সেই স্থল যথায় গাভী ও ভারবাহী পশু সকল বিষ্ঠা ও মূত্র পরিত্যাগ করে। উপরোক্ত প্রথম চারিটী বস্তু পৃথিবীর পক্ষে সুখকর হইতে পারে, কিন্তু পঞ্চম বস্তুটি পৃথিবীর পক্ষে কেন সুখকর তাহা আমরা স্থির করিতে পারি না। * ইহা দ্বারা স্পষ্ট বোধ

* বক্তিয়ার (Bactria)

† বেদোক্ত "সপ্তসিন্ধবঃ"। এই "হপ্ত হিন্দু" শব্দ হইতে হিন্দু শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।

‡ ঋগ্বেদোক্ত যম।

* বোধ হয় পশুপুরীষ সার জন্য ব্যবহার হইয়া থাকে এই জন্য উহা পৃথিবীস্থ সুখকর দ্রব্যের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। এক্ষণে ভারতবর্ষে গোচারণের পূর্ব্বাপেক্ষা অল্পতা হওয়াতে গোগণ তদ্রূপ আহার

হয় প্রাচীন পারস্যবাসীরা হিন্দুদিগের ন্যায় গোময় ও গোমূত্র পবিত্র বস্তু জ্ঞান করিতেন। মৃত ব্যক্তির জন্য ক্রন্দন ও পরিতাপ করা পারসীকদিগের মধ্যে একটি পাপ বলিয়া পরিগণিত। এই অধ্যায়ে অহুরমজদ্ জোরাস্তারকে বলিতেছেন "হে জোরাস্তার! মৃত পরিজনের জন্য পরিতাপ ও ক্রন্দন করা পৃথিবীর পক্ষে অতীব দুঃখকর।" আর্দাবিরাফ নামক পারসীকদিগের ধর্ম্ম-গ্রন্থে আছে "মৃত আত্মীয়ের জন্য আক্ষেপ ও দুঃখ করা ঈশ্বর অতীব গর্হিত পাপ বিবেচনা করেন।" সাদারপোর্ট নামক পারসীকদিগের আর এক খানি ধর্ম্মগ্রন্থে আছে "যখন কোন আত্মীয় এই অমঙ্গলের আলয় পৃথিবী হইতে চলিয়া যায়, তখন তাহার জন্য শোক ও ক্রন্দন করা উচিত নহে; কারণ তাহার জন্য তোমার চক্ষু হইতে যে-অশ্রু পতিত হইবে তাহা তোমার পরলোক-প্রবেশের পক্ষে প্রতিবন্ধক স্বরূপ হইবে।" পারসীকেরা মৃতদেহের সমাধি করা, কিম্বা মৃতদেহ দাহ করা মহাপাপ বিবেচনা করে। যে কেহ কোন মৃতদেহের সমাধি করিবে কিম্বা সমাধি করিয়া তাহা সার্দ্ধ বৎসরের মধ্যে পুনরায় মৃত্তিকা মধ্য হইতে উত্তোলন করিবে, অহুরমজদ্ তাহাকে এক সহস্র বেত্রাঘাতের শাস্তি ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, এবং যে ব্যক্তি দুই বৎসরের মধ্যে উত্তোলন করিবে তাহার পাপের ক্ষমা নাই, প্রায়শ্চিত্ত নাই, এই রূপ বলিয়া গিয়াছেন। হিন্দুদিগের মধ্যে যেরূপ বিশ্বাস আছে এবং বেদব্যাস যেরূপ বলিয়া গিয়াছেন যে মহাভারত পাঠ করিলে কায়িক, বাচিক, মানসিক সকল প্রকার পাপ রাশি হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়, সেই রূপ পারসীকদিগের মধ্যে বিশ্বাস আছে এবং জোরাস্তার আবেস্তার এই তৃতীয় অধ্যায়ে ও অন্যান্য স্থলে বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি অহুরমজদের ধর্ম্ম-নিয়ম পাঠ কিম্বা শ্রবণ করে অথবা তাহার সাধুবাদ করে, সে নরহত্যা, প্রবঞ্চনা, মৃতদেহের সমাধি করণ, ঋণগ্রহণ ও অন্যান্য সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হয়।

চতুর্থ অধ্যায়ে ঋণগ্রহণ, অঙ্গীকারভঙ্গ, প্রতিহিংসা প্রভৃতি কয়েকটি দোষের কি প্রকার শাস্তি প্রদান করিতে হইবে তাহাই বিবৃত হইয়াছে। অহুরমজদ্ এই সকল দোষের গুরুত্ব ও লঘুত্ব অনুসারে বেত্রাঘাত ও ক্রোশ-চরণ নামক এক প্রকার যন্ত্র দ্বারা প্রহারের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। ঋণগ্রহণ অথবা ঋণগ্রহণ করিয়া তাহা পরিশোধ না করা পারসীকদিগের মধ্যে একটি মহাপাপ বলিয়া বিবেচিত হয়। এই অধ্যায়ের এক স্থলে লিখিত হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি ঋণ গ্রহণ করিয়া তাহা পরিশোধ না করে সে যে অর্থ ঋণস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছে সেই অর্থের অপহরণ রূপ মহাদোষে দোষী হয়।

পঞ্চম অধ্যায়ে, কোন্ কোন্ ঘটনাতে অশৌচ হয় না, শীতকালে ও গ্রীষ্মকালে কি প্রকারে অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া-সম্পন্ন করিতে হয়, পরিবারস্থ কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তজ্জনিত কি প্রকার অশৌচ হয়, প্রভৃতি কয়েকটি বিষয় বিবৃত হইয়াছে। হিন্দুদিগের মধ্যে গোমূত্র যেরূপ পবিত্র বস্তু বলিয়া বিবেচিত হয় পারসীকদিগের মধ্যেও সেই রূপ, ইহার প্রমাণ এই যে অহুরমজদ্ কয়েক প্রকার অশৌচ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য গোমূত্রে স্নান ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই আবেস্তা ধর্ম্ম-গ্রন্থে জ্ঞানপূর্ণ উচ্চভাবের কথা

পায় না এবং তন্নিবন্ধন সারের অল্পতা হওয়াতে কৃষি কার্য্যের ব্যাঘাত হইতেছে। এই বিষয় লইয়া সম্বাদ পত্রে এক্ষণে আন্দোলন চলিতেছে।

দুষ্প্রাপ্য নহে। পঞ্চম অধ্যায়ের এক স্থানে উক্ত হইয়াছে "জন্মের পর মনুষ্যের পক্ষে পবিত্রতাই পরমোৎকৃষ্ট বস্তু।" "পবিত্র ব্যক্তি সৎকার্য্য, সদালাপ ও সৎচিন্তা দ্বারা আপনাকে পবিত্র রাখেন।" পারসীকেরা পুণ্যের পুরস্কার ও পাপের শাস্তি এবং স্বর্গ ও নরক আছে ইহা বিশ্বাস করিয়া থাকে। এই অধ্যায়ের এক স্থলে আছে "যাহারা পবিত্র নহে তাহারা মৃত্যুর পর স্বর্গে গমন করিবার অধিকারী হইবে না, তাহারা সেই চিরান্ধকারময় স্থানে গমন করিবে যথায় পাপীরা বাস করে*।"

ক্রমশঃ

* এই বাক্য আবেস্তার অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়।

ব্রাহ্মসমাজের উন্নতিপথের কণ্টক।

অন্তর্দৃষ্টি ধর্ম্মের প্রাণ। বিক্ষেপ শক্তি আমাদিগকে নানাত্বে লইয়া যায় কিন্তু সংকোচ শক্তি আমাদিগকে একত্বে সংস্থাপন করে। এই সঙ্কোচ শক্তি আয়ত্ত না হইলে অন্তর্দৃষ্টি কি আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। বিক্ষেপের বিষয় বাহ্যবস্তু, সংকোচের বিষয় আমাদের আত্মা। পূর্ব্বে এই ভারতবর্ষে যখন মায়াবাদ প্রচলিত ছিল তখনকার বিশ্বাস আত্মাই নিত্য ও সত্য পদার্থ। সে অবস্থায় বাহ্য জ্ঞানের অলীকতায় লোকের অন্তর্দৃষ্টিই প্রবল হয়। কিন্তু ঐ মায়াবাদ দোষশূন্য নহে; আমি এই ধনধান্যপূর্ণ পৃথিবীকে প্রত্যক্ষ করিতেছি কিন্তু আমাকে বিশ্বাস করিতে হইবে ইহার অস্তিত্ব নাই। এই বিশ্বাস অমূলক, আমরা বস্তুতই এই পৃথিবীর বাহ্য বিষয় আমাদেরই জন্য, কিন্তু আকাশে যেমন পক্ষীর পদচিহ্ন পড়ে না, জলে যেমন মৎস্যের গতিরেখা দৃষ্ট হয় না, আমাদেরও বিষয়ক্ষেত্রে বিচরণ সেই রূপ হওয়া আবশ্যক। আমরা বাহ্য ব্যাপারে থাকিব কিন্তু তাহাতে লিপ্ত হইব না। কার্য্য করিব কিন্তু স্বয়ং কর্ত্তৃত্ব-বুদ্ধি-শূন্য হইয়া থাকিব। এই রূপে বিষয়ের মধ্যগত হইয়া চিত্তের প্রত্যাহার যতদূর আবশ্যক করিব তবেই আমাদের অন্তর্দৃষ্টি বর্দ্ধিত হইবে এবং ধর্ম্ম ও রক্ষা পাইবে।

এই সঙ্কোচ বা আত্মদৃষ্টি বিক্ষেপ বা বহির্দৃষ্টির উপর সমস্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ভর করিতেছে। অদ্য আমরা এই মূল সূত্র ধরিয়া ব্রাহ্মসমাজকে পরীক্ষা করিতে এই প্রস্তাবের অবতারণা করিলাম। ইতি পূর্ব্বে জনসমাজ উপধর্ম্মে উপহত হইয়া বিচেষ্টমান হইতেছিল। সেই উপধর্ম্মের শৃঙ্খল ছেদন এবং জনসমাজকে বিশুদ্ধ ধর্ম্মে অবস্থাপন এই দুইটি লক্ষ্য করিয়া ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ব্রাহ্মের উচিত যে তাঁহারা এই লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করেন। কিন্তু আমরা দেখিতেছি তাহা হইতেছে না। ইহার কারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়ম ও ব্যবহারগত দোষ। আমরা এই নিয়ম ও ব্যবহারের দোষ প্রতিপাদন করিবার জন্য আপাতত দুই একটী বিষয় উল্লেখ করিতেছি।

প্রথমত ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্মপ্রচার আলোচনা করা আবশ্যক। আমরা নিজে যে সত্যটি পাইয়াছি সর্ব্ব সাধারণের সহিত তাহা নির্ব্বিশেষে ভোগ করিবার জন্য আমাদের একটি প্রবল আবেগ উপস্থিত হয়, সেই জন্যই ধর্ম্মপ্রচার। আমরা জনসমাজের পক্ষে তাহা শ্রেয়স্কর মনে করি। কিন্তু বর্ত্তমানে যেরূপে ধর্ম্মপ্রচার আরম্ভ হইয়াছে সেটি নির্দ্দোষ নহে। মনুষ্য ধর্ম্ম ও বিদ্যা বুদ্ধিতে যতই কেন উন্নত হউন না আমরা দেখিতেছি তিনি প্রশংসানুরাগ সহজে এড়াইতে পারেন না। অন্য কোন পার্থিব ব্যাপারে হয় ত ইহা দ্বারা কোন সুফল ফলিতে পারে কিন্তু ধর্ম্মরাজ্যে ইহা একটী অনর্থের কারণ হয়। এই প্রবল প্রশংসানুরাগে মনুষ্যের শেষে নিজের দেবত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা দাঁড়ায় এবং তিনি ক্রমে ঈশ্বরের পবিত্র সিংহাসন স্বয়ং অধিকার করিয়া বসেন। মনুষ্যের অতীত ইতিবৃত্ত তাহার সাক্ষ্যস্থল। আমরা দেখিতেছি ব্রাহ্মসমাজে এই প্রশংসানুরাগ প্রবেশলাভ করিতেছে। শ্রীলাবণ্য-শোভিত পুষ্পে বিকট কীট প্রবেশ করিতেছে। ইহার প্রমাণ এই সমস্ত সম্প্রদায়ের সম্বাদ পত্র। আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই এই সমস্ত

সংবাদপত্র ধর্ম্মপ্রচারকের তিলপ্রমাণ কার্য্য তালপ্রমাণ করে। তাঁহাকে উৎসাহিত করিবার জন্য মুষলধারে প্রশংসা-বৃষ্টি করিয়া থাকে। কিন্তু এক জন ধর্ম্মপ্রচারকের পক্ষে স্তুতি নিন্দা সমান হওয়া উচিত। এই স্থলে একটী ঘটনা মনে পড়িল। একদা এক জন সন্ন্যাসী আমাদের নিকট উপস্থিত হন। তিনি আসিয়া কহিলেন, আমি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত। আমরা গৃহে কোন রূপ খাদ্য সামগ্রী নাই দেখিয়া, তাঁহাকে কিছু পয়সা দিতে চাহিলাম। কিন্তু সন্ন্যাসী তাহাতে অসম্মত হইয়া কহিলেন আমি ক্ষুধার্ত্ত, কেবল কিছু খাদ্য সামগ্রী চাই। তখন আমরা তাঁহার সপর্য্যাবিধানের জন্য প্রচুর আয়োজন করিয়া দিলাম। কিন্তু সন্ন্যাসী ঐ সমস্ত খাদ্য সামগ্রীর যৎকিঞ্চিৎ মাত্র গ্রহণ করিলেন এবং তাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট সেই সমস্ত খাদ্য দ্রব্য পড়িয়া রহিল। তদ্দৃষ্টে আমরা বিস্মিত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি কহিলেন, জঠরজ্বালা শান্তির জন্যই উদাসীনের আহার, যাহাতে লোভ বৃদ্ধি হয় আপনারা এমন কোন দ্রব্য উদাসীনকে দিবেন না। উদাসীনের এই কথা ব্যাপক ভাবে লইলে এই বুঝা যায় যে ধর্ম্মার্থীকে কোন প্রকার লোভ [illegible] [illegible] দোষাবহ। আমরাও বলি [illegible] ধর্ম্মকামনায় পিতা মাতাকে [illegible] ব্রাহ্মসমাজে [illegible] দিয়াছেন প্রশংসার [illegible] আর তাহাদিগকে বধির করা হয় কেন? বরং প্রশংসারব লোকের বহির্দৃষ্টি বর্দ্ধিত করিয়া দেয়। যাঁহার বহির্দৃষ্টি প্রবল তাঁহার দ্বারা প্রকৃত পক্ষে ধর্ম্মপ্রচার হইতে পারে না।

এখন যে প্রণালীতে ধর্ম্মপ্রচার হইতেছে তাহা সম্পূর্ণ বৈদেশিক অনুকরণ। কিন্তু ভারতবর্ষে প্রচারের ভাব ভিন্নরূপ। পূর্ব্বকার রীতি এখনকার লোক আজিও বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। পূর্ব্বে কোন অরণ্যে বহুসংখ্য ঋষি সমবেত হইতেন। মধ্যস্থলে তত্ত্বদর্শী কুলপতি বেদির উপর উপবিষ্ট। সমবেত ঋষিগণ তাঁহাকে ধর্ম্মরহস্য জিজ্ঞাসিতেছেন। তিনি তাহার সদুত্তর প্রদান করিতেছেন। এখনও এক জন নিরক্ষর সামান্য কথক যে পরিমাণে লোকের মনে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি জাগরূক করিয়া দেন ব্রাহ্মসমাজের এক জন সুশিক্ষিত প্রচারক তাহার শতাংশের একাংশও করিতে পারেন না। ফলত এতদ্দেশীয় লোকের মনকে পূর্ব্ব-ভাব সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া আছে। বৈদেশিক অনুকরণে ধর্ম্মপ্রচার তাহা যে শীঘ্র আয়ত্ত করিতে পারিবে সে সম্ভাবনা নাই। আর যদি বিবেচনা করা যায় তাহা হইলে এতদ্দেশের চিরপরিচিত বিশুদ্ধ রীতি পরিত্যাগ করিয়া অনুকরণে অধিকতর প্রয়াস কেবল বহির্দৃষ্টিরই পরিচায়ক বলিয়া বোধ হয়।

এখনকার ব্রাহ্মসাহিত্যে একবার দৃষ্টিপাত কর ইহাতেও এই বহির্দৃষ্টির পরিচয় পাইবে। যে সমস্ত উচ্চ ভাব অন্তরে তাড়িতবৎ প্রবেশ করে, যাহার প্রভাবে হৃদয় বিনীত ও প্রাণ শীতল হয় ইদানীন্তন ব্রাহ্ম সাহিত্যে আর তাহা দেখিতে পাই না। কোন একটী উপদেশ শুনিবার জন্য যাও তন্মধ্যে কেবলই দেখিবে ধর্ম্মের সহজ ও সরল ভাব অপেক্ষা ভাষা ও অলঙ্কারের প্রতি বক্তার অধিক দৃষ্টি। তিনি কিসে পদ্মাস্রোতের ন্যায় অনর্গল বলিতে পারিবেন, কিসে নিজের বিদ্যা বুদ্ধি প্রচার করিতে পারিবেন সেই দিকেই তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য। আমরা বলিতেও লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হই এক জন ধর্ম্মপ্রচারক বেদি হইতে অবতরণ করিয়াই গম্ভীর ভাবে আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন আপনারা ইতিপূর্ব্বে এই রূপ বক্তৃতা শুনিয়াছেন কি না? তিনি ধর্ম্মবুদ্ধি অপেক্ষা অধিকতর বৈষয়িক বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া যে ঐ রূপ জিজ্ঞাসা করেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ফলত এই রূপ বাহ্যদর্শী লোকের দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের সে লক্ষ্য সিদ্ধ হইতেছে আমাদিগের কিছুতেই এরূপ বিশ্বাস হয় না।

আজ কাল ব্রাহ্মসমাজে গতানুগতিক লোকের সংখ্যাই অধিক। ইহাদের একটা স্বাধীন চিন্তা নাই। ইহারা গড্ডলিকা-প্রবাহের ন্যায় জ্যেষ্ঠেরই অনুসরণ করিয়া থাকে। এই রূপ অবস্থায় প্রচারকের একটু বিশেষ সতর্কতা আবশ্যক। লোকের যে ধর্ম্ম-জীবন গঠিত হইবে তিনিই তাহার দৃষ্টান্তস্থল হইতেছেন। কিন্তু দেখিতেছি

তাঁহারই বিশ্বাস ও কার্য্যে সামঞ্জস্য নাই। তাঁহার বিশ্বাস ও কার্য্যে যেমন সামঞ্জস্য থাকা আবশ্যক সেই রূপ আবার কার্য্যে অনাড়ম্বর ও বিনয় রক্ষা করা চাই। আহার ঋষিসেব্য শাকান্ন, বাসস্থান বেণুবীণানিনাদিত প্রাসাদ, কিন্তু বলিবেন বদরীমূলে পবিত্র পর্ণ-কুটীর। এইরূপ বিনয়-প্রচ্ছন্ন আড়ম্বর একজন ধর্ম্মপ্রচারক আচার্য্যের পক্ষে বিশেষ দূষণীয় সন্দেহ নাই। এই বৈষম্য এক জন সুকুমার-মতির ধর্ম্মে বিতৃষ্ণা জন্মিবার বিশিষ্ট কারণ। সে তাঁহাকেই জীবন-পথের ধ্রুব তারা দেখিয়া ছিল, কিন্তু তাঁহার এই অনবস্থা সহজেই তাহাকে আত্মদৃষ্টির বাহিরে আনিয়া ফেলে এবং সে ধর্ম্মকে বিড়ম্বনা বোধ করে।

দ্বিতীয়তঃ স্ত্রীস্বাধীনতা। এই একটী বিষম ব্যাপার হইয়াছে। স্ত্রীজাতি স্বভাবতই বিলাসপ্রিয়, অধিক কি বিলাসই ইহাদের জীবন। রুদ্ধ অবস্থাতে বরং এই বিলাসের ভাব কিছু খর্ব্ব থাকিবার সম্ভাবনা কিন্তু শৃঙ্খলমুক্তির অবস্থায় ইহা যে উদ্দাম হইয়া উঠিবে তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহার বিশেষ কারণও আছে। অবরোধ-কালে যিনি যে অবস্থার লোক তাঁহার সেইরূপই সংসর্গ হইয়া থাকে, যদিও কখন কখন সংসর্গে বৈষম্য ঘটনা হয় কিন্তু তাহা অল্প কালের জন্য। ইহা দ্বারা এক শ্রেণীর অভ্যাস অন্য শ্রেণীতে সহজে সংক্রমিত হয় না। কিন্তু স্বাধীন অবস্থায় সেইটি হয়। সংসর্গের গাঢ়তা এক শ্রেণীর অভ্যাস অন্য শ্রেণীতে সংক্রম করে। এখন ব্রাহ্মসমাজে ধনী ও নির্ধন দুই প্রকার অবস্থার লোক আছেন। ইহাঁদের মধ্যে ধর্ম্মসম্পর্কে সংসর্গের গাঢ়তাও জন্মিতেছে, কিন্তু ইহা একটি অব্যর্থ কথা যে সাম্য সম্বন্ধ না থাকিলে বন্ধুতা হয় না, কি আহার ব্যবহার কি পরিচ্ছদ-পরিপাটী সকল বিষয়েই মৈত্রীসূত্রে সাম্য থাকা আবশ্যক। স্ত্রীজাতি একত বিলাসপ্রিয় তাহাতে আবার উচ্চ নীচ নির্ব্বিশেষে পরস্পর-সম্পর্ক ও মিত্রতা, ইহাতে উচ্চ শ্রেণীর রুচি ও অভ্যাস নিম্নশ্রেণীর মধ্যে যে সহজেই সংক্রমিত হইতেছে তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এখন একবার বুঝিয়া দেখ এই ব্যাপারটি কি গুরুতর। প্রথমতঃ স্ত্রীজাতির স্বাভাবিক বিলাস চরিতার্থ করাই বর্ত্তমানে বহুব্যয়-সাধ্য হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে আবার উচ্চ সংসর্গ, সুতরাং এই উচ্চ অবস্থার উচ্চ রুচি অনুকরণ করিতে গিয়া যে কতটা ব্যয়-ভার সহ্য করা আবশ্যক তাহা সামান্য জ্ঞানেও বুঝিতে পারা যায়।

এস্থলে আর একটী কথা বলা আবশ্যক। হিন্দুসমাজে একান্নবর্ত্তিতার ভাব প্রবল, আজিও এই প্রণালী বিলক্ষণ প্রচলিত আছে; হিন্দুস্ত্রীদিগের আর পাঁচটার মুখাপেক্ষায় এই বিলাসের ভাব কিছু দমনে থাকে। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে আর একান্নভুক্ত-পরিবার-প্রণালী নাই। যুগল মূর্ত্তিই এক এক পরিবার, এস্থলে স্ত্রীজাতির ইচ্ছা যে নিরঙ্কুশ হইবে তাহা সহজেই বুঝা যায়। ব্রাহ্মেরা এই নিরঙ্কুশ ইচ্ছার কশাঘাতে যে কি পর্য্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতেছেন তাহা ভাবিলেও দুঃখ হয়! ব্রাহ্মদিগের মধ্যে নিম্ন অবস্থার লোকই অধিক, তাহার উপর আবার তাঁহাদিগের স্কন্ধে একএকটী মুক্তবায়ুবিহারিণী স্ত্রী চাপেন। ইহাদের ষোড়শোপচারের আয়োজিত বিলাসের জন্য ব্রাহ্মদিগের মধ্যে অর্থলোভ অতিমাত্র প্রবল হইয়া উঠিতেছে। ফলতঃ এই স্ত্রীস্বাধীনতা প্রভাবে ব্রাহ্মেরাও যে ইউরোপীয়দিগের ন্যায় বাহ্যসুখ সাধনে বিব্রত তাহার সন্দেহ নাই। আর একটু বক্তব্য আছে, একবার কিছু ব্যয় করিয়া কোন রূপ স্থায়িতর অলঙ্কারাদি প্রস্তুত করা এতদ্দেশের রীতি। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে ইহার বিপরীত, ইহাতে ইউরোপীয় অনুকরণ প্রবল বেগে চলিতেছে। সুতরাং সেই স্থায়িতর অলঙ্কারাদির প্রতি ব্রাহ্মসমাজের দৃষ্টি নাই। যে সকল দ্রব্য অল্পকালের জন্য ব্যবহার্য্য, সাময়িক রীতির উত্তেজনায় এবং বৈদেশিক অনুকরণের আবেগে তদ্বিষয়েই লোকের দৃষ্টি পড়িয়াছে। ইহার প্রভাবে ব্রাহ্ম যে কোন দিনের জন্য শান্তি-সুখ অনুভব করিবেন তাহার সম্ভাবনা নাই। ধর্ম্ম শান্তির সহচর, শান্তি না থাকিলে ধর্ম্ম থাকেন না। ব্রাহ্মেরা এই স্ত্রীস্বাধীনতার

প্রশ্রয় দিয়া এবং তন্নিবন্ধন বৈদেশিক জীবন-প্রণালীর আশ্রয় লইয়া দুর্ব্বহ সংসার-ভারে নতশির হইতেছেন। ইহাঁদের আর অন্তর্দৃষ্টির অবসর কৈ?

আমরা সঙ্ক্ষেপত ব্রাহ্মসমাজের নিয়ম ও কার্য্য-প্রণালী আলোচনা করিয়া বুঝিলাম যে ব্রাহ্মসমাজে এখন বাহ্যভাবই প্রবল। তাহাতে আবার গণ্ডের উপর একটী বিস্ফোটক জন্মিয়াছে। সেইটি নিরীশ্বর বিবাহ। আমরা পূর্ব্বেই কহিয়াছি যে এখন এই বিবাহে গৌণকল্পে ঈশ্বরোপাসনা রহিয়াছে কিন্তু ভবিষ্যতে ইহা না থাকিবারই সম্ভাবনা। কারণ গৌণ কল্পের কুত্রাপি চিরকাল আদর থাকে না। এক্ষণে এই নিয়ম ও কার্য্যগত দোষ নিবন্ধন উপস্থিত সঙ্কট এবং রেজেষ্টরি বিবাহ নিবন্ধন ভাবী সঙ্কট ব্রাহ্মসমাজের এই উভয় সঙ্কটে আমাদের ভয় হয়। ফলত ব্রাহ্মসমাজ অচিরাৎ ধর্ম্মশূন্য হইয়া পড়িবে। আমরা ধর্ম্ম ও ঈশ্বরকে চাই। যে সমস্ত চেষ্টা আমাদের এই ইচ্ছার পরিপন্থী হয় তাহা পরিত্যাগ করা আবশ্যক। বরং সেই পূর্ব্বতন মায়াবাদ ভাল, কারণ তাহা বাহ্যভাব এককালে বিলুপ্ত করিয়া আমাদিগকে ধর্ম্ম ও ঈশ্বরের দিকে প্রেরণ করিয়াছিল, কিন্তু যাহাতে ধর্ম্ম ও ঈশ্বরকে হারাইতে হয় সে বাহ্য ভাব কোনও মতে প্রশংসনীয় নয়।

হা! আমরা কিছুকাল পূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজের যেরূপ অভ্যুদয় দেখিয়া ছিলাম এখন আর সেরূপটী দেখিতে পাই না। বড় অধিক দিনের নয় ব্যাখ্যানের কালটি মনে করিলেই ইহা বুঝিতে পারা যায়। তখন কি সময়ই গিয়াছে! কি উৎসাহই ছিল! মতবিরোধ কোনও আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই, সকলের এক মন ও এক প্রাণ। আমরা ব্রাহ্মের মুখশ্রীতে পবিত্র ধর্ম্মজীবনের জ্বলন্ত দীপ্তি ও গাম্ভীর্য্য দেখিতাম; নেত্রে উপাসনাশীলতার শান্তি ও ওজস্বিতা দেখিতাম। এখন সেই সৌম্য মূর্ত্তি আর একটীও চক্ষে পড়ে না। ব্রাহ্মসমাজের এই শোচনীয় অবস্থা দেখিলে পাষাণও বিগলিত হয়।

আয় ব্যয়

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫০।

বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ১৮০১ শক।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	...	৫৭৬/১০
পূর্ব্বকার স্থিত		...	১৮৯৷৷১০
সমষ্টি	...	...	৭৬৫৷৵০
ব্যয়	...	...	৫৮১৷৫
স্থিত	...	...	১৮৪৷/১৫

আয়

ব্রাহ্মসমাজ		১২২৵৫
দান প্রাপ্তি।		
শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়	১০	
„ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের অন্তঃপুরের দান	১০	
„ শিবচন্দ্র নন্দি	১০	
„ মণিলাল মল্লিক	৪	
„ শ্রীনাথ মিত্র	৩	
„ বনমালী চন্দ্র	২	
„ কালীনাথ দত্ত	২	
„ রাখাল রাজ রায়	১	
„ বৈকুণ্ঠনাথ সেন	১	
„ মৃত রামলাল গঙ্গোপাধ্যায়	৩৬	
	৭৯	
দানাধারে প্রাপ্ত	৭৷০	
সঙ্গীতের কাগজ বিক্রয়	৪৸৵১৫	
ভিন্ন ভিন্ন সমাজে ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান আদি পাঠাইবার মাশুল আদায়	৩০৸৶১০	
	১২২৵৫	
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	১১৩৷৶১০
পুস্তকালয়	...	৪০ (৫
যন্ত্রালয়	...	২৬৯
গচ্ছিত	...	৩১৷৶১০
সমষ্টি		৫৭৬/১০

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	...	...	১৫৩৷৷১০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা..		...	১৯৮/০
পুস্তকালয়	...	...	৩৬৷৷১০
যন্ত্রালয়	...	...	১৫৯৸৵১০
গচ্ছিত	...	...	৩৩৶১৫
সমষ্টি			৫৮১৷৫

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

সম্বৎ ১৯৩৬। কলিগতাব্দ ৪৯৮০। ১ শ্রাবণ বুধবার।

iReg sterd NO 52.

দশম কল্প
প্রথম ভাগ
৪৩৩ সংখ্যা
ভাদ্র ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫০
শক ১৮০১

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ब्रह्मवा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयसर्व्ववित सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्य साधनञ्च तदुपासनमेव।

মুক্তি।

অজ্ঞান ও মোহ-জাল, পাপাসক্তি ও সংসার-বিমুগ্ধতা প্রভৃতিই আত্মার বন্ধন। সাধন উপাসনা দ্বারা এই সকল গ্রন্থি ছেদ করিতে পারিলে—এই সকল বন্ধন উন্মোচন করিয়া ব্রহ্মের সত্তা সামীপ্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইলেই আত্মা মুক্ত হয়। কিন্তু এই অবস্থাতেই আত্মা নিঃশঙ্ক রূপে চির-মুক্তি সম্ভোগ করিতে পারে না। সংসার যে প্রকার স্থান, এখানকার প্রলোভন যেরূপ রাশি রাশি, তাহাতে একবার ঈশ্বরের সহিত যোজিত-আত্মা হইলেও আবার তাঁহা হইতে জীবকে বিচ্যুত হইতে দেখা যায়। সেই জন্য সাধকের আত্মোন্নতির অবস্থা-ভেদে সালোক্য, সাযুজ্য, সারূপ্য এবং নির্ব্বাণ এই চতুর্ব্বিধ মুক্তি আর্য্য-ধর্ম্ম-শাস্ত্রে উক্ত হইয়া থাকে। এই চতুর্ব্বিধ মুক্তির প্রকৃতি ও অবস্থা পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে আর্য্য ঋষিদিগের আধ্যাত্মিক উন্নতির পরাকাষ্ঠা উপলব্ধি করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। তাঁহারা যে পৃথিবীতে আত্মোন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা ব্যক্ত করিতে রসনা সঙ্কুচিত হয় না। তাঁহারদের নিগূঢ় আধ্যাত্মিক তত্ত্বের প্রগাঢ় তাৎপর্য্য বোধে অসমর্থ হইয়া, দেশ বিদেশীয় কত লোকেই তৎসমূহের কত প্রকার ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্ত প্রকাশে প্রবৃত্ত হওত মূল তাৎপর্য্যকে বিপর্য্যস্ত করিয়া দিয়াছেন। কত লোকেই সেই পূজ্যপাদ মহর্ষিদিগকে লোকসমাজে উপহাসাস্পদ করিয়া তুলিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। যাঁহারদের মুখ-বিনির্গত এক একটি তেজোময় অগ্নিময় মহাবাক্য যখন লক্ষ লক্ষ লোকের চিত্তকে জাগ্রৎ করিয়া তুলিতেছে, যাঁহারদের আদেশ উপদেশ সকল বর্ত্তমান সময়ে জ্ঞান বিজ্ঞানের তীব্র জ্যোতির মধ্যেও অক্ষত অব্যাহত থাকিয়া যখন সাধারণ মনুষ্য জাতির ধর্ম্মের আদর্শ হইয়া সর্ব্বত্র পূজিত ও সমাদৃত হইতেছে, বস্তুতঃ তখন তাঁহারাই যে সর্ব্বাপেক্ষা লোক-সাধারণের নিকটে অধিকতর আদরণীয় ও মাননীয় তাহা কে না স্বীকার করিবে?

ইহা কে না জানে, যে, কোন জ্যোতির্ব্বেত্তা; ভূতত্ত্ববেত্তা বা চিকিৎসাবেত্তা প্রভৃতির কোন নিগূঢ় সিদ্ধান্ত অবগত হইতে

গেলে, আপনাকে জ্ঞান বিজ্ঞানে তাঁহারদের সমান উন্নত করিতে না পারিলে কোন প্রকারেই তাহা সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। পরমার্থ-বিদ্যা বিষয়ে সেই নিয়মের ব্যভিচার করিলে যে তাহার বিপরীত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়, তাহা মুক্ত কণ্ঠে সকলকেই স্বীকার করিতে, হইবে। পদার্থ-বিদ্যা-ঘটিত কোন তত্ত্ব সপ্রমাণ করিতে গেলে যেমন ভৌতিক জগৎ হইতেই তাহার প্রমাণ আহরণ করিতে হয়, তেমনি আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সম্বন্ধে কোন সত্য উপলব্ধি করিতে হইলে আত্মা দিয়াই তাহা বুঝিতে হয়। যাঁহারদের অন্তর্দৃষ্টি ক্ষীণ এবং যাঁহারদের আত্মা পাপ-বিকারে বিকৃত, যাঁহারদের বুদ্ধি বিদ্বেষ-ভাবে দূষিত, যাঁহারদের স্বাভাবিক সরল-জ্ঞান-জ্যোতি কুসংস্কার দ্বারা আচ্ছাদিত, তাঁহারা কদাচ অপরের আত্মোন্নতির আধ্যাত্মিক ভাবের প্রকৃত তাৎপর্য্য বোধে সমর্থ হইতে পারেন না। এই কারণেই শুদ্ধ ভারতবর্ষে কেন, সমুদায় পৃথিবীর ধর্ম্ম-শাস্ত্র ও ধর্ম্ম-মত সকল নানা দোষ ভ্রমে দূষিত ও বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। একজন অত্যুন্নত তেজীয়ান্ মহা পুরুষ সাধন ও তপস্যা-প্রভাবে কোন উজ্জ্বল সত্য লাভ করিয়া জগতের কল্যাণ-কামনায় তাহা ব্যক্ত করিলেন, তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী কোন শিষ্যানুশিষ্য হয়তো আপনার গৌরব-কামনায় অথবা তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য-বোধে অসমর্থ হইয়া তাহার ভিন্ন অর্থ প্রচার করত প্রকৃত সত্যের অনাদর এবং গুরুর অবমাননা করিয়া ফেলিলেন। কিম্বা শিষ্যগণ বুদ্ধি বা ধৃতি-শক্তির দোষে তাহার বিপরীত অর্থ তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়া তাহার বিকৃত আকার প্রদান করিলেন। মনুষ্যের স্বভাব-সুলভ এই রূপ ভ্রম প্রমাদ সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হইয়া থাকে। আর্য্য-ধর্ম্ম-শাস্ত্রে মুক্তির প্রকৃত অর্থ একরূপ হইলেও অনেকানেক আচার্য্য ও টীকাকারগণ আপনাপন রুচি ও প্রবৃত্তি অনুসারে তাহার নানা ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য্য প্রকাশ করাতে তাহা নানা লোক দ্বারা নানা অর্থে গৃহীত হইয়া থাকে। কেহবা জীবন্মুক্ত পুরুষের ধ্যান-ধারণা প্রয়োজন নাই; কেহ বা ব্রহ্ম-যোজিত-চিত্ত সাধুর পক্ষে আর ঈশ্বর-প্রীতি এবং তাঁহার প্রিয়-কার্য্য সাধন আবশ্যক নাই, কেহ বা লক্ষ্য-বিদ্ধ শরের ন্যায় জীব ব্রহ্মের একত্ব স্বীকার করিয়া ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপ পুণ্যের প্রভেদ নাই, ইত্যাকার নানা সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া মুক্ত আত্মার অনন্ত উন্নতি-পথে কণ্টক অর্পণ করিয়া থাকেন এবং ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসু সাধু সদাশয় লোক সকলকে ভ্রান্তি-চক্রে নিক্ষেপ করেন। তদ্‌-বিরুদ্ধে শত শত শাস্ত্রীয় প্রমাণ বর্ত্তমান থাকিলেও তাহা অবলম্বন পূর্ব্বক উল্লিখিত মতামত খণ্ডনে প্রবৃত্ত না হইয়া প্রাগুক্ত চতুর্ব্বিধ মুক্তির নামানুরূপ সহজ অর্থ তাৎপর্য্য প্রকাশে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

অজ্ঞান ও মোহ-জাল, পাপাসক্তি ও সংসার-বিমুগ্ধতা প্রভৃতিই আত্মার বন্ধন। সাধন উপাসনা দ্বারা এই সকল হৃদয়-গ্রন্থি ছেদ করিয়া, এই সকল বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া ব্রহ্মের সত্তা সামীপ্য উপলব্ধি করিবার নামই মুক্তি। সামান্যতঃ যেমন একটী মাত্র মহা সমুদ্র ভূমণ্ডলকে বলয়াকারে বেষ্টন করিয়াছে কিন্তু দেশভেদে প্রকৃতি-ভেদে যেমন তাহা পঞ্চ নামে অভিহিত হইয়া থাকে; পৃথিবীমধ্যে যেমন একটী মাত্র পর্ব্বত-শ্রেণী বিদ্যমান থাকিলেও স্থানভেদে নানা নামে আখ্যাত হয়, তেমনি মুক্তি, সাধারণতঃ এক হইলেও সাধকের আত্মোন্নতির অবস্থা-ভেদে তাহা চতুর্ব্বিধ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে। পর্ব্বতের মধ্যে

পৃথ্বীমণ্ডলে যেমন হিমালয়ই সর্ব্বোচ্চ, তেমনি মুক্তির মধ্যে এই অধোলোকে নির্ব্বাণ মুক্তিই আত্মোন্নতির চরম-সীমা।

১ম সালোক্য-মুক্তি। মানব-আত্মা অজ্ঞান-অন্ধকার ও পাপ-মোহ-জাল হইতে বিমুক্ত হইলেই পিঞ্জরমুক্ত বিহঙ্গের মুক্তাকাশ প্রাপ্তির ন্যায়, সত্যজ্ঞান অনন্ত স্বরূপ ঈশ্বরের সত্তা সর্ব্ব প্রথমে বহির্জগতে উপলব্ধি করে। তখন সে আলোক অন্ধকারের, অমৃত গরলের প্রভেদ সুন্দর রূপে বুঝিতে পারে। তখন পাপের মলিনতা, পুণ্যের জ্যোতি তাহার অন্তশ্চক্ষুতে প্রতিভাত হয়। বালকের যেমন পুষ্পের শোভা, চন্দ্রের কান্তির প্রতি সর্ব্বাগ্রে দৃষ্টি নিপতিত হয়, তেমনি সেই নবোন্মুক্ত আত্মা সকল কালে সকল দেশে, ভূলোক দ্যুলোকে সেই একমাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের সত্তা সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিয়া প্রেমোৎফুল্ল হৃদয়ে বলিতে থাকে "সর্ব্বাদিশঊর্দ্ধমধশ্চ তির্য্যক্ প্রকাশয়ন্ ভ্রাজতে যদনড্বান্।" "সূর্য্য যেমন ঊর্দ্ধ অধঃ তির্য্যক্ সমুদায় দিক্ প্রকাশ করিয়া প্রকাশ পান, অদ্বিতীয় ঐশ্বর্য্যবান্ বিশ্বপ্রকাশক জগৎ-কারণ বরণীয় পরমেশ্বর সেই রূপ প্রকাশ পাইতেছেন।" "যস্যেম মহিমা ভুবি দিব্যে" ভূলোকে দ্যুলোকে তাঁহারই এই মহিমা। এই রূপে বহির্লোকে ঈশ্বরকে সন্দর্শন করাই মুক্তির প্রথম অবস্থা। মুক্ত আত্মার এই অবস্থাকেই সালোক্য মুক্তি কহে।

২য় সাযুজ্য মুক্তি। ঈশ্বরকে বহির্জগতে সন্দর্শন করিয়া মানব আত্মা পরিতৃপ্ত হয় না। আত্মার সঙ্গে ঈশ্বরের যে প্রকার নিকটতর নিগূঢ়তর সম্বন্ধ, তাঁহাতে সেই অন্তরতম প্রিয়তম পুরুষকে দূরে দেখিয়া আত্মার শান্তি লাভ আরাম লাভ হয় না। বহির্জগতে কখনও তাঁহাকে দেখা যায়, কখনও মোহ-মেঘ উত্থিত হইয়া সেই জ্ঞান-সূর্য্য, প্রেম-চন্দ্রকে আর দেখিতে দেয় না। যখন তাঁহাকে সন্দর্শন করা যায়, তখন হৃদয়-সরোবর প্রেমানন্দে উচ্ছ্বসিত হয়, আবার তাঁহার অদর্শনে পরক্ষণেই বিচ্ছেদ-যন্ত্রণায় আত্মা দগ্ধ হইতে থাকে। সুতরাং 'মুক্ত-আত্মা সাধু ক্ষণিক সুখ, ক্ষণিক দুঃখ, ক্ষণিক আনন্দ, ক্ষণিক বিষাদে উৎফুল্ল ও বিষণ্ণ হইয়া থাকিতে পারেন না। সেই জন্য সাধক সেই আনন্দ স্বরূপ অমৃত স্বরূপ পরব্রহ্মের সহিত সর্ব্বক্ষণ যোজিত-আত্মা হইয়া অবাধে যোগানন্দ, প্রেমানন্দ, ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিবার নিমিত্ত লালায়িত হইয়া তাঁহাকে আত্মাতে দেখিতে ইচ্ছুক হয়। দেব-প্রসাদে, আত্ম-প্রভাবে তাঁহাকে হৃদয়-কন্দরে প্রাপ্ত হওত বলিতে থাকেন "যশ্চায়ং পুরুষে। যশ্চাবাদিত্যে স একঃ।" যিনি এই আত্মাতে, তিনি এই আদিত্যে, তিনিই এক, তাঁহার সহিত সর্ব্ব কাল যোগ-যুক্ত হইয়া পরমানন্দে কালাতিপাত করেন। এই অবস্থাই মুক্তির দ্বিতীয় অবস্থা। ইহাকেই সাযুজ্য মুক্তি বলে।

৩য় সারূপ্য মুক্তি। মনুষ্য যেরূপ সংসর্গে অবস্থান করে, তাহার সেই প্রকার প্রকৃতি লাভ হয়। বিদ্বান্ লোকের সহবাসে, জ্ঞান-স্পৃহা উদ্দীপ্ত হয়, সাধু-সঙ্গে সাধু ভাবই বর্দ্ধিত হয়, ধার্ম্মিকের নিকট অবস্থান করিলে ভগবৎ-প্রেম উজ্জ্বল হইয়া উঠে—সৎকার্য্য, ধর্ম্মকার্য্য সাধনে ইচ্ছা হয়। মনুষ্য, যেরূপ আদর্শের নিকটে থাকে, তাহার স্বভাব প্রকৃতি স্বভাবতই সেই রূপে সংরচিত হইয়া থাকে। ব্রহ্ম-যোজিত-আত্মা যে সত্য-সুন্দর মঙ্গল-স্বরূপ পরমেশ্বরকে হৃদয়-কন্দরে অনিমেষ-জ্ঞান-নয়নে সর্ব্বদা নিরীক্ষণ করে, অহর্নিশি যাঁহার পবিত্র সহবাসে অবস্থান করে, প্রকৃতির

নিয়মেই সে তো তাঁহার স্বরূপের অনুকরণ করিবেই। শুদ্ধ-সত্ত্ব পবিত্র আত্মা, সেই অনন্ত-উন্নত পবিত্র আদর্শ পরমেশ্বরের নিকটে থাকিয়া জবাকুসুম-সন্নিহিত স্ফটিকের ন্যায় তাঁহার স্বরূপের প্রতিবিম্ব তো প্রাপ্ত হইবেই। এই অবস্থাতেই উন্নত-আত্মা সাধুদিগের অন্তরতম প্রদেশ হইতে এই বাক্যই বিনির্গত হয় "ত্বম্ অস্মাকং তবাস্মি।" তুমি আমারদের, আমি তোমার। ইহাই মুক্তির তৃতীয় অবস্থা। সমুদায় আত্মার সহিত পরব্রহ্মের সত্য-সুন্দর মহান্ মঙ্গল-স্বরূপের অনুকরণ ও অনুসরণ করার নামই সারূপ্য-মুক্তি।

৪র্থ নির্ব্বাণ মুক্তি। আত্মা মুক্তির তৃতীয় অবস্থাতে উত্থিত হইয়া ঈশ্বরের স্নেহ করুণা ও মঙ্গল-ভাবের অনুকরণ করিতে সমর্থ হইলেও তাহার উন্নতির শেষ হয় না। সেই মুক্ত আত্মা, ঈশ্বরের উদার অকপট স্নেহের অনুকরণ করিয়া আত্মপর সকলকেই সমভাবে রক্ষণ-পালন করিতেছে, কিন্তু তাহার মূলে যশঃস্পৃহা বর্ত্তমান থাকিতে পারে। দীন-দরিদ্রদিগকে নানা কষ্ট ক্লেশ হইতে উদ্ধার করিতেছে, কিন্তু সেই করুণার অন্তরালে মান-সম্ভ্রম-লালসা সঞ্চরণ করিতে পারে। গ্রন্থাদি প্রণয়ন দ্বারা জগতের অজ্ঞান-অন্ধকার বিনষ্ট করিতেছে, কিন্তু তাহার ভিত্তি-মূলে মান-সম্ভ্রম-ইচ্ছা লুকায়িত থাকাও অসম্ভব নহে। বল বিক্রম দ্বারা বিশেষ বীরত্বের সহিত স্বদেশের অন্তঃ-শল্য উদ্ধারের চেষ্টা করিতেছে কিন্তু সেই অসম সাহসিক কার্য্য-মূলে দাম্ভিকতা দীপ্তি পাইতে পারে। শুদ্ধ-সত্ত্ব পবিত্র হইয়া ধর্ম্ম-সাধনে নিযুক্ত রহিয়াছে কিন্তু তাহার অভ্যন্তরে সাধুত্বের অভিমান অবস্থিতি করিতে পারে। বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, ধর্ম্ম-মন্দির প্রভৃতি সংস্থাপনে, সাধক অকাতরে অর্থ-সাহায্য করিতেছেন, কিন্তু সুখ্যাতি ও সন্নাম-ইচ্ছা তাহার মধ্যে অবস্থান করিতে পারে। ঈশ্বরের উদার মঙ্গল-স্বরূপের অনুকরণ ও অনুসরণ করিলেও সাধকের হৃদয়ে অহং-জ্ঞান দীপ্তি পাইতে পারে। আমি হর্ত্তাকর্ত্তা, দাতা পালয়িতা; আমি বিদ্বান্ ধার্ম্মিক ইত্যাকার অহং জ্ঞান ও অভিমান এবং দম্ভ মাৎসর্য্য পরিত্যাগ করিয়া নিরবচ্ছিন্ন নিষ্কাম ও নিঃস্বার্থ ভাবে ঈশ্বরের প্রিয়-কার্য্য সাধনে নিযুক্ত থাকাই নির্ব্বাণ মুক্তির লক্ষণ। সকল প্রকার ফল-কামনা-শূন্য হইয়া—অপর লক্ষ্যে জলাঞ্জলি দিয়া কেবল পরব্রহ্মের ইচ্ছা উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পাদনে ব্রতী থাকাই আত্মোন্নতির চরম অবস্থা। ক্ষতি লাভ ও পাপ পুণ্যের ফলাফল গণনায় নীয়মান না হইয়া—আপনার ক্ষুদ্রত্ব, লঘুত্ব বিসর্জ্জন দিয়া যখন সাধক ঈশ্বরের ইচ্ছা, অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্যের সহিত আপনার ইচ্ছা অভিপ্রায়কে একীভূত করিতে পারে, যখন তাঁহার উদার অনন্ত জ্ঞান প্রেম ও মঙ্গল-ভাবের সহিত আপনার জ্ঞান প্রেম মঙ্গল-ভাব, দুগ্ধ নিক্ষিপ্ত জলের ন্যায় বিলীন হইয়া যায়; যখন লক্ষ্য-বিদ্ধ শরের ন্যায় আত্মার সকলই ব্রহ্মের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া পড়ে; যখন তাঁহার জয়ে আমার জয়; তাঁহার মঙ্গলে আমার মঙ্গল; তাঁহার জগতের উন্নতিতে আমার আনন্দ অনুভূত হয়, তখনই সেই সাধক নির্ব্বাণ মুক্তির অধিকারী হইয়া থাকেন। তখনই সেই সাধক "স সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বমেবাবিবেশ" ঈশ্বরকে জানিয়াই সর্ব্বজ্ঞ হয়েন এবং সকলেতে প্রবেশ করেন। "সোঽশ্নুতে সর্ব্বান কামান সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা" তিনি তখন ঈশ্বরের সহিত কামনার সমুদায় বিষয় উপভোগ করিতে থাকেন। "তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়াতেই তাঁহার সকল

লোক প্রাপ্তি হয় এবং সকল কামনা সিদ্ধ হয়।" "সত্তু তৎপদমাপ্নোতি যস্মাৎ ভূয়োন জায়তে।" তিনি সেই ব্রহ্ম-পদ প্রাপ্ত হন, যাহা হইতে তাঁহার আর প্রচ্যুতি হয় না। ইহাই অধোলোকে আত্মোন্নতির চরম সীমা; ইহাই নির্ব্বাণ-মুক্তির প্রত্যক্ষ ফল। এই অবস্থাতেই সাধক "যথাদর্শে তথাত্মনি" এই ভাবই প্রত্যক্ষ প্রতীতি করেন।

সূর্য্য প্রকাশিত হইলে যেমন চন্দ্র-প্রভা দীপ্তি পায় না, তেমনি সূর্য্যের সূর্য্য জ্যোতির্ম্ময় ঈশ্বর যখন আত্মাতে প্রকাশ পান, তখন খদ্যোতসদৃশ আত্মপ্রভাব নির্ব্বাণ হইয়া যায়। যখন তাঁর অনুপম সৌন্দর্য্য অন্তরে বাহিরে জাজ্বল্যতররূপে পরিদৃষ্ট হয়, তখন আপনার সৌন্দর্য্য বিলুপ্ত হয়। যখন তাঁর অকপট উদার মঙ্গল ভাব, তাঁর অনির্ব্বচনীয় জ্ঞান শক্তি মহিমা চতুর্দ্দিকে দেদীপ্যমান দেখা যায়, তখন দম্ভ মাৎসর্য্য অহং-জ্ঞান স্বার্থপরতা নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়। তখন জীব হর্ষ শোক হইতে বিমুক্ত হইয়া স্বাধীন ইচ্ছার সহিত আপনার যথাসর্ব্বস্ব পরব্রহ্মে সমর্পণ করত অদীনসত্ত্ব হয়েন। চন্দ্র যেমন সূর্য্যের জ্যোতি প্রাপ্ত হইয়া জ্যোতিষ্মান্ হয়, আত্মা তেমনি ঈশ্বরের শোভা সৌন্দর্য্য অনুভব করিয়াই অপূর্ব্ব শোভা ও অতুলন ব্রহ্ম বর্চ্চস্ জ্যোতি ধারণ করত ব্রহ্মবান্ হয়েন। ইহাই নির্ব্বাণ মুক্তি, ইহাই নির্ব্বাণ মুক্তি। আত্মার লোকেতে ব্রহ্মদর্শনই সালোক্য মুক্তি; সর্ব্ব কালে যোগযুক্ত হইয়া আত্মাতে ব্রহ্ম দর্শনই সাযুজ্য মুক্তি, ভাবের সহিত ব্রহ্ম দর্শনই সারূপ্য মুক্তি; দেশ কাল ভাব ও কার্য্যের সহিত অচ্ছেদ্য যোগ-জনিত ব্রহ্ম লাভই নির্ব্বাণ মুক্তি।

সাধক দম্ভ, মাৎসর্য্য, অহংজ্ঞান ও স্বার্থপরতা পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মগত-প্রাণ হইতে পারিলেই পরম-পুরুষার্থ স্বরূপ নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করে। ভারতের সুপ্রসিদ্ধ কবি এবং সুবিখ্যাত ধার্ম্মিক মহাত্মা তুলসীদাস স্বীয় "দোঁহা" কদম্বে নির্ব্বাণ মুক্তির যে বিশদ অর্থ তাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা এই "ধনমদ তনমদ রাজমদ বিদ্যামদ অভিমান। এই পাঁচ কো আউটকে পাওয়ে পদ নির্ব্বাণ।" ধনমদ, দেহমদ, রাজ্যমদ, বিদ্যামদ, অভিমান এই পাঁচটি অতিক্রম করিতে পারিলেই জীব নির্ব্বাণ-পদ প্রাপ্ত হয়।

আবেস্তা।

(৪৩২ সংখ্যক পত্রিকার ৭৭ পৃষ্ঠার পর)

ষষ্ঠ অধ্যায়ে, যে ভূমির উপর মনুষ্য কিম্বা অন্য কোন পশু মরিয়াছে তাহার কি প্রকার ব্যবহার করিতে হইবে, মৃতশরীর জলে ভাসিতে দেখিলে অহুরমজদ্-প্রবর্ত্তিত নিয়মে নিষ্ঠাবান ব্যক্তির কর্ত্তব্য কি, এবং অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া কি প্রকারে সম্পন্ন করিতে হয়, প্রভৃতি কয়েকটি বিষয় বিবৃত হইয়াছে। জোরাস্তার জিজ্ঞাসা করিলেন হে অহুরমজদ্! যে ভূমির উপর কোন মনুষ্য বা পশু মরিয়াছে সে ভূমির কি রূপ ব্যবহার করিতে হইবে? অহুরমজদ্ উত্তর করিলেন হে জোরাস্তার, সে ভূমি এক বৎসর কাল কর্ষণ করিবে না ও তাহাতে বারি সেচন করিবে না। যদি কেহ তাহা কর্ষণ বা তাহাতে জল সেচন করে তাহা হইলে সে মৃত শরীরের সমাধিকরণরূপ মহাপাপে পাপী বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং তজ্জন্য সমুচিত দণ্ড প্রাপ্ত হইবে। জোরাস্তার জিজ্ঞাসা করিলেন হে সর্ব্বস্রষ্টা অহুরমজদ্! যদ্যপি তোমার নিয়মপালক কোন ব্যক্তি কোন মৃত শরীর জলে ভাসিতে দেখে তাহা হইলে

সে কি করিবে? অহুরমজদ্ উত্তর করিলেন হে জোরাস্তার! তখন সে ব্যক্তি পাদুকা ও পরিহিত বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া জলে নামিবে ও সেই মৃত শরীর উত্তোলন করিয়া শুষ্ক ভূমিতে রাখিয়া দিবে। জোরাস্তার জিজ্ঞাসা করিলেন হে অহুরমজদ্! আমরা মৃত শরীর কোথায় লইয়া যাইব, কোথায় তাহা রাখিয়া আসিব? অহুরমজদ্ উত্তর করিলেন হে জোরাস্তার! যথায় মাংসাশী কুক্কুর ও পক্ষিগণ অনায়াসে দেখিতে পায় এমন উচ্চ স্থানে মৃত শরীর লইয়া গিয়া রাখিয়া আসিবে। অহুরমজদের এই আজ্ঞা অনুসারে পারসীকেরা মৃত শরীর দাহ কিম্বা তাহার সমাধি না করিয়া এক উচ্চস্থানে রাখিয়া চলিয়া আইসে, উহা দ্বারা পরিশেষে কুক্কুর, শৃগাল ও নানা প্রকার মাংসাশী পক্ষীগণের উদর পূরণ হয়। পারসীকদিগের প্রধান আবাসভূমি বোম্বাই নগরে উহাদিগের উপরোক্ত প্রকার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদনার্থ যে স্থান আছে তাহা অত্যুচ্চ, প্রকাণ্ড ও সুবিস্তৃত। ঐ স্থানকে "Tower of Silence" অর্থাৎ "নিভৃত প্রাসাদ" বলিয়া থাকে।

সপ্তম অধ্যায়ে. বস্ত্র কিম্বা কাষ্ঠ অবিশুদ্ধ হইলে তাহা কি উপায়ে বিশুদ্ধ করিতে হইবে. যে সকল ব্যক্তি মৃত মনুষ্য কিম্বা পশুর মাংসাহার করিয়া অবিশুদ্ধ হইয়াছে কি করিলে তাহারা পবিত্র হইবে, চিকিৎসা বিদ্যা কি প্রকারে শিক্ষা করিতে হইবে ও চিকিৎসকদিগকে কি প্রকার পুরস্কার প্রদান করিতে হইবে ইত্যাদি কয়েকটি বিষয় বিরত হইয়াছে। পারসীকদিগের মতে চিকিৎসক তিন প্রকার। প্রথমতঃ যাঁহারা অস্ত্র প্রয়োগ দ্বারা চিকিৎসা করেন. দ্বিতীয়তঃ যাঁহারা উদ্ভিদ-ঘটিত ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা চিকিৎসা করেন, এবং তৃতীয়তঃ যাঁহারা মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা চিকিৎসা করেন। এই তিন প্রকার চিকিৎসকগণের মধ্যে শেষোক্ত প্রকার চিকিৎসকেরা অর্থাৎ যাঁহারা মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা চিকিৎসা করিয়া থাকেন তাঁহারাই প্রধান, এবং তাঁহারা রোগ নাশ করিতে সর্ব্বাপেক্ষা দক্ষ ও পটু বলিয়া সম্মানিত হয়েন। চিকিৎসক রোগ নাশ করিতে সমর্থ হইলে তিনি ভিন্ন ভিন্ন পদবীস্থ লোকের নিকট হইতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন। তিনি যদি কোন রাজাকে নীরোগ করিয়া থাকেন, রাজার নিকট হইতে তিনি চারিটী বৃষসংযুক্ত একখানি শকট পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন। তিনি যদি কোন পুরোহিতকে নীরোগ করিয়া থাকেন, পুরোহিতের নিকট হইতে তিনি শুভাশীর্ব্বাদ পুরস্কার পাইবেন। তিনি যদি কোন গৃহস্থকে নীরোগ করিয়া থাকেন, গৃহস্থের নিকট হইতে তিনি একটি ভারবাহী পশু পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন। তিনি যদি কোন ধনবান ব্যক্তির স্ত্রীকে নীরোগ করিয়া থাকেন, ধনবান ব্যক্তির স্ত্রীর নিকট হইতে তিনি একটি গাভী পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন। তিনি যদি কোন গৃহস্থের স্ত্রীকে নীরোগ করিয়া থাকেন গৃহস্থের স্ত্রীর নিকট হইতে তিনি একটি ঘোটকী পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন। পারসীকদের মতে মৃত শরীর সমাহিত করা মহাপাপ বলিয়া গণ্য হওয়াতে সমাধি-মন্দির সকল ধ্বংশ করা একটি শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। অহুরমজদ্ জোরাস্তারকে কহিলেন, হে পবিত্র জোরাস্তার! মনুষ্যবর্গকে সমাধি-মন্দির সকল ধ্বংশ করিতে উপদেশ দেও এবং উত্তেজিত কর। যে ব্যক্তি একটি মাত্র সমাধি-মন্দির ধ্বংশ করিতে পারে সে কায়মনোবাক্যে যে সমুদায় পাপ করিয়াছে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করে। সে নশ্বর জগৎ হইতে অবিনশ্বর

জগতে স্থান পায় এবং স্বর্গে গমন করিতে তাহাকে কেহ বাধা দিতে পারে না। সূর্য্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রগণ তাহার সাধুবাদ করে, এবং বিশ্বস্রষ্টা আমি অহুরমজদ্ তাহার প্রশংসা করি।

অষ্টম অধ্যায়ে, যে গৃহে মনুষ্য কিম্বা কোন পশু মরিয়াছে কি কি প্রক্রিয়া দ্বারা সেই গৃহের অশুচি ভাব দূর করিতে হইবে, যে সকল ব্যক্তি মৃতদেহ বহন করিয়া লইয়া যায় কি কি উপায়ে তাহারা পবিত্র হইবে, যে পথ দিয়া শব লইয়া গিয়াছে সেই পথের অশুচি ভাব দূর করিবার জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক, মৃত শরীর বস্ত্র দ্বারা আবৃত করিবার অবৈধতা, এবং কেহ ঐ অবৈধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে তাহাকে কি শাস্তি প্রদান করিতে হইবে, এবং নিভৃত প্রদেশে দৈবক্রমে মনুষ্য কিম্বা কোন পশুর মৃত শরীর স্পর্শ করিলে কি উপায়ে তজ্জনিত অশুচিত্ব দূর হইবে, প্রভৃতি কয়েকটি বিষয় বিবৃত হইয়াছে। যে গৃহে কোন মনুষ্য কিম্বা পশু মরিয়াছে সে গৃহের অশুচিত্ব দূর করিবার জন্য অহুরমজদ্ চন্দনকাষ্ঠ, দাড়িম্ব বৃক্ষের কাষ্ঠ ও অন্যান্য কয়েক প্রকার সুগন্ধি কাষ্ঠ প্রজ্বলিত করিতে আজ্ঞা করিয়াছেন। জোরাস্তার জিজ্ঞাসা করিলেন হে অহুরমজদ্! যাহারা মৃতদেহ বহন করিয়াছে তাহারা পবিত্র হইবার জন্য কি করিবে? অহুরমজদ্ উত্তর করিলেন হে জোরাস্তার! শববাহকেরা পবিত্র হইবার জন্য গোমূত্রে স্নান করিবে। যে পথ দিয়া শব লইয়া গিয়াছে সেই পথের অশুচিত্ব দূর করিবার জন্য পারসীকদিগকে যে যে উপায় অবলম্বন করিতে হয় তন্মধ্যে একটি অতি অদ্ভুত। সেটি এই যে একটি পীত বর্ণের চারিচক্ষু বিশিষ্ট কুক্কুর কিংবা পীতবর্ণ কর্ণ বিশিষ্ট শ্বেতবর্ণের কুক্কুরকে তিন বার ঐ পথের এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্বে লইয়া বেড়াইতে হয়। চারি-চক্ষু-বিশিষ্ট কুক্কুর পৃথিবীতে নাই। আবেস্তায় যে চারি-চক্ষু-বিশিষ্ট কুক্কুরের উল্লেখ রহিয়াছে, তদ্বিষয়ে আবেস্তার টীকাকার জার্ম্মেণ দেশীয় স্পিগেল বলেন "কোন কোন কুক্কুরের চক্ষুর নিকট চক্ষুর ন্যায় দুইটি চিহ্ন থাকে, বোধ হয় ঐ প্রকার কুক্কুরকে এস্থলে চারিচক্ষু-বিশিষ্ট আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।" পারসীকদিগের মতে মৃত শরীর বস্ত্র দ্বারা আবৃত করা নিতান্ত অবৈধ কার্য্য। যে ব্যক্তি মৃত শরীরের উপর কোন প্রকার বস্ত্র নিক্ষেপ করিবে অহুরমজদ তাহাকে চারি শত হইতে এক সহস্র বেত্রাঘাত ও স্রোশচরণ নামক মন্ত্র দ্বারা প্রহার করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন। দৈবক্রমে কোন মনুষ্য কিংবা পশুর মৃতদেহ-স্পর্শ-জনিত অশুচিত্ব দূর করিবার জন্য অহুরমজদ্ গোমূত্রে ত্রিশ বার গাত্র, মস্তক ও হস্ত ধৌত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। সংস্কৃত ভাষায় "দেব" শব্দের অর্থ মনুষ্যের অপেক্ষা উন্নত স্বর্গবাসী জীব; কিন্তু জেন্দ ভাষায় ঐ শব্দের অর্থ মনুষ্যের অপেক্ষা নিকৃষ্ট মনুষ্যের অমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ও অপকারী আকাশনিবাসী জীব। আমাদিগের রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদিতে অসুর যে প্রকার কল্পিত জীব, প্রাচীন পারস্যবাসীদিগের দেব তদনুরূপ কল্পিত জীব বলিয়া বোধ হয়। পারসীকদিগের মতে প্রত্যেক দেব ধর্ম্ম-পরায়ণ সৎস্বভাব সম্পন্ন মনুষ্যগণের অমঙ্গল করিতে এবং তাহাদিগকে বিনাশ করিতে সর্ব্বদা চেষ্টিত, কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে কেহই আপনি যতগুলি মনুষ্যের অপকার করিবে ইচ্ছা করে ততগুলি মনুষ্যের অপকার করিতে সক্ষম হয় না। কোন ঘোর দুরাচারী ব্যক্তিকে আমরা যেমন অসুর

আখ্যা প্রদান করি, সেই রূপ পারসীকেরা ঐ প্রকার ব্যক্তিকে দেব আখ্যা প্রদান করে। আবেস্তার এই অধ্যায়ে এক স্থলে আছে "যে ব্যক্তি অসৎপথাবলম্বী, পাপী ও দুরাচারী, সেই দেব।"

ক্রমশঃ

পরকাল।

(৪৩২ সংখ্যক পত্রিকার ৭৩ পৃষ্ঠার পর)

ঈশ্বরের লক্ষণ-মূলক যুক্তিই পরকাল সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠতম যুক্তি। "ঈশ্বরের গূঢ় মঙ্গল স্বরূপে বিশ্বাস থাকিলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে পরকালে বিশ্বাস থাকিবেই থাকিবে। ঈশ্বর-পরায়ণ-চিত্ত পরকালের অন্যান্য প্রমাণ-সিদ্ধ যুক্তি অপেক্ষা এই ঈশ্বর-লক্ষণ-মূলক যুক্তির প্রতি অধিক নির্ভর করেন।" তাঁহারা বলেন "আমরা ঈশ্বরের আশ্রয়ে চিরকাল থাকিব, এই দৃঢ় বিশ্বাস অপেক্ষা পরকালের দৃঢ়তর প্রমাণ আর কিছুই নাই।" আমরা ইতি পূর্ব্বে ঈশ্বরের মঙ্গল স্বরূপ নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন করিয়াছি, এই মঙ্গল স্বরূপকে অবলম্বন করিয়া পরকাল স্থাপন করিবার অধিকার এক্ষণে আমাদের সম্পূর্ণ রূপ জন্মিয়াছে। কিন্তু আমরা সংশয়ী ভায়াদিগের সহিত প্রথমে তাঁহাদের নিজ কোটেই (কোটে দুর্গে) সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করি, অতএব আমরা প্রথমতঃ দার্শনিক প্রণালী অবলম্বন পূর্ব্বক মনুষ্যের মানসিক প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া পরকালিক মত স্থাপনের চেষ্টা করিব; তাহার মানস ক্ষেত্রেই পারলৌকিক বিশ্বাসের মূল অন্বেষণ করিব।

প্রত্যুত পরকালে বিশ্বাসের মূল অন্বেষণ করিয়া আমরা আমাদিগের মনেতেই সেই মূল প্রাপ্ত হই। পরকালের ভাব কোন রূপ আগন্তুক ভাব নহে। আমরা আমাদিগের মনকে ব্যবচ্ছেদ করিলে দেখিতে পাই, তাহার অধস্তলে প্রবল জিজীবিষা ও অনন্ত উন্নতি বা পূর্ণত্ব-লিপ্সা বিদ্যমান রহিয়াছে। এই দুই মনস্কাম আমাদের পরকালে বিশ্বাসের প্রধান প্রবর্ত্তক। পরে পরে নানা প্রকার ভাব যুটিয়া আমাদের এই বিশ্বাসের পোষকতা করিয়াছে।

জিজীবিষা। মরিতে না হয়, চিরকাল জীবিত থাকি, ইহা সকলেরই আন্তরিক ইচ্ছা। এ ইচ্ছা স্বাভাবিক। জীবনের প্রতি অনুরাগের জন্য অন্যের উপদেশের প্রয়োজন হয় না, যুক্তিরও আবশ্যকতা নাই। কিন্তু মনুষ্য যে জীবিত থাকিবার জন্য এত আগ্রহাতিশয্য প্রকাশ করে, সে কি এই অধম লোকের জন্য? চিরজীবি হইয়া এই অধোলোকে বাস করিবে এই কি তাহার আন্তরিক প্রার্থনা? কখনই না। বরং মনুষ্যেরা প্রায় সর্ব্বদাই ঐহিক বিষয়ে অতিশয় ঘৃণা ও বিরাগ বোধ করে, এ জীবনকে ভার জ্ঞান করে। এখানে থাকিয়া তৃপ্তি লাভ করা দূরে থাকুক, তাহারা সদাই তাপিত, ক্লিষ্ট ও পীড়িত। আমরা যত কেন ঐহিক ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকি না, বাহ্য ভাব ভঙ্গিতে যত কেন হর্ষ-লক্ষণ প্রদর্শন করি না, আমাদের অন্তর কিন্তু মর্ত্ত্য কোন পদার্থেই মনস্তাপ নিরাশ ক্লেশ যন্ত্রণা ব্যতীত তৃপ্তি-সুখ লাভ করিতে পারে না। এখানে অবিমিশ্র সুখের সম্পূর্ণ অভাব এবং অমঙ্গলের নিরতিশয় প্রাদুর্ভাব। এখানে "আমাদের মধুরতম সঙ্গীত তাহা, যাহা বিষাদভাবে স্নানীভূত।" এবং এখানে আমরা যে কয়েক দিন জীবিত থাকি, অসুখেই থাকি। "বৃহৎ তিমি মৎস্য তড়াগে রাখিলে, কিম্বা যুদ্ধ-ঘোষে উল্লসিতব্য তেজঃ-

পুঞ্জ সমরাশ্বকে আবর্জ্জনাবহ শকটে যোজিত করিলে সে যেমন অসুখে কাল যাপন করে, তদ্রূপ অসুখে আমরা এই শরীরে বদ্ধ আছি।" এখানে আমরা চিরজীবনের আশা কি করিব, বরং এখানে চতুর্দ্দিকে নিয়ত মৃত্যুরই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতেছি; এখানে মৃত্যু যে অবধারিত, এ ভাবি জ্ঞান আমাদের বিলক্ষণরূপ আছে। অতএব মরণ নিশ্চয় জানিয়াও অমরত্ব প্রত্যাশা করাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, মানব মন মৃত্যুতে ধ্বংশ সিদ্ধান্ত করে না; মৃত্যু অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান থাকিবার জন্য প্রত্যাশাপন্ন।

উন্নতি বা পূর্ণত্ব-লিপ্সা। আমাদের সমুদায় জীবন কেবল উন্নতির ব্যাপার। কোন প্রতিকূল শক্তির দ্বারা ব্যাঘাত প্রাপ্ত না হইলে, মানব আত্মার উন্নতির সীমা নাই, উন্নতি-মার্গে তাহার বিশ্রাম নাই। তাহার সম্মুখে অনন্ত সত্য, অপার মঙ্গল, অসীম প্রভাব, অতলস্পর্শ মহিমার সংস্থান রহিয়াছে, সে তাহা অনুধ্যান করিবে, আয়ত্ত করিবে, ভোগ করিবে। অনন্তের আস্থানে সে সর্ব্বদা ঊর্দ্ধমুখ হইয়া আছে, এ পাপলোকে কি তাহার উচ্চাভিলাষ সকল সম্পূর্ণ হইতে পারে? আমাদের অনন্ত-আকাশ-বিহারী আত্মা কি এই সার্দ্ধ-ত্রিহস্ত-পরিমিত ক্ষুদ্র দেহ-পিঞ্জরে সংরুদ্ধ থাকিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারে? কে না বলিবে কখনই না? এই মর্ত্ত্য লোকের সুখ সম্পদ শক্তি প্রভাব বিদ্যা বুদ্ধি যত প্রভূত হউক না, অমৃতের পুত্র, অনন্তের অধিকারী আত্মাকে তাহারা ভুলাইয়া রাখিতে পারে না। সে এখানে থাকিয়াই অনন্তের দিকে লক্ষ্য করিতেছে; ভক্তি প্রীতি, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস দ্বারা পক্ষপুট সজ্জিত করিতেছে, অনন্ত ভাব-লোকে প্রয়ান করিবে—অনন্তত্ব জয় করিবে। সে অনন্তত্ব অধিকার করিবে বলিয়াই, তাহার অনন্ত জীবনের প্রয়োজন ও স্পৃহা। অতএব বিবেচনা করিয়া দেখিলে, এমন যে মৌলিক বৃত্তি, জিজীবিষা, ইহাও আমাদের অনন্ত উন্নতিলাভেচ্ছার কেবল উত্তরসাধক রূপে পরিগণিত হয়। সুতরাং উন্নতি বা পূর্ণত্ব-লিপ্সাই মানব মনের সর্ব্বপ্রধান প্রবৃত্তি। ইহাই আত্মাকে এরূপ উৎপতিষ্ণু করিয়া আমাদিগকে মানব উপাধির উপযোগিতা প্রদান করিয়াছে। এবং এই লিপ্সা মনুষ্যের নিতান্ত স্বভাবগত অন্তরের গূঢ়তম প্রদেশে নিহিত। ইহার উত্তেজনায় আমরা চিরকালই অস্থির এবং ইহার কার্য্যেরও বিরাম নাই। আমরা আমাদিগকে যে অবস্থায় নিক্ষেপ করি না, ইহা মুহূর্ত্তের জন্যও আমাদের সঙ্গ ছাড়া নহে। বস্তুতঃ ইহা আমাদের নিকৃষ্ট উৎকৃষ্ট সমুদায় মনোবৃত্তির বিশেষ উত্তেজক। ইহারই তাড়নায় আমরা মৃত্যুর অপর পারে অনন্ত অনন্তির অদৃশ্য গর্ভে প্রবেশ করিতে উৎসুক হইয়াছি, অনন্ত সোপান-পরম্পরা অতিক্রম করিয়া ঐ সুদূরস্থ অস্পষ্ট-প্রত্যক্ষ আদর্শ পূর্ণত্বকে লাভ করিবার জন্য স্পর্দ্ধাবান হইয়াছি

মনুষ্যের এই দুইটী মহা তেজস্বিনী মনোবৃত্তি জিজীবিষা ও পূর্ণত্ব-লিপ্সা দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, সে কেবল ইহ লোকের জীব নহে। অকিঞ্চিৎকর অস্থায়ী ঐহিক প্রয়োজন সাধন জন্য তাহার এরূপ দূর-প্রসার মনোবৃত্তির আবশ্যক হয় না। অতএব উপায় ও উদ্দেশ্যের সমতা রক্ষার জন্য তাহার অনন্ত ভাবী জীবন অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ক্ষুদ্র মশক বধোদ্দেশে কোন্ নিপুণকর্ম্মী দুরন্ত কামান নিয়োজন করিয়া থাকে? এই জগৎ যন্ত্রে

শিল্প-নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাতে কিছুরই অতিরেক নাই, কিছুরই অভাব নাই। এই বিশাল যন্ত্রে একটী রেণু অপসারিত বা যোজিত করিলে সর্ব্বত্র বিসম বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া ভয়ানক সংবর্ত্ত উপস্থিত হইবে। এখানকার সকলই অত্যদ্ভুত কৌশলময়। এখানে অতি সামান্য উপায়ে মহৎ মহৎ ব্যাপার সংঘটন হয়; উপায় ও উদ্দেশ্যের সামঞ্জস্যও অতি অভাবনীয়। ক্ষুদ্র উদ্দেশ্য সাধন জন্য এখানে উৎকট উপায়ের প্রয়োজন হয় না, আবার উপায়ের অপ্রতুলতাও নাই। এই জগদ্ব্যাপক সামঞ্জস্য প্রতীতি করিয়া বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা বিশ্বস্ত হৃদয়ে আমাদের প্রত্যক্ষের অগোচর স্থান হইতে কত নূতন নূতন তত্ত্ব সকল আবিষ্কৃত করিতেছেন। সামঞ্জস্য শৃঙ্খল অনুসরণ করিয়া তাঁহারা তমসাচ্ছন্ন গভীর ঐ প্রকাণ্ড জ্বলন্তপিণ্ড সূর্য্য লোকে প্রবেশ করিতে শঙ্কা করেন না; এবং সর্ব্বত্র এই সামঞ্জস্য প্রত্যক্ষ করিয়া বিমোহিত হয়েন। এযাবৎ যত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে সকলই এই সামঞ্জস্যের ব্যাপার। বস্তুতঃ জগতে উপায় ও উদ্দেশ্যের সমতা একটী অবিসম্বাদিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বের বিলুপ্ত জাতীয় প্রাণীর প্রস্তরীভূত অবয়বসংস্থান পরীক্ষা করিয়া তাহাদের জীবিত ব্যবসায় অবধারণ করা যদি অসঙ্গত না হয়; প্রবাহক নাড়ীর গঠন ভাব পর্য্যালোচনা করিয়া যদি তাহাতে শোণিত প্রবহন আবিষ্কার করা সম্ভব হয়; দন্তের আকৃতি অনুসারে যদি আহার্য্য নির্ণয় করা যুক্তিযুক্ত হয়, এক কথায় যদি কার্য্যসাধন উপায় অনুসন্ধান করিয়া উদ্দেশ্য নিশ্চয় করা বৈজ্ঞানিক নীতির অনুমোদিত হয়, তাহা হইলে ঐহিক প্রয়োজন অতিক্রমকারি প্রাগুক্ত মনোবৃত্তিদ্বয়ের বিদ্যমানতা অবলোকন করিয়া মনুষ্য সম্বন্ধে অতিরিক্ত জীবন সিদ্ধান্ত কেন না বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত হইবে?

অপিচ মনুষ্য মাত্রেই যে একটী ভাবী ও উন্নততর জীবনের জন্য ব্যাকুল ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। এই পারলৌকিক আকর্ষণ সকলেই কোন না কোন সময়ে অনুভব করিয়া থাকে। ইহা সকলেরই প্রতিবোধের বিষয়। "Critical History of the Doctrine of Future Life." নামক পুস্তকপ্রণেতা বিজ্ঞবর অ্যাল্‌গর (Alger) সাহেব বলেন যে, এই আকর্ষণই পরলোক সম্বন্ধীয় যুক্তি সকলের মধ্যে চূড়ান্ত যুক্তি। অভাবের প্রতি কিছুই আকৃষ্ট হয় না। অতএব অবশ্যই কোন অদৃশ্য জগৎ আমাদের ব্যাকুল আত্মাকে এরূপ আকর্ষণ করিতেছে। "Nothing gravitates towards nothing and it must be some unseen orb that so draws our yearning soul." প্রত্যুত পারলৌকিক আকর্ষণ দ্বারা পরলোকের অস্তিত্ব সিদ্ধান্ত করাতে কিছুই বিশেষত্ব নাই। নেপ্‌চুনের অস্তিত্বেই তাহার সন্নিকৃষ্ট গ্রহাবলীর বিক্ষোভের কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। "The fact of Naptune explained by perturbations of the adjacent planets." এই প্রবল আকর্ষণ আমাদের আত্মাকে অবিরত এক জ্যোতির্ম্ময় আনন্দধামের দিকে আকর্ষণ করিতেছে, তাহার বিরাম নাই। এই আকর্ষণ আমাদের আত্মাতে বিভাবিত হয় মাত্র উহা আমাদের ইচ্ছাধীন নহে। উহা বহির্দ্দেশ হইতে আসিয়া আমাকে স্পর্শ করে, অনুপ্রাণিত করে। মৃত্যু কি এই পারলৌকিক আকর্ষণ ছিন্ন করিতে পারে? মৃত্যুত নিজে কোন শক্তি নহে। উহা একটা ঘটনা। উহার কার্য্যকারিতা শক্তি

কিছু মাত্র নাই। তবে এই পারলৌকিক আকর্ষণ ছিন্ন হইবার সম্ভাবনা কোথায়? বরং মৃত্যুর প্রাক্‌কাল পর্য্যন্ত যখন আমাদের শরীর মন অবসন্ন হয়; "দৃষ্টি হীন, নাড়ি ক্ষীণ, হিমকলেবর" হয়, আমাদের ইন্দ্রিয়-দ্বার সকল নিরোধ হইয়া আমাদিগকে ভৌতিক জগতের সহিত বিচ্ছিন্ন করে; শেষের সেই ভয়ঙ্কর দিন পর্য্যন্ত এই আকর্ষণ অক্ষুণ্ণ থাকে। অতএব এ যুক্তিতেও পরলোকের অস্তিত্ব নিঃসংশয়িত হইতেছে।

পরকালের বাস্তবতা সম্বন্ধে উপরে যেরূপ প্রমাণ প্রদর্শিত হইল, ঈশ্বরকে ছাড়িয়া—যিনি মহাকালরূপী (Eternal) মহেশ্বর, যাঁহার ত্রিকালদর্শী দৃষ্টিতে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান একই ভাবে বিভাসিত, "যিনি আমাদের ইহকাল ও পরকালের এক মাত্র উপজীব্য" যাঁহাকে লইয়াই পরকাল ও যিনি আমাদের চরম গতি, তাঁহাকে ছাড়িয়া পরকালের এতদপেক্ষা অধিকতর প্রবোধদায়ক প্রমাণ আর কি হইতে পারে! এইরূপ কার্য্য-মূলক যুক্তির প্রামাণ্য অবলম্বন করিয়াই ভৌতিক বিজ্ঞান এত দূর উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে, এত অদ্ভুত অদ্ভুত নৈসর্গিক তত্ত্ব সকল উদ্‌গীরন করিয়াছে। প্রকৃতিস্থবুদ্ধি কোন ব্যক্তিই প্রতিকূল প্রমাণ অভাবে, এবম্প্রকারে আবিস্কৃত ভৌতিক তত্ত্বে প্রতি সংশয় প্রকাশ করেন না, করা উচিতও নহে। বরং তাঁহারা নিঃশঙ্ক চিত্তে তত্তাবৎ বিশ্বাস করিয়া থাকেন। অতএব এরূপ প্রমাণ সত্ত্বে এক্ষণে আর পরকালের প্রতি অকারণ সন্দেহ করা যুক্তিযুক্ত নহে। ফলতঃ আমরা স্বীকার করি যে যুক্তি ক্ষীণতার লক্ষণ। যুক্তি-নিষ্পন্ন সত্য, আমাদের মুখ্য জ্ঞানের ন্যায় অবিরোধ্য নহে। তৎপ্রতি সন্দেহ করিবার অধিকার অবশ্যই আমাদের আছে। এ অধিকার আমাদের প্রকৃতিগত। কোন কোন পশুকে শিক্ষা দিলে সে যেমন অনেক বুদ্ধির কার্য্য অভ্যাস করিতে সক্ষম হয়, সন্দেহ করিবার অধিকার না থাকিলে আমরাও তেমনি অভ্যাসের দাস হইতাম। আমাদের সম্বন্ধে সত্য মিথ্যার কিছু মাত্র প্রভেদ থাকিত না। কিন্তু আমাদের মনোবৃত্তি কেবল অভ্যাস করিবার জন্য নহে। আমরা সত্য মিথ্যা, মহৎ অমহৎ, ন্যায় অন্যায়, পাপ পুণ্য পৃথক করিব, তুলনা করিব, চিন্তা করিব, এবং বাছিয়া লইয়া কল্পনা ধারণ করিব, শ্রদ্ধা করিব। ইহা আমাদের মহা গৌরবান্বিত স্বত্ব, ইহারই প্রভাবে আমরা সর্ব্বজীব-শ্রেষ্ঠ মনুষ্য। কিন্তু তা বলিয়া আমাদের স্বাধীন মনোবৃত্তি সকল কেবল সন্দেহ করিবার জন্যও নহে। সন্দেহ করিয়া, পরীক্ষা করিয়া বিশ্বাসকে দৃঢ়ীভূত করিব, ইহাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। আমাদের মনের সত্য ধারণ করিবার ক্ষমতা যদি স্বীকার করা যায়, এবং এই জগতে সত্যের সংস্থান যদি থাকে, তাহা হইলে, অবিশ্বাসকে নিরঙ্কুশতা প্রদান না করিয়া নিয়মিত করা সর্ব্ব বিষয়ে কর্ত্তব্য। আমরা সন্দেহ করিতে পারি বলিয়াই সন্দেহ করিব এ কোন্ যুক্তির কথা! আমরা যেমন সন্দেহ করিতে পারি, তেমনি বিশ্বাসও ত করিতে পারি। বরং বিশ্বাস মনের আদিম ভাব। অধিকন্তু আমরা যেমন অলীক বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না, তেমনি আবার বিশিষ্ট কারণ ব্যতীত কোন যৌক্তিক তত্ত্বে সন্দেহ করাও উচিত হয় না। যুক্তি দ্বারা তত্ত্ব নির্ণয় করিবার শক্তি যে আমাদের আছে, ইহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। তবে এ কথা সত্য বটে যে আমরা যুক্তির দ্বারা যে সিদ্ধান্ত উপলব্ধি করি, তাহা আমাদের আদিম মূল জ্ঞানের ন্যায়

একেবারে সন্দেহের অতীত নহে; তাহা স্বতঃসিদ্ধ নহে। কিন্তু আমাদের স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের সমষ্টি এত সংকীর্ণ যে, কেবল তন্মাত্র দ্বারা আমাদের জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ হওয়া দুস্কর। বর্ত্তমান অবস্থাতে আমাদিগকে প্রধানতঃ অর্জ্জিত জ্ঞানের উপর নির্ভর করিতে হয়। বিশেষতঃ যুক্তি ও অর্জ্জিত জ্ঞানের প্রতিপাল্য হইয়াই আধুনিক বিজ্ঞান শাস্ত্র সকল দিন দিন পুষ্টকায় হইতেছে। তবে পরকাল সম্বন্ধে যুক্তির সিদ্ধান্ত আদরণীয় না হইবে কেন?

ফলতঃ আমাদের পরকালে বিশ্বাস কেবল যুক্তিনিষ্পন্ন অর্জ্জিত জ্ঞান নহে। আমরা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিব, উহা স্বতঃসিদ্ধ উপজ্ঞাও বটে। তবে এই মুখ্য জ্ঞানের বিষয়, বর্ত্তমানে অপ্রত্যক্ষ্য ভবিষ্যতের গর্ভস্থ বলিয়াই তৎ প্রতি সন্দেহের পথ এত প্রশস্ত। কিন্তু আমরা যদি আত্মতত্ত্ব নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হই, আত্মার স্বরূপ ও ভাব পর্য্যালোচনা করি, তাহা হইলে সন্দেহের পথ একেবারে নিরোধ হইয়া যায় এবং এই বর্ত্তমান অবস্থাতেই আমরা পরকাল প্রত্যক্ষ করিতে সক্ষম হই। আপাততঃ আমরা ইহাই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছি যে, পরকালের জন্য আমাদের দুর্জ্জয় স্বাভাবিক স্পৃহা রহিয়াছে এবং আমরা এখানেই পরকালের আকর্ষণ অনুভব করিয়া থাকি; সুতরাং যুক্তি দ্বারা পরকালের অস্তিত্ব সিদ্ধান্ত সহজেই করা যায়, এবং সে সিদ্ধান্ত অবৈজ্ঞানিক নহে। স্থিতধী ফ্রান্‌সিস নিউম্যান সাহেব বলেন "Natural and innocent instinct brings with it its own warrant." অর্থাৎ আমাদের স্বাভাবিক ও নির্দ্দোষ স্পৃহা নিজেই স্বীয় নিদর্শন বহন করে। এবং আমরাও এই কথা অনায়াসে বলিতে পারি যে আমাদের মনের এই স্বাভাবিক কামনা জিজীবিষা নিজেই স্বীয় সম্প্রাপ্তির (fulfilment) ভবিষ্য সূচক। আরিষ্টটলও বোধ হয় এই ভাবেই বলিয়াছেন যে, আমরা যাহা আশা করি তাহা পাই (What we expect, that we find) আমরা ভৌতিক জগতে ক্ষুধার অন্ন পিপাসার জল অপর্য্যাপ্ত প্রাপ্ত হই, আধ্যাত্মিক জগতে আত্মার ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্ত হইবে না কেন? অতএব অতঃপর প্রতিবাদিরা বিরুদ্ধ প্রমাণ প্রদর্শন করিতে না পারিলে পরকালের অস্তিত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু আজি সহস্র সহস্র বৎসর কাল পরকালের প্রতিবাদ ঘোষণা করা হইতেছে, এপর্য্যন্ত কেহই একটিও যৌক্তিক প্রমাণ তৎবিরুদ্ধে প্রয়োগ করিতে সক্ষম হয়েন নাই।

আমরা কিন্তু প্রতিবাদীদিগের দুর্ব্বলতার বা অক্ষমতার উপর পরকালের মত স্থাপন করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিব না—কেবল ক্ষীণতা-সূচক যুক্তির উপর আমাদের জীবনের উৎকৃষ্টতম অংশ পরকাল অবলম্বিত করিয়া আশ্বস্ত হইতে পারিব না। আমাদের বর্ত্তমান জীবন নৈমিত্তিক ও অস্থায়ী, ভবিষ্য জীবনই আমাদের প্রকৃত জীবন "The seen is but temporal, the unseen is eternal." যে ভবিষ্যতের জন্য আমাদের হৃদয় মন এত ব্যাকুল, যাহার গর্ভেই আমাদের প্রিয়তম আশা ভরসা নিহিত, সংসারে দীপ্তশিরা হইয়া আমরা স্বভাবতঃ ব্যাকুল ভাবে যে ভবিষ্যতের দিকে নেত্রপাত করি, তাহাতে সন্দেহের সম্ভাবনা মাত্রও থাকিলে আমরা চিত্তে আরাম বোধ করিতে পারিব না। অতএব আমরা নিজ সংজ্ঞার মধ্যেই পরকালকে সাক্ষাৎ প্রতিবিম্বিত দেখিতে চাই—প্রত্যক্ষ করিতে চাই।

ক্রমশঃ

শঙ্করাচার্য্যের জীবন বৃত্তান্ত।

দিগ্বিজয়।

(৪৩০ সংখ্যক পত্রিকার ৩৯ পৃষ্ঠার পর।

শঙ্করাচার্য্য সেতুবন্ধ রামেশ্বরে সপ্তবিধ শৈবমতাবলম্বিদিগকে পরাস্ত করিয়া এবং অনন্তশয়ন নামক স্থানে নানা মতানুসারি বৈষ্ণবদিগকে স্বমতচ্যুত করিয়া স্বীয় অদ্বৈত মত গ্রহণ করাইলেন। পরে পশ্চিমদিগভিমুখে পঞ্চদশ দিন ভ্রমণানন্তর সুব্রহ্মণ্যাখ্য স্থলে উপনীত হইয়া তত্রত্য কুমারধারা-নদী-তটে বাসস্থান নিবেশিত করিলেন। সুব্রহ্মণ্যে কুমারদেবের এক মন্দির আছে। এস্থলে হিরণ্যগর্ভ, অগ্নি ও সূর্য্যের উপাসকদিগের সহিত আচার্য্যের বিচার হয়। প্রথমতঃ হিরণ্যগর্ভ দেবের উপাসকগণ আচার্য্যকে অভিবাদন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল "হে যতি-পতি! আপনাকে দেখিয়া আমরা কৃতার্থ হইয়াছি; কিন্তু অদ্বৈতমতের প্রয়োজন কি? আমরা হিরণ্যগর্ভ দেবকে উপাসনা করি। হিরণ্যগর্ভই জগতের কারণ, তাঁহা হইতেই সকল জীব উৎপন্ন হইয়াছে এবং প্রলয় কালে তাঁহাতেই সকলে বিলীন হইবে। হিরণ্যগর্ভ-দেবের জ্ঞান ও তৎপ্রতি ভক্তিই মোক্ষের কারণ। সুতরাং তৎসম্বন্ধীয় কমণ্ডলু প্রভৃতি চিহ্ন ধারণ পূর্ব্বক কর্ম্মমার্গ ও জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করিয়া আমরা মনস্থৈর্য্য লাভ করিয়াছি।" হৈরণ্যগর্ভ জগদ্বিধি প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক এই রূপে উক্ত হইলে পর শঙ্করাচার্য্য বলিলেন "হে হিরণ্যগর্ভগণ! যাঁহা হইতে ভূতগণ জন্মে, যদ্দ্বারা জীবিত থাকে এবং যাঁহাতে বিলীন হয়, তিনিই ব্রহ্ম। ব্রহ্মের লক্ষণ "সত্যং জ্ঞানং অ-নন্তং।" ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ অর্থাৎ সকল বিকারার্থ হইতে বিলক্ষণ সত্য, জ্ঞানস্বরূপ অর্থাৎ জড়বিলক্ষণ চিৎস্বরূপ এবং অনন্ত স্বরূপ অর্থাৎ দেশ কাল বস্তু প্রভৃতি দ্বারা পরিচ্ছেদ্য নহে। এবম্ভূত ব্রহ্মই জগৎ-কারণ, তাঁহা হইতেই হিরণ্যগর্ভাদি সকল জীব উৎপন্ন হইয়াছেন।

"যোব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং
যোবৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ।
তমাত্মবেদং শরণং সনাতনং
মমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে॥"

অতএব হিরণ্যগর্ভের উপাসনা দ্বারা কিঞ্চিন্মাত্র ফল লাভ হইতে পারে, মোক্ষ লাভ কখনই হইতে পারে না। আর সাকার উপাসনা দ্বারা ব্রহ্ম ও জীবের অভেদ জ্ঞান কখনই সাধিত হয় না। অভেদ জ্ঞান ব্যতিরেকে মুক্তি হইতে পারে না। সুতরাং হিরণ্যগর্ভের উপাসনা সম্যক নহে। অত-এব হে ব্রাহ্মণগণ! তোমরা কমণ্ডলু প্রভৃতি চিহ্ন পরিত্যাগ কর এবং হিরণ্যগর্ভের আদি কারণ পরব্রহ্মের উপাসনা করিতে শিক্ষা কর।" এই রূপে উপদিষ্ট হইয়া জগদ্বিধি হোমবিধি, কর্ম্মবিধি প্রভৃতি হৈরণ্যগর্ভ ম-তোপাসক ব্রাহ্মণগণ অদ্বৈত মত গ্রহণ ক-রিয়া আপনাদিগকে চরিতার্থ মনে করিল।

অনন্তর সুহোত্র, বীতিহোত্র, কাব্যহোত্র প্রভৃতি অগ্নির উপাসকগণ আচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইল এবং তাঁহাকে বলিল যে অগ্নিই সর্ব্বদেবের আদিম এবং উৎকৃষ্ট ইহা শ্রুতিসিদ্ধ। এই নিমিত্ত আমরা অগ্নি-দেবের উপাসনা করি এবং বিস্ফুলিঙ্গ-রূপ মণি-শলাকা-চিহ্ন সকল ধারণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্মাচরণে কালাতিপাত করি। অগ্নিদেবের সর্ব্বপাপহরত্ব নারায়ণ উপনিষদে উল্লিখিত আছে। অতএব সকল বিপ্রের একমাত্র অগ্নিদেবই উপাস-নীয় এবং আপনি অগ্নির উপাসনা দ্বারা কৃতার্থ হউন।" এতৎ শ্রবণে আচার্য্য বলিলেন হে অগ্নিপূজক ব্রাহ্মণগণ! তো-মরা যে বলিলে অগ্নি পরম দেব, তাহা

নহে; ঋগ্বেদ-ব্রাহ্মণে অগ্নির অবমত্ব দৃষ্ট হয়, যথা "অগ্নির্বৈ দেবানামবমঃ বিষ্ণুঃ পরম স্তদন্তরেণ সর্ব্বা দেবতাঃ।" আর অগ্নি কর্ম্মের দেবতা, জ্ঞানের দেবতা নহে। অগ্নি ব্রহ্মের অংশভূত সুতরাং অগ্নির উপাসনা দ্বারা মুক্তি অসম্ভব। অতএব অগ্নির উপাসনা হইতে ব্রহ্মোপাসনা অবলম্বন করিয়া শুদ্ধ অদ্বৈত বৃত্তির আশ্রয় কর এবং অগ্নির চিহ্নধারণ পরিত্যাগ কর। এইরূপ করিলে মোক্ষলাভ করিতে সক্ষম হইবে। এতদ্রূপে উপদিষ্ট হইয়া সুহোত্র প্রভৃতি অগ্ন্যুপাসকগণ স্বমত ত্যাগ পূর্ব্বক আচার্য্যমত গ্রহণ করিল।

অগ্নিমত নিবর্হণানন্তর রক্তবর্ণ-কুসুম-ধারী সূর্য্যভক্ত দিবাকর প্রভৃতি ব্রাহ্মণেরা আচার্য্যকে নমস্কার পূর্ব্বক বলিল "হে স্বামিন্! সূর্য্যই জগতের কারণ, সূর্য্যই পরমাত্মা, সূর্য্যই ব্রহ্ম, সূর্য্যের উপাসনা দ্বারাই মোক্ষ সিদ্ধি হইবে। অতএব আমরা সূর্য্যভক্ত, সূর্য্যের উপাসনা দ্বারা মোক্ষপথের পথিক। "ঘৃণিঃ সূর্য্য আদিত্যং" এই মন্ত্র আমাদিগের উপাসনীয়। রক্ত-চন্দন-পুণ্ড্রমালাধারী ষড়্বিধ সূর্য্যোপাসক আছে। কেহ উদয়মণ্ডলকে ব্রহ্মাত্মক বলিয়া সৃষ্টিকারণরূপে ভজনা করে। কেহ আকাশমধ্যস্থিত সূর্য্যকে ঈশ্বররূপে সকল জগতের লয়-কারণ বলিয়া উপাসনা করে। কেহ অস্তময় কালবিম্বকে বিষ্ণ্বাত্মক বলিয়া সর্ব্বজগতের পরিপালন-কারণরূপে পূজা করে। কেহ সূর্য্যের ত্রিকালমণ্ডলই সেবা করে এবং সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তি পরমাত্মাকে ভজনা করে। কেহ সূর্য্যমণ্ডল কেবলমাত্র নিরীক্ষণ করিয়া ষোড়শোপচারে পূজা সমর্পণ পূর্ব্বক কর্ম্মফল ভগবান্ সূর্য্যদেবকে অর্পণ করিয়া বাস করে এবং সূর্য্যদেবকে দর্শন না করিয়া আহার করে না। আবার কেহ বা তপ্ত লৌহ দ্বারা ফাল, ভুজ এবং বক্ষঃস্থলে মণ্ডল-চিহ্ন ধারণ করিয়া মানসে সূর্য্যদেবকে অনুক্ষণ ধ্যান করে। এই ষড়্বিধ উপাসকেরই পূর্ব্বোক্ত একমন্ত্র উপাসনীয়। সূর্য্যের উপাসনাই মোক্ষলাভের একমাত্র কারণ। সুতরাং আপনি সূর্য্যের উপাসনা শিক্ষা করুন, অদ্বৈতমতে কি ফললাভ হইবে?" দিবাকর প্রভৃতি সূর্য্যোপাসকগণ এই কথা বলিলে পর আচার্য্য উত্তর করিলেন "হে মূঢ় বিপ্রগণ! তোমরা যাহা বলিলে তাহা অসমঞ্জস। শ্রুতি রহিয়াছে

"চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্য্য অজায়ত।"
"ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ।"

অতএব সূর্য্য ব্রহ্মপরতন্ত্র, "ব্রহ্মভাসা ভাসিতঃ," বিয়চ্চর, পরাত্মা নহে। সুতরাং সূর্য্যের উপাসনা দ্বারা মুক্তিলাভ হইতে পারে না। এই নিমিত্ত তোমরা সৌর চিহ্ন পরিহার পূর্ব্বক শুদ্ধ অদ্বৈত মত অবলম্বন কর।" এইরূপে আদিষ্ট দিবাকরাদি সৌরগণ আচার্য্যকে নমস্কার পূর্ব্বক তন্মত গ্রহণ করিল। হিরণ্যগর্ভ, অগ্নি ও সূর্য্যের উপাসকদিগকে স্বমতে আনয়ন করিয়া শঙ্করাচার্য্য বায়ুকোণে গমন করিলেন। এই সময় তিনি ত্রিসহস্র শিষ্যে পরিবৃত। তদীয় শিষ্যগণ শঙ্খ, ঘণ্টা, করতাল প্রভৃতি বাদ্যধ্বনি দ্বারা দিক্‌মণ্ডল পরিপূর্ণ করিয়া চামর-পিচ্ছ প্রভৃতি দ্বারা আচার্য্যকে ব্যজন করিতে করিতে ক্রমাগত বায়ু কোণে যাত্রা করিতে লাগিল। এইরূপে তত্তদ্দেশবাসি বিপ্রদিগকে স্বমতে আনয়ন পূর্ব্বক তাহারা গণবর পুরে আগমন করিল এবং তত্রত্য কৌমুদী নদীতে স্নান করিয়া তত্তীরে প্রতিষ্ঠিত গণেশ দেবের মন্দিরে এক মাস বিশ্রাম করিল। এই সময়েই পদ্মপাদ, হস্তামলক, সমিৎপাণি, চিদ্বিলাস, জ্ঞানকন্দ, বিষ্ণুগুপ্ত, শুদ্ধকীর্ত্তি, শুদ্ধানন্দ, আনন্দগিরি প্রভৃতি ত্রয়োদশ জন পঞ্চপূজাপরায়ণ শিষ্য দিগ্গজ বলিয়া

বিখ্যাত হইলেন এবং সকলে একত্রিত হইয়া মহাসমারোহ সহকারে আচার্য্য গুরুর স্তুতি করিলেন। তৎপ্রদেশস্থিত দ্বিজগণ এতৎসমস্ত দর্শন করিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিল "এ কি? তোমাদের মত সম্যক বলিয়া দর্শকদিগের বোধ হয় না! তোমরা আকাশের ন্যায় নিরালম্ব অদ্বৈত কেবল ব্রহ্মের উপাসনা কর। বাঙ্মনের অগোচর ব্রহ্ম কিরূপে সাধারণের গ্রাহ্য হইতে পারে? অতএব তোমরা আমাদিগের এই বিখ্যাত ষড়্বিধ-ভেদ-বিশিষ্ট গাণপত্য মত গ্রহণ পূর্ব্বক কৃতার্থ হও।" এই বলিয়া তাহারা গাণপত্য মত ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিল। গণপতিই জগৎকারণ,ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র প্রভৃতি দেবগণের পতি, সর্ব্বাতীত, পরমাত্মা। গণপতিই সর্ব্বপ্রথমে বিদ্যমান ছিলেন এবং তাঁহার মায়ারচিত ব্রহ্মাদি সর্ব্বজগৎ। সুতরাং যাহারা মুক্তি প্রাপ্ত হইতে বাঞ্ছা করে তাহাদিগের গণেশ দেবের উপাসনা ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। গাণপত্য মত ষড়বিধ। মহাগণপতিমত, হরিদ্রাগণপতি মত, উচ্ছিষ্টগণপতিমত, নবনীতগণপতিমত, স্বর্ণগণপতিমত, ও সন্তানগণপতিমত। মহাগণপতি মতোপাসক গিরিজাপুত্র, হরিদ্রাগণপতি মতোপাসক গণপতিকুমার, উচ্ছিষ্টগণপতি মতাবলম্বী হেরম্বসুত, নবনীতগণপতি মতানুসারী বীরভদ্র, স্বর্ণগণপতি মতানুযায়ী একদন্ত এবং সন্তানগণপতিমতোপাসক সকলে ক্রমান্বয়ে শঙ্করাচার্য্যের সমীপে উপস্থিত হইলে পর আচার্য্য তাহাদিগকে বলিলেন "হে গাণপত্যগণ! গণপতি রুদ্রসুত বলিয়া প্রসিদ্ধ, সগুণ, এবং লয়ানুগ সুতরাং কখনই পরমাত্মা হইতে পারে না। গণপতি পরমাত্মা না হইলে তন্মতোপাসনা দ্বারাও মুক্তিলাভ করা যাইতে পারে না। অতএব নির্গুণ, সচ্চিদানন্দময় সর্ব্বাতীত, সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরব্রহ্মের উপাসনা কর এবং মূঢ়বুদ্ধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্ত করিয়া মুক্তিমার্গ অবলম্বন কর, পঞ্চপূজাপরায়ণ হও এবং অদ্বৈত মতের আশ্রয়ে মোক্ষপ্রাপ্ত হও।" এইরূপে উপদিষ্ট গাণপত্যগণ অদ্বৈত মত গ্রহণ করিল। তদনন্তর শঙ্করাচার্য্য ভবানীনগরে গমন করিলেন। এস্থলে আচার্য্য স্বশিষ্যবর্গের পূজা গ্রহণ করিয়া বৃহস্পতির ন্যায় শোভাপ্রাপ্ত হইলেন। ভবানীনগরে আচার্য্য একমাস কাল বাস করিলেন। ভবানীনগরবাসিরা ঐ যতিশিরোমণিকে অভিবাদন পূর্ব্বক বিনয় সহকারে বলিল "স্বামিন্! আমাদিগের অতি বিচিত্র মত শ্রবণ করুন। ভগবতীই মহাশম্ভু-শক্তি সর্ব্বজগৎ-কারণ; ভগবতীর মায়াবশত মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি নিখিল জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, তাঁহা হইতে ব্রহ্মাদি দেবগণ উৎপন্ন হইয়াছেন। অতএব ভগবতীরূপা ভবানীর চরণারবিন্দ-সেবা-তৎপর হইয়া তাঁহার চিহ্ন কুঙ্কুমাদি ধারণ পূর্ব্বক এবং তৎপাদাকৃতি স্বর্ণপদক গলদেশে ও বাহুতে বন্ধন করিয়া আমরা জীবন্মুক্ত হইয়াছি। ভবানীর কৃপামাত্রেই মুক্তি লাভ হইবে, তজ্জন্য মোক্ষাভিলাষিরা ভবানীকেই উপাসনা করিবে।" এতদুত্তরে আচার্য্য বলিলেন যে তোমাদের মতে ভবানী সংসার-ভয়-হারিণী জগৎ-কারণ; কিন্তু ঈশ্বর-জ্ঞান দ্বারা মুক্তি ইহাই সর্ব্বত্র প্রতিপাদিত হইয়াছে। "আত্মানমাত্মনা ধ্যাত্বা মুক্তোভবতি নান্যথা" এইটি মুক্তির বচন। "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি।" 'বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে' একবচনান্ত বিদ্যাশব্দের অর্থ আত্মাভিন্ন সকল পদার্থ অনিত্য, আত্মাই শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত সচ্চিদানন্দরূপ এতদাত্মক জ্ঞান। সগুণ ভবানীর উপাসনা অল্পফলপ্রদ এবং বেদবিরুদ্ধ। সুতরাং কুঙ্কুমপুণ্ড্র স্বর্ণ পদকাদিচিহ্ন বর্জ্জন পূর্ব্বক শুদ্ধাদ্বৈত মতে "ব্রহ্মাহমস্মি"

এই নিশ্চয় জ্ঞান দ্বারা মুক্ত হও।" এতাবতা ভবানীভক্ত ত্রিপুরকুমার, বিন্দুভক্ত, পূর্ণানন্দ প্রভৃতি বিপ্রগণ পরম গুরুকে নমস্কার পূর্ব্বক ভবানীচিহ্ন পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া শুদ্ধ অদ্বৈতমতাবলম্বন করিল এবং স্নান সন্ধ্যাবন্দন পঞ্চ পূজা প্রভৃতিতে নিরত হইয়া সচ্ছিষ্য হইল। তদনন্তর ভবানীনগরের সমীপস্থিত কুবলয়পুর হইতে লক্ষ্মীর উপাসকগণ আচার্য্যের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং বলিল "স্বামিন্! মহালক্ষ্মী জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের কারণ, ভগবান্ বিষ্ণুর প্রাণশক্তি। মহালক্ষ্মী মাতৃবৎ সর্ব্বফলদা, পার্ব্বতী বাণী প্রভৃতি শক্তির জননী বলিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্টা পরা প্রকৃতি। অতএব লক্ষ্মীর উপাসনা, মুক্তিকাঙ্ক্ষি ব্যক্তিদিগের একান্ত আবশ্যক এবং কমল, পদ্মাক্ষমালা ও কঙ্কমাদি বাহু কণ্ঠাদি অঙ্গে ধারণ অবশ্য কর্ত্তব্য।" ইহা শুনিয়া আচার্য্য বলিলেন তোমরা অদ্ভুত মত ব্যাখ্যা করিলে। তোমাদের মত সম্যক্ নহে। তোমরা কমলাদি চিহ্ন পরিত্যাগ পূর্ব্বক শুদ্ধ অদ্বৈত মত অবলম্বন করিয়া মুক্তিলাভ কর।" এইরূপে উপদিষ্ট শ্লিষ্টভূষণ, গঙ্গাকীর্ত্তি, লক্ষ্মীবিলাস, রমাভক্ত প্রভৃতি কমলাভক্তগণ অদ্বৈত মতাবলম্বন পূর্ব্বক স্নান পঞ্চপূজা প্রভৃতি সৎকর্ম্মশীল সৎশিষ্য হইয়া আচার্য্যের অনুগত হইল। তদনন্তর পুস্তকপুঞ্জ, কমলপাণি, নিগম, সাবিত্র পরমাগম, সুবাক প্রভৃতি শারদার উপাসকগণ আচার্য্যের সমীপস্থ হইয়া বলিল "হে স্বামিন্! আপনি দুর্গা ও লক্ষ্মীর উপাসকদিগকে মতভ্রষ্ট করিয়া বিচিত্রবেষধারী করিয়াছেন, আমরা শারদোপাসক পরমত-ভেদপটু। আমাদের মত নিগমসিদ্ধ। বেদ নিত্য, সুতরাং বেদরূপা শারদা নিত্যা। শারদা জগৎকর্ত্রী পরাৎপরতরা জগদুপাদানকারণ, নিত্যপ্রভা এবং পরব্রহ্মাদির জননী। সুতরাং মুমুক্ষু ব্যক্তিদিগের নিরন্তর উপাসনীয়া অতএব আপনি বৃথা আশা ত্যাগ করিয়া পুস্তকাদি চিহ্নিত হইয়া শারদার উপাসনা করুন, বাক্স্বরূপ জ্ঞান হইলেই মুক্ত হইবেন "নাবেদবিৎ মনুতে তং বৃহন্তং;" সুতরাং স্বরস্বতীর উপাসনা মুক্তি লাভের অতি সম্যক্ উপায়।" এই সকল বাক্য শ্রবণানন্তর শঙ্করাচার্য্য উত্তর করিলেন হে মূর্খ স্বারস্বতগণ! তোমাদের মত ভ্রান্ত এবং তোমাদের অজ্ঞান ঘোরতর। যখন প্রতি যুগপ্রলয়ে ব্রহ্মাদি দেবগণ পরব্রহ্মে বিলীন হয়েন, তখন ব্রহ্মার বক্ত্রস্থা স্বরস্বতী কিরূপে নিত্যা হইবেন? আর ব্রহ্মশক্তি বলিয়া স্বরস্বতী হইতে যে সকল জগৎসৃষ্টি হইয়াছে এই মতটি রমণীয় নহে। পরব্রহ্মই এক মাত্র নিত্য, অন্য সমস্তই অনিত্য। সুতরাং স্বরস্বতীর উপাসনা দ্বারা মোক্ষসিদ্ধি হইতে পারে না। অতএব অদ্বৈতবৃত্তি আশ্রয় করিয়া স্নানাদি সৎকর্ম্ম করিয়া সেই কর্ম্মফল ব্রহ্মে অর্পণ কর। এইরূপে সৎকর্ম্ম দ্বারা অনেক দুরিত ক্ষয় হইলে জ্ঞান প্রবৃত্তি হইবে এবং তখন লিঙ্গ শরীর ভঙ্গ দ্বারা মুক্ত হইবে। এই প্রকার উপদেশানুসারে কার্য্য করিয়া তোমরা আত্মরক্ষা কর।" আচার্য্য কর্ত্তৃক এইরূপে ভৎর্সিত ও উপদিষ্ট হইয়া নিগমাদি স্বারস্বতগণ লিঙ্গত্যাগ পূর্ব্বক "কৃতার্থ হইলাম" বলিয়া আচার্য্যকে প্রণাম পূর্ব্বক অদ্বৈত মত গ্রহণ করিল।

তদনন্তর শক্তিবাদী রাজশ্যামলের উপাসক শক্তিবিলাস, চিদানন্দ প্রভৃতি কতকগুলি বামাচারী আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা শঙ্করাচার্য্যকে কহিল "হে স্বামিন্! আপনি কি ব্রহ্মতত্ত্ব করতলে প্রাপ্ত হইয়াছেন যে সকলকে স্বমতভ্রষ্ট করিতেছেন?

আপনার অদ্বৈত জ্ঞান শশবিষাণের ন্যায়, বন্ধ্যা-পুত্রের ন্যায় এবং গগনারবিন্দের ন্যায় অত্যন্ত অসৎ, ঈশ্বর শক্তি বিনা কোন কার্য্য করিতে সমর্থ হয়েন না। শক্তি দ্বারাই জগৎপ্রবৃত্তি হয়। শক্তিবাদই শ্রেয়স্কর এবং মোক্ষলাভের উৎকৃষ্ট সোপান। আমরা পঞ্চদশী, ষোড়শী প্রভৃতি শক্তির উপাসনা করি সুতরাং মুক্তি আমাদিগের করতলস্থিত। পূর্ব্বযুগে ভৃগু, অগস্ত্য, বিশ্বামিত্র, রামচন্দ্র প্রভৃতি বামোপাসক শক্তিবাদী ছিলেন এবং জ্ঞানোন্নতি সাধন পূর্ব্বক মুক্ত হইয়াছিলেন। অতএব আপনি আমাদের মত গ্রহণ করুন। ইহা শ্রবণ করিয়া আচার্য্য বলিলেন তোমাদিগের মত অসত্য; কারণ প্রকৃতি অনিত্য। অনিত্য প্রকৃতির উপাসনা নিষ্ফল। তোমরা বামাচারশীল হইয়া ব্রাহ্মণ্য হারাইয়াছ; তোমাদিগকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। আর তোমরা কোন্ মুখে বলিলে যে আমরা ভৃগু, অগস্ত্য প্রভৃতির তুল্য; তাঁহাদিগের ক্ষমতার শতাংশের একাংশও তোমাদের নাই। এক্ষণে মূঢ়বুদ্ধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্ত করণানন্তর অদ্বৈত মত অবলম্বন করিয়া আত্মরক্ষা কর। এতদুপদেশ অনুসারে বামাচারিগণ অদ্বৈতমতাবলম্বী হইল।

অনন্তর শঙ্করাচার্য্য শিষ্যসমভিব্যাহারে ভবানী নগর হইতে উত্তর দিকে প্রস্থান করিলেন এবং উজ্জয়িনী নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন উজ্জয়িনী কাপালিকদিগের কেন্দ্রস্থান। উজ্জয়িনী নগরে দ্বিমাসকাল অবস্থিতি করিয়া তিনি কাপালিকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা স্বীয় আচার ও কুলাচার কি বল। স্ফটিক, অর্দ্ধচন্দ্র ও জটা দ্বারা পরিশোভিত কাপালিকগণ এই রূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া আচার্য্যকে বলিল "স্বামিন্! আমাদের আচার সকল প্রাণির সন্তোষজনক এবং আমরা কর্ম্মহীন। প্রমাণ আছে যে "কর্ম্মণা ন মুক্তিঃ।" সংহারভৈরব আমাদিগের উপাস্য দেবতা। অস্মদুপাস্য সংহারভৈরবই জগৎকর্ত্তা এবং প্রলয়কর্ত্তা; অতএব তিনিই জগতের রক্ষক। গুরুদিগের মুখে শুনিয়াছি যে সংহারভৈরবের অষ্টমূর্ত্তি; যথা

> অসিতাঙ্গো রুরুশ্চণ্ডঃ ক্রোধশ্চোন্মত্তভৈরবঃ।
> কাপালী ভীষণশ্চৈব সংহারশ্চাষ্ট ভৈরবাঃ॥

অসিতাঙ্গ বিষ্ণু, রুরু ব্রহ্মা, চণ্ড সূর্য্য, ক্রোধ রুদ্র, উন্মত্তভৈরব ইন্দ্র, কাপালী চন্দ্র, ভীষণ যম এবং সংহার ভৈরবকে বলা যায়। সৃষ্টিকর্ত্তারা রুরুর অংশভূত, পালনকর্ত্তারা অসিতাঙ্গের অংশ এবং সংহারকর্ত্তারা ক্রোধভৈরবের অংশ। এইরূপে সৃষ্টি স্থিতি লয় করিয়া অদ্বিতীয় নিত্য পরমাত্মা সংহারভৈরব বিদ্যমান থাকেন। অতএব আমাদিগের মতই প্রশস্য এবং মুমুক্ষু জনগণের গ্রাহ্য। আমার নাম বটুকনাথ। আপনি কর্ম্মহীন দণ্ডকমণ্ডলুধারী সন্ন্যাসী, কাপালিক হইবার ঠিক উপযুক্ত পাত্র। আপনি কাপালিক হইলে আপনার শিষ্যগণও কাপালিক হইবে। অতএব আসুন কাপালিক মত গ্রহণ করুন।" এইরূপ বটুকনাথ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়া শঙ্করাচার্য্য তাঁহাকে বলিলেন রে মূঢ়তম বর্ব্বর, তোমার এতদূর স্পর্দ্ধা হইয়াছে। তুমি মদ্যপায়ী, অসম্বদ্ধপ্রলাপী, বহুসংখ্য স্ত্রী জাতির মর্য্যাদাহন্তা, বেদাদিশাস্ত্রের অবজ্ঞাতা কাপালিক; সুতরাং তুমি তাড়নযোগ্য। এই বলিয়া আচার্য্য শিষ্যগণের দ্বারা তাহাকে উত্তমমধ্যম রূপ প্রহার করিলেন। কাপালিক গুরু অত্যন্ত তাড়িত হইয়া আকাশে নেত্রার্পণ পূর্ব্বক সংহারভৈরবকে আবির্ভূত করিবার জন্য উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল

"যঃ সংহারভৈরবঃ প্রভুরীশ্বরঃ স এবাগত্য সন্ন্যাসিপ্রভৃতীন্ ভক্ষয় সত্বরং।"

তিনবার এইবাক্য উচ্চারণ করিলে পর সংহারভৈরব আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার হস্তে খড়্গ, কপাল, ঘণ্টা এবং শূল, পরিধান দিগম্বর এবং জটাসমূহে আকাশ আচ্ছাদিত। তখন শঙ্করাচার্য্য তাঁহাকে বলিলেন যে আপনার ভক্ত বেদশাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া দুষ্ট যুক্তি অবলম্বন করিয়াছে বলিয়া আমি উহাকে তাড়না করিয়াছি। ইহা শুনিয়া সংহারভৈরব বলিলেন,

"শঙ্করস্ত্বং সদা পূজ্যঃ সর্ব্ববেদপদার্থভাক্।
ভবৎকৃতং হি যৎকর্ম্ম মমাপি চ কৃতং হি তৎ।
তেষাং কাপালিকানান্তু ব্রাহ্মণাচরতাং কুরু।"

সংহারভৈরব এই বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। কাপালিকগণ সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া ভীত হইয়া শঙ্করাচার্য্যের আশ্রয়গ্রহণ পূর্ব্বক অদ্বৈতমতাবলম্বী হইল।

এতদনন্তর শূদ্রজাতীয় উন্মত্তভৈরব নামে জনৈক কাপালিক চিতাভস্ম দ্বারা কলেবর ধূষরিত করিয়া নরকপাল-মালা দ্বারা গলদেশ আবৃত করিয়া, ললাটদেশে কজ্জল রেখা রচনা করিয়া, সকল কেশ দ্বারা জটাবন্ধন করিয়া, ব্যাঘ্রচর্ম্ম দ্বারা কৌপীন নির্ম্মাণ করিয়া, বাম করে কপাল ধারণ করিয়া এবং দক্ষিণ করে ঘণ্টাধ্বনি করিতে করিতে আচার্য্য সমীপে আগমন করিল এবং আচার্য্যকে বলিল

"স্বামিন্ কিং কাপালিকমতে স্নানতাস্তি তদন্তর কিং ফলমস্তি?"

উন্মত্তভৈরব এই বলিয়া বিচার প্রার্থনা করিলে আচার্য্য বলিলেন "রে কাপালিক! তুই দূর হইয়া যা; তোরে আমার প্রয়োজন নাই। দুষ্ট ব্রাহ্মণদমনই আমার উদ্দেশ্য" এই বলিয়া তিনি স্বশিষ্যদিগকে উহাকে তাড়াইয়া দিতে আদেশ করিলেন। শিষ্যগণ আদেশমাত্র উন্মত্তভৈরবকে কশাঘাত পূর্ব্বক দূর করিয়া দিল। এস্থলে আচার্য্যোক্ত সংস্কৃত বাক্যগুলি উদ্ধৃত করা আবশ্যক, যেহেতু তন্মধ্যে আচার্য্যের দিগ্বিজয়ের উদ্দেশ্য স্পষ্টাক্ষরে বিবৃত রহিয়াছে। সেই বাক্য এই

'গচ্ছ কাপালিক যথাসুখং বিহর ব্রাহ্মণানেব দুষ্টমতাবলম্বিনো দণ্ডয়িতুমস্মদাগমনং তদিতরেষাং অপি অগ্রজপাদসেবনাদিবৃত্তিঃ তদাচারানুসরণঞ্চ প্রশস্তমপি ভ্রষ্টস্য তব কিং মানং।'

আচার্য্যের দিগ্বিজয়ের উদ্দেশ্য সমালোচনাস্থলে আমরা ইহার যথাযথ ব্যবহার করিব।

অতঃপর চার্ব্বাক আসিয়া আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিল "যদি আপনি পরমার্থ বুঝিয়া থাকেন তবে মুক্তি-লক্ষণ কি বলুন।" এই বলিয়া চার্ব্বাক নিজমত ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিল "শরীরের লয়ই মোক্ষ, মৃত্যুই মুক্তি, ভস্মীভূত দেহের পুনরাগমন অসম্ভব, স্বর্গনরক পৃথিবীর সুখ এবং দুঃখ ভিন্ন আর কিছুই নহে, মৃত ব্যক্তিদিগের উদ্দেশে শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া নিস্ফল, অতএব জীবিত কালে কেবল আনন্দেই রত থাকিবে।" ইহার উত্তরে শঙ্করাচার্য্য চার্ব্বাককে বুঝাইয়া দিলেন যে জীব দেহেন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন। জীব জ্ঞান দ্বারা লিঙ্গশরীর-গ্রন্থি ছিন্ন করিয়া মুক্তিলাভ করে। যেমন তৃণজলৌক এক তৃণ হইতে অপর তৃণে গমন করে, তদ্রূপ জীব এক দেহ হইতে দেহান্তরে গমন করে, পরলোকে গমন করে। আর শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। এইরূপে আচার্য্য কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া চার্ব্বাক স্বমত বর্জ্জন করিয়া অদ্বৈতমত অবলম্বন করিল এবং আচার্য্যের পুস্তকাদির বাহক হইল।

তদনন্তর এক জন স্থূলকলেবর এবং সূক্ষ্মশিরস্ক সৌগতমতাবলম্বী আচার্য্যের নিকটে বিচারার্থ উপস্থিত হইল। আচার্য্য সৌগতকে বুঝাইয়াদিলেন যে মৃত্যু দ্বারা মুক্তি হয় না, জ্ঞান আবশ্যক এবং তাহাকে স্বমতচ্যুত করিয়া অদ্বৈতমতে আনয়ন করিলেন।

তৎপরে পূর্ণসময় নামে জনৈক ক্ষপণক কৌপীন পরিধান পূর্ব্বক আচার্য্য সকাশে আগমন পুরঃসর বলিল "হে স্বামিন্! আমার বিচিত্র মত শ্রবণ করুন। আমি কালজনক সূর্য্যকে গোলযন্ত্র বা তুরীযন্ত্র দ্বারা বন্ধন পূর্ব্বক সময়-জ্ঞান দ্বারা স্বর্গমর্ত্ত্যপাতালের শুভাশুভ বলিতে পারি। কালই পরম দেবতা। ঈশ্বরও আমার পক্ষ অন্যথা করিতে পারেন না।" ইঁহাকে শঙ্করাচার্য্য বলিলেন হে পূর্ণসময়! তুমি কালজ্ঞ, আমিও তাহাই; অতএব আমার আশ্রয়ে আইস। ইহা শ্রবণ করিয়া সে আচার্য্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সিদ্ধসঙ্কল্প হইল।

তদনন্তর মলদিগ্ধাঙ্গ কৌপীনধারী জৈন "অর্হোঽর্হতঃ" বলিতে বলিতে শিষ্য সহিত আগমন করিয়া আচার্য্যকে বলিল "জিনদেব সকলের মুক্তিদাতা এবং সর্ব্বপ্রাণির হৃদয়ে আত্ম রূপে অবস্থিত আছেন ইত্যাকার জ্ঞান দ্বারা দেহনাশের পরই মুক্তি হয়। জীব শুদ্ধ, দেহ কেবল মলপিণ্ড, জীবের সৎ কর্ম্মের প্রয়োজন নাই।" আচার্য্য জৈনকে তাহার মত ভ্রান্ত ও অগ্রাহ্য প্রমাণ করিয়া অদ্বৈতমতাবলম্বী করিলেন। তদনন্তর শবর নামে এক জন বৌদ্ধ আসিয়া উপস্থিত হইল এবং অদ্বৈতমতের দোষ কীর্ত্তন করিতে লাগিল। বৌদ্ধ বলিল যে, দৃষ্ট ফল পরিত্যাগ করিয়া অদৃষ্ট ফলাভিলাষ অনুচিত এবং নির্ব্বোধের কর্ম্ম। অদ্বৈত জ্ঞান শশবিষাণবৎ অসম্ভব, সুতরাং অগ্রাহ্য। মনুষ্য যত দিন জীবিত থাকে নানারূপে অন্নপানাদি দ্বারা আত্মাকে চরিতার্থ করিবে এবং মৃত্যুর পর মুক্তিলাভ করিবে। পরকাল লইয়া মস্তিষ্ক বিলোড়ন করিবার প্রয়োজন কি? যাহা দেখিতে পাইতেছ তদনুসারে কার্য্য কর। সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন কর এবং আনন্দানুভব দ্বারা জীবন সফল কর। দেহপাত হইলেই মোক্ষ প্রাপ্তি হইবে।" শবর এই কথা বলিলে শঙ্করাচার্য্য উত্তর করিলেন যে দেহনাশ দ্বারা মুক্তি হইতে পারে না, কারণ পরলোক গমন শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। আর আমরা ভূরি ভূরি প্রমাণ দেখিতে পাই যে "এই দেবতা আমার উপাসনা দ্বারা তুষ্ট হইয়া দেহাবসানে আমাকে আশ্রয়-স্থান দিবেন।" অতএব জীব দেহনাশানন্তর লোকান্তরে গমন করে।

"পরমাত্মা সর্ব্বদেবরূপঃ সর্ব্বলোকদঃ।
যো দেবো যদাভীষ্টঃ তল্লোকদঃ স এবাত্মা
একোঽদ্বিতীয়ঃ।"

সুতরাং জ্ঞান ব্যতিরেকে মুক্তি হইতে পারে না। সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন এবং আত্মাতে সর্ব্বভূতদর্শন দ্বারাই পরম ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয়। এক্ষণে মূঢ় বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া অদ্বৈত মত গ্রহণ দ্বারা সুস্থ হও।" এবম্প্রকারে আচার্য্য কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া শবর আচার্য্যের পাদবন্দনা করিয়া অদ্বৈত মত অবলম্বন পূর্ব্বক আচার্য্যের সেবক হইল *। অনন্তর উজ্জয়িনী পরিত্যাগ করিয়া শঙ্করাচার্য্য বায়ু কোণে চলিলেন।

ক্রমশঃ

---

* এই বৌদ্ধমত যে প্রাচীন বৌদ্ধমত হইতে অনেক ভিন্ন তাহা এস্থলে বলা আবশ্যক।

নূতন পুস্তক সমালোচন।

প্রকৃতিতত্ত্ব। শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীরাম পালিত প্রণীত, বাল্মীকি যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য ৷৷০ আনা

এই গ্রন্থে প্রকৃতির জ্ঞাতব্য তত্ত্ব সকল পদ্যে বিবৃত হইয়াছে। বঙ্গ-সাহিত্যে এই গ্রন্থ খানি নূতন প্রণালীর। বঙ্গভাষায় পদ্য-গ্রথিত প্রাকৃতিক তত্ত্ব ইতিপূর্ব্বে আমরা কখন দেখি নাই। তজ্জন্য অতি যত্নসহকারে ইহা পাঠ করিলাম। ছেলেরা কবিতা যত শীঘ্র শিখে এমন আর কিছু নহে, অতএব গ্রন্থকার বিনোদ ও শিক্ষা একত্র করিবার জন্য গ্রন্থটি পদ্যে লিখিয়াছেন। তিনি স্বীয় অভীষ্ট সাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। যে সমস্ত বিষয় মনুষ্যের ঐহিক ও পারত্রিক শুভ সাধন করে আমাদের মতে তাহাই সর্ব্বোচ্চ। প্রকৃতিতত্ত্বের গ্রন্থকার সেই সর্ব্বোচ্চ বিষয় লইয়া গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। এই গ্রন্থ পাঠে প্রকৃতির গূঢ় ও গভীর তত্ত্ব সকল আয়ত্ত হইবার সঙ্গে ঈশ্বরের রচনা-কৌশল অবগত হওয়া যায় এবং তন্নিবন্ধন তাঁহার প্রতি ভক্তি ও প্রীতি বর্দ্ধিত হয়। এক্ষণে বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া হয় না। যখন জনসমাজে ধর্ম্মের একতা নাই তখন বিদ্যালয় সমূহে কোন একটি বিশেষ ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া ভাল বোধ হয় না, কিন্তু যে গ্রন্থ সাম্প্রদায়িক দোষ দুষ্ট নয় অথচ নির্ব্বিশেষ ভাবে ধর্ম্মশিক্ষা দেয় আমরা বিদ্যালয়ে শিক্ষার জন্য সেই সকল গ্রন্থ নির্বাচন করিতে বলি। প্রকৃতিতত্ত্ব সেই শ্রেণীর গ্রন্থ। ইহা সমস্ত বঙ্গ বিদ্যালয়ে বিশেষত স্ত্রীশিক্ষার পাঠ-প্রণালী মধ্যে গৃহীত হওয়া উচিত। গ্রন্থকার কঠিন বিষয় অতি সরল ও সুললিত ভাষায় সকলের বোধসুলভ করিয়া দিয়াছেন। এই রূপ গ্রন্থ যত প্রচারিত হয় ততই ভাল।

বিজ্ঞাপন।

A History of the Brahmo Samaj from its rise to the present day by G. S. Leonard, late Assistant Secretary to the Asiatic Society of Bengal. To be had at the Adi Brahma Samaj Library Price 3 Rs. Postage 1½ anna.

মফঃস্বলস্থ যে সকল ব্রাহ্মসমাজে ও বিশেষ ব্যক্তিকে বিনা মূল্যে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা দেওয়া হয় তাঁহারা বৎসরের প্রারম্ভে ডাক মাশুল প্রেরণ না করিলে পত্রিকা পাঠান যাইবে না।

আগামী ২ভাদ্র রবিবার ধর্ম্মপুর ব্রাহ্মসমাজের সপ্তম সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে প্রাতে ৭৷৷ টা এবং অপরাহ্নে ৪টার সময় ব্রহ্মোপাসনা আরম্ভ হইবে।

আয় ব্যয়

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫০।

আষাঢ় ১৮০১ শক।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	...	৩৬৫৷৷৵১০
পূর্ব্বকার স্থিত		...	১৮৪৷৴১৫
সমষ্টি	...	...	৫৫০ (৫
ব্যয়	...	...	৩৫৬ ৷ ১০
স্থিত	...	...	১৯৩৷৷৶১৫

আয়

ব্রাহ্মসমাজ	১০ ৶০
দান প্রাপ্ত।	
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পাথুরেঘাটা)	৫
„ শ্যামলাল গুপ্ত	২
	৭
সঙ্গীতের কাগজ বিক্রয়	১৸০
ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির নিকট ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান আদি পাঠাইবার মাশুল আদায়	১৷৵০
	১০ ৶০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৫৯৸৴১০
পুস্তকালয় ...	১২৸৶০
যন্ত্রালয় ..	২৪৮৷০
গচ্ছিত ...	৩৪৷৶০
সমষ্টি	৩৬৫৷৵১০

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	...	...	৭৩৷৵১০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা..		...	৯৭ ৷ ১০
পুস্তকালয়	...	...	২২৸০
যন্ত্রালয়	...	...	১০৪ ৷ ৫
গচ্ছিত	...	...	৫৮৷৴ ৫
সমষ্টি			৩৫৬৷১০

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

Registerd NO 52.

দশম কল্প
প্রথম ভাগ
৪৩৪ সংখ্যা আশ্বিন ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫০ শক ১৮০১

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ब्रह्मवा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयं सर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्य साधनञ्च तदुपासनमेव।

বহিরিন্দ্রিয় সংযম।

"ইন্দ্রিয়ানাং বিচরতাং বিষয়েষপহারিষু।
সংযমে যত্নমাতিষ্ঠেদ্বিদ্বান যন্তেব বাজিনাং॥"

বহিরিন্দ্রিয়সংযম ব্রহ্ম-সাধনের একটী প্রধান অঙ্গ। বহিরিন্দ্রিয়-সকলকে সংযত ও উপরত করিতে না পারিলে, কোন রূপেই চিত্ত শান্ত ও বিক্ষেপশূন্য হয় না। চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি বহিরিন্দ্রিয় সকলের বাহ্য বিষয়ে সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকাই স্বাভাবিক ধর্ম্ম। মনোবৃত্তি সকল তাহাদিগকে অবলম্বন করিয়াই বহির্জগৎ হইতে জ্ঞান আহরণ করে, নানা চিন্তায় বিবিধ কল্পনায় ব্যাপৃত হয়। সুতরাং সাধন সমাধান সময়ে যদি চক্ষু কর্ণাদিকে আয়ত্ত এবং মনোবৃত্তি সকলকে সংযত করা যায়, তাহা হইলে সহজেই হৃদয় স্থির হ্রদের ন্যায় শান্ত সমাহিত হইয়া পড়ে। নতুবা বহিরিন্দ্রিয় সকল বাহ্য বিষয়ে নিয়োজিত হইলেই মন নানা চিন্তায় ধাবিত হয়, বুদ্ধি নানা বিষয়ে ব্যাপৃত হইয়া থাকে; তন্নিবন্ধন চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদন করা সাধকের পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। অতএব সর্ব্ব প্রযত্নে চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় সকলকে স্বীয় আয়ত্ত করিতে বিশেষ যত্নশীল হইবে। বহিরিন্দ্রিয় সকল বশীভূত না হইলে ব্রহ্ম-চিন্তায় ব্রহ্মোপাসনায় বিশেষ ব্যাঘাত উপস্থিত হয়। সাধক এদিকে প্রাণপণযত্নে ঈশ্বরে চিত্তসন্নিবেশ করিবার চেষ্টা পাইতেছেন, ও দিকে চক্ষু অন্য বিষয় দেখিবার জন্য উৎসুক, কর্ণ অন্য শব্দ শুনিবার নিমিত্ত উন্মুখ, রসনা অন্যবিধ রসাস্বাদন করিবার জন্য লালায়িত, নাসিকা অপর দ্রব্যের আঘ্রাণ লইবার নিমিত্ত সস্পৃহ, স্পর্শেন্দ্রিয় স্পর্শসুখ অনুভব করিবার কামনায় ব্যতিব্যস্ত; তাহা হইলে আর কিরূপে আত্মা পরব্রহ্মে সংস্থিত হইবে। একারণ বহিরিন্দ্রিয় সংযমে কৃতকার্য্য হওয়াই সাধকের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়।

চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় সকলকে এরূপ আয়ত্ত ও বশীভূত করিতে হইবে যে, উপাসনা জন্য আসীন হইলেই যেন তাহারা বহির্বিষয় হইতে উপরত হয়। চক্ষু নিমীলিত করিলে যেমন আর তাহাতে অন্য বস্তুর প্রতিবিম্ব পতিত হয় না, তেমনি অপর ইন্দ্রিয়-দ্বার অবরুদ্ধ করিবার স্বাভাবিক কবাট না থাকিলেও তাহারদিগকে স্ব স্ব

বিষয় হইতে এই রূপে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে যে, তাহারদের উপভোগ্য বিষয়-রাশি চতুর্দ্দিকে অবস্থান করিলেও যেন তাহারা তৎ তৎ বিষয়ে ধাবিত না হয়। চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় সকল যেন হৃদয়েতে সন্নিবিষ্ট হইয়া সাধন সমাধানের বিশেষ সহায়তা করে। আত্মা যখন বিষয়াতীত পরব্রহ্মের ধ্যান ধ্যারণায় প্রবৃত্ত হয়, বহিরিন্দ্রিয় সকলও যেন সেই সময়ে বিষয়-সম্বন্ধ পরিত্যাগ করে। তাহা হইলে সাধক অল্পায়াসে অল্প যত্নেই আত্মাকে পরমাত্মার সন্নিহিত করিতে সমর্থ হয়। চক্ষু কর্ণাদির উপভোগ্য বিষয় রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ, ইহারা সমুদায়ই পার্থিব সুতরাং অস্থায়ী। এই সকল ইন্দ্রিয়-সুখ কখনই আত্মার আভ্যন্তরিক তৃষ্ণা দূর করিতে পারে না। আত্মা যখন ব্রহ্মগত-প্রাণ হইবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়, তখন কদাচ ইচ্ছাবশত ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়ে চক্ষু কর্ণাদিকে আসক্ত হইতে দিবেক না। বরং তাহা স্বর্গ-মোক্ষের বিরোধী, ইহা মনে মনে চিন্তা করিয়া তাহারদিগকে নিবৃত্ত করিবে।

"ইন্দ্রিয়ার্থেষু সর্ব্বেষু ন প্রসজ্যেত কামতঃ।
অতি প্রসক্তিঞ্চৈতেষাং মনসা সন্নিবর্ত্তয়েৎ॥"

সামাজিক উপাসনায় শ্রবণেন্দ্রিয়ের প্রয়োজন। সাধককে আচার্য্যের ভগবৎ-প্রেমপূর্ণ উপদেশ সকল শুনিতে হয়, গায়কের নিকটে মধুরতর ব্রহ্মযশঃসংগীত শ্রবণ করিবার আবশ্যক হইয়া থাকে। অতএব বহিরিন্দ্রিয় সকলের উপরে এমনই কর্ত্তৃত্ব রাখিবে, যেমন বীণাবাদক রাগ-বিশেষ আলাপ করিবার সময়ে অনুলোমগামী তন্ত্রী-বিশেষ (পর্দ্দা) অনায়াসে উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক উচ্চতর বা নিম্নতর অভিলষিত তন্ত্রীতে বাদন-ক্রিয়া সম্পাদন করেন; তেমনি সাধক যেন ইচ্ছাক্রমে অভিলষিত ইন্দ্রিয়-দ্বার প্রমুক্ত করিয়া বাহ্য বিষয় হইতে ব্রহ্মজ্ঞানামৃত আহরণ করত আত্মাকে পোষণ করিতে পারেন। কিরূপে যে বহিরিন্দ্রিয় সকলের উপরে উপাসকের এরূপ কর্ত্তৃত্ব ও প্রভুত্ব জন্মে, তাহার উপায় নির্দ্দেশ করা সহজ ব্যাপার নহে। কিন্তু এই মাত্র সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, অভ্যাস ও সাধন দ্বারা এই দুঃসাধ্য ব্যাপারও সাধ্যায়ত্ত হইয়া আইসে।

ইন্দ্রিয়সংযমের ন্যায় শরীরসংযমও নিতান্ত প্রয়োজন। অনেকে শরীর সংযত করিতে সমর্থ না হওয়ায় একাসনে দীর্ঘকাল উপবেশন করিয়া অনন্যমনে ঈশ্বরচিন্তায় নিমগ্ন থাকিতে পারেন না। শারীরিক কষ্ট ক্লেশ নিবন্ধন অংশ পরিবর্ত্তনাদি দ্বারা চিত্ত-বিক্ষেপ উপস্থিত হয় সুতরাং ধ্যান ধারণার বিশেষ ব্যাঘাত হইয়া থাকে। অতএব তপঃক্লেশ সহ্য করিবার জন্য সর্ব্ব প্রযত্নে শরীরকে সুপুষ্ট বলিষ্ঠ ও সহিষ্ণু করিয়া তুলিবে। যাহাতে দীর্ঘকাল সমাসীন থাকিয়া একত্রে হৃদয়ে ঈশ্বরের বরণীয় জ্ঞান শক্তি ধ্যানে নিযুক্ত থাকা যাইতে পারে, তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নশীল হইবে। অনেক অসহিষ্ণু সাধক, প্রকাশ্য উপাসনা-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া স্থান-ত্যাগ, পার্শ্ব পরিবর্ত্তন, বা বহির্গমন প্রভৃতি দ্বারা অপরাপর উপাসকদিগের যোগ-ভঙ্গ, সাধন-ব্যাঘাত উপস্থিত করিয়া থাকেন। অনেকে বাক্-সংযমে অপটুতা নিবন্ধন অল্পকাল মধ্যেই বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইয়া অবশিষ্ট সাধকদিগকে মর্ম্মান্তিক বেদনা প্রদান করেন। শ্রেষ্ঠাধিকারী ব্রহ্মোপাসকদিগের পক্ষে ইহা সামান্য কলঙ্কের বিষয় নহে। যম নিয়ম আসন প্রভৃতি সাধন-অঙ্গগুলি পর্য্যায় ক্রমে শিক্ষিত ও অভ্যস্ত হইলে আর এরূপ বিঘ্ন বিপত্তি উপস্থিত হইবার আশঙ্কা থাকে না। যিনি যতই কেন উচ্চ-শিক্ষা

প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছুক হউন না, যদি যথা-পদ্ধতি বর্ণমালা হইতে সোপান-পরম্পরায় শিক্ষিত না হন, তাহা হইলে তাঁহার সেই আশা দুরাশা হইয়া পড়ে। উপর্য্যুপরি রীতিমত শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে উচ্চতর শিক্ষা সহজ হইয়া উঠে।

পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে সাধন সমাধান বিষয়ে কৃতকার্য্য হইবার জন্য কত শত আচার্য্য দ্বারা কত প্রকার যোগ-শাস্ত্র প্রকাশিত হইয়াছে। ইন্দ্রিয়-সংযম প্রভৃতি বিষয়ে কত লোকের দ্বারা কত প্রকার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। তৎসমূহের সাধন-প্রক্রিয়া যেরূপই হউক না, শরীরকে তপঃক্লেশ-সহিষ্ণু করা, সাধন সমাধান সময়ে ইন্দ্রিয়-দিগকে বহির্বিষয় হইতে বিরত করিয়া অন্তর্ম্মুখ করাই তৎসমূহের গূঢ় উদ্দেশ্য। কতলোকে তাহার সার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া এক একটী ইন্দ্রিয়-পথ এককালে নিরোধ করত এক একটী অশেষ জ্ঞান-দ্বার অবরোধ করিয়া সেই বিশ্বশিল্পী মহান্ পুরুষের অনুপম স্নেহ করুণা যাবজ্জীবনের জন্য বিসর্জন দিয়াছেন। কত মনুষ্য সাধন সংযমের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে না পারিয়া অনশনাদি দ্বারা শরীর ক্ষয় করিতেছেন। অতএব এই সারতম ধর্ম্ম-উপদেশ স্মরণ রাখিয়া আত্ম-হত্যা হইতে বিরত হইবে।

"প্রাপ্য চাপ্যুত্তমং জন্ম, লব্ধা চেন্দ্রিয়সৌষ্ঠবম্।
নবেত্ত্যাত্মহিতং যস্তু স ভবেদাত্মঘাতকঃ॥"

উত্তম মানব জন্ম প্রাপ্ত হইয়া এবং ইন্দ্রিয়-সৌষ্ঠব লাভ করিয়া যে ব্যক্তি আত্মহিত না জানে, সে আত্মঘাতী হয়।

অতএব কোন রূপে দেবদত্ত ইন্দ্রিয়-সৌষ্ঠব সকল বিনষ্ট বা বিকৃত না করিয়া তাহাদিগকে সংযত ও বশীভূত করিবে। মিতাহার ও মিতাচার দ্বারা শরীর মনকে পাপাচরণ হইতে বিরত রাখিবে। "যাঁহারা মন ও বাক্য ও কর্ম্ম ও বুদ্ধি দ্বারা পাপাচরণ না করেন, সেই মহাত্মারাই তপস্যা করেন, যাঁহারা শরীর শোষণ করেন, তাঁহারা তপস্যা করেন না।

"যে পাপানি ন কুর্ব্বন্তি মনোবাক্কর্ম্মবুদ্ধিভিঃ।
তে তপন্তি মহাত্মানোন শরীরস্য শোষণম॥"

পরকাল।

(৪৩৩ সংখ্যক পত্রিকার ৯২ পৃষ্ঠার পর)

এস্থলে ইহা উল্লেখ করা বাহুল্য বোধ হইতেছে যে, মহামহোপাধ্যায় স্যার উইলিয়ম হ্যামিল্টন স্বীয় দর্শনে "Consciousness"কে যে ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন এই প্রস্তাবে আমরাও প্রতিবোধ ও সংজ্ঞাকে সেই অর্থে গ্রহণ করিয়াছি।

আমাদের সর্ব্ব প্রকার জ্ঞানের মূলে প্রতিবোধ বিদ্যমান রহিয়াছে। আমরা বর্ত্তমানে যাহা প্রত্যক্ষ করি, যাহা অনুভব করি, যাহা বিশ্বাস করি, সকলেরই মূলে যেমন প্রতিবোধ তেমনি আবার স্মরণ করিয়া কোন অতীত তত্ত্ব উদ্ধার করিতে হইলে আমরা প্রতিবোধ মধ্যেই তাহা প্রাপ্ত হই, এবং আশা ও কল্পনাবলে কোন ভাবী বিষয়ের সূচনা করিতে হইলে তাহাকেও এই প্রতিবোধ-ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠাপিত করি। প্রত্যুত প্রতিবোধ ব্যতীত আমাদের কোন রূপ জ্ঞান-ক্রিয়া সম্ভব হয় না। প্রতিবোধই আমাদের সর্ব্ব প্রকার জ্ঞানের আশ্রয় ও আয়তন; প্রতিবোধই জ্ঞাতা। জ্ঞাতা-জ্ঞেয়ের সম্বন্ধ-ভাবের নাম জ্ঞাতৃতা বা জ্ঞান। জ্ঞান-ক্রিয়ার জন্য জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের স্বতন্ত্র সত্তা অবশ্য প্রয়োজনীয়। জ্ঞান জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়কে এক সম্বন্ধ-সূত্রে নিবদ্ধ করে।

অন্যান্য গুরুতর বিষয়ে সম্যক্ মত-ভেদ সত্ত্বেও প্রতিবোধের স্বাভাবিক রিক্ত-

প্তির প্রামাণ্য বিষয়ে দার্শনিকদিগের কাহারও মতভেদ যে নাই, ইহা আমরা মিল সাহেবের বচন দ্বারা পূর্ব্বেই প্রদর্শন করিয়াছি। তবে এক্ষণে বিবাদ কেবল প্রতিবোধের কোন কোন বিজ্ঞপ্তির স্বাভাবিকতা লইয়া। কেহ বলেন আত্মা ও আত্মেতর বহিঃসত্তা প্রতিবোধের সাক্ষাৎ বিষয়, এবং তাহার তৎ বিষয়ক বিজ্ঞপ্তি স্বাভাবিক। অন্য পক্ষ বলেন, আত্মা ও বাহ্য সত্তা কিছুই প্রতিবোধের সহজ ও সাক্ষাৎ বিষয় নহে। কতকগুলি অনুবোধ ও অনুভূতিই কেবল প্রতিবোধের সাক্ষাৎ বিষয়। আমাদের আদিম প্রতিবোধ মধ্যে আত্মা ও আত্মেতর সত্তার সাক্ষাৎ উপলব্ধি হয়, এরূপ বলা ভ্রম। (The "Statement that a Self and a Not-Self are immediately apprehended in our primitive consciousness" is wrong—Mill.) কিন্তু দার্শনিক-প্রবর লব্ধপ্রতিষ্ঠ মনস্তত্ত্ববিৎ হ্যামিল্‌টন সাহেব বলেন "ইন্দ্রিয়বোধ-ক্রিয়ায় আমরা আত্মা ও আত্মেতর সত্তাকে আমাদের প্রতিবোধ মধ্যে একত্রে কিন্তু পরস্পর বৈলক্ষণ্য ভাবে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করি। ইহাই প্রতিবোধের দ্বিত্বভাবমূলক তত্ত্ব। ইহা পরিস্কার ও স্পষ্ট বিষয়। আমি যখন কোন অতি সহজ ইন্দ্রিয়বোধ-ক্রিয়াতে চিত্ত বিনিবেশিত করিয়া পর্য্যবেক্ষণের পর প্রতিনিবৃত্ত হই, তখন আমি আছি এবং আমি ভিন্ন অন্য সত্তা বিশেষও আছে, এই দুইটী তত্ত্ব প্রকৃত প্রস্তাবে বরং একই তত্ত্বের এই দুইটী শাখা বিষয়ে আমার উপলব্ধি অনিবার্য্য হয়। এবং এতৎ কার্য্যে আমি আপনাকে অনুভবকারী বিষয়ী, এবং বাহ্য সত্তাটীকে অনুভূত বিষয় রূপে সংজ্ঞাত হই। এবং এই দুই সত্তাকে আমি আমার স্বাভাবিকী জ্ঞান-ক্রিয়ার একই ক্ষণে প্রতীতি করি" "We are immediately conscious in perception of an ego and a non-ego known together and known in contrast to each other. This is the fact of Duality of Consciousness. It is clear and manifest. When I concentrate my attention in the simplest act of perception, I return from my observation with the most irresistible conviction of two facts, or rather two branches of the same fact;—that I am,—and that something different from me exists. In this act I am conscious of myself as the perceiving subject, and of an external reality as the object perceived; and I am conscious of both existences in the same indivisible moment of intuition. Lecture XVI, P. 288.

এরূপ ইন্দ্রিয়বোধ-ক্রিয়ায় আত্মা ও বাহ্য সত্তার বাস্তবতা প্রতিবোধ মধ্যে একত্রে উপলব্ধি করা আত্মার স্বাভাবিক কার্য্য; এবং এই অনুবোধকে আত্মপ্রত্যয় বা স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাস নামেও অভিহিত করা করা যায়। ইহা সকলেরই পরীক্ষার বিষয়, এবং ইহার পরীক্ষাও অতি সহজ। এবং আমাদের প্রতিবোধের বর্ত্তমান পরিণত অবস্থাতে এই কূটস্থ ভাব দ্বিতয়ের উপলব্ধি যে তন্মধ্যে প্রতিভাত হয়, ইহা প্রতিপক্ষীয়েরাও অস্বীকার করেন না, কিন্তু তাঁহারা বলেন "ইহাই সম্ভব যে আমাদের ইন্দ্রিয়বোধিত অনুভূতি সকলকে নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে ও একত্রে সংশ্লিষ্ট ভাবে পুনঃ পুনঃ দীর্ঘকাল বোধগোচর না করিলে আত্মেতর সত্তার ভাব আমাদের উপলভ্য হয় না। পরন্তু আবার পরস্পর বৈষম্যভাবাপন্ন হেতু আত্মেতর সত্তার উপলব্ধি ব্যতীত আত্মোপলব্ধিও সম্ভব নহে। কারণ বৈষম্যানুবোধই জ্ঞান। অতএব এই ইতর সত্তার উপলব্ধি বিনা, অন্য যে কোন অনুভূতি, আমরা প্রথম বোধগোচর করি, তদ্দ্বারা যে আত্মজ্ঞান উদ্বোধিত হইবে ইহা কখনই বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না। যদিও এই দুই কূটস্থ ভাব আত্মা ও ইতর সত্তা বর্ত্তমানে আমাদের

প্রতিবোধ-ক্ষেত্রে বিদ্যমান রহিয়াছে, এবং তাহাদিগকে প্রতিবোধ হইতে অপসারিত করা দুষ্কর, অথবা দুষ্করবৎ প্রতীয়মান হয়, তথাপি ইতর সত্তার ভাব প্রথমাবধি যে আমাদের প্রতিবোধ মধ্যে ছিল, ইহা বিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। যেহেতু প্রথমাবধি না থাকিলেও উহা যে প্রকারে উদ্ভূত হইতে পারে,—হইতে পারে কেন—বরং নিশ্চয় যে প্রকারে উদ্ভূত হয়, তাহার ক্রম আমাদের বোধগম্য।" We have, in all probability, no notion of not-self, untill after considerable experience of the recurrence of sensations according to fixed laws and in groups. But without the notion of not-self, we cannot have that of self which is contrasted with it; and independently of this, it is not credible that the first sensation which we experience, awakens in us any notion of an Ego or Self." "Although these two elements, an Ego and a Non-ego, are in our consciousness now, and are, or seem to be, inseparable from it, there is no reason for believing that the latter of them, the non-ego, was in consciousness from the beginning; since even it was not, we can perceive a way in which it not only might, but must have grown up."—Mill's Examination of Hamiltion's Philosophy pp 214, 204.

উদ্ধৃত বাক্যগুলি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে প্রতীতি হইবে যে, প্রতিবোধের বিশুদ্ধ বিজ্ঞপ্তির প্রতি কাহারও অশ্রদ্ধা নাই। এবং উভয় পক্ষই স্বীকার করেন যে, প্রতিবোধের বর্ত্তমান অবস্থাতে, তন্মধ্যে উক্ত কূটস্থ তত্ত্বযুগল আত্মা ও ইতর সত্তা উপলভ্য হয়। দার্শনিকপ্রবর হ্যামিলটন সাহেব সমূহ সাধারণ মনুষ্যবর্গের সহিত একমত হইয়া বলেন যে প্রতিবোধ মধ্যে এই তত্ত্ব-দ্বিতয়ের আবির্ভাব স্বাভাবিক। এবং আমাদের তৎ তৎ বিষয়ক জ্ঞান, মুখ্য জ্ঞান; তাহা অবশ্য বিশ্বসনীয়। কিন্তু তার্কিকবর মিল সাহেব বলেন, উক্ত কূটস্থ তত্ত্বদ্বয় যদিও বর্ত্তমানে আমাদের প্রতিবোধে অপরিহার্য্য বলিয়া প্রতীত হয়, তথাপি তাহাদিগকে প্রতিবোধের স্বাভাবিক বিজ্ঞপ্তি বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। যে হেতু প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, ইতর সত্তার ভাব উপার্জ্জিত ও আগন্তুক। আমাদের আদিম প্রতিবোধ কিরূপ, তাহা এক্ষণে নির্ণয় করা অসাধ্য; অতএব বর্ত্তমান প্রতিবোধান্তর্গত আপাতত স্বাভাবিকবৎ প্রতীয়মান উক্ত ভাবের আগম-পথ নির্দ্দেশ করিতে পারিলে, তাহাকে আর স্বাভাবিক বা স্বয়ম্ভূত বলা যায় না। বলিলে প্রমেয় যাচ্ঞা করা হয়। অধিকন্তু আবার ইতর সত্তার ভাব ব্যতীত আমাদের আত্মজ্ঞানও সম্ভব হয় না। কারণ আমাদের জ্ঞান অন্ধভাবাত্মক। আমরা আপনাদিগকে কি ভাবে অবগত হই? অন্য হইতে ভিন্ন বলিয়াই আমরা আপনাদিগকে জানি। অতএব ইতর সত্তার ভাব আগন্তুক হইলে তদালম্বিত আমাদের আত্মভাবও যে আগন্তুক হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু হ্যামিল্টন বলেন আমাদের প্রতিবোধ মধ্যে আমরা এই দুইটী কূটস্থ তত্ত্বকে কেবল যে যুগ্মভাবে প্রাপ্ত হই, এমন নহে। উহারা তথায় উভয়ে একত্রে কিন্তু পরস্পর সমতুল ও স্বতন্ত্র ভাবে উদিত হয়। "Consciousness not only gives us a duality, but it gives its elements in equal counterpoise and independence. The ego and non-ego—mind and matter—are not only given together, but in absolute co-equality." Lecture. XVI. P. 292.

মিলের উপরি উক্ত মত যদি সত্য হয়, "আমি আছি" বর্ত্তমান কালের এই সহজ আত্মবোধ যথার্থই প্রতিবোধের স্বাভাবিক বিষয় না হইয়া, যদি আগন্তুক হয়, তাহা

হইলে আমাদের পরকালিক জীবনের প্রতি বিশ্বাস কি প্রকারে প্রতিবোধের স্বাভাবিক বিষয় হইতে পারে? একেত "বর্ত্তমান বিষয়ই প্রতিবোধের বিষয়, ভবিতব্য বিষয়, তাহা নহে," ;"Consciousness is of *what is*, not *of what must be*" প্রতিবোধ সম্বন্ধীয় এই নির্দ্দেশ পরকালকে তন্মধ্যে দর্শন-সম্ভাবনার বিসম অন্তরায় রহিয়াছে; তাহাতে আবার যদি এরূপ হয় যে আমরা আমাদের বর্ত্তমান আত্মঅস্তিত্ব প্রতিবোধ মধ্যে গৌণ ভাবে উপলব্ধি করি, তাহা হইলে আমাদের পারলৌকিক বিশ্বাসকে মুখ্য জ্ঞান বলিয়া নির্দ্ধারণ করা একেবারে অসম্ভব বোধ হয়। এবং তাহা হইলে আমাদের পরকালের প্রতি নির্ভর ও নিষ্ঠা বিচলিত হইয়া উঠে। কারণ গৌণ জ্ঞানের যাথার্থ্যের প্রতি আমাদের সমধিক আস্থা নাই, তৎপ্রতি সন্দেহের উপলক্ষ অতি প্রবল। সংশয়ী মহাশয়েরা ইহা অতি বিশদ রূপে আমাদিগকে প্রদর্শন করিয়াছেন।

ক্রমশঃ

তত্ত্বকৌমুদী ও ব্রাহ্মবিবাহ।

আমরা গত আষাঢ় মাসের পত্রিকায় "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ও তত্ত্বকৌমুদী" শীর্ষক প্রস্তাবে ব্রাহ্মবিবাহ রেজিস্টারি করিবার বিরুদ্ধে যাহা যাহা বলিয়াছিলাম, বিগত ১ শ্রাবণের তত্ত্বকৌমুদী তাহার প্রতিবাদ করিয়া এক দীর্ঘ প্রস্তাব লিখিয়াছেন। আমাদিগের যুক্তি গুলি খণ্ডন করিবার জন্য তিনি যে সকল বাক্যের অবতারণা করিয়াছেন আমরা এই প্রস্তাবে তাহার অপ্রামাণিকত্ব ও অসারত্ব প্রতিপন্ন করিব।

তত্ত্বকৌমুদী আদি ব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতি অনুসারে হিন্দু বিবাহের তিনটি প্রধান অঙ্গ সম্প্রদান, পাণিগ্রহণ ও সপ্তপদীগমন সহকৃত অপৌত্তলিক ঈশ্বর-নাম-পূত বৈদিক-মন্ত্রোচ্চারণ ও ব্রহ্মোপাসনা পূর্ব্বক বিবাহ যে সিদ্ধ তাহা তিনি স্বীকার করিতে চাহেন না। স্বীকার না করিবার তিনি এই কারণ দেন যে এতদ্দেশীয় প্রায় সকল প্রধান প্রধান পণ্ডিতই একবাক্যে বলেন যে উক্ত বিবাহ অসিদ্ধ। এই কারণটি অপ্রামাণিক, এবং সত্য ইহার ভিত্তি নহে। যখন ব্রাহ্ম-বিবাহ সিদ্ধ কিনা এই বিষয় লইয়া আন্দোলন চলিতেছিল তখন আদি ব্রাহ্মসমাজ কাশীস্থ এবং নবদ্বীপ বিক্রমপুর কলিকাতা ও ত্রিবেণী প্রভৃতি সমাজস্থ ধর্ম্মশাস্ত্রব্যবসায়ী প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণের নিকট হইতে মত গ্রহণ করেন; তাঁহারা সকলেই একবাক্যে আদি সমাজের পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ বলিয়াছিলেন। যখন কাশীস্থ অষ্টবিংশতি জন, নবদ্বীপ প্রভৃতি সমাজস্থ পঞ্চবিংশতি জন, বিক্রমপুরস্থ চতুঃপঞ্চাশ জন ও কলিকাতার নয় জন ধর্ম্মশাস্ত্রব্যবসায়ী প্রধান প্রধান পণ্ডিত এবং সুবিখ্যাত ব্যবস্থাশাস্ত্রজ্ঞ ফিট্‌জেমস্ ষ্টিফেন সাহেব ও হিন্দু ব্যবস্থাশাস্ত্রবিৎ ইংলণ্ডপ্রবাসী অধ্যাপক মোক্ষমূলার আদি ব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ বৈধ ও সিদ্ধ বলিয়া মত দিয়াছেন তখন অন্য কোন খ্যাতনামা পণ্ডিত উক্ত বিবাহ অবৈধ ও অসিদ্ধ বলিলে আমরা তাহা স্বীকার করিতে পারি না।

তত্ত্বকৌমুদী বলেন অনেক পণ্ডিত বলিয়াছেন যে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ, নান্দীমুখ, কুশণ্ডিকা না করিলে বিবাহ সিদ্ধ হয় না। বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ, নান্দীমুখ, কুশণ্ডিকা ইত্যাদি না করিলে যে বিবাহ সিদ্ধ হয় তাহা শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয় "ব্রাহ্ম-বিবাহ ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে সিদ্ধ কিনা?" ইত্যভিধেয় প্রস্তাবে বিশদরূপে ও সর্ব্বজন-স-

ন্তোষজনকরূপে প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। তত্ত্বকৌমুদী-সম্পাদককে তাহা পাঠ করিতে আমরা অনুরোধ করি।

তত্ত্বকৌমুদী বলেন কাশীর বাপুদেব শাস্ত্রী প্রভৃতি কয়েক জন পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, হিন্দুবিবাহের যে কএকটি অঙ্গ আছে তাহার কোন একটি অঙ্গ পরিত্যাগ করিলে বিবাহ সিদ্ধ হয় না। হিন্দুসমাজে অঙ্গ-হীন বিবাহ অনেক ঘটিয়া থাকে, কিন্তু সে সকল বিবাহ অবৈধ ও অসিদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হয় না। আমরা জ্ঞাত আছি বোম্বাই প্রদেশে কুশণ্ডিকা ব্রাহ্মণের বিবাহের একটি অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত নহে। কুশণ্ডিকা না করিলে যদি হিন্দুবিবাহ অসিদ্ধ হইত তাহা হইলে বোম্বাই প্রদেশে কুশণ্ডিকা না করিয়া অদ্যাবধি যত বিবাহ হইয়াছে সকলই অসিদ্ধ ও অবৈধ বলিয়া বিবেচিত হইত এবং তাহা বৈধ ও সিদ্ধ প্রতিপন্ন করিবার জন্য ইতিপূর্ব্বেই বোম্বাই প্রদেশবাসীদিগকে রাজদ্বারে উপস্থিত হইতে হইত। ব্রাহ্মণের বিবাহ-পদ্ধতিতে যাহা আছে তাহা শূদ্রের বিবাহ-পদ্ধতিতে নাই। কিন্তু উভয়ের বিবাহ রাজদ্বারে বৈধ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। হিন্দুসমাজে যে সকল বিবাহ প্রচলিত ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে সম্পাদিত হয় না তাহাও রাজদ্বারে বৈধ বলিয়া গণ্য হয়। কবীর, দাদুপন্থী, নানকপন্থী, শিখ্‌-সাধ, শিবনারায়ণী প্রভৃতি হিন্দুসম্প্রদায়ের বিবাহ সকল উক্ত ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে সম্পাদিত না হইলেও রাজদ্বারে বৈধ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে, এমন কি কোকা নামক অতি অধুনাতন সম্প্রদায়ের বিবাহ সকল পঞ্জাব প্রদেশের বিচারালয়ে অবৈধ বলিয়া গণ্য হয় না। চৈতন্যমতাবলম্বী বৈষ্ণবদিগের মধ্যে কেবল কণ্ঠীবদল করিয়া বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে, সে বিবাহও অবৈধ ও অসিদ্ধ নহে। তবে ব্রাহ্মবিবাহ কি দোষ করিল ? তাহা কেন অবৈধ বলিয়া গণ্য হইবেক ? যাঁহারা সমাজ সম্বন্ধে পরকীয় রাজার ব্যবস্থাকে ভয় করেন, যাঁহারদের স্বজাতীয় ভাবে, স্বাধীন ভাবে স্বদেশের ধর্ম্ম ও রীতি নীতির সংস্কার করা সংকল্প ও উৎসাহ, তাঁহাদের নিকটে আদি ব্রাহ্মসমাজের বিবাহ-পদ্ধতি যে কত আদরণীয় তাহা বলা যায় না। যাঁহারা শিক্ষার দোষে স্বজাতীয় বিশুদ্ধ ভাবকে উপেক্ষা করেন তাঁহারা তাহা কোন প্রকারেই বুঝিতে পারেন না।

আমরা বলিয়াছিলাম যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনুমোদিত রেজিস্টরি বিবাহ নিরীশ্বর হইবার কারণ এই যে, এই প্রকার বিবাহে ঈশ্বরোপাসনা গৌণ এবং রেজিষ্টরি মুখ্য কার্য্য। ইহার উত্তরে তত্ত্বকৌমুদী বলেন "আমরা বলি যে ব্রাহ্ম বিবাহের প্রধান অংশ—সারাংশ—মুখ্য অংশ ব্রহ্মোপাসনা; রেজিষ্টরিই হউক আর যাহাই হউক তাহা অবশ্য গৌণ। কোন একটি বিবাহে ব্রহ্মোপাসনা হইল, কিন্তু রেজিষ্টরি হইল না। অবশ্য সকল ব্রাহ্মই তাহাকে ব্রাহ্মবিবাহ বলিবেন। কিন্তু মনে করুন, কোন একটি বিবাহে ব্রহ্মোপাসনা হইল না, কিন্তু বিধি পূর্ব্বক রেজিস্টরি করা হইল। ইহা নিশ্চয়, কোন ব্রাহ্ম, কোন ব্যক্তিই এই শেষোক্ত বিবাহকে ব্রাহ্মবিবাহ বলিবেন না সুতরাং যখন দেখা যাইতেছে যে, রেজিস্টরি না হইলে ব্রাহ্মবিবাহ হয়, কিন্তু ব্রহ্মোপাসনা না হইলে কখনই হয় না, তখন তর্কশাস্ত্রানুসারে নিশ্চয়ই বলিতে হইবে যে ব্রহ্মোপাসনাই ব্রাহ্মবিবাহের অপরিত্যজ্য মুখ্য অংশ।" সহযোগী রেজিষ্টরি বিবাহে ব্রহ্মোপাসনা মুখ্য ও রেজিষ্টরি করা গৌণ কার্য্য ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য উপরে উ-

দ্ধৃত যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা অতি অসার। রেজিষ্টরি না হইলে ব্রাহ্মবিবাহ হয়, এবং ব্রহ্মোপাসনা না হইলে ব্রাহ্মবিবাহ হয় না এই যুক্তি অনুসারে রেজিষ্টরি ও তাহার সহিত ব্রহ্মোপাসনা করিয়া যে বিমিশ্র ও বৈজাত্য ব্রাহ্মবিবাহ সম্পাদিত হয় সে বিবাহে ব্রহ্মোপাসনা মুখ্য ও রেজিষ্টরি করা গৌণ কার্য্য হইল ইহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। যে বিবাহে ব্রহ্মোপাসনা হইল, কিন্তু তাহা সিদ্ধ ও বৈধ করিবার জন্য রেজিষ্টরি করিতে হইল, জিজ্ঞাসা করি, সে বিবাহে ব্রহ্মোপাসনার গৌরব কোথায় রহিল! এইরূপ বিবাহে যে ব্রহ্মোপাসনার কিছুই গৌরব থাকে না তাহা আমাদিগের সহযোগী বিশেষরূপে অবগত আছেন, কিন্তু তাহা জানিয়াও তিনি এইটি তাঁহার দীর্ঘ প্রস্তাবে যত্নের সহিত প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছেন কেন? পাত্র ও কন্যা সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মের সমক্ষে তাঁহাকে সাক্ষী করিয়া তাঁহার উপাসনা পূর্ব্বক উদ্বাহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলেন, সে সাক্ষিতা কিছু হইল না আবার রেজিষ্টারকে সাক্ষী স্বরূপ আনা হইল, ইহাই যখন রেজিষ্টরি ব্রাহ্মবিবাহের প্রকৃতি তখন আমরা কি প্রকারে বলিব যে ব্রহ্মোপাসনা ও পরব্রহ্মের সাক্ষিতাই রেজিষ্টরি ব্রাহ্মবিবাহের মুখ্য কার্য্য? ব্রহ্মোপাসনার পরে কিম্বা পূর্ব্বে রেজিষ্টরি করিয়া যদি বিবাহকে বৈধ ও সিদ্ধ করিয়া লইতে হইল তাহা হইলে ব্রহ্মোপাসনা কি প্রকারে ঐ বিবাহের মুখ্য কার্য্য হইল আমরা তাহা বোধগম্য করিতে পারি না। রেজিষ্টরি ব্রাহ্মবিবাহের ব্রহ্মোপাসনার কোন মূল্যই নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না, অতএব উক্ত বিবাহে নিরীশ্বর-উপাধি সম্পূর্ণ রূপে প্রযুজ্য।

আমরা বলিয়াছিলাম যে সম্প্রদান, পাণিগ্রহণ, সপ্তপদীগমন ও ঈশ্বর-নাম-পূত বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক বিবাহ হইলেই প্রকৃত হিন্দুবিবাহ হয় এবং তাহা সিদ্ধ হয়। আমাদের এই কথা হইতে তত্ত্বকৌমুদী স্বীয় অত্যুর্ব্বর কল্পনাশক্তির সাহায্যে অনুমান করিয়া লইয়াছেন যে ব্রহ্মোপাসনা আদি ব্রাহ্মসমাজের অনুমোদিত বিবাহের প্রধান অঙ্গ নহে। সহযোগী আদি ব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতি অনুসারে সম্পাদিত বিবাহ অবশ্য দেখিয়াছেন, তাহা দেখিয়াও যখন বলিতেছেন যে ব্রহ্মোপাসনা আদি ব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতির প্রধান অঙ্গ নহে তখন ইহাতে কেবল তাঁহার অসম সাহসিকতা ও অকুতোভয়তার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। ব্রহ্মোপাসনা আদি ব্রাহ্মসমাজের বিবাহপদ্ধতির সর্ব্বস্ব। পবিত্র উপাসনা-মণ্ডপে ঈশ্বরের সাক্ষাতেই পিতা পাত্রকে কন্যা সম্প্রদান করেন; পতি পত্নীর পাণিগ্রহণ করেন এবং পরস্পর হৃদয়ে হৃদয়ে সখ্যভাব স্থাপিত করেন। এ সকলই ঈশ্বরের উপাসনার অন্তর্ভূত, ইহার বহির্ভূত কিছুই নহে। ব্রহ্মোপাসনা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে, কিম্বা ব্রহ্মোপাসনা শেষ হইয়া গেলে রাজনিযুক্ত রেজিষ্ট্রারের নিকট ইহাদিগের দ্বিতীয় বার আর আইনোক্ত বিবাহের মন্ত্র পাঠ করিতে হয় না। কিন্তু রেজিষ্টরি করিতে হইলে ১৮৭২ শালের তিন আইনের নিয়মানুসারে রেজিষ্ট্রারকে রাজার প্রতিনিধির ন্যায় বিবাহে উপস্থিত থাকিতে হয় এবং ব্রহ্মোপাসনার পূর্ব্বেই হউক বা পরেই হউক অথবা ব্রহ্মোপাসনা নাই হউক তাহার সাক্ষাতে আইন-অন্তর্গত বাক্য সকল দম্পতীর পাঠ করিয়া বিবাহ সম্পন্ন করিতে হয়। কর্ম্মীর ন্যায় ঈশ্বরের স্থানে অগ্নিকে সাক্ষী করিয়া, পৌত্তলিকের ন্যায় দেবতার স্থানে ঘটকে সাক্ষী করিয়া, নিরীশ্বর বিবাহে রাজার স্থানে রেজিষ্ট্রারকে সাক্ষী করিয়া

বিবাহ দিতে হয়। ইহার সহিত ব্রহ্মোপাসনা করিলে ব্রাহ্মবিবাহের গৌরব কোথায় থাকে? যদি কর্ম্মীরা অগ্নিচয়ন করিয়া বিবাহ দিয়া তাহার পরে ব্রহ্মোপাসনা করে, অথবা পৌত্তলিকেরা ঘটস্থাপন করিয়া বিবাহ দিয়া পরে ব্রহ্মোপাসনা করে, তবে কি সেই সকল বিবাহকে ব্রাহ্মবিবাহ বলা যায়? সেইরূপ রেজিষ্ট্রারের সাক্ষাতে বিবাহ দিয়া ব্রহ্মোপাসনা করিলে কিংবা ব্রহ্মোপাসনা করিয়া রেজিষ্ট্রারের সাক্ষাতে বিবাহ দিলে তাহাকে কি প্রকৃত ব্রাহ্মবিবাহ বলা যাইতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরের অপেক্ষায় আমরা রহিলাম।

আমরা বলিয়াছিলাম "সাধারণ সমাজের অনুমোদিত বিবাহ ঈশ্বরের সাক্ষিতা সত্তেও অসিদ্ধ হয় অর্থাৎ যখন ঈশ্বরের সমক্ষে পরিণীত দম্পতীর সন্তান সন্ততি কেবল রেজিষ্টরি না হওয়াতে দায়াধিকারে বঞ্চিত হয়, তখন তাঁহাদের বিবাহে রেজিষ্টরিই মুখ্য, ঈশ্বরোপাসনা গৌণ, এই জন্য আমরা এই বিবাহে নিরীশ্বর উপাধি দিয়াছি।" ইহার উত্তরে তত্ত্বকৌমুদী বলেন যে কেবল ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া বিবাহ হয় না, সামাজিক ভাবে বিবাহ চাই। ঈশ্বরের সাক্ষিতা যথেষ্ট নহে, মানুষের সাক্ষিতা চাই। তিনি বলেন যে সাধারণ সমাজের অনুমোদিত রেজিষ্টরি বিবাহে যেমন রেজিষ্ট্রারের সাক্ষিতা আবশ্যক, তেমনি আদি সমাজের অনুমোদিত বিবাহে পুরোহিতের সাক্ষিতা আবশ্যক; এবং আমরা যেরূপ বলিয়াছিলাম যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনুমোদিত বিবাহে ঈশ্বরকে গৌণ কল্পে রাখিয়া রেজিষ্ট্রারের সাক্ষিতায় বিবাহ সিদ্ধ করা হইতেছে এবং রেজিষ্ট্রারকে ঈশ্বরের স্থান অধিকার করিতে দিয়া ঈশ্বরের অবমাননা করা হইতেছে, সেইরূপ সহযোগী বলিতে চাহেন যে আদি সমাজের অনুমোদিত বিবাহে ঈশ্বরকে গৌণ কল্পে রাখিয়া পুরোহিতের সাক্ষিতায় বিবাহ সিদ্ধ করা হইতেছে এবং পুরোহিতকে ঈশ্বরের স্থান অধিকার করিতে দিয়া ঈশ্বরের অবমাননা করা হইতেছে। আমরা দেখিতেছি তত্ত্বকৌমুদী এই স্থলে বিষম ভ্রমে পড়িয়াছেন। রেজিষ্ট্রারের সহিত পুরোহিতের তুলনা আদৌ হইতে পারে না। রেজিষ্ট্রার বিবাহের সাক্ষীস্বরূপ বিবাহস্থলে উপস্থিত থাকিয়া বিবাহ বৈধ করেন। পুরোহিত বিবাহ-সম্পাদক স্বরূপ হইয়া মন্ত্র পাঠ করান এবং সম্প্রদান পাণিগ্রহণ ও সপ্তপদীগমন প্রভৃতি কর্ম্ম সম্পাদনে সাহায্য করেন। ইহা ব্যতীত তাঁহার আর কোন কিছু কার্য্য নাই। পুরোহিত রেজিষ্ট্রারের ন্যায় বিবাহস্থলে বিবাহের সাক্ষীস্বরূপ উপস্থিত থাকেন না এবং বর ও কন্যা তাঁহার নিকট আসিয়া পরস্পরকে স্বামী স্ত্রী বলিয়া স্বীকার করিয়া অঙ্গীকার-পত্রে আপনাদিগের নাম সাক্ষর করেন না। পুরোহিত যখন বিবাহের সাক্ষী না হইয়া কেবল বিবাহ-সম্পাদক মাত্র হইলেন তখন সহযোগী আদি সমাজের অনুমোদিত বিবাহকে সাধারণ সমাজের অনুমোদিত রেজিষ্টরি বিবাহের ন্যায় দোষাবহ, নিরীশ্বর, ও ঈশ্বরাবমাননাকারী বিবাহ বলিয়া প্রমাণ করিতে যে প্রয়াস পাইয়াছেন তাহা সর্ব্বতোভাবে ও সম্পূর্ণ রূপে বিফল হইয়াছে।

আমরা উপরে যাহা বলিলাম তাহা আমরা বারংবার বলিয়াছি। আমরা আমাদিগের সহযোগীকে এ পর্য্যন্ত অনেক কথা বলিয়াছি, তথাপি তিনি বুঝিলেন না, অতএব তাঁহাকে বুঝাইবার বিষয়ে আমাদিগকে অবশেষে পরাজয় মানিতে হইল।

শঙ্করাচার্য্যের জীবন-বৃত্তান্ত।

দিগ্বিজয়।

৪৩৩ সংখ্যক পত্রিকার ৯৯ পৃষ্ঠার পর।

উজ্জয়িনী পরিত্যাগ করিয়া শিষ্যবর্গ-সমেত শঙ্করাচার্য্য বায়ুকোণে যাত্রা করিলেন এবং কিয়দ্দিন পর্য্যটন করিয়া অনুমল্ল নামক এক নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই নগরে তিনি একবিংশতি দিবস অবস্থিতি করিলে পর পৌরগণ তাঁহাকে প্রণতি পূর্ব্বক বলিল "স্বামিন্ আমরা মল্লারি দেবের উপাসক। মল্লাসুরকে বিনাশ করিয়া ইনি মল্লারি নামে আখ্যাত হইয়াছেন। ইনি পরমেশ্বর জগৎকারণ এবং মুক্তিদাতা। আমরা ইহাঁর পূজা করি এবং ইহাঁর প্রিয় বরাটিকা-মালা কণ্ঠদেশে ধারণ করি। ইনি সর্ব্বাত্মক ও সর্ব্বব্যাপী এবং আমাদিগের আশ্রয়। আপনিও আমাদিগের মত অবলম্বন করুন।" তখন আচার্য্য তাহাদিগের মত বেদবিরুদ্ধ বলিয়া খণ্ডন করিলেন এবং তাহারা প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপ বিশোধন করিয়া অদ্বৈত মত গ্রহণ করিল। অনন্তর অনুমল্লপত্তন হইতে পশ্চিমদিগভিমুখে গমন করিয়া আচার্য্য মরুন্ধপুর প্রাপ্ত হইলেন। তথায় বিষ্বকসেন মত এবং মন্মথ মত নিরাকরণ করিয়া উত্তরদিক্স্থিত মাগধপুরে প্রয়াণ করিলেন। বিষ্বক্সেন-মত-বাদীরা বলিল "স্বামিন্! বিষ্বক্সেন বৈকুণ্ঠবাসী ভগবান বিষ্ণুর দ্বিতীয় অবতার এবং সকল-লোক-নিয়ন্তা। ইহাঁর উপাসনা দ্বারা আমাদিগের যম-ভয় নিবারণ এবং বৈকুণ্ঠ-লোক-প্রাপ্তি হইবে। আমরা বিষ্বক্সেন দেবের প্রিয় শঙ্খ ও চক্র-চিহ্ন ভুজোপরি ধারণ করিয়া থাকি। আমাদিগের মত অত্যন্ত পুণ্যপ্রদ এবং মুমুক্ষুদিগের গ্রাহ্য।" মন্মথদেবের উপাসকেরা বলিল "স্বামিন্ সর্ব্ব-প্রাণি-হৃদয়ের অন্তর্বর্ত্তী পরমাত্মা মন্মথদেব উৎপত্তি-কারণ, সুতরাং স্থিতি ও সংহারেরও কারণ। ইনি সর্ব্বদাতা ও মুক্তিপ্রদ। ইনি বাঞ্ছাকল্পতরু। অতএব ইহাঁর উপাসনা দ্বারা অবশ্যই মোক্ষলাভ হইবে। আপনিও অদ্বৈত মত বর্জ্জন পূর্ব্বক আমাদিগের মত অবলম্বন করুন।"

আচার্য্য মাগধপুরে উপনীত হইয়া যক্ষালয় নামক প্রসিদ্ধ দেবস্থানে গমন করিলেন এবং সেই স্থানে এক পক্ষকাল বাস করিলেন। কুবের-মতোপাসকগণ স্বর্ণগুটিকা-মালিকা দ্বারা গলদেশ শোভিত করিয়া তাঁহার সহিত বিচার করিতে আসিল। তাহারা বলিল "স্বামিন্ কুবেরদেব ধনদাতা, পূর্ণানন্দপ্রদ এবং ব্রহ্মস্বরূপ। ইহাঁর উপাসনা দ্বারা মোক্ষসিদ্ধি হইবে। অতএব ইনি সকলের উপাস্য।" আচার্য্য তাহাদিগকে বলিলেন "তোমাদের মতে ধর্ম্মলেশও নাই" এবং তিনি তাহাদিগের মত খণ্ডন পূর্ব্বক ইন্দ্রপ্রস্থ নগরে উপস্থিত হইলেন। ইন্দ্রপ্রস্থে ইন্দ্রোপাসকদিগের সহিত তাঁহার বিচার হয়। ইন্দ্রমতাবলম্বীরা ইন্দ্রদেবকেই পরব্রহ্ম রূপে অর্চ্চনা করে। শঙ্করাচার্য্য তাহাদিগের মত নিরসন পূর্ব্বক তাহাদিগকে অদ্বৈত মত গ্রহণ করাইলেন। পরে তিনি যমপ্রস্থ পুরে গিয়া তত্রত্য যমোপাসকদিগকে স্বমতভ্রষ্ট ও অদ্বৈতমতাবলম্বী করিলেন। যমদেবের উপাসকগণ যমকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া পূজা করে এবং যমদেবের অনুগ্রহেই মুক্তিলাভ করিবে বিশ্বাস করে। যমপ্রস্থ হইতে আচার্য্য গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থল পুণ্যবিবর্দ্ধন প্রয়াগ নগরে চলিলেন। প্রয়াগে উপস্থিত হইয়া তিনি পাশচিহ্নধারী বরুণদেবের উপাসক, ধ্বজ-চিহ্নধারী বায়ুদেবের উপাসক, পূর্ণাঙ্কধারী ভূমির উপাসক এবং বিন্দুচিহ্নধারী তীর্থের

উপাসক,—এই চতুর্ব্বিধ উপাসকদিগকে অদ্বৈত মত স্বীকার করাইলেন। বরুণভক্ত তীর্থপতি বলিল যে বরুণই পর ব্রহ্ম এবং সকলের উপাসনীয়। বায়ুভক্ত প্রাণনাথ বলিল যে বায়ুদেবই সকল দেহের প্রাণস্বরূপ মুক্তিদাতা ও উপাসনীয়। ভূমিমতাবলম্বী অনন্ত বলিল যে ভূমিই সর্ব্বকারণ,সর্ব্বোৎকৃষ্ট,সর্ব্বদেবময় এবং মমুক্ষুদিগের উপাস্য। তীর্থোপাসক জীবনদ বলিল যে তীর্থই ব্রহ্ম, সুতরাং উহা মুক্তিলাভেচ্ছু ব্যক্তিদিগের একমাত্র আশ্রয়স্থান ও উপাস্য।

অনন্তর নিরালম্ব নামে একজন শূন্যবাদী আসিয়া আচার্য্যকে বলিল "স্বামিন্, সবই শূন্য, কিছুই নাই, ব্রহ্মও নাই। আমার নাম নিরালম্ব, আমার পিতা কল্পিতরূপ এবং মাতা নির্ভরিতা। আপনি কেন বৃথা ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন।" তখন আচার্য্য তাঁহাকে তাঁহার ভ্রম বুঝাইয়া দিয়া স্বমতে আনয়ন করিলেন। তৎপরে তিনি আদি-বরাহোপাসক, চতুর্দশলোকোপাসক, গুণোপাসক, সাংখ্যপ্রধানবাদী, কাপিল-যোগমতাবলম্বী এবং পীলুমতোপাসকদিগের সহিত বিচার করিলেন। আদি-বরাহোপাসক বলিল যে ভগবান্ একীকৃত সকল সমুদ্রে নিমগ্ন পৃথিবীকে বরাহরূপে দংষ্ট্রাগ্রে উদ্ধার করিয়াছিলেন। তিনিই জগৎকারণ, মোক্ষপ্রদ এবং সর্ব্বজনের উপাসনীয়। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল যে চতুর্দশ লোকই ঈশ্বর এবং ইহাঁদিগের অনুগ্রহে সত্যলোক-প্রাপ্তি হইতে পারে বলিয়া আমি লোকসমূহের উপাসনা করিয়া থাকি। তৃতীয় ব্যক্তি বলিল যে গুণ সকলই লোককর্তা, ব্রহ্মাদি দেবের কারণ এবং উপাসকদিগের অভিলাষপূরক। যে ব্যক্তি গুণের উপাসনা করে সে সর্ব্ব-লোক-পূজ্য হয়,যে হেতু সকল প্রপঞ্চই গুণময়। চতুর্থ সাংখ্যবাদী বলিল যে প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতিই জগদুপাদান কারণ। সত্ত্ব, রজ ও তম এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি। প্রকৃতির ব্যক্ত ভাবের নাম জগৎ এবং অব্যক্ত ভাবের নাম লয়। প্রকৃতি হইতেই মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি সকল বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে। প্রকৃতি অচেতন কিন্তু সকল জগতের মূল। প্রকৃতির মূল নাই। মোক্ষেচ্ছু ব্যক্তিরা প্রকৃতির উপাসনা করিলেই উদ্দেশ্য সাধন করিতে সমর্থ হইবে। পঞ্চম যোগমতবাদী বলিল যে যোগসাধন দ্বারাই মুক্তি লাভ করা যাইতে পারে। ষষ্ঠ পীলুমতাবলম্বী কহিল যে পরমেশ্বর সাক্ষাৎ জগৎকর্ত্তা; তিনি সৃষ্টিকালে পৃথিবী প্রভৃতির অণুসমূহ সংযোগ এবং লয়কালে বিয়োগ করেন। অণুসমূহ নিত্য। এইরূপে ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি প্রপঞ্চ উৎপন্ন হইলে তদ্দ্বারা তিনি লোক সৃষ্টি করিয়া সেই লোকে বাসযোগ্য প্রাণি সকল সৃজন করেন। তিনিই সর্ব্বসাক্ষী, সর্ব্বদর্শী ও সর্ব্বপরিপূর্ণ।

ইহারা এবম্প্রকারে স্ব স্ব মত ব্যক্ত করিলে পর আচার্য্য প্রথমকে বলিলেন তোমার মত বেদবিরুদ্ধ এবং ব্রাহ্মণগণের অগ্রাহ্য; দ্বিতীয়কে বলিলেন তোমার বিবেকের লেশমাত্র নাই, অনিত্য ভৌতিক ও জড় লোক সকল কিরূপে ফল অর্পণ করিবে, তৃতীয়কে বলিলেন জন্য অনিত্য গুণ সমূহ কিরূপে শাশ্বত-ফল মোক্ষ প্রদান করিবে। অনন্তর সাংখ্যকে কহিলেন যে অচেতন প্রকৃতির দর্শন-শক্তি নাই, সুতরাং জগতের উপাদান কারণ হইতে পারে না, চৈতন্যময় ঈশ্বরই জগতের উপাদান কারণ, আর প্রকৃতি গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা, সুতরাং তাহার উপাসনা দ্বারা সাত্ত্বিক জ্ঞান লাভ হইতে পারে না। তৎপরে যোগবাদীকে বলিলেন যে যোগ দ্বারা কেবল দেহশুদ্ধি

হইতে পারে, চিত্তশুদ্ধি হইতে পারে না; চিত্তশুদ্ধিই ব্রহ্মজ্ঞানের নিদান, সুতরাং যোগ দ্বারা মুক্তিলাভের কোন সম্ভাবনা নাই। যোগের সহিত মুক্তি-মার্গের কোন গন্ধও নাই। অবশেষে পীলুমতবাদীকে কহিলেন যে পৃথিব্যাদির নিত্যকল্পনা যুক্তি-সঙ্গত নহে; একমাত্র পরমেশ্বরই নিত্য, তদ্ব্যতিরিক্ত জগৎ অনিত্য; প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসিদ্ধ ভূতাস্তিক্য কল্পনা করিলে মৃত্যুর পর শৃগালযোনি প্রাপ্ত হইতে হয়, প্রমাণ যথা

"অধীত্য গৌতমীং বিদ্যাং শার্গালীং যোনিমাবিশেৎ।"

অতএব উহা পরিত্যাগ কর এবং "সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম" এই উপদেশ জ্ঞাত হইয়া শুদ্ধ অদ্বৈত বিদ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে। এই প্রকারে পূর্ব্বোক্ত ষড়্বিধ মত নিরাকরণ পূর্ব্বক তদুপাসকদিগকে স্বমতে আনয়ন করিয়া প্রয়াগ হইতে বহির্গত হইলেন এবং ত্রিবেণীতে স্নান করিয়া পূর্ব্বমুখে কাশীতে আগমন করিলেন। কাশীতে উপস্থিত হইয়া শঙ্করাচার্য্য ক্রমশঃ কর্ম্মমত, চন্দ্রমত, মঙ্গলাদিগ্রহমত, কালব্রহ্মবাদি-ক্ষপণক-মত, পিতৃমত, অনন্তমত, গরুড়মত, সিদ্ধমত, গন্ধর্ব্বমত, ভূতবেতালমত প্রভৃতির নিবর্হণ করিলেন। কনকগিরি, তুরঙ্গনাথ প্রভৃতি কর্ম্মবাদীরা বলিল যে কর্ম্মই সর্ব্বকারণ, জগতের উৎপত্তি, বিপত্তি ও সম্পত্তি সমস্তই কর্ম্ম দ্বারা ঘটে, যাহারা সৎকর্ম্ম করে তাহারা সুকৃতযোনি প্রাপ্ত হয় এবং যাহারা অসৎ কর্ম্ম করে তাহারা পাপযোনি প্রাপ্ত হয়। কর্ম্মই পুণ্যপাপযোনিতে জনন-কারণ, অতএব মুমুক্ষুরা সৎকর্ম্মে রত হইবে, মোক্ষসংসিদ্ধির নিমিত্ত কারণ কর্ম্ম। আচার্য্য এতদুত্তরে বলিলেন যে জড় কর্ম্ম জগজ্জন্মাদির কারণ হইতে পারে না, ঈশ্বরই সর্ব্বকারণ। শিবাভরণ নামে জনৈক চন্দ্রমতাবলম্বী বলিল যে ষোড়শকলাপূর্ণ সর্ব্বপ্রাণি-পোষণ-তৎপর চন্দ্রদেব নিজ অষ্টাদশ সহস্র যোজন বিস্তীর্ণ মণ্ডল দ্বারা পৃথিবীকে দ্যোতিত করিয়া এক অদ্বিতীয় অমৃত স্বরূপ বিভুরূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন। চন্দ্রোপাসনা দ্বারা মুক্তিলাভ হয়। আচার্য্য বলিলেন চন্দ্র অনিত্য এবং দেবগণের অন্নস্বরূপ, সুতরাং মোক্ষকারণ হইতে পারে না। তৎপরে গ্রহোপাসকগণ আচার্য্যের নিকটে আসিয়া স্ব স্ব মত ব্যাখ্যা করিতে লাগিল। মঙ্গলোপাসক বলিল যে মঙ্গলদেব দিক্‌পতি ও পৃথিবীপতি সুতরাং ফলেচ্ছুদিগের উপাসনীয়। বুধোপাসক বলিল বুধ সর্ব্ববিদ্যাপ্রদ ও জ্ঞানহেতু, সুতরাং মোক্ষাবাপ্তির নিমিত্ত উপাস্য। বৃহস্পতির উপাসক বলিল যে বৃহস্পতি দেবগুরু ও সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া উপাসনীয়। ভৃগুর উপাসক বলিল যে মহর্ষি শুক্রাচার্য্য সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বদ্বিজপূজ্য বলিয়া জ্ঞানসিদ্ধির জন্য উপাসনীয়। শনিগ্রহোপাসক বলিল যে শনৈশ্চর সুখকারণ বলিয়া দুঃখনিবৃত্তি ও মোক্ষপ্রাপ্তির নিমিত্ত উপাস্য। রাহুর উপাসক বলিল যে চন্দ্রার্কগ্রহণ-সমর্থ মহাবল-সম্পন্ন রাহুর উপাসনা অত্যন্ত আবশ্যক। ইহাদিগকে আচার্য্য বলিলেন যে গ্রহগণ জড়, সুতরাং মুক্তিদানে অসমর্থ; চৈতন্যই মোক্ষাভিলাষিদিগের উপাসনীয়। অতএব বেদ-বিরুদ্ধ জড়োপাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক শুদ্ধাদ্বৈত বিদ্যার আশ্রয় গ্রহণ কর। তদনন্তর ক্ষপণক আসিয়া বলিল যে আমি আপনার আশ্রয়ে ষণ্মাসকাল রহিয়াছি, এক্ষণে আমার মত পরীক্ষা করুন, পরে আমি গমন করিতে ইচ্ছা করি। কালই ব্রহ্ম, যিনি কালকে বিদিত আছেন তিনি ব্রহ্ম জানেন এবং মুক্ত হয়েন। এই ক্ষপণক উজ্জয়িনী

নগরে শঙ্করাচার্য্যের বশ্যতা স্বীকার করিয়া তাঁহারই আশ্রয়ে অবস্থিতি করিতেছিল। ইহার নাম পূর্ণসময়। আচার্য্য ইহাকে বলিলেন যে কাল জন্য, সুতরাং অনিত্য, ব্রহ্ম নহে। তখন ক্ষপণক অদ্বৈত মত গ্রহণ করিল। তৎপরে পিত্রুপাসক সত্যশর্ম্মা, কৃতবর্ম্মা প্রভৃতি বলিল যে পিতৃগণ নিত্য-মুক্ত হইয়া চন্দ্রমণ্ডলোপরি স্বর্গে বাস করিতেছেন, পিতৃগণের উপাসনা মোক্ষসিদ্ধির মুখ্য হেতু; অতএব পিতৃযজন অবশ্য কর্ত্তব্য। আচার্য্য ইহাদিগকে বলিলেন যে কর্ম্ম দ্বারা মুক্তি লাভ হইতে পারে না, জ্ঞান মোক্ষসিদ্ধির মুখ্য হেতু; অতএব তোমরা জ্ঞানলাভে যত্নশীল হও। তখন শেষোপাসক ও গরুড়োপাসকগণ আগমন পুরঃসর বলিল যে শেষ নারায়ণের তল্প এবং গরুড় তাঁহার বাহন; সুতরাং ইহাঁদিগের উপাসনা দ্বারা মুক্তি লাভ করা যাইতে পারে। সিদ্ধমতবাদিরা বলিল যে সত্যনাথ প্রভৃতি সিদ্ধগণ শ্রীশৈলাদি দেবাবির্ভূত স্থলে মন্ত্রৌষধবিশেষ প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ ও চিরজীবী হইয়াছেন। তাঁহাদিগের সদুপদেশে আমরা সর্ব্বপ্রপঞ্চ জ্ঞাত হইয়াছি, নানাবিধ বিদ্যা, যোগ, ক্রিয়া, শক্তি, মন্ত্র প্রভৃতি দ্বারা সর্ব্বজ্ঞ হইয়াছি। এইরূপে মন্ত্রবুদ্ধি লাভ করিয়া আমরা কৃতার্থ ও মুক্ত হইয়াছি। আচার্য্য ইহাদিগকে বলিলেন যে তোমরা অনিত্য ফল লাভ করিয়াছ, চিরজীবন কিছু মুক্তির উপায় নহে, দেহ দুঃখালয়, দেহত্যাগ বিনা মুক্তিলাভ অসম্ভব। অতএব তোমাদের ভ্রান্ত মত পরিহার পূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞানে প্রযত্নশীল হও এবং অদ্বৈত মত গ্রহণ কর। অনন্তর গীতশীল বিশ্বাবসুর উপাসক গান্ধর্ব্বমতাবলম্বী বলিল যে আমরা বিশ্বাবসু নামক গন্ধর্ব্বের উপাসনা দ্বারা গান-কারণ বিদিত হইয়া এবং নাদ, বিন্দু প্রভৃতির শিক্ষা দ্বারা ধ্যানে কলা অনুভব করিয়া মুক্ত হইয়াছি। মোক্ষপ্রাপ্তির নিমিত্ত গান্ধর্ব্ব বিদ্যাতে পরিশ্রম আবশ্যক। আচার্য্য ইহাকে কহিলেন যে নাদ শব্দ, বিন্দু ও কলা সগুণ, সুতরাং এতদুপাসনা মোক্ষপ্রদান করিতে পারে না। তৎপরে চিতাভস্মাচ্ছাদিত-কলেবর ভূতরাজ ও বেতালের উপাসকগণ বলিল যে ভূতরাজ সাত জন, তাঁহাদিগের উপাসনা দ্বারা শত্রুজয়াদি ফল লাভ হয় এবং সর্ব্বলোক বশ করা যায়। আচার্য্য ইহাদিগকে বলিলেন যে ব্রাহ্মণদিগের নিত্য-কর্ম্ম-পরিহার এবং ভূতোপাসন একান্ত বেদ বিরুদ্ধ। ভূতগণ ব্রহ্মকর্ম্মের প্রতিবন্ধক, যথা—

> "অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভুবি সংস্থিতাঃ।
> যে ভূতা বিঘ্নকর্ত্তারস্তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া॥"

অতএব ভূতের উপাসনা অত্যন্ত অগ্রাহ্য। শঙ্করাচার্য্য এই সমস্ত বিপথগামী নানা মতাবলম্বিদিগকে স্বদলাক্রান্ত করিয়া অদ্বৈত মতের উপাসক করিলেন।

অতঃপর একদিন মধ্যাহ্নকালে মণিকর্ণিকার ঘাটে শঙ্করাচার্য্য স্নানানন্তর নিদিধ্যাসন করিতেছেন এমন সময়ে ভগবান্ ব্যাস একটি স্থবির ব্রাহ্মণের ন্যায় আগমন করিয়া শঙ্করাচার্য্যের ষট্‌সহস্র শিষ্য দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ইনি কে? শিষ্যেরা তাঁহাকে বলিল ইনি পরম গুরু শঙ্কর, ইনি সেতুবন্ধ প্রভৃতি প্রদেশস্থ কুমতাবলম্বি ব্রাহ্মণদিগকে দমন করিয়া দিগ্বিজয়-প্রসঙ্গে এক্ষণে কাশীতে উপস্থিত হইয়াছেন। ইনি ব্রহ্মসূত্রের তাৎপর্য্য বিনির্ণয় করিয়াছেন এবং অদ্বৈতমতাবলম্বী। তখন ব্যাস শঙ্করের নিকট উপসর্পণ পূর্ব্বক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি ব্রহ্মসূত্র-ব্যাখ্যা করিয়াছ, বল দেখি, কোন্ স্থলে তোমার ব্যাখ্যা করিতে অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে? শঙ্কর বলিলেন হে বিপ্র! তুমি কোন্

স্থল বুঝিতে পার নাই তাহা বল, আমি অর্থ করিয়া দিতেছি। বৃদ্ধ বলিল "তদন্তর-প্রতিপত্তৌ রংহতিসম্পরিষ্বক্তঃ প্রশ্ননিরূপণাভ্যাং" এই সূত্রের তুমি কি অর্থ করিয়াছ? শঙ্কর একরূপ অর্থ করিলেন, বৃদ্ধ আর একরূপ অর্থ করিলেন। শঙ্করাচার্য্য জানিতেন না যে ঐ বৃদ্ধ ব্যাস। উভয়েই বাদানুবাদ করিতে করিতে উত্তপ্ত হইতে লাগিলেন। অবশেষে শঙ্করাচার্য্য ব্যাসকে বলিলেন 'তুমি ইহার তত্ত্ব কিছুই বুঝ না' এবং এই বলিয়া তাঁহার কপোলদেশে এক চপেটাঘাত করিলেন। কপোলতাড়ন করিয়াই পদ্মপাদকে বলিলেন এই বৃদ্ধকে অধোমুখ করিয়া উহার পাদাগ্র উপর দিকে আলম্বন পূর্ব্বক দূর করিয়া দেও। বৃদ্ধ এই কথা শ্রবণ মাত্র আপনি শীঘ্র দূরে চলিয়াগেল। পদ্মপাদ তখন গুরুকে প্রণাম পূর্ব্বক বলিলেন প্রভো!

"শঙ্করঃ শঙ্করঃ সাক্ষাৎ ব্যাসোনারায়ণঃ স্মৃতঃ।
তয়োর্ব্বিবাদে সম্প্রাপ্তে কিঙ্করঃ কিং করোম্যহং॥"

আপনি সাক্ষাৎ শঙ্কর, ব্যাস নারায়ণ, আপনাদিগের বিবাদ উপস্থিত হইলে, আমি কিঙ্কর কি করিব। তখন শঙ্করাচার্য্য অনেক আরাধনা করিয়া ব্যাসকে প্রত্যারত্ত করিলেন এবং তাঁহাকে সম্যক অর্চনা পূর্ব্বক তাঁহার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলেন। ব্যাস প্রসন্ন হইয়া অদ্বৈতবাদের সর্ব্বত্র জয় হইবে এবং তোমার শতবর্ষ পরমায়ুঃ লাভ হইবে বলিয়া শঙ্করাচার্য্যকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। এস্থলে বলা আবশ্যক যে এই ব্যাস কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নহেন। কাশীতে প্রথম ব্যাসের সময়াবধি বরাবর এক জন ব্যাস আছেন। ব্যাস উপাধিমাত্র। এক্ষণেও কাশীতে এক জন ব্যাস অবস্থিতি করিতেছেন। কিন্তু অনেকে মনে করেন যে স্বয়ং কৃষ্ণদ্বৈপায়নই শঙ্করের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। শঙ্করবিজয়ে এমন কোন বাক্য দৃষ্ট হয় না যে ব্যাসকে দ্বৈপায়ন বলিয়া স্থির করা যাইতে পারে। আনন্দগিরি কিন্তু যে কি বুঝিয়াছিলেন তাহা আমরা বলিতে পারি না। তাঁহার লিখিত বিজয়ে তিনি কিছুই স্পষ্ট করিয়া লিখেন নাই। তাঁহার এরূপ সংস্কার থাকিতে পারে যে ব্যাস চিরকাল বর্ত্তমান এবং সেই ব্রহ্মসূত্রকর্ত্তা ব্যাসই আসিয়াছিলেন। আমরা তাহা বলিতে পারি না, যে হেতু তাহাতে সময়গত দোষ উপস্থিত হয়। ব্যাস চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন আর শঙ্কর এক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে কাশীতে উপনীত হয়েন। সুতরাং ইনি তাৎকালিক ব্যাস বলিয়া মীমাংসাই সমীচীন বোধ হয়।

কাশী হইতে উত্তরগদিভিমুখে প্রস্থান করিয়া শঙ্কর অমরলিঙ্গ,কেদারলিঙ্গ নামে শিবমূর্ত্তি দর্শন পূর্ব্বক কুরুক্ষেত্রে সমাগত হইলেন এবং কুরুক্ষেত্র সন্দর্শনানন্তর বদরিকাশ্রমে সমুপস্থিত হইয়া তত্রত্য বদরীনারায়ণ দর্শন করিলেন। সে স্থানে উষ্ণপ্রস্রবণের জলে স্নান করিয়া আচার্য্য স্নিগ্ধ হইলেন এবং দ্বারকাদি দিব্যস্থল ভ্রমণ করিয়া অযোধ্যানগরীতে আগমন করিলেন। অযোধ্যা হইতে গয়া,গয়া হইতে গঙ্গা, গঙ্গা হইতে জগন্নাথক্ষেত্রে গমন করিলেন। সেই প্রদেশে আচার্য্য একমাস বাস করিলেন। ইতিমধ্যে রুদ্ধাখ্যপুর হইতে ব্রাহ্মণেরা তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল যে ভট্টাচার্য্য নামক জনৈক পণ্ডিত উত্তর দেশ হইতে আসিয়া বৌদ্ধ ও জৈনদিগকে পরাস্ত করিয়া উহাদের শিরশ্ছেদন করিয়াছেন এবং উহাদিগের মস্তক উদূখলে চূর্ণ করিয়াছেন। অবশেষে কোন জৈনগুরুর নিকটে পরাজিত হইয়া কিছু উপদেশ লাভ করিয়া নির্ব্বেদাপন্ন হইয়াছেন।

ইহা শুনিয়া সাতিশয় কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া শঙ্করাচার্য্য রুদ্ধাখ্যপুরে গমন করিলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া শুনিলেন যে ভট্টাচার্য্য "আমি জৈন বধ করিয়া কি সর্ব্বনাশ করিয়াছি, যখন জৈনের নিকটে শিক্ষালাভ করিলাম, তখন জৈন আমার গুরু হইল, সুতরাং গুরুবধ করিয়াছি" এই ভাবিয়া বিজন প্রদেশে হোমাগ্নি দ্বারা দেহ-পাত করিতে সংকল্প করিয়াছেন। তখন তাঁহার দর্শনার্থ শীঘ্র গমন পূর্ব্বক তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে ভট্টা-চার্য্যের জানুপর্য্যন্ত দগ্ধ হইয়াছে। শঙ্করা-চার্য্য ভট্টকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "হে দ্বিজ! তুমি অজ্ঞানত এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছ, তুমি গূঢ় বেদার্থ পরিজ্ঞাত নহ।" ইহা শুনিয়া ভট্ট জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি নূতনতর বৌদ্ধ?" শঙ্কর উত্তর করিলেন "আমি বৌদ্ধ নহি, অদ্বৈত-মত-প্রচারক শঙ্করাচার্য্য। তখন ভট্ট বলিলেন যদি তো-মার এতই বাদকণ্ডূয়ন (চুলকানি) হইয়া থাকে, তবে আমার ভগিনীপতি মণ্ডনমিশ্রের নিকটে গমন কর এবং তাঁহার সহিত বাদানু-বাদ করিয়া কণ্ডূয়ন নিরত্তি কর। আমি এই অবস্থায় পরলোকে চলিলাম, এই বলিয়া ভট্টাচার্য্য নিমীলিতাক্ষ হইলেন এবং প্রাণ-বায়ু পরিত্যাগ করিলেন। ভট্ট এক জন কর্ম্ম-কাণ্ডাবলম্বী ছিলেন। তৎপরে শঙ্করাচার্য্য রুদ্ধাখ্য পুরস্থ সমুদায় লোকদিগকে অদ্বৈত মত গ্রহণ করাইয়া তথা হইতে মণ্ডনমিশ্রের উদ্দেশে উত্তর দিকে প্রয়াণ করিলেন। পদ্ম-পাদ প্রভৃতি শিষ্যগণ ঢক্কা, শঙ্খ, করতাল প্রভৃতি বাদ্য দ্বারা এবং আচার্য্যের জয়শব্দ দ্বারা দিক্‌হস্তিদিগের কর্ণকুহর বধির করিয়া চলিলেন।

ক্রমশঃ

জ্ঞানীবাক্য।

(গ্রীকগ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত ও অনুবাদিত।)

৪৩০ সংখ্যক পত্রিকার ৪০ পৃষ্ঠার পর।

(১৪৩)

যে ঈশ্বর বুদ্ধি মনের অতীত, তাঁহার সহিত প্লোটাইনস ও আমি উভয়ে মধ্যে মধ্যে এক প্রকার অত্যন্ত সুখজনক যোগ অনুভব করিতাম। যে ঈশ্বরের আকার নাই ও প্রতিমা নাই, যিনি বুদ্ধি এবং সমস্ত বিদিত পদার্থের অতীত স্থানে সংস্থাপিত, তাঁহার প্রতি প্লোটাইনস আপনার মন সর্ব্বদা এ রূপ উত্থিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন যে ঈশ্বর তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে দেখা দিতেন।

পরফাইরি প্রণীত
প্লোটাইনসের জীবনচরিত।

(১৪৪)

(যোগ বিষয়ক)

ইহা এক প্রকার সংস্পর্শ এবং সামান্য জ্ঞান অপেক্ষা উজ্জ্বল সাক্ষাৎকার এবং জগতের কেন্দ্রের সহিত আমাদিগের নিজের কেন্দ্রের সংযোগ।

ঐ

(১৪৫)

সকল বস্তুর রাজার চতুর্দ্দিকে সে সকল সংস্থিত এবং তাঁহারই নিমিত্ত সকল বস্তু এবং তিনি সকল শ্রেষ্ঠ বস্তুর কারণ।

প্লেটো।

(১৪৬)

যাহা চিরকাল আছে এবং যাহা জন্য নহে এবং যাহা কখন সৃষ্ট হয় নাই, তাহাই ঈশ্বর।

ঐ

(১৪৭)

ঈশ্বর সর্ব্বাগ্রণী সুন্দর; তিনি সৌন্দর্য্য স্বরূপ।

ঐ।

(১৪৮)

এই সর্ব্ব-ভূতের রাজা ও অধিপতি অপেক্ষা এমন কোন বস্তু নাই যাহা আমাদিগের এবং অন্য প্রাণীর প্রাণের অধিকতর কারণ।

ঐ।

(১৪৯)

যে কূটস্থ পূর্ণ প্রীতিস্বরূপ পদার্থ স্বীয় প্রাচুর্য্য-বশতঃ উচ্ছ্বসিত হইল এবং স্বকীয় উচ্ছ্বাস দ্বারা সকল বস্তু উৎপাদন করিল সেই পদার্থই ঈশ্বর।

প্লোটাইনস।

(১৫০)

ঈশ্বর একমাত্র সত্য স্বরূপ পদার্থ, তিনি ক্ষুদ্র নহেন কিংবা বৃহৎ নহেন, কিন্তু তিনি বৃহৎ অপেক্ষাও বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র অপেক্ষাও ক্ষুদ্র।

প্রর্ফাইরি।

(১৫১)

আমি তাহাদিগকে, অধার্ম্মিক বলি যাহারা বিশ্বাস করে যে যাহা হস্ত দ্বারা স্পর্শ করা যায় তাহাই কেবল আছে এবং অদৃশ্য পদার্থকে বিদ্যমান পদার্থের শ্রেণী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়।

প্লেটো।

(১৫২)

স্বতঃসিদ্ধ ন্যায়ের ভাব অসীম দ্যুলোকে এবং অনন্ত জ্যোতি এবং অনন্ত দেশে বিরাজিত আছে অর্থাৎ তাহা সার্ব্বভৌমিক।

এম্পিডক্লিস।

(১৫৩)

সার্ব্বভৌমিক সত্য অদ্যকার নহে, কল্যকার নহে, কিন্তু তাহা চিরস্থায়ী। তাহাদের জন্মদিন ও উৎপত্তি-স্থান কোন মনুষ্য নির্দ্ধারণ করিতে পারে না।

সফোক্লিস্।

(১৫৪)

ঈশ্বর পৃথিবী কিংবা স্বর্গের কোন বিশেষ স্থানে নাই কিন্তু আপনাতে আছেন।

প্লেটো।

(১৫৫)

ঈশ্বর সকল স্থানে আছেন অথচ কোন স্থানে নাই।

ফাইলো।

(১৫৬)

ঈশ্বর কোন বিশেষ স্থানে না থাকা প্রযুক্ত কোন বিশেষ স্থানে সংস্থিত বস্তুর সম্মুখে সম্যক রূপে বিদ্যমান আছেন।

প্লোটাইনস।

(১৫৭)

জগত ঈশ্বরে স্থিত আছে কিন্তু ঈশ্বর জগত দ্বারা অবচ্ছিন্ন নহেন।

পরফাইরি।

(১৫৮)

ঈশ্বর কালের ব্যপদেশ্য নহেন কিন্তু কালের অতীত।

প্লোটাইনস।

(১৫৯)

ঈশ্বর অসংযত ও বিমূঢ় প্রবৃত্তিদিগের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা নহেন, কিন্তু ধর্ম্মপ্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

সেল্‌সেস।

(১৬০)

ঈশ্বর আপনার প্রকৃতি ও স্বরূপ অনুসারে কার্য্য করেন, তাঁহার স্বরূপ ও প্রকৃতি সততা ও ন্যায়-প্রকাশক, কারণ এই সকল গুণ যদি তাঁহাতে না থাকিবে, তবে কোথায় থাকিবে।

প্লোটাইনস্।

(১৬১)

(ঐশী দণ্ড)

ঐশী জাঁতা আস্তে আস্তে ঘোরে
কিন্তু কোষে গুঁড়া করে মারে।

প্লুটার্কোদ্ধৃত জনসাধারণ প্রচলিত পদ।

(১৬২)

ঈশ্বর এবং আত্মার অমরত্ব এই দুইয়ের মধ্যে অবশ্যম্ভাবী সম্বন্ধ আছে। এক প্রকার যুক্তি উভয়ের সম্বন্ধে প্রযুজ্য। একটীকে আর একটী হইতে পৃথক করা যাইতে পারে না।

প্লুটার্ক।

(১৬৩)

জগৎ একটি সত্য কাব্য।

প্লোটাইনস।

(১৬৪)

ঈশ্বর বিশ্বকে অত্যন্ত সুন্দর ও সম্পূর্ণ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহা এবং ইহার অংশ সকলের মধ্যে বিলক্ষণ মিল আছে। ইহার মহৎ ও নীচ অংশ, সকলই পরস্পর সুসঙ্গত। যে ব্যক্তি অংশ দেখিয়া সমস্তকে নিন্দা করে সে অন্যায় নিন্দা করে' কারণ অংশ সকল পৃথক রূপে বিবেচনা করা উচিত নহে, কিন্তু সমস্তের সঙ্গে সঙ্গত কি না এরূপ বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

ঐ

(১৬৫)

ঈশ্বরের বিষয় বিবেচনা করিতে গেলে কেবল ভূত কালের প্রতি দৃষ্টি করা কর্ত্তব্য নহে, ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি করা কর্ত্তব্য, প্রাচীনদিগের এই মত অবহেলা করা উচিত নহে।

ঐ

(১৬৬)

স্থপতিরা বলে যে গৃহনির্ম্মাণ-সময়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর না দিলে বড় বড় প্রস্তর উত্তম রূপে সংস্থাপন করা যায় না। সামান্য মানব শিল্পকার স্বীয় বিদ্যা দ্বারা ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বস্তুর প্রতি দৃষ্টি রাখিতে পারে তদপেক্ষা শক্তিমান ঈশ্বরকে হীন জ্ঞান করিয়া তিনি ক্ষুদ্র বিষয়ের প্রতি অমনোযোগী এমন মনে করা উচিত হয় না। অর্থাৎ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সকল বিষয়েরই প্রতি তাঁহার মনোযোগ আছে।

প্লেটো।

(১৬৭)

সাধু উৎকৃষ্টতর আত্মাকে উৎকৃষ্টতর লোকে প্রেরণ এবং নিকৃষ্টতর আত্মাকে নিকৃষ্ট লোকে প্রেরণ, জগৎনিয়ন্তার ইহা অপেক্ষা গুরুতর কার্য্য আর নাই।

ঐ

(১৬৮)

ঈশ্বর সম্মান ও পূজার লোভে জগৎ সৃজন করিয়াছেন ইহা মনে করা হাস্যকর ব্যাপার। তাহা হইলে সামান্য শিল্পকরের ভাব তাঁহার প্রতি আরোপ করা হয়।

প্লোটাইনস।

(১৬৯)

বিশ্বের ব্যবস্থা ও শৃঙ্খলা ভৌতিক কারণের এবং আকস্মিক গঠনের কার্য্য নহে, কিন্তু ঐশী জ্ঞানের কার্য্য। অন্ধ প্রকৃতি যে বস্তুকে যে স্থানে অবস্থিত করিত সে বস্তুকে সে স্থলে ঈশ্বর অবস্থাপন করেন নাই কিন্তু সমস্তের মঙ্গলের জন্য তাহার যে স্থানে অবস্থিত হওয়া সুবিধাজনক তাহাকে সেই স্থান প্রদান করিয়াছেন।

এম্পিডক্লিস।

(১৭০)

বিশ্ব সকল কার্য্যের প্রধান, ঈশ্বর সকল কারণের শ্রেষ্ঠ।

প্লুটার্ক।

(১৭১)

ঈশ্বর দ্বারা সকল বস্তু পরিমিত হইয়াছে, তিনি সকল বস্তুর পরিমাপক।

প্লেটো।

(১৭২)

ঈশ্বর অপক্ষপাতী নিয়ম স্বরূপ।

ডিমণ্ডো নামক গ্রন্থ প্রণেতা।

TO BABOO SHIB CHUNDER DEB,

SECRETARY TO THE *Sadharana Brahmo Samaj*.

SIR,

I HAVE received your Asst: Secretary's letter of the 16th instant, forwarding to me an extract from the proceedings of the Committee of your Samaj dated the 19th May, last. The resolution contained in the extract has given me much satisfaction but I am led to think that we should not content ourselves with merely recording a resolution that we should adopt a national mode of propagation but should try to reduce it to practice in every possible from. We should adopt a national form of divine worship, a national theistic text-book and a national ritual as far as all this could be done consistently with the dictates of conscience. We should renounce marked foreign customs and manners that we might have without much thought or reflection but innocently, adopted from Europeans but which are repugnant to the general feeling of the nation and by renouncing which we do not act against Brahmoism. * * * *

We should conduct our reformatory movements in a national way so as to suit the tastes and ideas of the nation without compromising our Brahmo principles. The *Sadharana Brahmo Samaj* would therefore do well to adopt the form of worship, the Theistic Text Book (Brahmo Dharma Grantha), the ritual, in short, the whole system of the Adi Brahmo Samaj as described by me in the pamphlets presented to your Committee, The system in question contains nothing against the principles of Brahmoism but has every thing in its favor to recommend it for your acceptance, especially the signal advantage which it possesses of being able to attract the regard of the General Hindu Community compared to which English-educated nations are but drops in the ocean. I think you ought to decide soon whether you should adopt a strictly Hindu mode of propagation, for if you do not adopt it at once, the Arya Samajes bid fair to outstrip the Brahmo Samajes as has been the case at Monghyr and elsewhere. The Arya Samajes should not be allowed to do so as Brahmo Dharma has a greater claim to the veneration and love of the people, being the *Sára Dharma* according to their own admission.

It is observed, that in the Samajes in the Notrh West, there are very few Hindusthanee members. The majority are Bengalees. In the Samajes of Bengal, the majority of members are English-educated natives. From this it is evident that the Brahmo movement is a superficial one, and has not penetrated into the very depths of Hindu Society. What is the cause of this? The cause is we do not know how to move Hindu Society. Hindu Society must be moved in a Hindu way. Vedyasagar's first widow-marriage pamphlet was a small tract of only sixteen pages but the effect of these sixteen pages was tremendous. Hindu Society, which all along seemed a vast stagnant lake, now began to upheave itself and show signs of the most tempestuous commotion. Similar was the effect also of Ram Mohun Roy's Prefaces to the Upanishads. The subject of the new religion was agitated "at every *Tole*, at every *Dalan*, at every *Chandi-mandap*" to quote the words of Kissory Chand Mittra. Things have not much changed since then. The ocean of Hindu Society remains the same as before, English educated natives being but as a drop in the ocean, although they may fancy that whole India has been anglicized, and is basking in the sunshine of Western knowledge and refinement. Brahmoism has much deviated from the course of reformatory action pursued by Ram Mohun Roy, the members of the Tattwabodhini Sabha, headed by the venerable, Debendra Nath Tagore, and previous Hindu reformers. * * * * * We should now restore it to its legitimate channel under the full conviction that such a course only has a chance of succeeding in India. * * * *

In conclusion, I beg to request you will be pleased to ventilate this most important question at the next meeting of your Committee in connection with my pamphlets and kindly inform me of the result.

I remain,
Sir,
Your most obedt. servant
RAJ NARAIN BOSE.

15th June, 1878.

HINDU SAMAJ

(Continued from No. 420.)

But the greatest mischief arising from the hypocrisy or silence of enlightened Hindus when questioned about their religion, has yet to be told. The educated natives exercise a wide-spread influence on youth still receiving education as well as those who consider them as their models and superiors. A notion has got abroad that the greatest indifference to religion is manifested by those who are the most enlightened. This notion has, to a great extent, taken its rise from the hypocrisy of enlightened Hindu believers and is fraught with the most dangerous consequences. Say what non-religious moralists may, the healthy growth of a society takes root only in its earnest and pure religious faith. When we consider the strength of temptations betraying even educated men into shameful crimes, we cannot entertain the least hope that a society can be properly governed by mere morality without the support of a pure religion. The body of society is yet made up by the lower million, the upper ten thousand occupying only the margin. So it will be the height of folly to entrust unsupported morality with its government. The fact that even some educated and religious men are seen to fall into moral transgressions cannot be an argument against religion. On the contrary, it shows the appalling strength of temptations which can sometimes baffle the efforts of morality and religion united. The conclusion, in such cases, cannot be the removal of religion but the necessity of invoking, were it possible, the help of an additional assistant. The impossibility of such assistance necessitates the strengthening of religious education. Men, whose minds have been strongly impressed with the solemn teachings of a pure religion, cannot indulge in immorality. Such men are models of moral conduct. It is a sad want in our Schools and Colleges, as some philanthropists have already shown, that they are without any provision for religious education. The common points of all religions can furnish a salutary course of religious education without giving offence to people of any particular faith. It is high time that such a course should be provided, in our educational institutions. The Hindus are admitted by all to be the most religious nation under the sun and this distinction should be preserved by them as long as they have any power to do so.

The deeper the tree of morality strikes its root into religion, the safer it is. No adverse wind can blow it down. Morality, whose root is not characterized by depth and does not reach religion, can be easily shaken and uprooted. Many superficial observers are apt to think that the true prosperity of a nation arises from worldliness. They point to the present prosperous condition of Europe. But they seem to overlook the great fact that the present vigour of Europe is mainly owing to Christianity. Had not Christianity got admission into Europe, her present prosperity would not have been a wonder to the people of Asia. Babu Rajnarain Bose has truly said that external grandeur does not indicate the lasting prosperity of a nation which could be securely based only on a moral basis. No nation can be so great as that whose motto is "Morality and Religion." Had not morality been deprived of its importance in the religious systems of the world, its condition by this time had been far otherwise than it really is. The finer portion of Hinduism is highly favorable to morality but its grosser part, adverse to it. Every thing below is apt to be mixed with alloy and it is the duty of the wise to provide a safeguard against the same. Nothing can be more favorable to reformation than the constitution of Hinduism. The endeavour to remove its grosser part can be sanctioned by Hinduism itself and it is a mater of wonder that only a small sect of our nation appreciates the reformatory advantages furnished by this religion. The greatest possible refinement is consistent with it. The national taste is unnecessarily offended by many of our reformers. Monier Williams proposes to establish Christianity in this country without interfering with the favorite caste system of the natives at the outset but our reformers particularly study to present a scare-crow to our countrymen at the first step they take towards reformation. All great reformers have been conservatives, in the midst of their zeal for reform. Luther only sought

to remove the principal cause of the gathering evils of Christianity. Ram Mohun Roy taught Brahmoism by copious quotations from the Shasters. Chaitanya established his doctrines by frequent quotations from the Hindu scriptures. He laid his axe at the root of the modern system of caste with sharp effect without departing from Hindu ways. He did not allow every one to trample upon the caste system, only devotional and pure men were allowed to do so. Far from offending the nation, Chaitanya succeeded in attracting it towards his reformatory movement. It is but natural that Indians should be as fond of their own manners and customs as any other nation or more and he cannot be a benefactor of our country who obtrudes foreign customs without properly examining the moral aspect of the customs supplanted.

The caste system is not so bad as many imagine it to be. I admit the badness of the caste system as it at present exists but it can be turned into a highly beneficial system by the introduction of certain modifications. The caste system can be seen from various points of view. The division of labor, effected by it, is admired by political economists. Dr. Robertson among others is an admirer of hereditary profession. He says with great reason that an art is really improved when it descends from father to son, the latter being from childhood habituated to its practice. A beneficial modification of the system would be if the son of a Kayastha display any particular love for the profession of the spiritual order, he should be Brahminized and the proceeding does not lack precedents in the immense Hindu literature. I have already said that the greatest improvements are compatible with the Hindu religion so I need not enlarge on this point. Although it admits of reform, the caste system is not so bad as it appears to anglicized reformers. Religion thinks all men equal, society thinks them unequal. Government lays emphasis on its orders being implicitily obeyed and on the enforcement of subordination. A prince and a peasant can worship together in a religious festival on perfect terms of equality but if the peasant carries the idea of equality with him always and everywhere and sits accordingly with the prince at the dinner table, he will be immediately expelled with disgrace. In matter of social reformation we should proceed with caution. Gradual reformation is slow but sure but violent movements only occasion confusion.

(*To be continued.*) KISSORYLAL ROY.

আয় ব্যয়

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫০।

ভাদ্র।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	... ...	৪৫৮॥০
পূর্ব্বকার স্থিত	...	১৯৩॥৶১৫
সমষ্টি	... ...	৬৭২ ৶১৫
ব্যয়	... ...	৩২৮॥/০
স্থিত	... ...	৩৪৩॥৵১৫

আয়

ব্রাহ্মসমাজ		৮৸৶১০
দান প্রাপ্তি।		
শ্রীযুক্ত আশুতোষ ধর		৫
„ দিননাথ অধ্যেতা		১
		৬
সঙ্গীতের কাগজ বিক্রয়		২৵১০
ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির নিকট ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান আদি পাঠাইবার মাশুল আদায়		৸/০
		৮৸৶১০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	১০৩৸/১০
পুস্তকালয়	...	৪॥৵১০
যন্ত্রালয়	...	৩৩৯ ৶০
গচ্ছিত	...	২১৸/১০
সমষ্টি		৪৭৮॥০

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	... ...	৯১ ৶ ৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৯৭ ৵ ৫
পুস্তকালয়	... ...	১৮॥ ১০
যন্ত্রালয়	... ...	৮৪ / ৫
গচ্ছিত	... ...	৩৭॥/ ১৫
সমষ্টি		৩২৮॥/০

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

Registerd NO 52.

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

সমাধি।

ব্রহ্ম প্রাপ্তি-বিষয়ে যোগ-শাস্ত্রে যে, যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা প্রভৃতি ক্রমোচ্চ সোপান সকল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা পর্য্যায়ক্রমে অবলম্বন পূর্ব্বক সাধক ক্রমশঃ সিদ্ধকাম হইতে পারিলে, অনায়াসে পরব্রহ্মে আত্মার সমাধি-সাধনে সমর্থ হইয়া থাকেন। বর্ত্তমান সময়ে যম-নিয়ম, আসন-প্রাণায়াম প্রভৃতি শব্দ গুলি উচ্চারণ করিলে, অথবা এই সকল সোপান-পরম্পরায় সাধন-মার্গে উত্থিত হইতে অনুরোধ করিলে হয় তো অনেকেই বলিয়া উঠিবেন যে, "ইহার দ্বারা ঈশ্বর-লাভের সরল সোপানকে কুটিল ও দুর্গম করিয়া তোলা হইতেছে। ঈশ্বর-লাভের পথ সরল; সেই ব্রহ্মধামের দ্বার অবারিত। পিতার নিকটে যাইতে সন্তানের আর বাধা কি?" ইহা সত্য বটে কিন্তু সন্তান যদি বধির বা পঙ্গু, অথবা অন্ধ হয়, পিতা আহ্বান করিলেও সে তো তাঁহার সস্নেহ আহ্বান শুনিতে পায় না। তিনি ক্রোড় প্রসারিত করিলেও সে তো তাঁহার নিকটে যাইতে পারে না। তিনি সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেও সে তো তাঁহার স্নেহ-পূর্ণ শান্ত মূর্ত্তি দেখিতে সমর্থ হয় না। পিতার বাক্য শুনিবার জন্য, পিতার নিকট যাইবার নিমিত্ত, পিতাকে দেখিবার কারণ যেমন সন্তানের শরীর প্রকৃতিস্থ থাকা আবশ্যক, তেমনি ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বান্তর্যামী হইলেও সংসার-কোলাহল, বিষয়-আকর্ষণ, ইন্দ্রিয়-প্রলোভন প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া আত্মাকে তাঁহার সমীপস্থ করিতে গেলে মোহ-মেঘাচ্ছন্ন অন্তরাকাশকে নির্ম্মল করিয়া তাঁহাকে দর্শন এবং তাঁহার সহিত অকাট্য যোগ নিবদ্ধ করিতে হইলে, তাঁহাতে সমাধি-সাধনের উপযুক্ত হইতে হইলে, শরীর মনকে সংযত বশীভূত করা সাধকের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন। যম নিয়ম, আসন প্রাণায়াম, এবং প্রত্যাহার ও ধ্যান ধারণা প্রভৃতি যে তাহারই উপায় মাত্র, ঐ সকল সাধন-অঙ্গের লক্ষণ এবং অর্থ তাৎপর্য্য আলোচনা করিয়া দেখিলেই তাহা স্পষ্ট প্রতীতি হইবে। যথা;—

১ম। যম, "তত্রাহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহাঃ যমাঃ

অহিংসা, সত্য, অচৌর্য্য, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহকেই 'যম' কহে।

২য়। নিয়ম, "শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ।"

শুচি, সন্তোষ, তপস্যা, অধ্যয়ন এবং ঈশ্বরেতে প্রণিধানের নাম 'নিয়ম'।

৩য়। আসন, "করচরণাদিসংস্থানবিশেষলক্ষণানি পদ্মস্বস্তিকাদীনি আসনানি।"

হস্ত পদাদির সংস্থান-বিশেষ—পদ্মাসন প্রভৃতির নাম 'আসন'।

৪র্থ। প্রাণায়াম, "রেচকপূরককুম্ভকলক্ষণাঃ প্রাণনিগ্রহোপায়াঃ প্রাণায়ামাঃ।"

রেচক পূরক কুম্ভক রূপ প্রাণ দমন করিবার উপায়কে 'প্রাণায়াম' কহে।

৫ম। প্রত্যাহার, "ইন্দ্রিয়ানাং স্ব স্ব বিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহরণং প্রত্যাহারঃ"।

ইন্দ্রিয়দিগকে স্ব স্ব বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করার নামই 'প্রত্যাহার'।

৬ষ্ঠ। ধারণা, "অদ্বিতীয়বস্তুন্যন্তরিন্দ্রিয়ধারণং ধারণা"।

অদ্বিতীয় পরব্রহ্মে অন্তঃকরণের অভিনিবেশ করার নাম 'ধারণা'।

৭ম। ধ্যান, "তত্রাদ্বিতীয়বস্তুনি বিচ্ছিদ্য বিচ্ছিদ্য অন্তরিন্দ্রিয়বৃত্তিপ্রবাহঃ ধ্যানং।"

অদ্বিতীয় পরব্রহ্মে অন্তঃকরণের বৃত্তি প্রবাহকে'ধ্যান' বলে।

১ম, এই সাধন-অঙ্গ গুলি পর্য্যায়ক্রমে অভ্যস্ত হইলে জীব সহজেই সমাধিলাভে সমর্থ হইয়া থাকে। যম, ব্রহ্ম-সাধনের প্রথম সোপান। হিংসা-দ্বেষ, মিথ্যা প্রবঞ্চনা, চৌর্য্য প্রতারণা, লোভ লালসা প্রভৃতি পাপের উৎস সকল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সমূহের প্রবলতা হইতেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ইহাদিগকে দমন করিয়া অসৎ কার্য্য হইতে নিরস্ত হওয়াই সাধকের প্রথম কার্য্য। কাম-ক্রোধ, লোভ, মোহ, হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি পশু প্রবৃত্তি সকল যদি প্রবল থাকে, তাহা হইলে মানব-হৃদয় পাপের অশেষ আলয় হইয়া উঠে। নানাবিধ অসৎ কার্য্যে, অসৎ চিন্তায়, অসৎ কামনায় তাহার চিত্ত সর্ব্বদাই উদ্বেল হয়। শান্ত সংযত হইয়া দেব ভাব অর্জ্জন করা দূরে থাকুক, সে দুষ্প্রবৃত্তির উত্তেজনায় দুর্দ্দম্য হিংস্র জন্তু অপেক্ষাও ভয়ানক রাক্ষস-প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। এই জন্য বীজ বপনের পূর্ব্বে কৃষক যেমন ভূমিকে নিষ্কণ্টক করিয়া থাকে, ব্রহ্মসাধনে প্রবৃত্ত হইবার প্রারম্ভে সাধকের মিতাহার মিতাচার অভ্যাস দ্বারা সংযমী হওয়াই আবশ্যক।

২য়; অন্তর ও বহিঃশুদ্ধি দ্বারা শুচি ও পবিত্র না হইলে, লোভ-লালসা পরিত্যাগ করিয়া সন্তোষ-পরায়ণ না হইলে, কষ্টক্লেশ-সহিষ্ণু হইয়া অধ্যয়নশীল না হইলে, কদাচ ঈশ্বরের নবতর কল্যাণতর জ্ঞান-শক্তি মহিমার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আপ্তকাম ঈশ্বরপ্রাণ সাধু সজ্জনদিগের সাধনলব্ধ সত্যগর্ভ গ্রন্থাদি পাঠে প্রবৃত্তি জন্মে না। সুতরাং বহুদর্শন না হইলে বুদ্ধি মার্জ্জিত, জ্ঞান উজ্জ্বল, হৃদয় প্রেম-বিস্ফারিত হইয়া ধর্ম্মতত্ত্ব অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে পারে না এবং ঈশ্বরেতেও চিত্তের অভিনিবেশ হয় না; এই কারণেই ব্রহ্মসাধনের দ্বিতীয় অঙ্গ "নিয়ম" অভ্যাসে নিযুক্ত থাকা কর্ত্তব্য বলিয়া যোগ গ্রন্থে অবধারিত হইয়াছে।

৩য়; শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকলের উপরে যদি কর্ত্তৃত্ব না থাকে, তাহাদিগকে যদি ইচ্ছামত আয়ত্ত করিতে পারা না যায়, ক্ষণ কালের জন্য উপবেশন করিলেই যদি হস্ত পদ ব্যথিত হয়, তবে আর সাধক কেমন করিয়া অনন্যমনা অনন্যকর্ম্মা হইয়া ঈশ্বরের ধ্যান-ধারণায় কৃতকার্য্য হইবেন?

অভ্যাস-বলে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকলকে বশীভূত করত দীর্ঘকাল "ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরং" বক্ষঃ গ্রীবা শিরোদেশ উন্নত করিয়া স্থিরভাবে সমাসীন থাকিতে শিক্ষা করিবে। ইহারই নাম 'আসন'। শরীরের দৃঢ়তা সম্পাদন করাই ইহার উদ্দেশ্য।

৪র্থ, আসনসিদ্ধি-বিষয়ে যেমন বহিরঙ্গের উপরে সাধকের প্রভুত্ব থাকা আবশ্যক, প্রাণায়াম কার্য্যে তেমনি স্বাধ্যায় ও সমাধি-ক্রিয়া প্রভৃতিতে সুপারগ হইবার জন্য অন্তরঙ্গ বা আভ্যন্তরিক কার্য্য—ক্ষুৎ পিপাসা, শ্বাস প্রশ্বাস প্রভৃতি প্রাণন-কার্য্যের উপরে কর্ত্তৃত্ব স্থাপন-পূর্ব্বক তাহাদিগকে ইচ্ছামত সঙ্কোচ-বিকোচ, শিথিল-সংযম করিবার প্রয়োজন। ইহাই ব্রহ্মসাধনের চতুর্থ অঙ্গ, ইহারই নাম "প্রাণায়াম"। শরীরের স্থৈর্য্য-সম্পাদন-প্রভৃতিই প্রাণায়াম ক্রিয়ার উদ্দেশ্য।

৫ম; সুন্দর কুৎসিত সকল পদার্থই দর্শনের বিষয়, গন্ধ সকলই ঘ্রাণের বিষয়, শব্দ-সকলই শ্রবণের বিষয়, এইরূপ প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের উপভোগ্য বিষয়ে জগৎ সংসার পরিপূর্ণ। উপাসনাকালেও যদি বহিরিন্দ্রিয়গণ আপন আপন উপভোগ্য বিষয় লাভের জন্য বিব্রত থাকে, তাহা হইলে আর সাধক কোন প্রকারেই অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক বিষয়ে চিত্ত অভিনিবেশ করিতে পারে না। প্রতি-ক্ষণেই তাহার মন নানা বিষয়ে বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে। এই চিত্তবিক্ষেপ নিবারণ জন্য "শব্দাদি বিষয় হইতে বহিরিন্দ্রিয়গণকে নিবৃত্ত করিতে অভ্যাস করিবার প্রয়োজন। ইহারই নাম "প্রত্যাহার।"

ব্রহ্ম-চিন্তার সময় সাধকের যেরূপ ভাবাপন্ন হওয়া আবশ্যক, যোগ শাস্ত্রে তাহা কি সুন্দররূপেই কথিত হইয়াছে। যথা

"সচক্ষুরচক্ষুরিব সকর্ণোহকর্ণ ইব সমনা অমনা ইব সপ্রাণোহপ্রাণ ইব।"

বাহ্য বস্তুতে চক্ষু থাকিয়াও যেন চক্ষু-হীন, কর্ণ থাকিয়াও যেন কর্ণহীন, মন-সত্ত্বেও যেন মনোবিহীন, প্রাণ-সত্ত্বেও যেন প্রাণ-রহিত হইয়া—বিষয়-সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া বিষয়াতীত পরব্রহ্মে যোজিত-চিত্ত হওয়াই প্রার্থনীয়। অনেকানেক চিন্তাশীল অধ্যয়ন-নিপুণ ব্যক্তিকে চিন্তা ও অধ্যয়ন কালে বিষয়-সম্বন্ধ-বিরহিত হইতে দেখা যায় কিন্তু এরূপ 'প্রত্যাহার' বর্ত্তমান সময়ের উচ্চাধিকারী ব্রহ্মোপাসকদিগের মধ্যে উপাসনাকালে অত্যল্প লোকেরই দৃষ্ট হইয়া থাকে। যতদিন না সাধক এই প্রত্যাহার রূপ পঞ্চম-গ্রামে সম্যক্‌রূপে উত্থিত হইতে পারেন, ততদিন তিনি নিগূঢ়রূপে যে উপাসনার প্রত্যক্ষ ফললাভে সমর্থ হইতে পারেন না, ইহা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

৬ষ্ঠ; যখন বহির্ব্বিষয় ও বহিরিন্দ্রিয় সকলের উপদ্রব হইতে সাধক সুরক্ষিত হন, তখন তাঁহার চিত্তবৃত্তি সকল সহজেই অন্তর্মুখ হইয়া পড়ে। তখন তাঁহার জ্ঞান-চক্ষু অন্তরের অন্তর, আত্মার অন্তরাত্মা পরব্রহ্মের অনুপম সৌন্দর্য্যই সন্দর্শন করিতে থাকে—তখন তাঁহাতেই তাঁহার চিত্তের অভিনিবেশ হয়। এইরূপ "অদ্বিতীয় পরব্রহ্মে অন্তঃকরণের অভিনিবেশ করার নামই ধারণা।"

৭ম, সেই অতুলন সৌন্দর্য্য, একবার দেখিতে পাইলে—সেই জ্ঞান-প্রেম-পূর্ণ বিশ্বের আশ্রয়কে একবার আত্মার আশ্রয়রূপে প্রত্যক্ষ প্রতীতি করিতে সমর্থ হইলে, একবার সেই নিগূঢ় অমৃত-রসের প্রকৃত স্বাদ প্রাপ্ত হইতে পারিলে; নদী যেমন আপনা হইতেই সমুদ্রাভিমুখে, ভ্রমর যেমন সহজেই সুগন্ধি পুষ্পের প্রতি ধাবিত হয়, তেমনি অন্তরের বৃত্তি-প্রবৃত্তি-সকল প্রবল বেগে সেই শান্ত-গম্ভীর জ্ঞান-প্রেম-অমৃত-সিন্ধু পরমেশ্বরের প্রতিই প্রবাহিত হইতে থাকে।

এইরূপে অদ্বিতীয় পরব্রহ্মে অন্তঃকরণের একাগ্রতা—'চিত্তবৃত্তি সমূহের ধাবমানতাই-'ধ্যান শব্দের বাচ্য।'

৮ম ;: সমাধি; "নির্ব্বাতদীপবচ্চিত্তং সমাধিরভিধীয়তে।' অবাতকম্পিত দীপ-শিখার ন্যায়, যখন চিত্ত নিরবচ্ছিন্ন পরব্রহ্মের প্রতি একাগ্র হইয়া থাকে, আত্মার সেই অবস্থাকেই সমাধি বলে। সমাধি দুই প্রকার; নির্ব্বিকল্প ও সবিকল্প।

নির্ব্বিকল্প সমাধি। নির্ব্বিঘ্ন ও নিরুপদ্রব-ভাবে ব্রহ্মার্পিত ও ব্রহ্ম-যোজিত-চিত্ত হইয়া থাকার নামই "নির্ব্বিকল্প সমাধি।"

সবিকল্প সমাধি; নির্ব্বিকল্প-সমাধি-কালে যদি চিত্ত ঈশ্বরের মহান্ ভাব অনুভব ও অবলম্বন করিতে গিয়া অবসন্ন হয়; তাঁহাতে চিত্ত অভিনিবেশ করিতে গিয়া যদি অন্য-মনস্ক বা অন্য-চিন্তায় ব্যাপৃত হইয়া পড়ে; কিম্বা চিত্ত অবসন্ন ও বিক্ষিপ্ত না হইয়াও যদি সমাধি-কালে সহসা রাগাদি বাসনা-দ্বারা উত্তেজিত হইয়া ব্রহ্মাবলম্বনে অসমর্থ হইয়া স্তব্ধ হয়; অথবা যদি তাঁহাকে নির্ব্বিকল্পরূপে অবলম্বন করিতে অপারগ হইয়া ক্ষণিক ক্ষুব্ধ, ক্ষণিক আনন্দাস্বাদন করে অর্থাৎ তাঁহাকে সম্যক্ অবলম্বন করিতে না পারিয়া যোগ-বিচ্যুতি-জনিত চিত্ত নিরাশ ও নিরানন্দ হয়, আবার ক্ষণিক যোগ-নিবন্ধন উল্লাস ও আনন্দ আস্বাদন করে, তাহাকেই "সবিকল্প-সমাধি" বলে। সমাধির প্রাগুক্ত বিঘ্ন-চতুষ্টয় যোগ-শাস্ত্রে লয়, বিক্ষেপ, কষায় ও রসাস্বাদন শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। যথা;

লয়। "অখণ্ডবস্তুনবলম্বনে চিত্তবৃত্তের্নিদ্রা।"

অখণ্ড ব্রহ্ম বস্তুকে অবলম্বন করিতে অসমর্থ হইয়া অন্তঃকরণ-বৃত্তির নিদ্রার নাম লয়।

বিক্ষেপ। "অখণ্ডবস্তুনবলম্বনেন চিত্তবৃত্তেরন্যাবলম্বনং বিক্ষেপঃ।"

অখণ্ড ব্রহ্মবস্তুকে অবলম্বন করিতে সমর্থ না হইয়া অন্তঃকরণ-বৃত্তির অন্য-অবলম্বন-কেই বিক্ষেপ বলে।

কষায়। "লয়-বিক্ষেপাভাবেঽপি চিত্তবৃত্তেরাগাদিবাসনয়া স্তব্ধীভাবাৎ অখণ্ডবস্তুনবলম্বনং কষায়ঃ।"

লয় ও বিক্ষেপের অভাবেও রাগাদি বাসনা দ্বারা অন্তঃকরণ স্তব্ধ হইয়া অখণ্ড ব্রহ্ম বস্তুকে অবলম্বন করিতে অসামর্থ্যই কষায়।

রসাস্বাদন। "অখণ্ডবস্তুনবলম্বনেনাপি চিত্তবৃত্তেঃ সবিকল্পানন্দাস্বাদনং রসাস্বাদঃ। সমাধ্যারম্ভসময়ে সবিকল্পানন্দাস্বাদনং বা।"

নির্ব্বিকল্প অখণ্ড ব্রহ্ম বস্তুর অবলম্বনে অন্তঃকরণ-বৃত্তির সবিকল্প আনন্দ-আস্বাদন অথবা নির্ব্বিকল্প সমাধির আরম্ভকালীন সবিকল্প-আনন্দ আস্বাদনকে রসাস্বাদন বলে।

নির্ব্বিকল্প-সমাধি।"

"অনেন বিঘ্নচতুষ্টয়েন রহিতং চিত্তং নির্ব্বাতদীপবদচলং সদখণ্ডচৈতন্যমাত্রমবতিষ্ঠতে যদা তদানির্ব্বিকল্পকঃ সমাধিরিত্যুচ্যতে।"

এই বিঘ্নচতুষ্টয় অতিক্রম করিয়া অবাত-কম্পিত দীপের ন্যায় যখন চিত্ত অচল হইয়া সেই পূর্ণ জ্ঞান সচ্চিদানন্দ স্বরূপের চিন্তাপর হয়, তখন তাহাকে "নির্ব্বিকল্প-সমাধি" বলে। সেই সমাধি অবস্থাতেই ঈশ্বরের স্বরূপ সত্তা ভিন্ন অন্তশ্চক্ষুতে আর কিছুই প্রতিভাত হয় না। সেই অবস্থাতেই ঈশ্বরই কেবল সাধকের প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর জ্যোতিঃ, আত্মার অন্তরাত্মা হইয়া প্রকাশ পাইতে থাকেন। তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়াতেই জ্ঞান-চক্ষু জ্যোতিষ্মান্ হয়, সমুদায়-হৃদয়-গ্রন্থি ছিন্ন হয়, সকল ফল-কামনা তিরোহিত হইয়া যায়।

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্ব-সংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।"

এই অবস্থাই জীবন্মুক্তির অবস্থা। সাধক এই অবস্থাতে উত্থিত হইলেই পাপের

ভয়, পুণ্যের ফলাফলাকাঙ্ক্ষা হইতে বিমুক্ত হইয়া পরম সাম্য প্রাপ্ত হয়েন।

"তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্য-মুপৈতি।"

তিনি পাপের মূল ও বন্ধনের কারণ স্বার্থপরতাকে বিসর্জ্জন দিয়া ব্রহ্মগত-প্রাণ হইয়া অহর্নিশি তাঁহারই প্রিয়কার্য্য-সাধন করিতে থাকেন। যেখানে কাম ক্রোধ লোভ মোহের প্রবলতা, যেখানে স্বার্থ-পরতার আতিশয্য, সেই খানেই পাপ-তাপ, ভয়-শোক, আত্মগ্লানি ও অনুশোচনা। শান্ত সংযত পুণ্যাত্মা, সে সকল জঞ্জাল হইতে বিমুক্ত হইয়া আনন্দময় পরব্রহ্মকে লাভ করত আনন্দিত হয়েন। তিনি ভয়-তাপ, পাপ-শোক হইতে উত্তীর্ণ হইয়া——হৃদয়-গ্রন্থি সমুদায় হইতে বিমুক্ত হওত অমৃত হয়েন।

"তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং গুহা গ্রন্থিভ্যো বিমুক্তোঽমৃতো ভবতি।"

এই অবস্থাতেই জীবন্মুক্ত পুণ্যাত্মারা দিব্য জ্ঞান-চক্ষু লাভ করিয়া সকল শক্তির শক্তিতে, সকল সৌন্দর্য্যের মূলে, সকল কৌশলের অভ্যন্তরে, সকল ঘটনার ভিত্তি-ভূমিতে সেই শক্তির শক্তি, কারণের কারণ, মূলাধার ঈশ্বরকে জাজ্বল্যমান্ সন্দর্শন করিয়া বলিতে থাকেন "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" সকলই ব্রহ্মের সত্তাতে পরিপূর্ণ!

"তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।"

সমস্ত জগৎ সেই দীপ্যমান পরমেশ্বরেরই দ্বারা অনুপ্রকাশিত হইয়া দীপ্তি পাইতেছে।

"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।"

পরব্রহ্ম দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের যে কিছু পদার্থ, সমুদায়ই ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছে। তাঁহারদের চক্ষে ঈশ্বরের শক্তি-সত্তা ভিন্ন আর কিছুই প্রতিভাত হয় না। শিল্পী যেমন কোন শিল্প-কার্য্য দেখিলে এককালে তাঁহার দৃষ্টি সেই শিল্প-চাতুরীর মূলে নিপ-তিত হয়, বিজ্ঞানবিৎ কোন যন্ত্রাদি নিরীক্ষণ করিলে এককালে যেমন তাঁহার চক্ষু সেই কৌশল-ভিত্তিই সন্দর্শন করে, ব্রহ্মদর্শী জীবন্মুক্ত সাধু-সজ্জনগণ তেমনি জগৎ-দর্শন সময়ে সুতীক্ষ্ণ জ্ঞান, সমুজ্জ্বল প্রেমদৃষ্টি দ্বারা সকল আবরণ অন্তরাল ভেদ করিয়া এক-কালে সকলের মূলে সেই সর্ব্বাশ্রয় মূলা-ধার পরব্রহ্মকেই সন্দর্শন করেন। "তাঁহাতে সকল ভূত, সকল দেবতা, সকল লোক, সকল প্রাণ, এই সমুদয় জীব অর্পিত হইয়া রহিয়াছে এবং তিনি সকলেতেই বর্ত্তমান রহিয়াছেন দেখিয়া পরমানন্দ অনুভব ক-রেন।"

"তে সর্ব্বগং সর্ব্বতঃ প্রাপ্য ধীরা যুক্তাত্মানঃ সর্ব্বমেবাবিশন্তি।"

সেই যুক্তাত্মা ধীরেরা সর্ব্বব্যাপি পর-মাত্মাকে সর্ব্বত্র প্রাপ্ত হইয়া সকলেতে প্র-বিষ্ট হয়েন।

পার্থিব প্রেমের সূত্রপাত সময়েই যখন

"যদেতদ্ হৃদয়ং মম, তদস্তু হৃদয়ং তব।
যদেতদ্ হৃদয়ং তব, তদস্তু হৃদয়ং মম।"

আমার যে এই হৃদয়,তাহা তোমার হউক; এই রূপ তোমার যে এই হৃদয়,তাহা আমার হউক, শুভ প্রার্থনা শ্রুত হওয়া যায়; তখন সেই প্রেমের গাঢ়তা হইলে, সেই প্রণয়-অ-ঙ্কুর ফুল ফলে বর্দ্ধিত হইলে আর পরস্পরের লক্ষ্য-ইচ্ছা দ্বিধা-ভাব ধারণ করে না। প্রেমের পরিণত অবস্থায় লোকে বন্ধুকে অভিন্ন-হৃদয় সুহৃদ্ বলিয়া সম্বোধন করে। তৎকালে শরীর মন আত্মার স্বতন্ত্র সত্তা থাকিলেও সুহৃদে সুহৃদে একপ্রাণ, একমন, একাত্মা বলিতেও কুণ্ঠিত হয় না। ভগবৎ-প্রেম কি পার্থিব প্রেম অপেক্ষা উচ্চতর মহত্তর নহে? মনুষ্যে মনুষ্যে যেরূপ

সম্বন্ধ, ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের কি তাহা অপেক্ষা নিগূঢ়তর, স্থায়িতর এবং কল্যাণতর সম্বন্ধ নহে? পার্থিব-প্রেম-প্রভাবে মনুষ্য যখন বন্ধুর যাহা, তাহা আমার এবং আমার যাহা, তাহা বন্ধুর, বলিতে সঙ্কুচিত হয় না; তখন সেই স্বর্গীয় ভগবৎ-প্রেমের উৎকর্ষ অবস্থায় সাধক কি ঈশ্বরকে "ত্বং অস্মাকং ত্ববাস্মি"। তুমি আমারদের, আমি তোমার, ইহা বলিতেও অধিকারী নহে?

পরম বন্ধু পরমেশ্বরের সঙ্গে যখন যোগের গাঢ়তা হয়, তখন সাধকের জ্ঞান-প্রেম ইচ্ছা, তাঁহার সহিত একীভূত হইয়া যায়। যখন তাঁহার জয়ে, আমার জয়; আমার মঙ্গলে, যখন তাঁহার মঙ্গল-কামনা সিদ্ধ হয়; তখন সাধক জগতের সেই অব্যক্ত কারণ, প্রচ্ছন্ন-সত্তা ঈশ্বরকে আত্মার মধ্যে জাগ্রৎ-জীবন্ত রূপে প্রত্যক্ষ প্রকাশমান দেখিয়া রোমাঞ্চিত শরীরে তটস্থ হইয়া বলিতে থাকেন "তৎত্বমসি" "সেই যে তুমি," যাঁহাকে সকল কার্য্যের কারণ, সকল সৃষ্টির মূল বলিয়া অব্যক্ত ও অপরিস্ফুট রূপে পূর্ব্বে অনুভব করিতাম; এখন যে "সেই তুমি" আমার সর্ব্বস্ব হইয়া আত্মার মধ্যে জাজ্বল্যতররূপে প্রকাশ পাইতেছ! "অন্ন, কি প্রাণ, কি মন" প্রভৃতি কেহই এই ভূত-সকলের উৎপত্তি-স্থিতি বা ভঙ্গের কারণ নহে, কোন অন্ধশক্তি বা পরিমিত জ্ঞানও এই সুকৌশল-সম্পন্ন পরমাশ্চর্য্য সৃষ্টির নিদানভূত নহে, সেই "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" সেই পূর্ণজ্ঞান পরব্রহ্মই এই অনন্ত সৃষ্টির কারণ। "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" এই যে পরমাত্মা যাঁহাকে আমার আত্মাতে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ প্রতীতি করিতেছি, যিনি আমার আত্মার অন্তরাত্মা হইয়া প্রকাশ পাইতেছেন এবং আমাকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিতেছেন, তিনিই অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা, পাতা, বিধাতা; তিনিই ব্রহ্ম। তিনি আমার আত্মার ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জল, বিপদের কাণ্ডারী, নির্ভরের স্থল হইয়া আত্মার অভ্যন্তর হইতে "অহং ব্রহ্মাস্মীতি" এই যে আমি তোমার প্রাণসখা ব্রহ্ম, তোমার আত্মাতে রহিয়াছি, এই লোমহর্ষণ মহা বাক্যে ধর্ম্মকার্য্যে উৎসাহিত করিতেছেন এবং আমাকে ভয় তাপ, দুঃখ শোকে অভয়দান করিতেছেন! ইনিই জগতের সম্ভজনীয়—দেব মনুষ্যের পরমারাধ্য পরব্রহ্ম। ইনিই "একমেবাদ্বিতীয়ং" ইনিই একমাত্র অদ্বিতীয়। জ্ঞান-প্রেমে, সত্য মঙ্গলে, শক্তি সামর্থ্যে, স্নেহ করুণায় কেহই ইহাঁর সমান বা কাহাকেও ইহাঁ হইতে শ্রেষ্ঠ দেখা যায় না।

"ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে"।

এই সকল বাক্য জীবন্মুক্ত অত্যুন্নত-আত্মা মহা পুরুষদিগের জ্ঞান-প্রেম-উচ্ছ্বসিত হৃদয়-কন্দর হইতে বিনির্গত হইয়াছে, এজন্য এতৎ সমূহ "মহাবাক্য" বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। ঈদৃশ 'মহাবাক্য' সকল ব্রহ্মগতপ্রাণ ঈশ্বর-সর্ব্বস্ব সাধুদিগের মুখেই শোভা পায়। সাধনবিহীন, সংসারবদ্ধ, অপ্রেমিকের সন্নিধানে ইহা অন্য অর্থ ধারণ করে। বাক্য ব্যাকরণ দ্বারা ইহার প্রগাঢ় তত্ত্ব বুঝাইবার উপায় নাই। আত্মা জ্ঞান-প্রেম-পূর্ণ হইলে——সাধন-তপস্যা বলে ঈশ্বরের সহিত অকাট্য অধ্যাত্ম যোগ যুক্ত হইতে পারিলে সাধক আপনিই ইহার গূঢ় তাৎপর্য্য স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয়েন। বন্ধুর গৃহকে আমার গৃহ বলিয়া অনুভব করা সামান্য প্রেমের কার্য্য নহে। হৃদয়ের কোন্ অবস্থাতে অকপট ভাবে আমার যাহা, তাহা বন্ধুর; বন্ধুর যাহা, তাহা আমার বলা যায়; সেই প্রগাঢ় প্রেম উৎপত্তির দেশ কালের পরিমাণ নির্দ্দেশ করিবার উপায় নাই। যে ব্যক্তির

হৃদয় মন আত্মা, সেই রূপ অবস্থায় উত্থিত হইয়াছে, তিনিই তাহা প্রত্যক্ষ প্রতীতি করিতে পারেন। অন্যের পক্ষে তাদৃশ বাক্য সকল অর্থশূন্য, তাৎপর্য্যরহিত বলিয়া উপেক্ষিত হয়।

"ন কর্ম্মনা বিমুক্তঃ স্যান্ন মন্ত্রারাধনেন বা,
আত্মনাত্মনমাজ্ঞায় মুক্তোভবতি মানবঃ"।

কর্ম্ম মন্ত্র বা আরাধনা দ্বারাও মনুষ্য মুক্ত হয় না, কেবল আত্মা দ্বারা পরমাত্মাকে জানিতে পারিলেই জীব মুক্ত হয়। ইহাই সাধন সমাধির ফল; ইহাই অনন্ত মুক্তির সোপান।

বঙ্গভাষার উন্নতির প্রতিবন্ধক।

সকলেই স্বীকার করিবেন বঙ্গভাষা অদ্যাপি অনুন্নত অবস্থায় রহিয়াছে। পুরাকালীন সংস্কৃত, গ্রীক, ও লাটিন প্রভৃতি ভাষা এবং বর্ত্তমান কালীন ইংরাজী, ফরাসী ও জার্ম্মেন প্রভৃতি ভাষার ন্যায় বঙ্গভাষা অদ্যাপি পরিমার্জ্জিত ও উন্নত হয় নাই। বঙ্গভাষার উন্নতিপক্ষে দুইটি মহান ও প্রধান প্রতিবন্ধক দেখিতে পাওয়া যায়। সেই দুইটি প্রতিবন্ধক যতদিন অপসারিত না হইতেছে ততদিন বঙ্গভাষার বিশেষ উন্নতি ও সমৃদ্ধির আশা করা বৃথা।

প্রথম প্রতিবন্ধক শিক্ষিত বঙ্গবাসিগণ কর্ত্তৃক ইংরাজী ভাষার সমধিক চর্চ্চা ও আলোচনা, এবং বঙ্গভাষানুশীলনে অবহেলা এবং তাহার প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন। কোন একটি ভাষার যতই অনুশীলন ও চর্চ্চা বৃদ্ধি হইতে থাকে, ততই সে ভাষা উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে, ততই সে ভাষাতে ক্রমে ক্রমে অসাধারণ-প্রতিভা-সম্পন্ন কবি, কাব্যকার, নাটককার, ইতিহাস-লেখক ও দার্শনিক সকল সমুদিত হইয়া সেই ভাষা প্রকৃষ্টরূপে পরিপোষণ করিতে থাকেন। যেদেশে দুই চারিটি ভাষা সমানরূপে প্রচলিত সে দেশে কোন একটি ভাষা কখনই সমধিক উন্নতি লাভ করিতে পারে না, ইতিহাস এই কথার যথার্থতা প্রতিপন্ন করিতেছে। অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যান্তর্ভুক্ত হুঙ্গেরি প্রদেশে যতদিন অষ্ট্রিয়ার ভাষা প্রচলিত ছিল ততদিন হুঙ্গেরিয়ান ভাষা উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। স্পেন দেশে পূর্ব্বে বাসক্ (Basque) নামক ভাষা প্রচলিত ছিল, কিন্তু যখন ঐ দেশ রোমরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল এবং তথায় রোমক ভাষা প্রচলিত হইল, তখন বাসক্ ভাষা কিছুকাল পরে প্রায় এককালে লোপ পাইল। মধ্য ইটালীতে পূর্ব্বে টসক্যান (Tuscan) ভাষা প্রচলিত ছিল, ঐদেশে রোমক ভাষা প্রচলিত হইলে উহা কিছু কালের মধ্যে লোপ পাইল। উত্তর ইউরোপে ফরাসী ও জার্ম্মেন ভাষাদ্বয় প্রচলিত হইয়া হলেণ্ড, দেনমার্ক, নরওয়ে, ও সুইডেন প্রদেশ সকলের প্রাকৃত ভাষা সকল একেবারে ধ্বংস করিয়াছে। পৃথিবীর ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে এইরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশে ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষার চর্চ্চা এক সঙ্গে চলিতেছে। কিন্তু ইংরাজী ভাষার যেরূপ আত্যন্তিক চর্চ্চা ও অনুশীলন হইতেছে তাহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে ইংরাজী ভাষা বঙ্গভাষার উন্নতির বিশেষ হানিকর হইতেছে এবং ঐ ভাষায় প্রতিভাসম্পন্ন লেখক উদিত হইবার পক্ষে ব্যাঘাত জন্মাইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে যাঁহারা শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত তাঁহারা প্রায় সমস্ত জীবন ইংরাজী ভাষানুশীলনে, ইংরাজী পুস্তক অধ্যয়নে, ও ইংরাজী বিদ্যা পর্য্যালোচনায় অতিবাহিত করেন। বঙ্গভাষার বিশেষ অনুশীলনে তাঁহাদিগের মধ্যে অতি

অল্প লোককেই তৎপর দেখা যায়। তাঁহারা ইংরাজী ভাষায় পুস্তক লিখেন, ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা করেন, বন্ধু বান্ধবের সহিত একত্রিত হইলে ইংরাজী ভাষায় কথোপকথন করেন, এবং ইংরাজী ভাষায় সামান্য পত্রাদি লিখেন। যে সকল ব্যক্তি শিক্ষিত তাঁহারাই বঙ্গভাষার উন্নতি সাধনে সক্ষম ও পারগ। কিন্তু তাঁহারাই যদি কেবল ইংরাজী ভাষার চর্চ্চা ও অনুশীলনে ব্যাপৃত থাকিবেন, ক্ষণকালও মাতৃভাষানুশীলনে ও চর্চ্চায় ক্ষেপণ করিবেন না তখন আর বঙ্গ ভাষার উন্নতির আশা কোথায়? যে সকল ব্যক্তিরা তাঁহাদিগের উচ্চ শিক্ষার গুণে বঙ্গভাষার কবি, নাটককার, দার্শনিক, সাহিত্য-লেখক হইবেন আশা করা যায় তাঁহারাই যদি সামান্য পত্রাদি লেখা ও কথোপকথন পর্য্যন্ত ইংরাজীতে চালাইবেন তখন আর প্রতিভা-সম্পন্ন বঙ্গীয় গ্রন্থকার উদিত হইবার ভরসা কোথায়? আমরা দেখিতেছি যতই বঙ্গদেশে ইংরাজী ভাষার চর্চ্চা ও অনুশীলন বৃদ্ধি পাইতেছে ততই বঙ্গভাষার উন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়া যাইতেছে। এক্ষণে বঙ্গদেশে ইংরাজী ও বঙ্গভাষার সহিত সংগ্রাম চলিতেছে, কিন্তু ইংরাজী ভাষা যেরূপ প্রবল হইয়া উঠিতেছে তাহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে যদ্যপি কৃতবিদ্য লোকে বঙ্গভাষার প্রতি অধিকতর মনোযোগ প্রদান না করেন তাহা হইলে বঙ্গভাষা উক্ত সংগ্রামে পরাভূত হইবে এবং উহার উন্নতির আশা ভরসা একেবারে বিনষ্ট হইবে। যদ্যপি আমাদিগের দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ কালবিলম্ব না করিয়া ইংরাজীতে পুস্তক লেখা, ইংরাজীতে বক্তৃতা করা, ইংরাজীতে পত্রাদি লেখা এবং ইংরাজীতে কথোপকথন করা প্রভৃতি স্বদেশানুরাগবিরুদ্ধ, স্বদেশ-বিদ্বেষীদিগের পক্ষে উপযুক্ত অন্যায় অভ্যাস সকল পরিত্যাগ না করেন এবং তাঁহারা বিশিষ্ট রূপে বঙ্গভাষার চর্চ্চা ও অনুশীলন বৃদ্ধি না করেন তাহা হইলে কখনই বঙ্গভাষা উন্নতি লাভ করিবে না। অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যান্তর্ভুক্ত হুঙ্গেরি রাজ্যে অষ্ট্রিয়ান ভাষা সুবিস্তৃত রূপে প্রচলিত হওয়াতে হুঙ্গেরি নিবাসিগণ অষ্ট্রিয়ার সম্রাটের নিকট আবেদন করিয়া যখন আইন করিয়া লইলেন যে হুঙ্গেরি রাজ্যের রাজসভায়, বিচারালয়ে ও গবর্ণমেণ্টের সকল কার্য্যালয়ে হুঙ্গেরিয়ান ভাষাই প্রচলিত হইবে এবং সকল বিদ্যালয়ে ও শিক্ষাগারে হুঙ্গেরিয়ান ভাষাই শিক্ষিত হইবে, তখন সকল ব্যক্তি কেবল হুঙ্গেরিয়ান ভাষাই ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন, হুঙ্গেরিয়ান ভাষাতেই পুস্তকাদি লিখন, বক্তৃতা করণ ও কথোপকথন আরম্ভ হইল, এবং তাহার পর হইতেই মৃতপ্রায় হুঙ্গেরিয়ান ভাষা বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে লাগিল এবং হুঙ্গেরিয়ানদিগের মধ্যে কবি, কাব্যকার, নাটককার, ইতিহাস-লেখক ও দার্শনিক সকল উদিত হইয়া হুঙ্গেরিয়ান ভাষাকে সমধিক উন্নতিশালী করিয়া তুলিল। হুঙ্গেরিবাসীদিগের ন্যায় রাজার নিকট আবেদন করিয়া বঙ্গদেশের রাজসভা সমূহে, সমস্ত বিচারালয়ে ও গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত কার্য্যালয়ে বঙ্গভাষার প্রচলন ও বঙ্গদেশের সমস্ত বিদ্যালয়ে বঙ্গভাষারই শিক্ষা প্রদান এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত করা এক প্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু কৃতবিদ্য বঙ্গবাসিগণ যদ্যপি ইংরাজী ভাষার চর্চ্চা ও অনুশীলনের সহিত বঙ্গভাষার সবিশেষ চর্চ্চা ও অনুশীলন করেন তাহা হইলে বঙ্গভাষার উন্নতি পক্ষে উল্লিখিত প্রতিবন্ধক সকল অনেক পরিমাণে নিরাকৃত হইতে পারে। ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ বঙ্গদেশীয় সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণ ইংরাজী ভাষায় সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজ-

কারণ যে জাতির ভাষা উন্নত সে জাতি অন্যান্য সকল বিষয়েই উন্নত হইয়া থাকে। ভাষা উন্নত হইলে জাতীয় উন্নতি এক প্রকার অবশ্যম্ভাবী। এক জন দূরদর্শী বিজ্ঞ ইংরাজ লেখক বলিয়াছেন "The best index to the growth of a people is the growth and development of its language" পৃথিবীর ইতিহাসও এই সত্যের যথার্থতার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

শঙ্করাচার্য্যের জীবন-বৃত্তান্ত।

দিগ্বিজয়।

৪৩৪ সংখ্যক পত্রিকার ১১৫ পৃষ্ঠার পর।

অনন্তর শঙ্করাচার্য্য উত্তর দিক অবলম্বন পূর্ব্বক হস্তিনাপুরের আগ্নেয় কোণে বিজিলবিন্দু নামে প্রথিত বিদ্যালয় স্থলের সন্নিহিত এক তালবনে আসিয়া উপনীত হইলেন। এই তালবনে মণ্ডনমিশ্রের নিবাস। ইনি এক জন সুদক্ষ কর্ম্মকাণ্ডাবলম্বী এবং জ্ঞানকাণ্ডবাদিদিগের ঘোর বিপক্ষ। ইনি পঞ্চশত শিষ্যদিগকে দিগ্বিজয়ে সমর্থ করিয়াছিলেন। মণ্ডনমিশ্রের আলয়ে দাস দাসী ও শুক সারিকা সকল সংস্কৃত শ্লোক বলিতে পারিত। শঙ্করাচার্য্য যখন মণ্ডনমিশ্রের দাসীদিগকে তাঁহার আলয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তখন দাসীগণ বলিয়াছিল

"প্রত্যক্ষশব্দান্তবিধিপ্রভেদৈঃ
শুকাঙ্গনা যত্র গিরং বদন্তি।
দ্বারে তু নীড়ান্তরসন্নিরুদ্ধাঃ
অবেহি তন্মণ্ডনমিশ্রধাম।
শব্দান্তসংপ্রত্যয়ধাতুবাদৈঃ
শুকাঙ্গনা যত্র গিরং বদন্তি। ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ।
কাব্যাদিভির্নাটকসিদ্ধবাদৈঃ
শুকাঙ্গনা যত্র গিরং বদন্তি। ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ।"

শঙ্করাচার্য্য মণ্ডনমিশ্রের গৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে কবাট রুদ্ধ রহিয়াছে এবং শুনিলেন যে মণ্ডনমিশ্র শ্রাদ্ধ করিতেছেন। প্রাণায়ামবলে শূন্যমার্গ দিয়া আচার্য্য ভিতরে প্রবেশ করিয়া মণ্ডনমিশ্রের সন্নিহিত হইলেন। সন্ন্যাসীদর্শনে মণ্ডনমিশ্র কোপাকুলিতচিত্ত হইয়া বলিলেন আঃ এ মুণ্ডী আবার কোথা হইতে আসিল। ক্ষণকাল উভয়ে উত্তর প্রত্যুত্তর হইল। অবশেষে ব্যাসের বাক্যানুসারে মণ্ডনমিশ্র আচার্য্যকে পাদ্য প্রদান করিলেন। মণ্ডনমিশ্র শ্রাদ্ধে ব্যাসকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন; আনন্দগিরি বলিবেন যে মিশ্র মন্ত্র-শক্তিবলে ব্যাসকে তথায় আনয়ন করিয়াছিলেন! পাদ্য-গ্রহণ-কালে আচার্য্য বলিলেন "বাদার্থমাগতোস্মি।" মিশ্র উত্তর করিলেন "ভোজনানন্তরং তথা করোমি।" বাদের পণ হইল যে যিনি পরাজিত হইবেন তিনি স্বমত ত্যাগ পূর্ব্বক বিজেতার মত অবলম্বন করিবেন। মিশ্রপত্নী সরসবাণী উভয়পক্ষ-গ্রহণ-সমর্থ মধ্যস্থ রহিবেন। প্রসিদ্ধি আছে যে, মণ্ডনমিশ্র স্বয়ং ব্রহ্মা এবং সরসবাণী ব্রহ্মপত্নী সরস্বতী। নিগমাদি সর্ব্ববিদ্যা-প্রসঙ্গে শতদিন বিচার হইল। শতদিনের পরে সরসবাণী মণ্ডনমিশ্রকে বলিলেন "নাথ মণ্ডনমিশ্র, এহি ভিক্ষায়ৈ।" মণ্ডনমিশ্র বিচারে পরাস্ত হইয়া শঙ্করাচার্য্যের চরণে প্রণতিপুরঃসর তদুপদেশানুসারে সন্ন্যাসী হইয়া উত্তর দিকে গমন করিলেন। সরসবাণী দেখিলেন যে পতি সন্ন্যাসাশ্রম স্বীকার করিয়া যতি হইলেন এবং তাঁহাকে পতির জীবিতাবস্থাতেই বিধবা হইতে হইল। এই দুঃখে তিনি ব্রহ্মলোকে গমন করিতে উদ্যত হইলেন। শঙ্করাচার্য্য তাঁহাকে বলিলেন "সরসবাণি, তুমি ব্রহ্মশক্তি এবং মণ্ডনমিশ্রের পত্নী। আমার সহিত বিচার না করিয়া তুমি যাইতে পারিবে না। অতএব আমার নিকটে পরাভব স্বীকার কর।" সরসবাণী বিচার আরম্ভ করিলেন এবং সর্ব্ব

প্রথমে কামশাস্ত্রে নায়িকানায়ক প্রপঞ্চের আলাপ করিলেন। শঙ্করাচার্য্য কামশাস্ত্র পাঠ করেন নাই, সুতরাং তাঁহার প্রশ্নের উত্তর করিতে পারিলেন না। তখন আ-চার্য্য বলিলেন "মাতঃ আপনি ছয় মাসকাল অপেক্ষা করুন আমি কামকলা শিক্ষা করিয়া আসিতেছি।" এই বলিয়া তিনি কামশাস্ত্র শিক্ষা করিতে বহির্গত হইলেন এবং পশ্চিম দিকে গমন করিতে করিতে দেখিলেন যে এক রাজার মৃত দেহ চিতার উপর নিহিত রহিয়াছে। তখন সেই পুরের প্রান্তভাগে স্থিত এক গিরিগহ্বরে নিজ দেহ সংস্থাপন পূর্ব্বক স্বশিষ্যদিগকে তাহার রক্ষণে নিয়োজিত করিয়া পর-শরীর-প্রবেশ-বিদ্যা-প্রভাবে রাজার দেহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তদনন্তর রাজপুরে রা-জ্ঞীর নিকটে কামশাস্ত্র শিক্ষা করিলেন। রাজ্ঞী অতিশয় চতুরা, রাজার আচার ব্যবহার দেখিয়া তাঁহার সন্দেহ জন্মিল এবং তিনি ভৃত্যগণকে আজ্ঞা করিলেন "দ্বাদশ যোজ-নের মধ্যে নদী, গিরিগুহা, দেবালয় প্রভৃতি যে কোন নিভৃত স্থানে কোন মৃত দেহ দে-খিতে পাইবে, তাহা আনিয়া দাহ কর।" ভৃত্যগণ অনেক অন্বেষণ করিয়া শঙ্করাচার্য্যের মৃত দেহ প্রাপ্ত হইয়া এবং তাহা দাহ করিতে লইয়া চলিল। তাঁহার শিষ্যগণ রাজার স-কাশে প্রস্থান পূর্ব্বক তাঁহাকে উদ্বোধন ক-রিতে লাগিল। তখন শিষ্য কর্ত্তৃক উদ্বো-ধিত হইয়া শঙ্করাচার্য্য মূর্চ্ছিত হইলেন এবং রাজদেহ ত্যাগ করিয়া স্বদেহান্বেষণ করিতে লাগিলেন। শঙ্করাচার্য্য সূক্ষ্ম শরীরে স্থূল-শরীর অন্বেষণ করিয়া চিতার উপর উহা প্রজ্বলিত দেখিতে পাইলেন এবং কপাল মধ্য দিয়া দেহে প্রবেশ পূর্ব্বক চিতা হইতে লম্ফ দিয়া ভূমিতে পড়িলেন। নৃসিংহদেব অমৃতবৃষ্টি দ্বারা তাঁহার আরোগ্য সাধন করিয়া "সর্ব্বলোকং জয়" এই আশীর্ব্বাদ করিয়া তিরোধান করিলেন। তৎপরে শঙ্করাচার্য্য সত্বর মণ্ডনমিশ্রপুরে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক সরসবাণীর নিকটে উপনীত হইলেন এবং বিচার প্রার্থনা করিলেন। সরসবাণী অশ্লীল আলাপ হইবার শঙ্কাবশতঃ নিজের পরাভব স্বীকার করিলেন। এই প্রকারে সরসবাণীকে জয় করিয়া শঙ্করাচার্য্য তাঁহাকে মন্ত্রবদ্ধ করিলেন এবং তুঙ্গভদ্রা নদীতীরে প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্গপুরে গমন করিলেন। এই স্থানে এক মঠ নির্ম্মাণ করিয়া সরস্বতীকে ক-হিলেন "এবং আকল্পং স্থিরা ভব মদাশ্রমে," তুমি আমার মঠে চিরকাল স্থির হইয়া অব-স্থিতি কর। এই মঠ অদ্যাপি সিংহারি নামে প্রথিত। অনন্তর তথায় বিদ্যাপীঠ নির্ম্মাণ করিয়া ভারতীসম্প্রদায় স্থাপন করি-লেন। অত্রত্য শিষ্যমণ্ডলীর ভারতী নাম প্রদান করিলেন। ভারতী সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীগণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পূজনীয়; ইহাদের মধ্যে মূর্খ সন্ন্যাসী ছিল না। সন্ন্যাসী তিন প্রকার—ভারতী, গিরি ও পুরী। অনেকে বলেন যে শঙ্করাচার্য্য ভারতীসম্প্রদায়, গিরিসম্প্রদায় পুরীসম্প্র-দায় এই তিন সম্প্রদায় সংস্থাপিত করেন। কিন্তু আনন্দগিরির বিজয়ে ভারতীসম্প্র-দায়ের মাত্র উল্লেখ আছে। আনন্দগিরি গিরিসম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। ভারতী ও গিরিসম্প্রদায়ের মহান্ত সকল ভারত-বর্ষের অনেক স্থলে দৃষ্ট হয়। তার-কেশ্বরের মহান্ত গিরিসম্প্রদায়ের লোক কিন্তু তাঁহার দশ নামার মধ্যে দুই তিন জন ভারতীও আছে। পুরীসম্প্রদায় আমরা অবগত নহি।

ক্রমশঃ।

তত্ত্ব, রাজনীতি, পুরাতত্ত্ব, বার্ত্তাশাস্ত্র, বিজ্ঞান ও দর্শন বিষয়ক পুস্তক না লিখিয়া এবং বক্তৃতা না করিয়া যদ্যপি তাঁহারা বাঙ্গালা ভাষায় ঐ সকল বিষয়ে পুস্তক লিখেন ও বক্তৃতা করেন তাহা হইলে তাঁহারা বঙ্গভাষার বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে সমর্থ হইবেন। আমাদিগের দেশের সুশিক্ষিত ও কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ যত কাল বঙ্গভাষা বিশিষ্ট রূপে চর্চ্চা ও অনুশীলন করিতে আরম্ভ না করিবেন তত কাল বঙ্গভাষা প্রকৃত উন্নতি লাভ করিতে পারিবে না। এক্ষণে কতিপয় মাত্র কৃতবিদ্য ব্যক্তি বঙ্গভাষার অনুশীলন করিয়া থাকেন, বাঙ্গালাতে অতি অল্প সংখ্যক উত্তম গ্রন্থ ও প্রবন্ধ যাহা প্রকাশিত হইয়া থাকে তাহা তাঁহাদিগের দ্বারা রচিত হইয়া থাকে, কিন্তু সাধারণ কৃতবিদ্যের সংখ্যার সহিত তুলনা করিলে তাঁহাদিগের সংখ্যা অতি অল্প।

বঙ্গভাষার উন্নতির পক্ষে দ্বিতীয় প্রতিবন্ধক বাঙ্গালীদিগের স্বাধীনতাশূন্যতা। স্বাধীনতা ভাষার উন্নতিসাধনের পক্ষে একটি অত্যাবশ্যক উপকরণ। স্বাধীনতাশূন্যতা ভাষার উন্নতিপক্ষে একটি মহান ও প্রধান প্রতিবন্ধক। আমরা দেখিতে পাই যাহার যেরূপ মনের অবস্থা তাহার ভাষাও সেই রূপ হইয়া থাকে। যিনি সম্রাট কিম্বা রাজা, তাঁহার হৃদয় প্রভুত্ব ও রাজকীয় মহত্ত্বে পরিপূর্ণ এবং তাঁহার ভাষাও তদস্বরূপ প্রভুত্ব ও মহত্ত্বসূচক। যিনি প্রভু তাঁহার ভাষাও প্রভুত্বব্যঞ্জক, যে দাস তাহার ভাষাও দাসত্বব্যঞ্জক। যে ব্যক্তি স্বাধীন তাহার ভাষাও সেই রূপ মুক্ত এবং যে ব্যক্তি পরাধীন তাহার ভাষাও সেই রূপ বদ্ধ। সেই প্রকার যে জাতির স্বাধীনতা আছে, সেই জাতির ভাষা মুক্ত সুতরাং উন্নত, আর যে জাতির স্বাধীনতা নাই সেই জাতির ভাষা বদ্ধ সুতরাং অনুন্নত ও অপরিমার্জ্জিত। যে দেশের লোকেরা স্বাধীন তাহারা স্বাধীন ভাবে, নির্ভয়ে, মুক্তভাবে তাহাদিগের চিন্তাশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি সকল পরিচালনা করিতে পারে তজ্জন্য তাহাদের ভাষা শীঘ্র পরিপুষ্ট ও পরিমার্জ্জিত হইয়া উন্নত হয়, আর যে দেশের লোকেরা স্বেচ্ছাচারী কিন্তু যথেচ্ছাচারী রাজার অধীন এবং সকল প্রকার স্বাধীনতা-পরিভ্রষ্ট তাহারা সর্ব্বদা ভয়ে কম্পিত, তাহাদের হৃদয় ও মন বদ্ধ; স্বাধীনতা-জনিত মনের নির্ভয়তা ও মুক্তভাব তাহাদিগের মন হইতে একেবারে পলায়ন করিয়াছে সুতরাং তাহাদিগের ভাষার বিশেষ রূপে অনুশীলন ও চর্চ্চা হইতে পারে না, তন্নিমিত্ত উহা পরিমার্জ্জিত ও উন্নত হইতে পারে না। যে জাতি স্বাধীন সে জাতির লোকেরা স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিতে কোন বাধা ও বিঘ্ন প্রাপ্ত হয় না, তাহারা সকল সময়ে সকল অবস্থায় যাহা চিন্তা করে তাহা অবাধে মন খুলিয়া বলিতে পারে, সুতরাং তাহাদিগের চিন্তাস্রোত উন্মুক্ত হইয়া যায় এবং চিন্তাশক্তি তেজস্বী, প্রখর ও দৃঢ় হয়, তজ্জন্য তাহাদের ভাষায় নূতন নূতন কথার সৃষ্টি হইতে থাকে এবং উহা নূতন নূতন ভাবে সুসজ্জিত হইতে থাকে; এইরূপে তাহাদের ভাষা ক্রমশঃ উন্নত, বিশুদ্ধ ও পরিমার্জ্জিত হইতে থাকে। কিন্তু যে জাতির স্বাধীনতা নাই সে জাতির লোকেরা স্বাধীনরূপে চিন্তা করিতে পারে না, স্বাধীন ভাবে, মন খুলিয়া সকল কথা বলিতে পারে না, ভয়ে তাহাদের মুখ বদ্ধ থাকে, সুতরাং তাহাদিগের চিন্তাশক্তি অবাধে পরিচালিত হইতে না পারাতে উহা তেজস্বী হইতে পারে না, তজ্জন্য তাহাদের ভাষাও উন্নতি লাভ করিতে সক্ষম হয় না। স্বাধীনতা যে ভাষার একটি উন্নতিসাধক এবং স্বাধীনতা-

শূন্যতা যে ভাষার উন্নতিসাধনের একটি প্রতিবন্ধক ইতিহাস তাহার যথার্থতা অকাট্য রূপে প্রমাণ করিয়া দিতেছে। ইতিহাস পাঠে আমরা অবগত হই যে প্রায় যখন যে জাতি সম্যক স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়াছে তখনই তাহাদের ভাষা সুমার্জ্জিত ও উন্নত হইয়াছে, এবং যখন যে জাতির স্বাধীনতা অপহৃত হইয়াছে তখনই তাহাদের ভাষা অবনতি প্রাপ্ত হইয়াছে। গ্রীস দেশে যে সময়ে সাধারণ তন্ত্র প্রচলিত ছিল তৎকালেই গ্রীসে সক্রেটিস, প্লেটো, সফোক্লিস, ইউরিপাইডিস্ ডিমস্থিনিস প্রভৃতি অসাধারণ প্রতিভা-সম্পন্ন লেখক দার্শনিক কবি নাটককার বক্তা ও অন্যান্য নানা বিষয়ক গ্রন্থকর্ত্তা উদিত হইয়া ছিলেন। রোমীয় জাতি যখন সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিলেন, যখন তাঁহারা সমস্ত ইউরোপের ও অধিকাংশ আসিয়ার অধিপতি হইয়া ছিলেন তৎকালে তাঁহাদিগের মধ্যে সিসিরো, বর্জ্জিল, হোরেস, প্রভৃতি অসাধারণ লেখকগণ উদিত হইয়াছিলেন। চতুর্দ্দশ লুইএর রাজত্বকালে ফ্রান্সদেশে একতা সংস্থাপিত হয় এবং প্রজারা প্রায় সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয়; তাঁহারই রাজত্ব-সময়ে কর্ণিল, রেসিন, মোনিয়ার, লাফণ্টেন, ফেনেলন, বয়েলু প্রভৃতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফরাসী লেখকগণ উদিত হয়েন। ইংলণ্ডে রাজ্ঞী এনের রাজত্ব কালে একট্ আব সেটল্‌মেণ্ট (Act of Settlement) নামক আইন বিধিবদ্ধ হইলে ইংরাজদিগের স্বাধীনতা সুদৃঢ় ভিত্তিতে সংস্থাপিত হয়, উহার পর হইতে ইংলণ্ডে পোপ, ষ্টীল, এডিসন, জনসন প্রভৃতি অসাধারণ-শক্তি-সম্পন্ন অমর লেখকগণ উদিত হইতে লাগিলেন।

বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গবাসীরা সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন নহেন। সত্য বটে সুসভ্য স্বাধীনতাপ্রিয় ইংরাজ জাতি আমাদিগের রাজা, কিন্তু তাঁহারা আমাদিগকে সকল প্রকার স্বাধীন অধিকারে অধিকারী করেন নাই। সম্প্রতি আবার তাঁহারা প্রেস্ একট্ আইন বিধিবদ্ধ করিয়া আমাদিগের স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন আলোচনার পক্ষে বিশেষ ব্যাঘাত উপস্থিত করিয়াছেন। আমাদিগের এই স্বাধীনতাশূন্যতা আমাদিগের মাতৃভাষা বঙ্গভাষার উন্নতির একটি প্রধান প্রতিবন্ধক। যখন আমাদিগের রাজপুরুষেরা প্রত্যেক ইংরাজ যে সকল অধিকারে অধিকারী আমাদিগকে সেই সকল অধিকার প্রদান করিবেন, যখন আমরা সকল বিষয়ে স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইব, তখন স্বাধীনতা প্রযুক্ত ভাষার যে অপরিসীম উন্নতি হইতে পারে আমরা বঙ্গভাষার সেই অপরিসীম উন্নতি দেখিতে পাইব। যখন বঙ্গবাসীরা রাজপুরুষদিগের নিকট হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইবেন তখন বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিসম্পাদক অসাধারণ প্রতিভা ও বুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন লেখকগণ অবশ্যই উদিত হইবেন, এবং তখনই বঙ্গভাষা প্রকৃত, স্থায়ী, অপরিবর্ত্তনীয় উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে। বঙ্গদেশের এই রূপ ভাবী স্বাধীন অবস্থায় বঙ্গের সাহিত্যোদ্যানে যে সকল পুষ্প প্রস্ফুটিত হইবে তাহা বঙ্গদেশের বর্ত্তমান অধীন অবস্থায় উহার সাহিত্যোদ্যানে যে সকল পুষ্প প্রস্ফুটিত হইতেছে তাহাদিগের অপেক্ষা কতদূর অধিক সৌন্দর্য্য ও সৌরভ-বিশিষ্ট হইবে তাহা কল্পনা করা যায় না।

যৎকালে বঙ্গভাষার উন্নতির পক্ষে উপরোক্ত দুইটি প্রতিবন্ধক একেবারে অপসারিত হইবেক তখন আমরা বাঙ্গালী জাতির গার্হস্থ্য, সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় সম্যক উন্নতি দেখিতে পাইব;

খ্রীষ্ট কে?

শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনের বক্তৃতার উত্তর।

ব্রাহ্মধর্ম্ম অপৌত্তলিক ধর্ম্ম। অদ্বিতীয় ঈশ্বরই ইহার প্রাণ-সর্ব্বস্ব। অন্যান্য উপ-ধর্ম্মের ন্যায় ইহা অবতারবাদ স্বীকার করেন না এবং ঈশ্বর ও মনুষ্যের ব্যবধানে কোন ব্যক্তিকেই আনয়ন করেন না। এই দীনহীন মনুষ্য স্বয়ংই সেই সর্ব্বাধিপতি মহান পুরুষের সন্নিহিত হইতে পারিবে এই ভাবটিই এই ধর্ম্মের প্রাণ। "তং বেদ্যং পুরুষং বেদ" জ্ঞাতব্য একমাত্র ঈশ্বরকেই জান এই ধর্ম্মের এই সার উপদেশ। কিন্তু আমাদের দেশের কি দুরদৃষ্ট। এই একেশ্বরবাদ অধুনাতন কালের নহে, ইহার বীজ পুরুষ সরস্বতীতীরবাসী প্রাচীন মহর্ষিগণ। ইহা একটী জ্ঞানের ধর্ম্ম। কিন্তু যখন ইহা এই ভারতক্ষেত্রে প্রথমে প্রচারিত হয় তখন জনসাধারণ ইহা গ্রহণ করিতে পারে নাই। তাহার কারণ কেবল সাধারণে বিশুদ্ধ জ্ঞান-চর্চ্চার অভাব। সুতরাং কেবল ইহাঁদেরই জন্য তৎকালে পুরাণের সৃষ্টি হয়। কিন্তু এখন সর্ব্বসাধারণে জ্ঞানপ্রচারের সময় উপস্থিত। অনেকেই সূক্ষ্ম ধর্ম্ম অনুধাবন করিতে পারেন। মহাত্মা রামমোহন রায় প্রকৃত অবসর বুঝিয়াই এই বেদবেদান্ত-প্রতিপাদিত ধর্ম্মের পুনর্ব্বার অবতারণা করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখ ও ক্ষোভের বিষয় এই যে এই অর্দ্ধ শতাব্দির মধ্যেই ইহাতে পৌরাণিক ভাব প্রবেশ করিল। যে খৃষ্ট মনুষ্যকে ঈশ্বর হইতে একেবারে ব্যবহিত করিয়াছেন, যিনি স্বয়ংই স্বহস্তে মনুষ্যের মুক্তির ভার গ্রহণ করিয়াছেন এখন দেখিতেছি কোন কোন ব্রাহ্মের ইচ্ছা যে সেই খৃষ্ট এই ব্রাহ্মধর্ম্মের মধ্যে একটী সর্ব্বোচ্চ স্থান পান। শ্রীযুক্ত বাবু কে[illegible]বচন্দ্র সেন এই দলের অধিনায়ক। তিনি কিছু দিন পূর্ব্বে কোন এক প্রকাশ্য উপদেশে খৃষ্টে দেবত্ব আরোপ করিয়াছেন এবং তাঁহাকে অবতার বলিয়া স্বমুখে স্বীকার করিয়াছেন। আমরা কেশব বাবুর বাক্যে কোন রূপ বাদানুবাদ করিতে চাহি না, এই উপদেশের প্রত্যুত্তর-স্থলে রেবেরেণ্ড চার্লস বয়সী নামক এক জন ইংরাজ একেশ্বরবাদী কি বলেন সর্ব্বসাধারণের গোচরার্থে নিম্নে তাহার সারাংশ অনুবাদ করিয়া দিলাম। ইনি লণ্ডন মহানগরে একটী ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়াছেন। ইনিই পূর্ব্বে কেশব বাবুর এক জন বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

"পুনরায় কেশবচন্দ্র সেন গত ৯ এপ্রেল কে? এই প্রশ্ন বিষয়ে একটি চমৎকার বক্তৃতা করিয়াছেন। তিনি এক জন প্রধান লোক এবং তাঁহার প্রভাবও যথেষ্ট, কেবল এই বলিয়াই যে আমরা এই গুরুতর প্রশ্নের তিনি কি উত্তর দিয়াছেন তাহা জানিতে উৎসুক আছি তাহা নহে, তবে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মগণ আমাদিগকে ধর্ম্মভাব ও ধর্ম্মবিশ্বাসে ইউরোপীয় অন্য কোন সম্প্রদায় অপেক্ষা তাঁহাদিগের নিকটতর বোধ করেন এই জন্য এই প্রশ্নের কি মীমাংসা হইয়াছে তাহা জানিতে আমরা ব্যগ্র হইয়াছি। বলিতে কি এই জন্য আমরা কেশবচন্দ্র সেনের এই অপূর্ব্ব এবং স্থলবিশেষে শোচনীয় বাক্যের গম্ভীর রূপে নিন্দা না করিয়া এবং আমাদিগের নিন্দাবাদের কারণ না দর্শাইয়া নিরস্ত থাকিতে পারি না। অন্যান্য প্রশ্ন অপেক্ষা খ্রীষ্টধর্ম্ম সম্পর্কে 'খ্রীষ্ট কে?' এইটিই বিশেষ প্রশ্ন। এখন চতুর্দ্দিকে ধর্ম্ম-সম্বন্ধে যে সকল বাদানুবাদ [illegible] সেই সকলের মূলে এই প্রশ্নটি নিহিত। খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের যে মতটি লইয়া আলোচনা কর পরিশেষে তাহার এই গভীর বীজ মতটি কি তাহা স্থির করিতে হইবে। * * * খ্রীষ্টের

ঈশ্বরত্বে বিশ্বাসের সহিত খ্রীষ্টধর্ম্মের অন্যান্য প্রত্যেক মতের নিগূঢ় সম্বন্ধ রহিয়াছে। * * * ইহা খ্রীষ্টধর্ম্মের একটি আবরণ, যদ্যপি এই আবরণ ভেদ করা যায় তাহা হইলে খ্রীষ্টধর্ম্ম ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িবে। এই মতে সন্দেহ উপস্থিত হইলেই অন্যান্য প্রধান প্রধান মতে আর বিশ্বাস থাকিতে পারে না, অতএব "খ্রীষ্ট কে ?" এই প্রশ্নটি একটি দুর্গস্বরূপ; পরিশেষে এই দুর্গের চতুর্দ্দিকে খ্রীষ্টধর্ম্ম-বৈরী-সম্প্রদায় সমবেত হইবে।

বর্ত্তমান কালে যখন পুরাতন ধর্ম্ম মত সকল নূতন আকারে উপস্থিত হইয়া আমাদিগের ধর্ম্ম বিষয়ে পরাধীনতা চিরস্থায়ী করিতে চেষ্টা পাইতেছে তখন ধর্ম্ম বিষয়ে স্বাধীনতা লাভের সূত্রপাত করা যে কেবল বুদ্ধি ও বিবেকানুরাগের কার্য্য তাহা নহে; বর্ত্তমান ও উত্তর কালীন লোকদিগের মঙ্গলার্থ উহা সম্পাদন করা আমাদিগের বিশেষ কর্ত্তব্য। যদি আমরা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারি যে খ্রীষ্টোপাসনা একটি ভ্রমাত্মক পদার্থ, সম্পূর্ণরূপে যুক্তিবিরুদ্ধ, এবং উহা খ্রীষ্টের জীবন-বৃত্তান্ত দ্বারা সাব্যস্ত হয় না, উহা উন্নত ধর্ম্ম জীবনের সম্পূর্ণ ব্যাঘাতক এবং ঈশ্বরের পক্ষে অপমান-জনক, উহা আমাদিগের আত্মাকে সঙ্কীর্ণ করে উহার উন্নতির ব্যাঘাত প্রদান করে, এবং উন্নত ও উচ্চমনা ব্যক্তিগণকে ধর্ম্ম হইতে বিযুক্ত করে, যদ্যপি আমরা বুঝিতে পারি যে খ্রীষ্টোপাসনা পুরাকালে যে কিছু মঙ্গল সম্পাদন করুক না কেন, বর্ত্তমান সময়ে ইহা নিতান্ত অমঙ্গলকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং কিছুকাল পরে সকলে ইহা দোষ-দুষ্ট বুঝিয়া পরিত্যাগ করিবে তাহা হইলে আমাদিগের এই নিতান্ত অপকারী ভ্রমাত্মক মতের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হওয়া, ইহা যাহাতে অধিক কাল স্থায়ী না হইতে পারে তজ্জন্য চেষ্টা করা, এবং যে সকল দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তি ইহা কোন নূতন আকারে রক্ষা করিতে চেষ্টা করে তাহাদিগকে সাহায্য না করা আমাদিগের অতীব কর্ত্তব্য।

খ্রীষ্টের চরিত্রে ভক্তি, প্রেম ও প্রশংসার উপযুক্ত যাহা কিছু আছে আমরা তাহাতে ভক্তি ও প্রশংসা করিয়া থাকি। আমরা স্পষ্ট স্বীকার করি যে খ্রীষ্টের এমন অনেক গুণ ছিল যাহা আমাদিগের ভক্তি প্রেম ও প্রশংসার উপযুক্ত। কিন্তু আমরা ইহার অধিক যাই না। আমরা তাঁহার দোষের প্রশংসা করি না। তাঁহার নানারূপ ভ্রান্ত মতে ভক্তি করি না, এবং তাঁহার চরিত্রগত দোষ সকল ভাল বাসি না।

খ্রীষ্ট স্বমত রক্ষার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করেন, এই কারণেই তিনি সাধারণের প্রশংসার্হ হইয়াছেন; কিন্তু যে পুস্তকে তাঁহার এই বীরোচিত স্বার্থত্যাগের উল্লেখ আছে তাহা পাঠ করিলে সুস্পষ্টই অবগত হওয়া যায় যে যে সকল রাজনৈতিক ও ধর্ম্ম বিষয়ক মতের জন্য তাঁহাকে প্রাণত্যাগ করিতে হয় সে সকল মত কোন প্রকৃতিস্থ ব্যক্তির হইতে পারে না। ইহুদি জাতির ও ইহুদি শাসনকর্ত্তাদিগের অনুরোধে রোমকেরা খ্রীষ্টকে ক্রুশে বিদ্ধ করে। কি দোষের জন্য? ইহুদিরা বলিয়া[illegible] কারণ তিনি আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। তাহারা আরও বলিয়াছিল "এই [illegible]নার জন্য তিনি আমাদের রাজ্যের ব্যবস্থানুসারে বিনষ্ট হইবেন।" ইহুদিদিগের প্রধান প্রধান পুরোহিতেরা খ্রীষ্টকে [illegible] বিদ্রোহিতা-দোষে দোষী করিয়াছিল, এবং তৎকালীন ইহুদি শাসনকর্ত্তা পাইলেটকে বলিয়াছিল যদি তুমি

খ্রীষ্টকে অব্যাহতি দেও তাহা হইলে তুমি সিজারের বন্ধু নহ। সিজার ব্যতীত আমাদের আর কেহই রাজা নাই।” নিউটেষ্টমেণ্টে এই সকল বাক্য স্পষ্টাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে; এই সকল বাক্য আমি ঈর্ষাপরতন্ত্র হইয়া রচনা করি নাই। ঈশ্বরের অবমাননা করা, আপনাকে ঈশ্বরের পদে প্রতিষ্ঠিত করা, এবং আপনাকে জেরুজিলম নিবাসীগণ কর্ত্তৃক দায়ুদপুত্র ও ইহুদিদিগের রাজার স্বরূপ গৃহীত হইতে দেওয়া এই কএকটী কারণে খ্রীষ্ট ইহুদিদিগের রাজকীয় ব্যবস্থা অনুসারে দোষী প্রমাণিত হন, এবং ক্রুশে বিদ্ধ হইয়া বিনষ্ট হইয়াছিলেন। এই সকল কার্য্য খ্রীষ্টের চরিত্রের মহত্ত্ব ও এবং তাঁহার মৃত্যুর বীরত্ব অনেক পরিমাণে হ্রাস করিয়া দিতেছে।

খ্রীষ্টের অনেকের প্রতি প্রেম ও বন্ধুতা ছিল কিন্তু স্বপরিবারের প্রতি প্রেম না থাকাতে এবং স্বদেশীয় ব্যক্তিগণকে অভিসম্পাত করাতে তাঁহার ঐ সকল গুণের সৌন্দর্য্য প্রায় লোপ পাইয়াছে।

যাঁহারা নিউটেষ্টমেণ্ট অধ্যয়ন করেন তাঁহারা সম্মুখে স্পষ্টাক্ষরে যাহা লিখিত রহিয়াছে তাহা বুঝিতে অক্ষম, এবং খ্রীষ্টের যোগ্যতা যথার্থ রূপে স্থির করিতে এবং তাঁহার চরিত্র অপক্ষপাতে বিচার করিতে কৃতকার্য্য হন না। খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীরা শৈশব কাল হইতে খ্রীষ্টের চরিত্রের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে নানা ভ্রমাত্মক মতে বিশ্বাস করিতে শিক্ষা করায় তাঁহারা দোষাংশের প্রতি এক প্রকার অন্ধ হয়েন; এই অন্ধতা-দোষ তাঁহাদিগের এরূপ প্রকৃতি-গত হইয়া পড়ে যে তাঁহারা চেষ্টা করিলেও উহা দূর করিতে পারেন না, অতএব তাঁহাদিগের ঐ দোষ অবশ্যই মার্জ্জনীয়; কিন্তু যখন এক জন ভারতবর্ষবাসী—এক জন ভারতবর্ষবাসী ব্রহ্মবাদী যিনি বহুকাল একটি জ্ঞানপূর্ণ সহজ ধর্ম্মে বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছেন এবং যাঁহার আত্মাতে ঐ ধর্ম্মের অলৌকিক জ্যোতি প্রতিভাত হইয়াছে, তিনি যখন খ্রীষ্টের পূর্ণতা, সৌন্দর্য্য ও অনুপগম্য মহত্ত্বের বিষয়ে প্রলাপোক্তি করিতে থাকেন তখন আমরা তাঁহার মন যে প্রকৃতিস্থ আছে এরূপ বিশ্বাস করিতে পারি না। ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় যে লোকে অবৈধ রূপে খ্রীষ্টকে যে সকল শ্রেষ্ঠ মানবীয় গুণে বিভূষিত করিয়াছে কেশবচন্দ্র সেন সেই সকল গুণের জন্য তাঁহাকে যে ভক্তি করেন এমন নহে, তাঁহার যে সকল দোষ এবং তাঁহার যে সকল অর্থশূন্য গর্ব্বিত প্রলাপোক্তিকে আমরা অত্যন্ত নিন্দা করি, খ্রীষ্টের সেই সকল দোষ ও বাক্যের জন্যই কেশবচন্দ্র সেন তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। চেনিং কিম্বা মার্টিনিউর ন্যায় যদি কোন ব্যক্তি খ্রীষ্টচরিত্রের পূর্ণতার অলভ্য উচ্চতার বিষয়ে কিছু বলেন আমরা তাহাতে তাদৃশ বিরক্ত হই না; তখন আমরা এই বিবেচনা করিয়া বিস্মিত হই যে কি প্রকারে ইহা সম্ভবপর যে এই সকল মহৎ ব্যক্তি আপনাদিগের পূর্ব্বমতে অন্ধীভূত হইয়া যান, এবং তাঁহাদিগের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত বাইবেলে যাহা লিখিত রহিয়াছে তাহা বুঝিতে সম্যক অকৃতকার্য্য হন। কিন্তু খ্রীষ্ট আপনি ঈশ্বরতুল্য, ঈশ্বরের সহিত অভিন্ন; আপনি সৃষ্টির পূর্ব্বে ঈশ্বরের ন্যায় বর্ত্তমান ছিলেন, আপনি ত্রিমূর্ত্তির অন্যতর মূর্ত্তি এবং সমস্ত মানবজাতির ভাবী বিচারকর্ত্তা বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন, যখন কেশবচন্দ্র সেনের ন্যায় কোন ব্যক্তি তজ্জন্য তাঁহাকে প্রশংসা করেন তখন আমরা আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারি না।

* * *

খ্রীষ্ট স্বীয় ঐশী শক্তি ও মহিমা স্বয়ং ব্যক্ত করিয়াছিলেন এবং যথার্থই তাঁহার ঐশী শক্তি ও মাহাত্ম্য ছিল খ্রীষ্টানদিগের মধ্যে এই দৃঢ় বিশ্বাস থাকাতে খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী জাতিগণের মধ্যে নানা অমঙ্গল ঘটিয়াছে। কিন্তু যখন এক ব্যক্তি আপনাকে ব্রহ্মবাদী বলিয়া পরিচয় দেন এবং স্পষ্টাক্ষরে বলেন "আমি খ্রীষ্টান নহি" যখন তিনি খ্রীষ্ট আপনাকে ঐশী শক্তি ও মাহাত্ম্য-সম্পন্ন বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন এই কারণে তাঁহাকে আত্যন্তিক প্রশংসা করেন তখন অন্যান্য সকল ব্রহ্মবাদী কি নিশ্চিন্ত থাকিবেন। বলিতে কি, কিছুকাল পূর্ব্বে যে কেশবচন্দ্র সেন ভারতবর্ষীয় একেশ্বরবাদী সমাজের অধিনায়ক ছিলেন এক্ষণে তাঁহার ন্যায় খ্রীষ্টের প্রণত উপাসক ও অনুরক্ত ভক্ত আর দ্বিতীয় নাই। হয়ত আমরা কেশবচন্দ্র সেনকে ইংলণ্ডের খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মসমাজের কোন সম্প্রদায়ভুক্ত কিম্বা মেথডিষ্ট নামক খ্রীষ্টীয়দিগের মতাবলম্বী অথবা কার্ডিনেল নামধারী খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত দেখিতে পাইব।

* * *
* * *
* * *
* * *

যে কেশবচন্দ্র সেন এক সময়ে এক ঈশ্বরের অকৃত্রিম উপাসক ও ভক্ত ছিলেন তিনি এক্ষণে পৌত্তলিকদিগের সহিত প্রণত হইয়া খ্রীষ্টকে (ঈশ্বরকে নহে) পৃথিবীর যথার্থ আলোক স্বরূপ বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন এবং খ্রীষ্টের প্রতি "আমার মধুর খ্রীষ্ট! আমার হৃদয়ের উজ্বল মণি! আমার আত্মার রত্নহার! বিংশতি বৎসর আমি তাঁহাকে এই ক্ষুদ্র হৃদয়ে ধারণ করিয়া আসিতেছি, সংসারের অপবিত্রতায় ও নির্য্যাতনে প্রপীড়িত হইয়া আমি প্রভু ইশা হইতে অনির্ব্বচনীয় মধুরতা ও আনন্দ লাভ করিয়াছি" এই প্রকার এক জন রোমান কেথেলিক সম্প্রদায়-ভুক্ত সন্ন্যাসিনীর উপযুক্ত বাক্যে আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন, তদ্দৃষ্টে আমরা দুঃখের অশ্রু আর কিছুতেই সম্বরণ করিতে পারি না।

খ্রীষ্টের মৃত দেহ সমাহিত হইবার তিন দিবস পরে তাঁহার পুনরাবির্ভাব, খ্রীষ্টের মাংস ভক্ষণ ও শোণিত পান বিষয়ক মত, খ্রীষ্টের স্বর্গারোহণ, এবং জীবিত ও মৃত ব্যক্তিগণের বিচারার্থ পুনরাগমন, কেশবচন্দ্র সেন এই সকল খ্রীষ্টীয় মতের কি প্রকারে পোষকতা করিয়াছেন তাহা আমি তাঁহার বক্তৃতা হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে পারিতাম কিন্তু সময়াভাবে তাহা পারিলাম না। তাঁহার আর একটি কথা আমি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি তাহা পাঠ করিয়া আমি নিতান্ত সন্তাপিত হইয়াছি। কেশবচন্দ্র সেন বলেন; "মেরীপুত্র খ্রীষ্টের এমন কোন প্রিয় পরিবার-বন্ধন ছিল না যাহা তাঁহাকে মোহিত কিম্বা বদ্ধ করিয়া রাখে। যখন তাঁহার নিকট সম্বাদ আসিল যে তাঁহার মাতা ও ভ্রাতৃগণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন, তিনি বলিলেন, "কে আমার মাতা এবং কাহারা আমার ভ্রাতৃগণ। যে ব্যক্তি আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করেন, তিনিই আমার ভ্রাতা, ভগিনী ও মাতা"। খ্রীষ্ট অতি দীনহীন দরিদ্র ছিলেন, তাঁহার আপনার বলিবার কিছুই ছিল না; তাঁহার গৃহ ছিল না, পরিবার ছিল না, পৃথিবীতে তাঁহার কিছুই ছিল না। কিন্তু ঈশ্বরেতেই তাঁহার বাসস্থান ছিল, চতুর্দ্দিকে তাঁহার বৃহৎ পরিবার এবং অসংখ্য

পুত্র কন্যা ছিল, এবং তিনি মধুরতম বন্ধনে বদ্ধ ছিলেন।

স্বীয় পরিবারের প্রতি স্নেহশূন্যতা এই অত্যন্ত অস্বাভাবিক দোষের জন্য কেশবচন্দ্র সেন খ্রীষ্টকে প্রশংসা করিয়াছেন দেখিয়া, আমি তাঁহার ধর্ম্মনীতি নির্দ্ধারণে সম্যক অন্ধতা উপলব্ধি করিয়া নিতান্ত লজ্জিত ও গভীররূপে দুঃখিত হইয়াছি। খ্রীষ্ট বলিয়াছিলেন "যদ্যপি এমন কোন ব্যক্তি আমার নিকট আইসে যে তাহার পিতামাতা স্ত্রীপুত্র ও ভ্রাতাভগিনী এবং স্বীয় জীবন পর্য্যন্ত ঘৃণা না করে, সে ব্যক্তি আমার শিষ্য হইতে পারিবে না।" এই বাক্য শুনিয়া কোন্ ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির মনে না ঘৃণা ও অবজ্ঞা উদয় হয়। পিতামাতা ও স্ত্রীপুত্রের মঙ্গল অপেক্ষা আপনার জীবন অধিকতর প্রিয় খ্রীষ্টের এই মত তাঁহাকে কতদূর স্বাভাবিক স্নেহমমতাশূন্য বলিয়া স্পষ্টরূপে প্রকাশ করিয়া দেয়।

কেশবচন্দ্র সেনকে সাধারণ লোকের সহিত ব্যবহার করিতে হয় অতএব তিনি সবিশেষ অবগত আছেন যে বন্ধুগণ ও প্রতিবাসীদিগের স্নেহ ও সম্মানের পাত্র হওয়া অপেক্ষা, সর্ব্বদা সমানরূপে স্ত্রী, পুত্র, ও ভৃত্যগণের স্নেহ ও ভক্তি লাভ করা কতদূর দুষ্কর ব্যাপার। খ্রীষ্ট ও অন্যান্য অনেক হিতকারী ব্যক্তি মানবজাতির প্রতি কতকগুলি কল্পিত কর্ত্তব্য কার্য্য কিম্বা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কোন কল্পিত কর্ত্তব্য পালন করিবার জন্য, গৃহবন্ধন ও পরিবারের প্রতি কর্ত্তব্য অগ্রাহ্য করিয়াছেন এবং নিকটতর ও প্রিয়তম বস্তু সকল বিসর্জ্জন দিয়াছেন, ইহা তাঁহাদের মানসিক ক্ষীণতা বলিতে হইবে। এ প্রকার লোকেরা আপনাদিগের অনুষ্ঠিত কার্য্য চিরস্থায়ী হইবার বিষয়ে এবং আপনাদিগের পরিবারের প্রধান ও পবিত্র অধিকার সকল নষ্ট না হইতে দিতে কখনই সমর্থ হইতে পারেন না। এই বিষয়ে খ্রীষ্টের যে মানসিক দৌর্ব্বল্য দেখা যায় তজ্জন্য তাঁহাকে ক্ষমা করা যাইতে পারে, কিন্তু প্রশংসা করা যাইতে পারে না; এবং তিনি মনুষ্যের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য সকলের মধ্যে এই কর্ত্তব্যটি সাধন করিতে পারেন নাই বলিয়া তাঁহাকে ঐশীশক্তিসম্পন্ন বিবেচনা করা যাইতে পারে না।

১৮৬৭ খ্রীঃ অব্দে হিলস্থ উপাসনা-মন্দিরে আমি যাহা বলিয়াছিলাম অদ্য আমি তাহা পুনরুচ্চারণ করিয়া এই বক্তৃতা সমাপন করিতেছি—"যদাপি কোন সর্ব্বোচ্চ মত-বিশিষ্ট ধর্ম্ম-পরিবার আত্মীয় কুটুম্বের প্রতি কৃতঘ্ন হইতে উপদেশ দেয়, কিম্বা পবিত্র পারিবারিক স্নেহ ও ভ্রাতৃভাব হ্রাস করিতে চেষ্টা পায়, তাহা হইলে সেই ধর্ম্মকে আমি "পার্থিব, ইন্দ্রিয়-সুখ-প্রশ্রয়কারী এবং 'শয়তানী' আখ্যা প্রদান করি।

পত্র।

ব্রহ্মকৃপা হি কেবলং।

পরমভক্তিভাজন

শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়

সমীপেষু।

ভক্তিপূর্ণ প্রণামপুরঃসর নিবেদন। * * * * * সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার নির্দেশানুসারে অদ্য মহাশয়ের নিকট একটী বিষয় নিবেদন করিতে অগ্রসর হইতেছি। এ বিষয়টী অতি গুরুতর এবং এ সম্বন্ধে ব্রাহ্মদিগের কি কর্ত্তব্য মহাশয় উপদেশ দিয়া কৃতার্থ করিবেন।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের নেতৃগণ ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মধর্ম্মের নামে যে সকল মত প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহার অনেকগুলি আমাদিগের নিকট ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃত ভাব ও চিরাদৃত মতের বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয়। এই সকল মতের অনুবর্ত্তীরা যদি ব্রাহ্ম হন, তাহা হইলে আমাদিগকে অব্রাহ্ম বলিয়া অভিহিত হইতে হয়। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপ

চন্দ্র মজুমদার "Theistic quarterly Review" নামে এক খানি ত্রৈমাসিক পত্র সম্পাদন ও প্রচার করিতেছেন। তাহার জুলাই সংখ্যায় "The Brahmo's creed" ব্রাহ্মের বিশ্বাস বলিয়া ৩৯টী মত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তন্মধ্যে কয়েকটী স্থল অল্পাধিক আপত্তি-জনক থাকিলেও নিয়োদ্ধৃত দুইটী মত সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ও ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরোধী বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

"আমি বিশ্বাস করি যিশুখৃষ্ট ঈশ্বর-প্রেরিত লোক ও গুরুদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান।"

"আমি বিশ্বাস করি ব্রাহ্মসমাজের নেতাদিগের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির প্রত্যাদেশ ও সত্যশিক্ষা দিবার শক্তি আছে, তন্মধ্যে বাবু কেশবচন্দ্র সেন প্রধান।" (অনুবাদ)

লেখক " The Brahmo's creed " বলিয়া যেরূপ ভাবে লক্ষণা করিয়াছেন তাহাতে জগতের নিকট দুইটী বিষয় বলা হইতেছে। (১) উল্লিখিত মতে ব্রাহ্ম মাত্রেই বিশ্বাস করেন, (২) উক্তরূপ বিশ্বাস যাঁহার নাই, তিনি ব্রাহ্ম বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না। আমরা দেখিতেছি ব্রাহ্মদিগের মধ্যে অদ্যাপি এমত অনেক লোক আছেন, যাঁহারা এরূপ বিশ্বাস করেন না। আর যিশুখৃষ্ট ও বাবু কেশবচন্দ্র সেন প্রধান প্রেরিত ও ধর্ম্মগুরু বলিয়া স্বীকার না করিলে যদি অব্রাহ্ম হইতে হয়, তাহা হইলে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মকে ব্রাহ্মসমাজ হইতে বিদায় লইতে হয়। এরূপ স্থলে ব্রাহ্মসমাজ উদার সনাতন ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া খৃষ্ট বা কেশবোপাসক-সম্প্রদায়ে পরিণত হইয়াছে বলিয়া অপবাদ ঘোষণা করা হইতেছে, তাহা হইতে ইহাকে রক্ষা করা এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের নামে আকৃষ্ট হইয়া কেহ অসত্যের কুহকে পতিত না হয়, তাহার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করা ব্রাহ্ম মাত্রেরই কর্ত্তব্য বোধ হয়। উদাসীন থাকিয়া ব্রাহ্ম নামের ও ব্রাহ্মসমাজের আর দুর্গতি সাধন হইতে দেওয়া উচিত বোধ হয় না। আমরা দেখিতেছি ইতিমধ্যে অনেক ব্রাহ্মের মনে ব্রাহ্মধর্ম্ম-বিরুদ্ধ অনেক ভাব প্রবেশ করিয়াছে, তাহা নিরাকরণ না হইলে ব্রাহ্মসমাজে ঘোরতর কুসংস্কার সকল বদ্ধমূল হইবে এবং নরপূজার প্রাদুর্ভাবে অদ্বিতীয় সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের উপাসনার ব্যাঘাত করিবে।

আমাদিগের ইচ্ছা ব্রাহ্মের বিশ্বাস বলিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম-বিরুদ্ধ যে সকল মত প্রচারিত হইতেছে, তৎসম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজ সকলের এবং চিন্তাশীল ব্রাহ্মগণের মত গ্রহণ করিয়া সাধারণ্যে প্রচার করা হয়; তাহা করিলে উপস্থিত বিপদের কতক প্রতীকার হইতে পারে। যাঁহারা মনুষ্য বিশেষকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া ঈশ্বরের সহিত আত্মার সাক্ষাৎ যোগ ছেদন করিতে যান, তাঁহাদিগকে ব্রাহ্ম নামে অভিহিত করা যায় কি না এ বিষয়েও একটী সাধারণ মত স্থাপন আবশ্যক। এতৎ সম্বন্ধে মহাশয়ের যে অভিপ্রায় হয় তাহা ব্যক্ত করিয়া এবং আমাদিগের কর্ত্তব্য বিষয়ে উপদেশ দিয়া অনুগৃহীত করেন এই প্রার্থনা।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়
১৩নং মৃজাপুরষ্ট্রিট কলিকাতা
১৮৭৯। ১৪ আগস্ট

আজ্ঞাধীন
শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত
সা,ব্রা,স, সহ, সম্পাদক

মান্যবর

শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সহকারি সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু

সবিনয় নিবেদন।

৫০ ব্রাহ্ম সম্বৎ ২১ ভাদ্র দিবসীয় আদি ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষদিগের অধিবেশনে আপনার ১৮৭৯ সালের ১৪ আগস্ত দিবসের পত্র অর্পিত হইয়াছিল। তাহা পাঠ করিয়া তাঁহারা এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন যে গত জুলাই মাসের থীইষ্টিক কোয়ার্টর্লি রিবিউ নামক ত্রৈমাসিক পত্রিকায় শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ব্রাহ্মদিগের মত ও বিশ্বাস বলিয়া যে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার কোন কোন বিষয় আদি ব্রাহ্মসমাজ কখনই অনুমোদন করিতে পারেন না। উহার একস্থলে লিখিত আছে যে "আমি বিশ্বাস করি যে ঈশ্বরানুপ্রাণিত ধর্ম্মবক্তা এবং ধর্ম্মোপদেষ্টাদের মধ্যে ঈশা সর্ব্বপ্রধান" আর একস্থলে আছে "আমি বিশ্বাস করি ব্রাহ্মসমাজের নেতাদিগের মধ্যে কেহ কেহ ঈশ্বরানুপ্রাণিত এবং সত্য উপদেশ প্রদানে ক্ষমতা বিশিষ্ট এবং তাঁহাদের মধ্যে কেশবচন্দ্র সেন শ্রেষ্ঠ।" অন্য অন্য আপত্তিজনক বাক্যের মধ্যে এই দুইটি বাক্য প্রধান বোধ হইল। কোন কোন বিশেষ ব্রাহ্মের মত হইতে পারে যে যিশুখ্রীষ্ট ধর্ম্মবিষয়ক উপদেষ্টাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান এবং ব্রাহ্মসমাজের নেতাদিগের মধ্যে শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন সত্য উপদেশ প্রদানে সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ ক্ষমতা বিশিষ্ট কিন্তু এই দুইটি বিষয়ে বিশ্বাস না করিলে কোন ব্যক্তি যে ব্রাহ্ম হইতে পারে না এমন বলা যাইতে পারে না। আর যাঁহারা বলেন যে এই দুইটি বিষয়ে বিশ্বাস না করিলে কোন ব্যক্তিকে ব্রাহ্ম বলা যাইতে পারে না, তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের বিপরীত কথা বলেন। ইতি ২৮ ভাদ্র ৫০।

শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ

LETTER OF REVD CHARLES VOYSEY TO BABU RAJNARAIN BOSE, PRESIDENT OF THE ADI BRAHMO SAMAJ.

CAMDEN HOUSE DULWICH S. C.

AUGUST 17, 1879.

MY DEAR SIR,

*   *   *   *   *

I THANK you with all my heart for your most kind and gratifying letters and also for your valuable present of books. * * * I will also forward copies to Mr. Newman and Miss Cobbe, if the latter has returned home from the continent.

I will ask you kindly to accept from me a parcel of my works which very likely you have not seen. The purely Theistic portions of them you will most likely agree with: but I commend also to your notice the 7th volume of "Sling and Stone" which deals with the subject of Prophesy. There are chapters devoted entirely to the "Evidence of Jesus" and "Jesus as a Prophet" which will open the eyes of any one so foolish as to dally with Christianity. These chapters will show how entirely baseless is Keshub Baboo's reverence for Jesus even as a Prophet and a man like ourselves. You will do me great kindness by giving publicity to these chapters and causing them to be read. I give free permission to the reprinting of them, if my name as author be duly attached. There are only two men professing to be "religious teachers" in this country, or for the matter of fact, even in America, who have attacked the Idol of Christendom in this way. These two are Professor F. W. Newman and myself. The Unitarians are either unwilling or afraid to do so. Notice the attitude of Mr. Dall on this point. I will further ask of you the favor of conveying to the members of the Adi Brahmo Samaj my deep sense of their sympathy and good will in assuring me of their approval of my reply to Baboo Keshub Chunder Sen. It gratifies me beyond words to know that you are all so faithfully resolved on maintaining the purest Theism and in resisting the encroachments of an insidious but emasculated Christianity. The real orthodox Christianity goes straight to the mark and makes Jesus its God. It is a genuine and unvarnished Polytheism. But the Christianity of Mr. Dall and K. C. Sen is a poor hybrid and essentially idolatrous. Professor Newman's discourse in which he alludes to Baboo Keshub Chunder Sen I also send you. He told me the other day that he suspected K. C. S., of Christian proclivities years ago and always feared he had no depth of sound Theism. I am very thankful to learn that K. C. S. has lost his influence and can not do any harm to the Brahmo Samaj. Your letter gratifies me still more in reference to the subject of social reform. It always appeared to me a blunder to mix up two such wholly distinct things as Religious Belief and Social Customs. Moreover individual exertion is one thing and corporate interference quite another. It is well to encourage individuals to do their best in amending, altering or removing old customs which are proved to be pernicious. But it is wrong to imperil the influence of a Church or Religious Society by making it the obnoxious opposer of, or interferer with, established customs. You want to make all men *Theists* irrespective of their customs (and Caste) in other matters; and if you draw a hard and fast line to destroy customs you shut out a vast body of persons who would otherwise have listened thankfully to your religious teaching. You have, in my opinion done wisely and well in keeping free of such impediments and in leaving Social Reforms to your individual members.

I remember your valuable lecture on Brahmoism with great pleasure and again I must congratulate and praise you on your devoted fidelity to the One Living and True God whom, while we live, we will worship *alone* without rival or mediator. With regard to Scripture texts my object in choosing them is *generally* to shew that I value the Old Book on certain rational grounds, but I not unfrequently take as texts passages from modern literature to show that I have no superstitious regard for the Bible.

*   *   *   *

I write with a warm heart and much respect and gratitude.

Ever most truly yours,

CHARLES VOYSEY.

P. S.—AUGUST 20.

I am at home again and have read with

great admiration your Essay on Religion as a Science. This well deserves, and if I mistake not, will receive great attention from the scientific world. * * * *

C. VOYSEY.

বিজ্ঞাপন।

গত সংখ্যক পত্রিকায় আয়-ব্যয়-স্তম্ভে শ্রাবণ মাসের স্থলে প্রমাদবশত ভাদ্র মাস হইয়াছে। উহা শ্রাবণ হইবে।

আগামী ৩ কার্ত্তিক রবিবার প্রাতে ৭ ঘটিকার সময় মাসিক ব্রাহ্মসমাজ হইবেক।

শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

১৪ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার কালনা ব্রাহ্মসমাজের দ্বাদশ সাম্বৎসরিক মহোৎসব উপলক্ষে প্রাতঃকালে ৭॥ ঘটিকা ও সায়াহ্নে ৭ ঘটিকার সময় উপাসনা প্রভৃতি কার্য্য সকল আরম্ভ হইবে। ধর্ম্মানুরাগী মহানুভবগণ ইহাতে যোগ দিয়া সমাজের উন্নতি সাধন ও সভ্যদিগের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া যার পর নাই বাধিত করিবেন।

আগামী ৩০ কার্ত্তিক শনিবার বেহালা ব্রাহ্মসমাজের ষড়বিংশ সাম্বৎসরিক উৎসবে অপরাহ্ণ তিন ঘণ্টার পরে ব্রাহ্মধর্ম্মের পারায়ণ হইবে এবং সন্ধ্যা ৭ ঘণ্টার সময়ে ব্রহ্মোপাসনা হইবেক।

উল্লিখিত উৎসব উপলক্ষে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার উদ্দেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম সংক্রান্ত কতকগুলি পুস্তক অর্দ্ধমূল্যে বিক্রীত হইবে।

শ্রীশ্রীরাম চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক।

Who is Christ? A Reply to Keshub chunder Sen. A Sermon by Revd Charles Voysey. Price one anna. Postage ½ anna.

আয় ব্যয়

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫০।

ভাদ্র।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	... ...	৩০১/০
পূর্ব্বকার স্থিত	...	৩৪৩॥৵১৫
সমষ্টি	... ...	৬৪৪॥৶১৫
ব্যয়	... ...	২৮০
স্থিত	... ...	৩৬৪॥৶১৫

আয়

ব্রাহ্মসমাজ	৪১॥৶১০
দান প্রাপ্ত।	
শ্রীযুক্ত নীলকমল মুখোপাধ্যায়	১০
„ হরিমোহন রায়	১০
„ ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	„
„ তারিণীকান্ত ভট্টাচার্য্য	১
„ বৈকুণ্ঠচন্দ্র সেন	১
	২৬
দানাধারে প্রাপ্ত	৬।১০
সঙ্গীতের কাগজ বিক্রয়	১৸/০
মান্দ্রাজ ব্রাহ্ম সমাজ হইতে প্রেরিত	
পুস্তকের মাশুল আদায়	/০
পুরাতন ইষ্টক বিক্রয়	৭॥/০
	৪১॥৶১০

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৭২॥৶১০
পুস্তকালয়	...	৩১ (১০
যন্ত্রালয়	...	১২০
গচ্ছিত	...	৩৫ ॥/১০
সমষ্টি		৩০১ /০

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	... ...	৭৮ (১০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা..	...	৯৯৸৶১৫
পুস্তকালয়	... ...	২৪॥৵১৫
যন্ত্রালয়	... ...	৬৭ ৵০
গচ্ছিত	... ...	১০ ৶০
সমষ্টি		২৮০

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

Registerd NO 52.

দশম কল্প

প্রথম ভাগ

৪৩৬ সংখ্যা

অগ্রহায়ণ ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫০

শক ১৮০১

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ब्रह्मवा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम् सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयसर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्य साधनञ्च तदुपासनमेव।

অন্তরিন্দ্রিয়-সংযম।

অন্তরিন্দ্রিয় সকল সংযত ও বশীভূত না হইলে কোন রূপেই ব্রহ্মসাধনে প্রবৃত্তি জন্মে না। শরীর অসুস্থ থাকিলে যেমন ভোজ্য বস্তুর প্রকৃত স্বাদ গ্রহে সমর্থ হওয়া যায় না, তেমনি পাপ-বিকারে মন বিকৃত হইলে, ব্রহ্মামৃতপানেও তাহার ইচ্ছা ও অভিরুচি উপস্থিত হয় না। অতএব সর্ব্ব-প্রযত্নে অন্তরিন্দ্রিয় সকলকে বশীভূত করি-বার চেষ্টা করিবে।

পাপের মূল অন্তরেই। অন্তর হই-তেই পাপ-স্পৃহা উদ্দীপ্ত হয়, পরে তাহা বাক্যে ও কার্য্যে প্রকাশ পায়। পাপ-প্রবৃত্তি সকল দমন করিতে পারিলে, এককালে পাপ-স্রোত অবরুদ্ধ হইয়া যায়। সুতরাং হৃদয় মন আত্মা নির্ম্মল ও নিষ্পাপ হইয়া ঈশ্বরের প্রিয় সিংহাসন হইয়া উঠে। সর্ব্ব-প্রযত্নে পাপচিন্তা পাপালাপ, পাপানুষ্ঠান হইতে বিরত থাকিবে। কদাচ যৎসামান্য পাপ-স্ফুলিঙ্গকে হৃদয়ে স্থান দান করিবে না। যে, সর্প-শিশুকে পোষণ করে, কালেতে ঐ সর্পশিশু যেমন পরিপুষ্ট হইয়া আবার তাহাকেই দংশন করত বিনষ্ট করিয়া থাকে, তেমনি যে যৎসামান্য পাপকে প্রশ্রয় দেয়, সেই পাপাগ্নি ক্রমে প্রজ্বলিত হইয়া তাহার দেহ মন আত্মাকে দগ্ধ করে। অতএব সামান্য পাপকেও লঘু মনে করিবে না। যখনই পাপচিন্তা হৃদয়ে উপস্থিত হইবে, অমনি সাধু-সঙ্গ দ্বারা, সারগর্ভ ভগবৎ-প্রেম-পূর্ণ গ্রন্থ পাঠ দ্বারা এবং ঈশ্বরের সন্নিকর্ষ উপলব্ধি দ্বারা তাহাকে দমন করিবে। অসৎ সঙ্গে, অসৎ গ্রন্থ পাঠে, অসৎ বিষয়ের দর্শন ও আলোচনায় পাপপ্রবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠে। এই কারণে তৎসমূহ হইতে দূরে অবস্থিতি করিবে। কদাচ এমন মনে করিবে না, যে এক দিন না হয়, এক ঘণ্টা কালের জন্য পাপইচ্ছা চরিতার্থ করি, পরে তাহা হইতে এককালে নিবৃত্ত হইব। বিষ-পান করিলে যেমন শরীর ক্রমে অবসন্ন হয়, তেমনি পাপ-গরল একবার অন্তর-প্রবিষ্ট হইলে মনুষ্যের প্রকৃতিকে অন্তঃসারশূন্য করিয়া ফেলে। রুচি-প্রবৃত্তিকে একেবারে পরিবর্ত্তিত করিয়া দেয়। পাপের এমনই মোহিনী শক্তি, বিষয়-সুখ, ইন্দ্রিয়-সুখের এ প্রকার দুর্ব্বৃত্তি-

ক্রমণীয় আকর্ষণ ও প্রলোভন যে একবার তাহারদের কুহকে নিপতিত হইলে, মনুষ্য যতই কেন জ্ঞান-সম্পন্ন হউক না, তাহাকে এককালে ধর্ম্ম-পথ-ভ্রষ্ট করিয়া দেয়। তাহাকে পাপ হইতে পাপান্তরে এমনই নিঃশব্দে লইয়া যায়, যে সে তাহা অনুভবই করিতে পারে না। অতএব অত্যল্প দুশ্চিন্তা, দুঃসঙ্গ ও পাপানুষ্ঠান হইতে বিরত হইবে। "কাম্য বস্তুর উপভোগ দ্বারা কদাচ কামনার নিবৃত্তি হয় না, প্রত্যুত ঘৃত-প্রাপ্ত অগ্নির ন্যায় আরো বৃদ্ধি হইতে থাকে।

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥

ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া ইন্দ্রিয়-সংযমে যত্নশীল থাকিবে।

দুষ্ট অশ্ব যেমন সারথিকে কুপথে লইয়া যায়, তেমনি অবশীভূত দুর্দ্দম্য ইন্দ্রিয়-সকল আত্মাকে পাপহ্রদে নিঃক্ষেপ করে। এ জন্য প্রাণপণযত্নে ইন্দ্রিয়-দমনে নিযুক্ত থাকিবে। কাম-ক্রোধ, লোভ-মোহ প্রভৃতি রিপুগণই শারীরিক মানসিক এবং বাচনিক পাপের মূল কারণ। ইহারদিগকে সংযত ও বশীভূত করিয়া রাখিতে পারিলেই কায়, মন, বাক্য তিনই শুদ্ধসত্ত্ব পবিত্র থাকে, সুতরাং আত্মা নির্ম্মল ও নিষ্পাপ হইয়া ঈশ্বরের ধ্যান-ধারণার উপযুক্ত হয়।

ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্ব, বিষয়-সুখের অনিত্যত্ব এবং আত্মার অমরত্ব চিন্তনই অন্তরিন্দ্রিয়-দমনের প্রধান উপায়। ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বাশ্রয় ও সর্ব্বাচ্ছাদক, তিনি পাপের শাস্তা, পুণ্যের পুরস্কর্ত্তা; তিনি আমার অন্তরে বাহিরে বিরাজিত রহিয়াছেন এইটী সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ প্রতীতি করিতে পারিলে আপনা হইতেই রিপু সকল শান্ত সংযত হইয়া পড়ে। পিতা মাতাকে নিকটস্থ দেখিলে, গুরু জনকে সম্মুখে সন্দর্শন করিলে, রাজার দৃষ্টিকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতে পারিলে, লোকে যেমন সহসা পাপালাপ, পাপকার্য্য হইতে বিরত হয়, তেমনই সেই পিতার পিতা, মাতার মাতা, গুরুর গুরু, রাজগণরাজা বিশ্ব-ভুবন-পরিপালক সর্ব্বদর্শী সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরের উজ্জ্বলতর দৃষ্টি অন্তরে বাহিরে দেদীপ্যমান উপলব্ধি করিতে পারিলে আর কি মন কুচিন্তায় ধাবিত হয়? আর কি রসনা কুকথা উচ্চারণ করিতে সাহসী হয়? আর কি শরীর কু-কার্য্য করিতে নিযুক্ত হইতে পারে? আপনা হইতে সকলই সাম্যভাব প্রাপ্ত হয়। তৎকালে সাধক কায়-মনোবাক্যে সেই পিতৃ-আজ্ঞা, মাতৃ-আদেশ, গুরু-উপদেশ, রাজ-লক্ষ্য সংসাধনের জন্য শশব্যস্ত হইয়া উঠে। এই ধর্ম্ম-উপদেশ সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে

"একোঽহমস্মীত্যাত্মানং যত্ত্বং কল্যাণ মন্যসে।
নিত্যং স্থিতস্তে হৃদ্যেষ পুণ্যপাপেক্ষিতা মুনিঃ॥"

"হে ভদ্র! আমি একাকী আছি, এই যে তুমি মনে করিতেছ, ইহা মনে করিবে না, সেই পুণ্যপাপদর্শী সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ তোমার হৃদয়ে নিত্য স্থিতি করিতেছেন।"

বিষয়ের অনিত্যতা চিন্তন দ্বারা অনিত্য পদার্থে অসঙ্গত অনুরাগ ক্রমে মন্দীভূত হইয়া পড়ে, নিত্য বস্তুর প্রতি প্রীতি উদ্দীপ্ত হয়। ইন্দ্রিয়-সুখের অসারত্ব ও লঘুত্ব হৃদয়ে প্রতিভাত হইলে, ধর্ম্ম-জনিত আনন্দ ও আত্ম-প্রসাদ-উপভোগ-স্পৃহা প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। তদ্দ্বারা বিষয়-বিরাগ ও ধর্ম্মানুরাগ বর্দ্ধিত হয়। বিষয়-পাশের দৃঢ় বন্ধন ক্রমে শিথিল হইলে আত্মা তখন পিঞ্জর-মুক্ত বিহঙ্গের ন্যায় অনন্ত উন্নতির পথে ধাবিত হইবার চেষ্টা করিতে থাকে। সূর্য্যোদয়ে যখন রজনীর

অন্ধকার তিরোহিত হয়, তখন যেমন সকল বস্তুই আপনাপন স্বভাব প্রকৃতিতেই প্রকাশ পায়, তেমনই যখন ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্ব, বিষয়-সুখের অসারত্ব এবং আত্মার অমরত্ব একবার স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হয়, তখন সংসারের ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার আর আত্মাকে মুগ্ধ করিতে পারে না। তখন আত্মা মোহ-অন্ধকার-মুক্ত হইয়া, সকল বস্তুর প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে পারে। তখন তাহার সৎপদার্থে অনুরাগ, অসতেতে বিরাগ, অন্ধকারে বিতৃষ্ণা, জ্যোতিতে সমাদর; মৃত-পদার্থে অনভিরুচি, অমৃতেই তাহার রুচি প্রবৃত্তি, রতি-মতি উপস্থিত হয়।

আত্মা পৃথিবীর চিরনিবাসী নহে, ইহা যদি সাধকের একবার দৃঢ়তর রূপে হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়, তাহা হইলে সহজেই অবৈধ বিষয়-সেবাতে তাহার অনিচ্ছা হইয়া থাকে। অসঙ্গত ইন্দ্রিয়-সুখ-ভোগে তাহার আর প্রবৃত্তি হয় না। যাহা আত্মার চির-সম্বল, আত্মার চিরসঙ্গী, আত্মার অনন্ত-কাল-উপভোগ্য, সেই চিরন্তন ধর্ম্ম, সেই নিত্য-সেব্য ঈশ্বরের প্রতিই তখন তাহার দৃষ্টি নিপতিত হয়। সেই অমৃত ধন উপার্জ্জন করিবার জন্যই তখন সে লালায়িত হইয়া উঠে। তখন সেই সাধক কায়মনোবাক্যে অনন্ত কালের সম্বল আহরণেই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। অতএব ধর্ম্মজিজ্ঞাসু, ঈশ্বর-পিপাসু ব্যক্তি সর্ব্বদা আত্ম-প্রকৃতি-চিন্তায় এবং আত্মার অধিকার আলোচনায় নিযুক্ত থাকিবে।

অনেকে অন্তরিন্দ্রিয় সংযমকেই জীবনের সার কার্য্য মনে করিয়া থাকেন, চরিত্রকে বিশুদ্ধ করাই পুরুষত্বসম্পাদনের পরাকাষ্ঠা বিবেচনা করেন। ব্রহ্মসাধনের উচ্চতর অঙ্গের প্রতি, আত্মার উন্নতিশীল প্রকৃতির প্রতি, পরলোক ব্রহ্মলোকের প্রতি তাঁহারা দৃষ্টিপাত করেন না বলিয়াই চরিত্রশোধন পর্য্যন্ত সমাপন করিয়াই নিরস্ত হন। কিন্তু যাঁহারদের ধর্ম্মের প্রতি—ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি নিপতিত হয় এবং যাঁহারা তাঁহার সহিত জ্ঞান-ধর্ম্ম-সমন্বিত উন্নতিশীল অমর আত্মার অকাট্য নৈকট্য সম্বন্ধ বিশেষ রূপে উপলব্ধি করিতে পারেন, তাঁহারদের চক্ষে ব্রহ্ম-দর্শনের আরো উচ্চতর অঙ্গ সকল সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। তাঁহারা ব্রহ্ম-নিকেতনের দ্বার-দেশে দণ্ডায়মান হইয়া যৎকিঞ্চিৎ সুখ-শান্তি উপভোগ করত পরিতৃপ্ত হইতে পারেন না। তাঁহারা এই অবস্থাতেই ব্রহ্মদর্শন-লাভের জন্য যার পর নাই ব্যাকুল হইয়া আরো উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিবার নিমিত্ত যত্ন চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়েন। পবিত্র হৃদয়াসন বিস্তার করিয়া হৃদয়নাথকে তাহাতে আসীন করাইবার জন্য প্রার্থনা করেন।

যাঁহারা প্রকৃতির দৃষ্টান্তেই চালিত হন, যাঁহারা আত্মার উচ্চ প্রকৃতিকে, উদ্ভিদ্ পশু-প্রকৃতির তুল্য বিবেচনা করেন, সংসারেই তাঁহারদের আশা-ভরসা, সুখ উন্নতি সকলই বদ্ধ হইয়া পড়ে। তাঁহারা সাংসারিক ও সামাজিক সুখ-সচ্ছন্দতার জন্যই চরিত্রকে বিশুদ্ধ করিতে যত্নশীল হইয়া থাকেন। লোকে অসচ্চরিত্র হইলে পাছে মনুষ্য-সমাজের সম্পদ সৌভাগ্যের ব্যাঘাত হয়, পাছে পরস্পরের স্বার্থ-বিলোপ-জনিত দ্বন্দ্ব-কলহ উপস্থিত হইয়া লোক-যাত্রার বিশৃঙ্খলা সংঘটিত হয়, ব্যষ্টি বা সমষ্টিগত ইন্দ্রিয়-ব্যভিচার দ্বারা পাছে জনসমাজ উৎসন্ন হয়, এই আশঙ্কাতেই তাঁহারা অসৎ প্রবৃত্তি-দমনে এবং সৎপ্রবৃত্তির উৎকর্ষ-সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। সম্পদ-লাভই তাঁহারদের লক্ষ্য, সুখ-ভোগই তাঁহারদের উদ্দেশ্য

র্থ-রক্ষাই তাঁহারদের শিক্ষা গুরু, বৈষয়িক সচ্ছন্দতা-লাভের ইচ্ছাই তাঁহারদের ইন্দ্রিয়-সংযমের একমাত্র প্রবর্ত্তক। কাম ক্রোধ, লোভ-ঈর্ষা প্রভৃতি নীচ-প্রবৃত্তি সকল সংযত না করিলে যদি তাঁহারদের সাংসারিক সুখের ব্যাঘাত না হইত, তাহা হইলে হয় তো তাঁহারা তাহাদিগকে বশীভূত করিতে যত্নবান হইতেন না। যে অবস্থায় কোন নীচ-প্রবৃত্তি শিথিল হইলে আপনার বা অন্যের কোনরূপ বিশেষ সুখহানি হয় না, সে অবস্থায় হয় তো তাঁহারা তৎসংযমে দৃঢ়ব্রত হয়েন না। কিন্তু ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসু ঈশ্বর-পিপাসু সাধকের লক্ষ্য অন্য প্রকার। ব্রহ্ম-লাভই তাঁহার উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই ইন্দ্রিয়সংযমে, চরিত্রশোধনে তিনি প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। তদ্দ্বারা তাঁহার সহস্রবিধ বিষয়-সুখ ও ইন্দ্রিয়-সুখ-ভোগের ব্যাঘাত ঘটিলেও তৎপ্রতি তিনি ভ্রূক্ষেপ করেন না। বিবিধরূপে তাঁহার স্বার্থহানি হইলেও তাহাতে তিনি কাতর বা কুণ্ঠিত হয়েন না। তিনি ধর্ম্মের আদেশে ঈশ্বরের আদেশেই পরিচালিত হইয়া থাকেন। ঈশ্বরই তাঁহার জ্ঞান-প্রেম, সত্য-মঙ্গল, শান্ত ও পবিত্র ভাবের অভ্রান্ত আদর্শ। আপনাকে সেই অনুপম আদর্শের সন্নিহিত করাই, তাঁহার সকল সাধন সংযমের একমাত্র তাৎপর্য্য। তাঁহার আশা, ভরসা; সকলই সেই পরব্রহ্মে সংস্থিত রহিয়াছে। তাঁহার যাহা কিছু ব্রত-কর্ম্ম, জ্ঞান-ধর্ম্ম, সকলই সেই ঈশ্বরের জন্য। স্বার্থের জন্য তাঁহার কিছুই নহে। তিনি আত্মাকে ঈশ্বরের প্রিয় সিংহাসন করিয়া তুলিবার নিমিত্ত সাধন-তপস্যা-বলে তাহার অপকর্ষ-ভাব বিদূরিত করত উৎকর্ষ সাধনেই যত্নশীল হয়েন। তিনি সংসারের নীচ লক্ষ্য ক্ষুদ্র দৃষ্টি পরিত্যাগ করিয়া পরলোক ব্রহ্মলোকের জন্যই আপনাকে প্রস্তুত করিতে থাকেন। তিনি এককালে ইন্দ্রিয়-নিরোধ না করিয়া ঈশ্বরের আদেশে বৈধ ব্যবহার দ্বারা তাহাদিগকে বশীভূত করেন। কোনরূপে রিপুকুল-কুহকে, সংসার-প্রলোভনে কদাচ আসক্ত বা অভিভূত হয়েন না। তাঁহার লক্ষ্য উচ্চতর, তাঁহার আশা উন্নততম। ধর্ম্মই তাঁহার নেতা, ঈশ্বরই তাঁহার উপদেষ্টা।

তিনি চরিত্রসংশোধন দ্বারা কেবল ভূমি-কর্ষণ করিয়াই নিশ্চিন্ত হয়েন না, ইন্দ্রিয়-সংযম-জনিত আত্মাকে নির্ম্মল ও নিষ্পাপ করাকেই পরম-পুরুষার্থ জ্ঞান করেন না। তিনি সুদক্ষ কৃষকের ন্যায় সেই কণ্টক-শূন্য কর্ষিত চিত্ত-ক্ষেত্রে ব্রহ্মজ্ঞান-রূপ অমৃত-বীজকে অঙ্কুরিত এবং পুষ্প-ফলে সুশোভিত করিবার জন্যই অহর্নিশি প্রাণ-পণে চেষ্টা করিতে থাকেন। তিনি সেই পবিত্র আত্ম-নিকেতনে আত্মার অধিপতিকে প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্তই যত্নশীল হয়েন। নির্ম্মল আত্ম-দর্পণে সেই সত্য-সুন্দর মঙ্গল-স্বরূপের প্রতিবিম্ব সন্দর্শন করিবার জন্যই সস্পৃহ জ্ঞান-নেত্রে দৃষ্টি করিতে থাকেন। তিনি শান্ত-দান্ত, উপরত তিতিক্ষু সমাহিত হইয়া সেই আত্ম-রূপ উজ্জ্বল শ্রেষ্ঠ-কোষ মধ্যে বিশ্ব-ভুবন-পরিপালক পরমেশ্বরকে বিরাজিত দেখিতেই সমুৎসুক হয়েন

লক্ষ্য-শূন্য হইয়া অন্যের দর্শন-সুখের জন্য কেবল ভূমি-কর্ষণ করিলে যেমন ফল-শস্য প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তেমনি উচ্চতর মহত্তর উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করিয়া কেবল আত্ম-সুখের জন্য অথবা সামাজিক সুখ সচ্ছন্দতা বর্দ্ধনের নিমিত্ত ইন্দ্রিয়সংযমে প্রবৃত্ত হইলে ধর্ম্ম লাভ ঈশ্বর লাভ—এবং অমৃত লাভেরও সম্ভাবনা থাকে না। যদি চরিত্রকে কেবল নির্ম্মল ও নিষ্পাপ করাই মনুষ্য-জীবনের সার কার্য্য হয়, তাহা হইলে

নির্দ্দোষ পশু বা নিষ্কলঙ্ক শিশুরা তো বিনা যত্ন চেষ্টায় নিষ্পাপ অবস্থাতেই অবস্থান করে? তাহা হইলে ব্রত-পরায়ণ মনুষ্য অপেক্ষা তো ব্রতহীন পশু ও শিশুগণকে উচ্চপদস্থ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়? নির্দ্দোষ আহারই যদি কেবল মনুষ্যের প্রধান সাধন-কার্য্য হয়, তাহা হইলে ফল-মূল-শস্য-ভোজী অথবা দুগ্ধপায়ী জীব জন্তুকেই তো মহাতপস্বী বলা যাইতে পারে? যদি কেবল স্নান দ্বারাই মনুষ্য শুচি ও শুদ্ধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে জলজন্তু সকলই তো মহা-তপস্যায় অহর্নিশি নিযুক্ত রহিয়াছে বলিতে হইবে।। লক্ষ্যহীন কার্য্য কার্য্যই নহে। মনুষ্য ব্রহ্মলাভরূপ পরম লক্ষ্য পরিত্যাগ করিয়া যে কোন কার্য্যই করুক, তাহা ধর্ম্ম্য কার্য্য শব্দের বাচ্য হইতে পারে না। পরম লক্ষ্য বিহীন হইয়া মনুষ্য চরিত্রশোধনে—ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ-বিষয়ে যতই কেন যত্ন চেষ্টা করুক না, সে তপস্যায় সে নিষ্পাপই হইতে পারে কিন্তু তদ্দ্বারা তাহার ব্রহ্মলাভ হয় না; মোক্ষলাভেরও প্রত্যাশা থাকে না।

"তপসা কিল্বিষং হন্তি, বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে।"

তপস্যা দ্বারা নিষ্পাপই হওয়া যায়, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারাই অমৃত লাভ হইয়া থাকে। অতএব সর্ব্ব-প্রযত্নে অন্তরিন্দ্রিয় সকল সংযত করিয়া শুদ্ধসত্ত্ব পবিত্র হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভের চেষ্টা করিবে। সেই ব্রহ্মজ্ঞানকেই যিনি আপনার যন্ত্রী মন্ত্রী, নেতা নিয়ন্তা করিয়া, ব্রহ্মপ্রাপ্তির জন্যই ইন্দ্রিয়নিগ্রহে, মনঃসংযমে নিযুক্ত হয়েন, তিনিই সেই পরব্রহ্মের পরম স্থান প্রাপ্ত হয়েন।

"বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্।"

"বিজ্ঞান যাঁহার সারথি ও মনোরূপ রজ্জু যাঁহার বশীভূত, তিনি সংসার-পার সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্মের পরম স্থান প্রাপ্ত হয়েন।"

আবেস্তা।

(৪৩৩ সংখ্যক পত্রিকার ৮৮ পৃষ্ঠার পর)

নবম অধ্যায়ে, মৃত-শরীর-স্পর্শ-জনিত অশুচিত্ব দূর করিবার জন্য কি প্রকারে "বরষনম্ না শাবে" নামক প্রায়শ্চিত্ত সম্পন্ন করিতে হইবে, "বরষনম্" প্রায়শ্চিত্ত-সম্পাদন-সহায় পুরোহিতকে কি প্রকার পুরস্কার দিতে হইবে, এবং মৃত শরীর স্পর্শ করিয়া যে ব্যক্তি 'বরষনম্' প্রায়শ্চিত্ত সম্পন্ন না করে সে ব্যক্তি কতদূর অপরাধী ও দোষী, এই কয়েকটি বিষয় বিবৃত হইয়াছে। 'বরষনম্ না শাবে' একটি অদ্ভুত প্রায়শ্চিত্ত। ইহা নিম্ন-লিখিতরূপে সম্পন্ন করিতে হয়। যে ব্যক্তি মৃত শরীর স্পর্শ করিয়া অশুচি হইয়াছেন তিনি সত্য-বাদী ও আবেস্তাধ্যায়ী একজন পুরোহিত আনয়ন করিবেন। ঐ পুরোহিত অষ্টাদশ-হস্ত-পরিমিত চারি খণ্ড কাষ্ঠ স্বহস্তে বৃক্ষ হইতে ছেদন করিয়া বৃক্ষতৃণাদিশূন্য একখণ্ড শুষ্ক ভূমি ঐ চারি খণ্ড কাষ্ঠ দ্বারা বেষ্টন করিবেন এবং উহাতে নয়টি গর্ত্ত খনন করিবেন। পরে তিনি অশুচি ব্যক্তিকে ঐ স্থানে আনয়ন করিয়া তাঁহাকে কতকগুলি মন্ত্র উচ্চারণ করাইবেন। তৎপরে একটি যষ্টিতে গোমূত্র-পরিপূর্ণ একটি লৌহপাত্র লম্বমান করিয়া ঐ যষ্টি স্বহস্তে ধারণ করিয়া থাকিবেন; এবং ঐ পাত্র হইতে গোমূত্র গ্রহণ করিয়া অশুচি ব্যক্তির হস্ত ধৌত করিয়া দিবেন। পরে তাহার মস্তক, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, হস্ত, বক্ষঃস্থল, উদর, পদ প্রভৃতি সমুদায় অঙ্গে গোমূত্র ছড়াইয়া দিবেন। পরে তিনি অশুচি ব্যক্তিকে ক্রমশঃ

একটি গর্ত্ত হইতে আর একটি গর্ত্তে লইয়া যাইবেন এবং প্রত্যেক গর্ত্তের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে মন্ত্র উচ্চারণ করাইবেন। এইরূপে ষষ্ঠ গর্ত্তে উপস্থিত হইলে অশুচি ব্যক্তি তন্মধ্যে উপবিষ্ট হইবেন এবং ঐ গর্ত্তের মধ্য হইতে ধূলি ও কর্দ্দম গ্রহণ করিয়া স্বীয় গাত্রে লেপন করিবেন। পরে উহা শুষ্ক হইলে তিনি সপ্তম গর্ত্তে গমন করিয়া একবার, অষ্টম গর্ত্তে গমন করিয়া দুইবার, এবং নবম গর্ত্তে গমন করিয়া তিন বার পরিষ্কার জলে স্বীয় গাত্র ধৌত করিবেন এবং তৎপরে নূতন বস্ত্র পরিধান করিয়া গৃহে গমন করিবেন। গৃহে গমন করিয়া তিনি অহুরমজদ-প্রবর্ত্তিত নিয়মে নিষ্ঠাবান অন্যান্য ব্যক্তিগণ হইতে বিভিন্ন হইয়া তিন রাত্রি নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক উপবেশন করিয়া থাকিবেন। তৎপরে চতুর্থ দিবসে গোমূত্র ও পরিষ্কার জলে স্নান করিবেন। ইহার পর পুনরায় ঐ প্রকারে ছয় রাত্রি অতিবাহিত করিয়া সপ্তম দিবসে গোমূত্র ও পরিষ্কার জলে স্নান করিবেন। পরে পুনরায় ঐ প্রকারে নয় রাত্রি অতিবাহিত করিয়া দশম দিবসে গোমূত্র ও পরিষ্কার জলে স্নান করিলে তাঁহার অশুচিত্ব দূর হইবে এবং তিনি পূর্ব্ববৎ পবিত্র হইবেন। সামান্য সামান্য অশৌচ দূর করিবার জন্য পারসীকগণকে কি প্রকার কঠোর প্রায়শ্চিত্ত সম্পন্ন করিতে হয় তাহা 'বরষনম্ না শাবে' প্রায়শ্চিত্তের বৃত্তান্ত পাঠ করিলে সম্যক উপলব্ধি করা যায়। অশুচি ব্যক্তির এই প্রায়শ্চিত্ত-সম্পাদন-সহায় পুরোহিতকে স্বীয় অবস্থানুসারে পুরস্কার দিতে হয়। তিনি যদি ভূস্বামী হয়েন তাহা হইলে একটি বৃহৎ উষ্ট্র, তিনি যদি গৃহস্থ হয়েন তাহা হইলে একটি গাভী, তিনি যদি একটি বৃহৎ জাতির অধিপতি হয়েন তাহা হইলে একটি বৃহৎ ঘোটক, তিনি যদি একটি ক্ষুদ্র জাতির প্রধান হয়েন তাহা হইলে একটি বৃষ এবং তিনি যদি বালক হয়েন তাহা হইলে একটি ক্ষুদ্র পশু পুরস্কার পাইবেন। যে ব্যক্তি মৃত শরীর স্পর্শ করিয়া 'বরষনম্' প্রায়শ্চিত্ত সম্পন্ন না করে সে ব্যক্তি মহা অপরাধী ও দোষী বলিয়া বিবেচিত হয়। অহুরমজদ বলিয়াছেন সে ব্যক্তি আপনার রোগ ও মৃত্যু আনয়ন করে এবং সুখ, সন্তোষ ও সচ্ছন্দতা অপহরণ করিয়া থাকে; সূর্য্য চন্দ্র ও নক্ষত্রগণ অনিচ্ছার সহিত তাহার উপর আপনাদিগের বিমল কিরণ বর্ষণ করে, এবং অগ্নি, পৃথিবী, জল, বৃক্ষ, পবিত্র পুরুষ ও নির্ম্মলচরিত্রা রমণী সর্ব্বদাই তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকে।

দশম অধ্যায়ে দেবগণের অধিকার হইতে রক্ষা ও পরিত্রাণ পাইবার জন্য কতকগুলি প্রার্থনা বিবৃত হইয়াছে।

একাদশ অধ্যায়ে, গৃহ, অগ্নি, জল, পৃথিবী, পশু, বৃক্ষ, সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র প্রভৃতি বস্তু সকল অপবিত্র হইলে সেই সকল পবিত্র করিবার জন্য কয়েকটি প্রার্থনা বিবৃত হইয়াছে; কিন্তু কি কারণে ঐ সকল বস্তু অপবিত্র হয় তাহার উল্লেখ নাই। গৃহ, অগ্নি, জল, পৃথিবী, পশু, ও বৃক্ষ কি প্রকারে অপবিত্র হইতে পারে তাহা আমরা চিন্তা করিয়া স্থির করিতে পারি, কিন্তু কি হইলে সূর্য্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র অপবিত্র হইবে তাহা আমরা কল্পনাও করিয়া উঠিতে পারি না।

দ্বাদশ অধ্যায়ে, কোন আত্মীয় ব্যক্তি পরলোক গমন করিলে তাঁহার পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য কাহাকে কতবার প্রার্থনা করিতে হইবে এবং কি প্রকারে তাঁহার মৃত্যুজনিত গৃহের অশুচিত্ব দূর করিতে হইবে

তাহা বিবৃত হইয়াছে। পিতা পরলোক গমন করিলে পুত্র, এবং মাতা পরলোক গমন করিলে কন্যা তাঁহার পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য সর্ব্বস্রষ্টা অহুরমজদের নিকট ত্রিশবার প্রার্থনা করিবেন। পিতা ও মাতা যদি ধার্ম্মিক হয়েন তাহা হইলে ত্রিশবার প্রার্থনা করাই নিয়ম, আর যদি তাঁহারা পাপিষ্ঠ হয়েন তাহা হইলে ষাইটবার প্রার্থনা করিতে হয়। পিতা কিম্বা মাতা পরলোক গমন করিলে পুত্র কন্যাগণ তিনবার গাত্র ও বস্ত্র ধৌত এবং তিনবার গাথা উচ্চারণ করিয়া এবং পরিশেষে অগ্নির উপাসনা করিয়া আপনাদিগের গৃহের অশৌচ দূর করিবেন। এই রূপে পুত্র মরিলে তাহার পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য পিতা, কন্যা মরিলে মাতা, ভ্রাতা মরিলে ভ্রাতা, ভগিনী মরিলে ভগিনী, পিতামহ মরিলে পৌত্র, পিতামহী মরিলে পৌত্রী, পিতৃব্য মরিলে ভ্রাতুষ্পুত্র, এবং পিতৃব্যপত্নী মরিলে ভ্রাতুষ্পুত্রীকে কতবার প্রার্থনা করিতে হইবে, কতবার গাত্র ও বস্ত্র ধৌত, কতবার গাথা উচ্চারণ, এবং কতবার অগ্নির উপাসনা করিতে হইবে তাহা বিস্তারিত রূপে লিখিত হইয়াছে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে, কুক্কুরের প্রতি ব্যবহার, কুক্কুরের গুণ, কুক্কুর পালনের উপকারিত্ব এই কয়েকটি বিষয় বিবৃত হইয়াছে। পারসীকেরা বিশ্বাস করে যে কুক্কুরদিগের মনুষ্যের ন্যায় আত্মা আছে, এবং তাহারা মৃত্যুর পর স্বর্গস্থ কুক্কুরলোকে গমন করে। পারসীকেরা বিশ্বাস করে যে স্বর্গে গমন করিতে হইলে মানব আত্মাকে একটি সেতু পার হইয়া যাইতে হয়, আর সেই সেতু স্বর্গবাসী কুক্কুরেরা রক্ষা করে; এই জন্য কুক্কুরকে হত্যা করা দূরে থাকুক, কুক্কুরের উপযুক্ত সেবা না করা কিম্বা কোন প্রকারে তাহাকে কষ্ট দেওয়া পারসীকেরা একটি মহাপাপ বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে। কুক্কুরঘাতক ব্যক্তির পক্ষে পরলোক প্রবেশ করা অত্যন্ত কঠিন ও দুরূহ ব্যাপার, কারণ স্বর্গীয়-সেতু-রক্ষক কুক্কুরেরা তাহাকে ভয়ঙ্কর পাপী জ্ঞান করে এবং অত্যন্ত ঘৃণা করে। কুক্কুর ক্ষিপ্ত হইলেও পারসীকেরা তাহাকে হত্যা করে না এবং যাহাতে সে জলে পড়িয়া কিম্বা অন্য কোন প্রকারে আহত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত না হয় তজ্জন্য তাহাকে সযত্নে গৃহে বন্ধন করিয়া রাখে, এবং তাহাকে উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত আহার করিতে দেয়। যে স্থানে কোন ক্ষিপ্ত কুক্কুর কোন প্রকারে আহত হইয়া কুক্কুর-লোক প্রাপ্ত হয় সেই স্থানের সমস্ত লোক তাহার হত্যা-জনিত দোষে দোষী হইবে, জোরাস্তারের এইরূপ ব্যবস্থা। যৎকালে জোরাস্তার পারসীক ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করেন তখন পারসীকেরা নিতান্ত অসভ্য ছিল, পশুপালন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, এবং ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র শ্বাপদ পরিপূর্ণ পার্ব্বত্যপ্রদেশে বাস করিত। পশুরক্ষণে এবং হিংস্র পশু সকল তাড়নে কুক্কুরজাতি তাহাদিগের পক্ষে নিতান্ত উপকারী ছিল, বোধ হয় তজ্জন্যই জোরাস্তার পারসীকদিগকে কুক্কুরের প্রতি এইরূপ শ্রদ্ধা, ভক্তি প্রদর্শন করিতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। গোজাতি দ্বারা ভারতবর্ষনিবাসীদিগের নানা প্রকার উপকার সম্পাদিত হয় বলিয়া যেমন পুরাকালীন আর্য্যেরা গোজাতির প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন করিতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, তদ্রূপ জোরাস্তারের সময়ে পারসীকেরা কুক্কুর হইতে বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হইতেন বলিয়া তিনি পারসীকদিগকে কুক্কুর জাতির প্রতি শ্রদ্ধা

ভক্তি প্রদর্শন করিতে আজ্ঞা করিয়া গিয়াছেন।

ক্রমশঃ

শঙ্করাচার্য্যের জীবন-বৃত্তান্ত।

দিগ্বিজয়।

৪৩৫ সংখ্যক পত্রিকার ১৩২ পৃষ্ঠার পর।

শৃঙ্গপুরের অপর নাম শৃঙ্গগিরি, অধুনা সিংহারি। দ্বাদশ বৎসর এইস্থানে অবস্থান করিয়া এবং স্বশিষ্য সুরেশ্বরাচার্য্যকে বিদ্যা-পীঠের অধ্যক্ষ করিয়া শঙ্করাচার্য্য তথা হইতে নির্গত হইলেন। তিনি অহোবল নামক স্থানে নৃসিংহদেবোপাসকদিগকে অদ্বৈতমতাবলম্বী করিয়া বৈকল্যগিরিতে উপস্থিত হইলেন এবং সেস্থান হইতে কাঞ্চী নগরে প্রবেশ করিলেন। কাঞ্চী নগরে শিব ও বিষ্ণুর মন্দির ছিল। শঙ্করাচার্য্য ইহার নিকটে শিবকাঞ্চী এবং বিষ্ণুকাঞ্চী নামে দুই পত্তন স্থাপন করিলেন এবং অদ্বৈত মত প্রচার করিতে লাগিলেন। তৎপরে কাঞ্চীনগর ত্যাগ করিয়া বিদ্যাকা-মাক্ষী নাম্নী ব্রহ্মবিদ্যা রুদ্রশক্তির প্রতিষ্ঠা সাধন করিলেন। বিদ্যাকামাক্ষী উপাসক-বর্গের মোক্ষফলপ্রদা কল্পবল্লী এবং জ্ঞান-রূপিণী। এতদনন্তর শঙ্করাচার্য্য শ্রীচক্র রচনা করিলেন। শ্রীচক্র বৈদান্তিকদিগের উপাস্য। শ্রীচক্রপূজা দ্বারা মোক্ষসিদ্ধি হয়। শ্রীচক্রমধ্যে নয়টি চক্র আছে, ইহাদের প্রকার-বিশেষে সংস্থাপন দ্বারা হরগৌরীর মূর্ত্তি রচিত হয়।

"চতুর্ভিঃ শিবচক্রৈশ্চ শক্তিচক্রৈশ্চ পঞ্চভিঃ।
নবচক্রৈশ্চ সংসিদ্ধং শ্রীচক্রং শিবয়োর্ব্বপুঃ॥"

শিবচক্রচতুষ্টয়ের নাম বিন্দু, অষ্টদল-পদ্ম, ষোড়শদলপদ্ম ও চতুর্দ্দলপদ্ম। পঞ্চ-শক্তি চক্রের নাম ত্রিকোণ, অষ্টকোণ, দুইটি দশকোণ এবং চতুর্দ্দশকোণ। শক্তি ত্রি-কোণরূপিণী এবং শিব বিন্দুরূপ; বিন্দু এবং ত্রিকোণ নিত্যসম্বন্ধ, একটি আর এক-টির অভাবে থাকিতে পারে না, এই সম্বন্ধের নাম অবিনাভাব সম্বন্ধ। ত্রিকোণচক্রে বিন্দু, অষ্টকোণে অষ্টদলপদ্ম, দশকোণদ্বয়ে ষোড়শদলপদ্ম এবং চতুর্দ্দশকোণে চতুর্দ্দল পদ্ম সংশ্লিষ্ট আছে। শ্রীচক্র রচনা করি-বার প্রমাণশ্লোক যথা——

"ত্রিকোণমষ্টকোণঞ্চ দশকোণদ্বয়ং তথা।
চতুর্দ্দশারং চৈতানি শক্তিচক্রাণি পঞ্চ চ॥
বিন্দুশ্চাস্টদলং পদ্মং তথা ষোড়শপত্রকং।
চতুরস্রং চতুর্দ্ধারং শিবচক্রাণি তু ক্রমাৎ॥
ত্রিকোণবৈন্দবং শ্লিস্টমস্টারেঽস্টদলাম্বুজং।
দশারয়োঃ ষোড়শারং ভূগৃহং ভুবনাস্রকে।
শৈবানাং অপি শাক্তানাং চক্রানাং চ পরস্পরং।
অবিনাভাবসম্বন্ধং যো জানাতি স চক্রবিৎ॥
ত্রিকোণরূপিণী শক্তির্বিন্দুরূপঃ সদাশিবঃ।
অবিনাভাবসম্বন্ধং তস্মাৎ বিন্দুত্রিকোণয়োঃ॥
বিন্দুত্রিকোণবসুকোণদশারযুগ্মম্
অম্বস্রনাগদলসংযুতষোড়শারং।
বৃত্তত্রয়ঞ্চ ধরণীসদনত্রয়ঞ্চ
শ্রীচক্রমেতদুদিতং পরদেবতায়াঃ॥"

ইহার অর্থ উপরে উক্ত হইয়াছে। ভূগৃহ চতুর্দ্দলপদ্ম, ভুবনস্রক চতুর্দ্দশদলপদ্ম, বসুকোণ অষ্টকোণক্ষেত্র, চতুর্দ্দশার চতুর্দ্দশ-দলপদ্ম, নাগদল অষ্টদলপদ্ম, ধরণীসদন ভূগৃহ বৃত্তচক্র।

শ্রীচক্রনির্ম্মাণানন্তর তিনি ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ে শিষ্যদিগকে উপদেশ দিতে লাগি-লেন এবং মোক্ষমার্গ প্রকাশ করিলেন।

এই রূপে শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈত মত হিমাচল ও সেতুবন্ধের মধ্যস্থিত সর্ব্ব-স্থানে প্রচারিত হইল। কিন্তু অল্প কা-লের মধ্যে শঙ্কারাচার্য্য বুঝিতে পারিলেন যে লোকসাধারণ অদ্বৈত মত সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই এবং পুনর্ব্বার পৌত্তলিকতার আবির্ভাব হইতে

লাগিল। আচার্য্য শঙ্কিত হইলেন এবং কিরূপে অসৎ মতের গতিরোধ করিতে পারিবেন তাহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। অবশেষে পরমভক্তকালানল, লক্ষণ ও হস্তামলক, দিবাকর, ত্রিপুরকুমার, গিরিজাকুমার এবং বটুকনাথ প্রভৃতি নিজ শিষ্যদিগকে আহ্বান করিয়া শঙ্করাচার্য্য তাহাদিগকে অদ্বৈত মতের অবিরোধে শৈব মত, বৈষ্ণব মত, সৌর মত, শক্তি মত, গাণপত্য মত এবং কাপালিক মত সংস্থাপন ও প্রচার করিতে আদেশ দিলেন। এই সকল মত অদ্যাপি অদ্বৈত মতের সঙ্গে যুক্ত হইয়া আসিতেছে। এক্ষণে আর শুদ্ধ কোন মত দৃষ্ট হয় না, সকলেই অদ্বৈত মত অব্যাহত রাখিয়া স্বস্বমত প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে। নব্য স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি সর্ব্বত্রই অদ্বৈত মতের প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। শঙ্করাচার্য্য হিন্দুচিত্ত এরূপ অদ্বৈত-মত-প্রবণ করিয়া গিয়াছেন, যে অদ্যাপি হিন্দুগণ তাহা অনুভব করিতে পারিতেছেন। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এবং দাক্ষিণাত্যে শঙ্করাচার্য্যের প্রভাব বিস্তর; তথায় তিনি দেবতা, তাঁহার মত অভ্রান্ত। বঙ্গদেশে বৈদান্তিক মতের প্রচার অতি অল্প, সুতরাং শঙ্করাচার্য্যের প্রভাব ও আদর অতি অল্প। যে স্থানেই বেদান্তশাস্ত্রের অনুশীলন ও চর্চ্চা আছে, সে স্থানেই শঙ্করাচার্য্যের একাধিপত্য। কি আধুনিক সাংখ্য শাস্ত্র, কি আধুনিক মীমাংসা, কি আধুনিক পুরাণ সর্ব্বত্রই অদ্বৈত মতের মিশ্রণ এবং সংসৃষ্টি। কেবল বঙ্গদেশে ন্যায়শাস্ত্রই অদ্বৈত মতের সহিত সম্বন্ধ রাখে না।

এইরূপে অদ্বৈত-মত-মিশ্রিত অন্যান্য মত প্রচারিত হইলে পর শঙ্করাচার্য্যের জীবনী শক্তির হ্রাস হইতে লাগিল এবং তিনি স্থূল শরীর সূক্ষ্ম শরীরে অন্তর্হিত করিয়া সদ্রূপ হইলেন। তদনন্তর সূক্ষ্ম শরীর কারণ শরীরে বিলীন করিয়া চৈতন্যরূপ হইলেন। আনন্দগিরি বলেন তিনি অদ্যাপি চৈতন্যরূপে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার অলীক ও ক্ষণিক দেহত্যাগের পর শিষ্যগণ মহাসমারোহের সহিত অত্যন্ত শুচি প্রদেশে গর্ত্ত খনন পূর্ব্বক তাঁহার সমাধি করিল। কাঞ্চী নগরেই শঙ্করাচার্য্য এই ভৌতিক জগৎ ত্যাগ করেন। কোন কোন মতে তৎকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ৩২ বৎসর। আনন্দগিরিও বোধ হয় ইহাই বিশ্বাস করেন, কারণ বিজয়ানুসারে অষ্টম বর্ষে সমস্ত বিদ্যা শিক্ষা করিয়া তিনি দিগ্বিজয়ে বহির্গত হয়েন এবং ৫। ৬ বৎসর পরে বিদ্যাপীঠে দ্বাদশ বর্ষ যাপন করেন। অতঃপর স্বমত-প্রচারে ও নগর চক্রাদিনির্ম্মাণে ৫।৬ বৎসর অতীত হয়। ৫৩ প্রকরণে শঙ্করাচার্য্য ব্যাস ঋষিকে বলিতেছেন যে আমি আর ষোড়শ বর্ষ মাত্র বাঁচিব, তাহা হইলে আপনার অনুগ্রহ ব্যতীত অদ্বৈত মতের প্রচারসম্ভাবনা দেখি না। তদুত্তরে ব্যাস ব্রহ্মাকে শঙ্করের আয়ুর্বৃদ্ধ্যর্থ অনুনয় করিলে, ব্রহ্মা বলিলেন যে শঙ্কর যতদিন পৃথিবীতে থাকিতে ইচ্ছা করিবেন ততদিন থাকিতে পারিবেন। কিন্তু ব্যাস তাঁহাকে "জীব ত্বং শরদাং শতং" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। যদিই শঙ্করাচার্য্য ৩২ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ইহলোক ত্যাগ করিয়া থাকেন, তবু তাঁহার কার্য্যকলাপ অসম্ভব হইতে পারে না, তিনি অতিশয় বুদ্ধিমান ছিলেন, সুতরাং অল্প কাল মধ্যে অনেক কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। তিনি অসাধারণ লোক ছিলেন। তাঁহার প্রভাব ও কার্য্যসমূহ অলৌকিক।

শঙ্করাচার্য্যের জীবনবৃত্তান্ত সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হইল। পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থাবলী হইতে আমরা যতদূর পারিয়াছি সংকলন করিয়াছি, কিন্তু শঙ্করবিজয়ই প্রধান অবলম্বন। শঙ্কর-

দিগ্বিজয়ের সহিত ইহার অনেক স্থলে সংলগ্ন হইবে না, কারণ মাধবাচার্য্য কবি এবং শঙ্করের বহুকাল পরবর্ত্তী। মাধব অবতার-বৃত্তান্ত যেরূপ রঞ্জিত করিয়াছেন তাহা কাব্যের যোগ্য। শিব অবতীর্ণ হইবেন বলিয়া কার্ত্তিক কুমারিল স্বামী, ইন্দ্র সুধন্বানামে নৃপতি, বিষ্ণু সংকর্ষণ, অনন্ত নাগ পতঞ্জলি এবং ব্রহ্মা মণ্ডনমিশ্র ও সরস্বতী সরসবাণী রূপে অবতীর্ণ হইলেন। কেরলাখ্য প্রদেশে পূর্ণানদীতীরে বৃষাদ্রি নামক স্থলে বিদ্যা-নিবাস বলিয়া একজন অশেষশাস্ত্রকুশল পণ্ডিত ছিলেন। বিদ্যানিবাসের শিবগুরু নামে এক পুত্র জন্মে। শিবগুরু নানা বিদ্যাপারদর্শী হইলেন এবং ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক সমস্ত জীবন যাপন করিবেন স্থির করিলেন। কিন্তু স্বকীয় পিতা ও মাতার মনস্তুষ্টি সম্পাদনের নিমিত্ত অবশেষে বিবাহ করিতে বাধ্য হইলেন। কন্যা ও কন্যাযাত্রিরা বরের বাটীতে আগমন করিল এবং নির্ব্বিঘ্নে উদ্বাহক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়া গেল। এইরূপ নূতনপ্রকার বিবাহ অধুনা কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। শঙ্করাচার্য্য এই বিবাহের ফল। শিবগুরু অনেক যত্নেও সন্ন্যাসী হইতে পারিলেন না কিন্তু শঙ্করাচার্য্য সহজেই সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। মাধবাচার্য্য বাল্মীকির অনুকরণ করিয়া দেবগণের অবতার-বৃত্তান্ত লিখিলেন এবং গ্রন্থের কাব্য নাম সার্থক করিলেন। আনন্দগিরি শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য, মাধবাচার্য্য অন্ততঃ ৫০০ বৎসর পরকালীন। সুতরাং মাধবাচার্য্য অপেক্ষা আনন্দগিরির কথা আমাদিগের অধিক শ্রদ্ধেয়। আমরা আর একটি প্রস্তাবে দুই গ্রন্থের আর দুই একটি বৈষম্য প্রদর্শন এবং শঙ্করাচার্য্যের চরিত্র সমালোচনা করিব।

ক্রমশঃ

ধর্ম্মপুর ব্রাহ্মসমাজ সপ্তম সাম্বৎসরিক উৎসব।

২রা ভাদ্র রবিবার ১২৮৬ সাল।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্নের বক্তৃতা।

আহা আজি আমাদের কি আনন্দের দিন, আমরা এক বৎসর কাল যে দিন প্রাপ্তির আশা করিতেছিলাম অদ্য সেই শুভদিন সমাগত। আজ্ আমরা যে দিকে যে পদার্থে দৃষ্টিপাত করি, তাহাতেই যেন মঙ্গলময় পরম পিতা পরমেশ্বরের মঙ্গলভাব সকল সুস্পষ্ট দেখিতে পাই। এই প্রাভাতিক সুশীতল সমীরণ মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইয়া সেই মহিমার্ণব মহেশ্বরের অপার মহিমা প্রকাশ করিতেছে, দিবাকর স্বকীয় কিরণজাল বিস্তার পূর্ব্বক বিশ্বনিয়ন্তার আজ্ঞাপালন করিয়া তাঁহার অনন্ত শক্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে, মেঘমালা বারিবর্ষণ পুরঃসর ওষধি ও তরু লতাদির পুষ্টি সাধন পূর্ব্বক আমাদিগের জীবন ধারণের প্রধান অবলম্বন শস্য ও ফল মূলাদি উৎপাদন করিয়া করুণাময়ের অপার করুণার প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছে; এই উদ্যানস্থ মনোহর পুষ্পরাজি বিকসিত হইয়া জগৎপাতা জগদীশ্বরের পরম মনোজ্ঞ ভাব ব্যক্ত করিতেছে; সূর্য্যরশ্মি শিশিরবিন্দুতে ও নব পল্লবে পতিত হইয়া তাঁহারই শোভার প্রতিবিম্ব প্রকাশ করিতেছে; বিহঙ্গমগণ কলরব করিয়া সেই মহিমসাগরের অপার মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে; এই সমাগত ব্যক্তি মাত্রেরই মুখমণ্ডলে আনন্দস্বরূপের আনন্দভাব লক্ষিত হইতেছে, এই প্রকার নির্জীব সজীব যে কোন পদার্থের প্রতি নেত্রপাত করি, তাহাতেই যেন তাঁহার সত্তা স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। তিনি সর্ব্বকালে

সর্ব্বত্র সমভাবে বিদ্যমান, তিনি ঊর্দ্ধে অধোতে অন্তরে বাহিরে সম্মুখে পশ্চাতে সকল স্থানেই বর্ত্তমান, তিনি এই সমাজ-মন্দিরেও উপস্থিত থাকিয়া আমাদের হৃদ্গত ভাব সকল প্রত্যক্ষ করিতেছেন।

আমাদিগের পরম সৌভাগ্য যে আমরা এই পরাধীন দুর্বল অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছন্ন দেশের অধিবাসী হইয়াও উদার পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছি। এই পবিত্র ধর্ম্মের উপদেশানুসারে কার্য্য করা এবং ইহার বহুল প্রচার সম্বন্ধে আমাদের প্রাণগত চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। আমরা এমত উচ্চতম অধিকার প্রাপ্ত হইয়াও যদি ইহার প্রকৃত ব্যবহার না করি, তাহা হইলে আমাদিগের তুল্য হতভাগ্য আর নাই বলিতে হইবে। পৃথিবীতে যে সকল দেশ জ্ঞান ও সভ্যতায় শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত সে সকল দেশেও এমত উচ্চতম ধর্ম্ম দুর্লভ রহিয়াছে। দয়াময় পরম পিতা এই দুর্বল সন্তানগণের প্রতি কৃপা করিয়াই এই শ্রেষ্ঠতম অধিকার প্রদান করিয়াছেন। এ সময়ে এই পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম এ দেশে প্রয়োজন বলিয়াই সর্ব্বজ্ঞ পরম কারুনিক পরমেশ্বর সেই অভাব দূর করিয়াছেন। যত দিন এদেশে বিজ্ঞান, পদার্থতত্ত্ব প্রভৃতির আলোচনা ছিল না তত দিন উপধর্ম্মে সকলেরই আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল। অধুনা যে পরিমাণে জ্ঞানালোচনা হইতেছে, সেই পরিমাণে উপধর্ম্মের প্রতি লোকের অনাস্থা জন্মিতেছে, কি প্রৌঢ় কি নব্য কোন লোকের মধ্যে উপধর্ম্মের প্রতি আর বিশেষ আস্থা দেখিতে পাওয়া যায় না। যে কয়েক জন প্রাচীন ব্যক্তি উপধর্ম্মে বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের অনুষ্ঠানাদি প্রায় প্রণালীবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। ধর্ম্ম দ্বারা শরীর, মন ও আত্মা পবিত্র হয়, জনসমাজের কল্যাণ সাধিত হয় এবং পৃথিবী স্বর্গতুল্য সুখধাম হয়, ইহা প্রণালীবদ্ধ ধর্ম্মে কখনই সম্ভবে না। শরীর, মন ও আত্মা পাপে পরিপূর্ণ হউক, পরিবার মধ্যে পাপের স্রোত প্রবাহিত হউক তাহাতে কিছুমাত্র হানি নাই, প্রণালী রক্ষা করিতে পারিলেই ধর্ম্ম রক্ষা হইল, এই বিশ্বাস গুরুতর অনিষ্টকর। মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, ব্যভিচার, পরপীড়ন, পরস্বাপহরণ প্রভৃতি মহাপাপে জনসমাজ অধোগতি প্রাপ্ত হইতেছে; তথাপি প্রণালীবদ্ধ ধর্ম্ম তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করে না ইহা কি অল্প আক্ষেপের বিষয় নহে।

এই পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের বহুল প্রচারের পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় শিক্ষিত যুবকগণ, প্রায় খৃষ্টধর্ম্মেই আস্থাবান হইতেন। অধুনা ব্রাহ্মধর্ম্মের যে পরিমাণে উন্নতি হইয়াছে, এ সময়ে আর কোন সুশিক্ষিত ব্যক্তিকে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতে প্রায় শুনা যায় না। ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয় না হইলে খৃষ্টধর্ম্মই এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম হইয়া পড়িত ইহা বিলক্ষণ বোধ হইতেছে। তাহাতে সমাজের অনিষ্ট বৈ ইষ্ট সাধিত হইত না, কারণ এ পর্য্যন্ত এতদ্দেশীয় যতগুলি যুবক খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন ইহাঁরা সকলেই সমাজ-বহির্ভূত হইয়া গিয়া স্বতন্ত্র একটী সম্প্রদায় হইয়া পড়িয়াছেন; তাঁহাদের সহিত আমাদের একেবারে পার্থক্য ভাব হইয়া গিয়াছে; পরস্পর সম্ভাষণ ও সহানুভূতি নাই বলিলেই হয়; সুতরাং তাঁহাদের দ্বারা সমাজ কি প্রকারে বিশেষ উপকৃত হইবে। অতএব এই সময়ে এদেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম যে কিরূপ প্রয়োজনীয় বিবেক-শক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রই তাহা বিবেচনা করিতে পারেন। যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদিগকে বিশেষ

সাবধান থাকিতে হইবে; যেন কোন প্রকার ভ্রম, কুসংস্কার ও অপবিত্রতা আসিয়া পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মকে মলিন করিতে না পারে।

যে ধর্ম্মে কোন মনুষ্যের মত, কল্পনা বা প্রভুত্ব নাই যে ধর্ম্ম কোন দেশ বা জাতির নামে পরিচিত নহে, যে ধর্ম্ম কোন গ্রন্থে বা প্রণালীতে আবদ্ধ নহে, যে ধর্ম্ম কেবল এক-মাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনাই মনুষ্য-জাতির মুক্তির নিদান বলিয়া উপদেশ দেয়, যে ধর্ম্ম কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক ভাবে বদ্ধ নহে, যে ধর্ম্ম দ্বারা ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল হয়, তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম। একমাত্র অদ্বি-তীয় ঈশ্বরের আরাধনা, উদারতা, পবিত্রতা, সত্যতা নিত্যতা প্রভৃতি লক্ষণ দ্বারা ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম চিরপরিচিত থাকিবে। কোন সৃষ্ট-পদার্থ, কাল্পনিক দেবদেবী, সৃষ্ট পশুপক্ষি মনুষ্য, মৃত বা জীবিত ধার্ম্মিক মনুষ্য ইহা-দিগের কাহাকেও ঈশ্বর-জ্ঞানে বা ঈশ্বরের অবতারজ্ঞানে উপাসনা করিলে তাহা সম্পূর্ণরূপে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরুদ্ধ কার্য্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম কাহাকেই ঘৃণা করেন না, পাপী পুণ্যবান্, ধনী দরিদ্র, পণ্ডিত মূর্খ প্রভৃতি সকলকেই আশ্রয় দেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম কোন জাতির বা দেশের ধর্ম্ম নহে, ইহা বিশ্বব্যাপী সনাতন ধর্ম্ম। কোন সাম্প্র-দায়িক ধর্ম্ম হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মের উৎপত্তি হয় নাই। জগতের সত্যসমষ্টিই ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম। যাহা সত্য তাহাই ধর্ম্ম, ধর্ম্মের এই সাধারণ লক্ষণ। ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য কোন গ্রন্থে, কোন দেশে বা কোন মনুষ্যে বদ্ধ নহে। যদি কোন পুস্তকে কোন দেশে বা কোন মনুষ্যে কিছু সত্য পাওয়া যায় তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। এক ব্যক্তি যাহা সত্য বলিতেছেন বা কোন গ্রন্থে যে সকল সত্য প্রকাশিত আছে, তদ্ভিন্ন জগতে আর সত্য নাই, ইহা যিনি বিবেচনা করিবেন, তিনি কখনই ব্রাহ্ম বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবেন না। যদি কোন ব্যক্তি কোন সত্য প্রকাশ করেন তাহা তাঁহার সত্য মনে না করিয়া ঈশ্বরের সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

পণ্ডিত মূর্খ, ধনী দরিদ্র, পাপী পুণ্যবান্ যে কেহ সত্য প্রকাশ করিবেন, তাহাই ঈশ্বরের সত্য বলিয়া আদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিতে হইবে। অত্যন্ত ধার্ম্মিক ব্যক্তি যদি কোন ভ্রান্ত মত প্রকাশ করেন, তাহা হইলে সেই অসত্য মতকে তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিতে হইবে। কাহারও অনুরোধে বা ক্ষমতায় বিস্মৃত হইয়া অসত্য সত্য বলিয়া ধর্ম্মভ্রষ্ট হওয়া ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের বিরুদ্ধ কার্য্য। ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য কোন ব্যক্তির সত্য নহে, কোন সম্প্রদায়ের সত্য নহে, কোন গ্রন্থের সত্য নহে, কাহারও নিজের বস্তু নহে, ইহাতে সাধারণের সমান অধিকার। চন্দ্র সূর্য্য যেমন সাধারণের মঙ্গলের জন্য ব্রাহ্মধর্ম্মও সেইরূপ সাধা-রণের মঙ্গলের জন্য।

কোন কোন প্রাচীন ব্যক্তি আপনআপন সন্তানগণকে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে নিষেধ করেন, এটী তাঁহাদের অত্যন্ত ভ্রম বলিতে হইবে; কেন না এক্ষণে দেশে যেরূপ জ্ঞানের চর্চ্চা হইতেছে এখন আর শিক্ষিত ব্যক্তিরা কোন রূপ উপধর্ম্মে কোন রূপেই বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে না। জ্ঞান ধর্ম্মের মূল, জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই ধর্ম্মের উন্নতি হইতেছে। মনুষ্য যখন অসভ্য ছিল, তখন তাহার ধর্ম্ম এক প্রকার ছিল, যে পরিমাণে মনুষ্য বিদ্যাচর্চ্চা করি-তেছে সেই পরিমাণে ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন হইতেছে। অঙ্ক ভূগোল, ইতিহাস পদার্থ-তত্ত্ব ভূতত্ত্ব জ্যোতিষ শারীরবিজ্ঞান মনো-বিজ্ঞান প্রভৃতি প্রত্যেক বিভাগই ধর্ম্মের

শাখা প্রশাখা। এই সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া মনুষ্য আর পরিমিত পদার্থের উপাসনা করিতে পারেন না। জ্ঞানানুসারেই বিশ্বাসের উৎপত্তি হয়, জ্ঞান বিশ্বাসের নেতা। যে বিশ্বাস না হইলে মনুষ্য ও পশুতে বিভিন্নতা থাকে না সেই বিশ্বাসের মূল জ্ঞান। জ্ঞান বিশুদ্ধ হইলে বিশ্বাসও বিশুদ্ধ হইবে, জ্ঞান অমার্জ্জিত থাকিলে বিশ্বাসও কুসংস্কারাপন্ন হইবে। যে বিশ্বাসকে আমরা ধর্ম্মের জীবন বলিতেছি সেই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া পূর্ব্বকালে কতশত লোক জীবিত পুত্রকে সমুদ্রে বিসর্জ্জন দিয়াছে, মাতাকে জ্বলন্ত চিতায় দগ্ধ করিয়াছে এবং নরবলি দিয়া তাহার শোণিত পান করিয়াছে। বর্ত্তমান কালে বিশ্বাসের নাম লইয়া কত লোক কাল্পনিক দেবদেবীর পূজা করিতেছে; মৃত্তিকা প্রস্তর, নদী,পর্ব্বত, অগ্নি বায়ু,চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতির পূজা করিতেছে কত ব্যক্তি মৃত মনুষ্যকে, কেহ কেহবা জীবিত মনুষ্যকে পূজা করিতেছে আবার কতকগুলি লোক বিশ্বাসের বশীভূত হইয়া ব্যভিচার ও সুরাপানকেও ধর্ম্মের সাধন বলিয়া প্রচার করিতেছে। বিশ্বাস এমনি পদার্থ, এ যে বেশে আসুক না কেন, তাহাতেই মনুষ্যের মন হরণ করিতে পারে। মনুষ্য ধর্ম্মপথের যাত্রী, বিশ্বাস সেই পথের নায়ক, যদি বিশ্বাস বিশুদ্ধ না হয়, তবে অধোগতি প্রাপ্ত হইতে হইবে, জ্ঞানালোচনা ভিন্ন বিশ্বাস বিশুদ্ধ হয় না, আধুনিক যুবক-বৃন্দের বিশ্বাস জ্ঞানালোচনা দ্বারা বিশুদ্ধ হইতেছে এ সময়ে আর উপধর্ম্মে তাহাদের প্রবৃত্তি জন্মিবে কেন? এখন তাহাদের বিশ্বাসানুরূপ সত্য ধর্ম্মের আশ্রয়ই শ্রেয়স্কর হইতেছে। যদি কেহ সত্যধর্ম্ম অবলম্বনের ব্যাঘাত করেন তাহাহইলে শিক্ষিত যুবকবৃন্দ শূন্যহৃদয় হইয়া পড়িবে। ধর্ম্মভাবশূন্য মনুষ্য আপনার ও সমাজের অত্যন্ত অনিষ্টকারী। জ্ঞানী হইয়া যদি বিশুদ্ধবিশ্বাসী না হয়, তাহা হইলে তাহাদের অপেক্ষা নিরক্ষর কৃষকগণও অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ। কেননা ঐ মূর্খ কৃষকদের বিশ্বাসানুরূপ একটী ধর্ম্মের ভাব আছে; এ জন্য তাহারা অনেক গর্হিত কর্ম্ম হইতে বিরত থাকে। কিন্তু অধার্ম্মিক জ্ঞানীরা প্রয়োজন হইলে কোন প্রকার গর্হিত কার্য্য করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না। ধর্ম্মভাবশূন্য জ্ঞানীতে আর ব্যাঘ্র ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তুতে আকারগত প্রভেদ ব্যতীত কার্য্যগত কোন প্রভেদ নাই। প্রয়োজন উপস্থিত হইলে তাহারা না করিতে পারে এমন কর্ম্মই নাই। তাহারা জনসমাজে সুসভ্য মনুষ্য বলিয়া পরিচিত, কিন্তু অন্তরে পিশাচসদৃশ। ব্রাহ্মধর্ম্ম এরূপ জ্ঞানকে অত্যন্ত ঘৃণা করেন। জ্ঞানী যদি ঈশ্বরপরায়ণ হইয়া সত্যের পথে বিচরণ করেন, তবেই তাঁহার জীবন সার্থক হয়। জ্ঞানী হইয়া অনন্ত স্বরূপ মঙ্গলময় মুক্তিদাতা ঈশ্বরে বিশ্বাস করুন ও তাঁহাকে ভক্তি করুন পরমানন্দ লাভ করিবেন। ভক্তিবিহীন জ্ঞান অত্যন্ত কঠোর ও নীরস। ভক্তদিগের মন, ঈশ্বরকে কেবল সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া স্থির থাকে না। ভক্তেরা যখন তাঁহাকে আপনার সহায় আশ্রয় ও মুক্তিদাতা বলিয়া জানিতে পারেন, তখন তাঁহাদের আনন্দের আর পরিসীমা থাকে না। ভক্তি যে পরিমাণে বৃদ্ধি হইবে, মনুষ্য সেই পরিমাণে ঈশ্বরের নিকটস্থ হইতে থাকিবে, পূর্ব্বে যাহা কল্পনা বলিয়া বোধ হইত অত্যন্ত সুপণ্ডিত ব্যক্তিও যাহা চিন্তা করিতে সমর্থ হইতেন না ভক্তিবলে তাহা প্রত্যক্ষবৎ হইবে। ভক্তিশূন্য ধর্ম্ম, ধর্ম্মই নহে। জ্ঞানসহকৃত ভক্তি দ্বারা ঈশ্বর

প্রত্যক্ষ হন, ভক্তেরা তাঁহাকে লাভ করিয়া জীবন সফল করেন।

করুণাময় পরমেশ্বর প্রসাদে ধর্ম্মপুর ব্রাহ্মসমাজ অদ্য অষ্টম বৎসরে পদার্পণ করিল। এই উপলক্ষে আজি আমরা সকলে এই মহোৎসবে একত্র মিলিত হইয়াছি। ভ্রাতৃগণ! আসুন এখন সংসার-চিন্তা, বিষয়-ভাবনা প্রভৃতি মলিন কামনা অন্তঃকরণ হইতে দূরে রাখিয়া পবিত্র হৃদয়ে তাঁহাকে ধারণ পূর্ব্বক অনুপম আনন্দ লাভে প্রবৃত্ত হই। তাঁহার অপার মহিমা শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিয়া জীবন সার্থক করি। যে কয়েক জন স্বদেশহিতৈষী মহাশয়ের প্রযত্নে ও পরিশ্রমে এই সমাজটী স্থাপিত হইয়াছে, ঈশ্বর-প্রসাদে তাঁহাদের উদ্দেশ্য সফল হইবার উপক্রম হইয়াছে। মঙ্গলময়ের কৃপায় তাঁহারা দীর্ঘজীবী হইয়া দেশের হিতব্রতে ব্রতী থাকুন।

হে করুণাময় জগৎপিতঃ! আমরা তোমারই কৃপায় তোমারই এই বিশ্বরাজ্যে বিচরণ করিতেছি। যখন আমরা ঘোরতর সংসার-চিন্তায় একান্ত অভিভূত ও অবসন্ন হইয়া পড়ি, তখন কেবল তোমারই সে অমৃতময় নামোচ্চারণ করিয়া মৃত শরীরে জীবনসঞ্চারের ন্যায় পুনরায় নব জীবন প্রাপ্ত হই। যখন আমরা প্রাণভয়ে একান্ত ব্যাকুল হই তখন তুমিই আমাদের হৃদয়-মন্দিরে উপস্থিত হইয়া অভয় প্রদান করিয়া থাক। যখন কোন অর্ণবযানারোহী অকূল সমুদ্র মধ্যে প্রবল ঝটিকায় আক্রান্ত হয়, তখন কে তাহার সহায় হয়; তাহার মুখ হইতে কাহার নাম নির্গত হইতে থাকে? যখন কোন পথিক পথহারা হইয়া হিংস্র-জন্তু সমাকীর্ণ কোন নিবিড় অরণ্যে প্রবিষ্ট হয় তখন কে তাহার পথপ্রদর্শক হয়? বৃক্ষ লতা-বিহীন জনমানব-রহিত জলশূন্য বালুকাময় মরুভূমিতে প্রচণ্ড-মার্ত্তণ্ড-তাপে তাপিত শুষ্ককণ্ঠ মৃতপ্রায় পথিকের পিপাসা-শান্তির নিমিত্ত কে পান্থ-পাদপ রোপণ করিয়া রাখিয়াছে এবং কেই বা সেই পাদপকে অপূর্ব্ব সুপেয় জল প্রদানের শক্তি দিয়াছে? হে দয়াময়! এই সকল চিন্তা করিলে কাহার মন তোমার প্রতি ধাবিত না হয়? কেই বা তোমাকে বিস্মৃত হইয়া থাকিতে পারে? হে নাথ! আমরা ঘোর পাপী, আমাদিগের পাপমোচন কর এবং আমাদিগকে দিব্য জ্ঞান প্রদান কর, যেন আর শোক মোহ, আমাদিগকে কাতর করিতে না পারে। হে পিতঃ! পুত্র সহস্র অপরাধে অপরাধী হইলেও তাহা মার্জ্জনীয়। অতএব আমাদের সমস্ত পাপ মার্জ্জনা করিয়া আমাদিগকে তোমার শীতল অমৃতময় ক্রোড়ের ছায়ায় গ্রহণ কর। হে দয়াময়! আমাদিগকে এরূপ বলে বলীয়ান কর, যেন আমরা সংসারের প্রখর স্রোতের প্রতিকূলে গমন করিতে পারি এবং হৃদয়-বিদারক মর্ম্মচ্ছেদি ভীষণ মূর্ত্তি পাপ-পিশাচের প্রলোভন সকল অতিক্রম করিতে সমর্থ হই।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

জ্ঞানীবাক্য।

(গ্রীকগ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত ও অনুবাদিত।)

(৪৩৪ সংখ্যক পত্রিকার ১১৭ পৃষ্ঠার পর)

(১৭৩)

মন্দকে ভাল করিয়া তোলা কিম্বা অমঙ্গলকে মঙ্গলাক্ত করা সকল শিল্প অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শিল্প।

প্লেটো।

(১৭৪)

জ্ঞান ও প্রীতি সকল বস্তুর জনয়িতা ও মূল।

অর্ফিউস।

(১৭৫)

সকল বস্তু প্রথমে গূঢ় রূপে ঈশ্বরেতে নিহিত ছিল তৎপরে তিনি সে স্থান হইতে তাহাদিগকে প্রকাশ পূর্ব্বক তাহাদিগকে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব প্রদান করিয়া এই জগৎ সৃজন করিলেন।

ঐ

(১৭৬)

কার্য্য হইতে ঈশ্বর জানা জ্ঞানী ব্যক্তির সম্বন্ধে যথেষ্ট। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রকৃত স্বরূপ দেখিতে চাহেন তিনি ঈশ্বরের জ্যোতির লোকাতীত প্রভা বশতঃ অন্ধ হয়েন।

ফাইলো।

(১৭৭)

ঈশ্বর নিত্য প্রকৃতির প্রস্রবণ।

পিথাগোরাস।

(১৭৮)

ঈশ্বর সকল বস্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বশক্তিমান। যখন নানা প্রকার পদার্থ আছে তখন সকলকে নিয়মিত করিবার জন্য সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান কোন পদার্থের থাকা আবশ্যক। সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বশক্তিমান পদার্থ অবশ্যই একমাত্র।

জেনোফেনিস।

(১৭৯)

ঈশ্বর ছিলেন, আছেন ও পরে থাকিবেন।

পসেনিয়সোদ্ধৃত পিলিয়া দেশীয় দৈববাণী উক্তকারিণীর বচন।

(১৮০)

বলীবর্দ্দ এবং ঘোটকেরা যেরূপ স্বর্গ মর্ত্ত্য দেখে সেরূপ করিয়া দেখিও না, কিন্তু এরূপ করিয়া দেখ যে দৃশ্যমান জগতের নিম্নে আর একটী অদৃশ্য জগৎ আছে এমৎ নির্ণয় করিতে পার।

জুলিয়ান।

(১৮১)

এই ভৌতিক জগৎ অতি পবিত্র এবং ঈশ্বরের অত্যন্ত উপযুক্ত মন্দির।

প্লুটার্ক।

(১৮২)

সেই কূটস্থ পূর্ণ স্বরূপ পদার্থের নিম্নেই যত বস্তু আছে তাহার মধ্যে মন কিম্বা বুদ্ধি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সেই পূর্ণস্বরূপ পদার্থ প্রথম, উহা দ্বিতীয়। দ্বিতীয় প্রথমকে পিতা স্বরূপ দেখে এবং উহা ব্যতীত আর অন্য কোন বস্তুর উহার প্রয়োজন নাই। কিন্তু সেই আদি বস্তুর মন কিম্বা বুদ্ধির কোন প্রয়োজন নাই।

প্লোটাইনস।

তত্ত্বজ্ঞান কতদূর প্রামাণিক।

ভারতী হইতে উদ্ধৃত।

আরোহ-প্রণালী কিরূপ আর অবরোহ-প্রণালীই বা কিরূপ, তাহার পরিচয় এক-প্রকার দেওয়া হইয়াছে। এক্ষণে উভয়ের মধ্যে কে কেমন প্রামাণিক, তাহা একবার প্রণিধান করিয়া দেখা যাক্।

এক আপেক্ষিক বস্তু, আর এক সূক্ষ্মতর আপেক্ষিক বস্তুকে অবলম্বন করিয়া আছে, তাহাও আবার ততোধিক সূক্ষ্মতর বস্তুকে অবলম্বন করিয়া আছে; এইরূপ করিয়া যতই চলা যায়, আরোহ-প্রণালী আপেক্ষিকের ঊর্দ্ধে কোনক্রমেই যাইতে পারে না।

আরোহ-প্রণালীর প্রারম্ভে স্থূল-তম বিষয়, এবং তাহার উপসংহারে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর বিষয়।

অবরোহ-প্রণালীর প্রারম্ভে সূক্ষ্মতম বিষয়, পরিণামে স্থূল হইতে স্থূলতর বিষয়।

স্থূল-তম বিষয়, যাহা আরোহ-প্রণালীর ভিত্তিমূল, তাহার অস্তিত্বের প্রমাণ কি, এ কথা

কেহই জিজ্ঞাসা করেন না,—সকলেই জানেন যে, প্রত্যক্ষই তাহার প্রমাণ। জিজ্ঞাসা কেবল এই যে, সূক্ষ্মতম বিষয়, যাহা অবরোহ প্রণালীর ভিত্তি-মূল, তাহা ত প্রত্যক্ষের বিষয় নহে,—তাহার প্রমাণ কি? ইহার উত্তর এই যে, স্থূলের পরাকাষ্ঠা যেমন আমরা জড় বস্তুতে প্রত্যক্ষ করি, সূক্ষ্মের পরাকাষ্ঠা সেইরূপ আমরা বিশুদ্ধ জ্ঞানেতে উপলব্ধি করি। স্থূলগুলি প্রত্যক্ষ করি ইন্দ্রিয়-দ্বারা, সূক্ষ্মতমটি (বিশুদ্ধ জ্ঞান) উপলব্ধি করি আত্মা দ্বারা।

একদিকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ, অপর দিকে আত্ম-প্রমাণ; প্রথমটি স্থূল সত্যের প্রমাণ, দ্বিতীয়টি মূল-সত্যের প্রমাণ। আমরা যেমন চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা একেবারেই স্থূল বস্তুকে প্রত্যক্ষ করি, সেইরূপ আত্মা দ্বারা একেবারেই সূক্ষ্মতম বস্তুকে উপলব্ধি করি। তাহা যদি না হইত, তবে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর, তাহা হইতেও সূক্ষ্মতর এইরূপ করিয়া মনকে ক্রমাগতই শ্রান্ত ক্লান্ত বিভ্রান্ত হইতে হইত, আর, কোথাও বিশ্রাম করিতে না পাইয়া অন্ধকার দেখিতে হইত। অন্ধকার দেখে না যে, তাহার কারণ শুদ্ধ কেবল আত্মার অন্তরতম-জ্যোতি—বিশুদ্ধ জ্ঞান—প্রজ্ঞা। *

এ ধারে প্রত্যক্ষ, ওধারে প্রজ্ঞা, মধ্যে আরোহ অবরোহ এই দুই প্রণালী। আরোহ প্রণালীর প্রারম্ভে প্রত্যক্ষ-প্রমাণ শিরোধার্য্য করিয়াছি, অবরোহ-প্রণালীর প্রারম্ভে বিশুদ্ধ জ্ঞান শিরোধার্য্য করিতেছি। প্রত্যক্ষ-বিষয় যেমন আপনা আপনি সপ্রমাণ, বিশুদ্ধ জ্ঞানও সেইরূপ আপনা আপনি সপ্রমাণ। ইন্দ্রিয়-মনের যোগে প্রত্যক্ষ বিষয়ের উপলব্ধি হয়,—প্রজ্ঞার উপলব্ধি হয়। প্রজ্ঞা হইতে নীচে নাবিতে হইলে যুক্তি-সোপান অবলম্বন করিতে হয়, এবং প্রত্যক্ষ হইতে উপরে উঠিতে হইলে অনুমান-সোপান অবলম্বন করিতে হয়। প্রত্যক্ষ হইতে অনুমান-প্রবাহ ঊর্দ্ধগামী; প্রজ্ঞা-হইতে যুক্তি-প্রবাহ নিম্নগামী।

প্রত্যক্ষকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ না করিলে আরোহ-প্রণালী সম্ভবে না; প্রজ্ঞাকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ না করিলে অবরোহ-প্রণালী সম্ভবে না। প্রত্যক্ষকে যদি প্রমাণ না বল, তবে অনুমানকে প্রমাণ বলিতে পার না; প্রজ্ঞাকে যদি প্রমাণ না বল, তবে যুক্তিকে প্রমাণ বলিতে পার না।

প্রত্যক্ষ হইতে অনুমানে আরোহণ—ইহাই আরোহ প্রণালী; প্রজ্ঞা হইতে যুক্তিতে অবরোহণ—ইহাই অবরোহ প্রণালী। প্রত্যক্ষ যদি অসিদ্ধ হয়, তবে অনুমান অসিদ্ধ, আরোহ প্রণালী অসিদ্ধ, বিজ্ঞান-শাস্ত্র অসিদ্ধ। প্রজ্ঞা যদি অসিদ্ধ হয়, তবে যুক্তি অসিদ্ধ, অবরোহ প্রণালী অসিদ্ধ, দর্শনশাস্ত্র অসিদ্ধ। আরোহ-প্রণালীর ভিত্তিমূল যে প্রত্যক্ষ তাহারো আমরা প্রমাণ চাহি না, অবরোহ প্রণালীর ভিত্তিমূল যে প্রজ্ঞা, তাহারও আমরা প্রমাণ চাহি না, উভয়কেই আমরা শিরোধার্য্য করিয়া লইয়া জ্ঞান-পথে অগ্রসর হই। আমরা ভিত্তিমূলের আর ভিত্তিমূল চাহি না। যদি বল প্রত্যক্ষ যে প্রমাণ তাহার প্রমাণ কি? প্রজ্ঞা যে প্রমাণ তাহার প্রমাণ কি? তবে বল না কেন—প্রমাণ যে প্রমাণ তাহার প্রমাণ কি? ইহাকেই বলে তার্কিকতা।

প্রমাণ-বিষয়ে এত বাহুল্য করিয়া বলিবার প্রয়োজন কি? প্রয়োজন এই যে, অনেকে পরের কথা শুনিয়া আপনাকে এবং আপনার মূল পত্তন ভূমিকে একবারেই উড়াইয়া দিয়া থাকেন। লৌকিক প্রবাদ আছে, কাকে কাণ উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে শুনিলে লোক বিশেষ বলেন "তাই ত কি হইবে!" শুনিলেন যে, বৈজ্ঞানিকেরা আত্মার ভিত্তিমূলকে উড়াইয়া দিয়াছে, অমনি বলেন "তবে ত তাহা আর নাই! তবে ত আত্মা নাই! বিশুদ্ধ জ্ঞান তবে ত আর টেকে না।" কাকে যে কাণ উড়াইয়া লইয়া যায় নাই, বিশুদ্ধ-জ্ঞানকে যে কেহ উড়াইয়া দিতে পারে না, এই সহজ বিষয়টি যাঁহার সহজে হৃদয়ঙ্গম না হয়, তাঁহার প্রজ্ঞা-শূন্য বিজ্ঞতা, তাঁহার চক্ষুবিহীন সূক্ষ্মদর্শিতা, তাঁহার শিরোনাস্তি শিরঃপীড়া সহজে আরোগ্য হইবার নহে! সহজ সত্যে ভ্রম পৌঁছিলে তাহার প্রতিবিধান করা সহজ আয়াসের কর্ম্ম নহে। বিশুদ্ধ জ্ঞান যে কতদূর প্রামাণিক, তাহা একটু যোর করিয়া না বলিলে তাঁহাদের বোধগম্য হইবে না।

* ইংরাজীতে যাহাকে বলে Pure reason.

প্রজ্ঞা সকল যুক্তিরই প্রমাণ সাধন করে, সুতরাং প্রজ্ঞার প্রমাণ সাধন করিতে পারে এমন যুক্তি সম্ভবে না। প্রজ্ঞার প্রামাণিকতা প্রকারান্তরে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে তাহার একমাত্র উপায় এই যে, প্রজ্ঞা হইতে যে সকল যুক্তি দোহন করিয়া পাওয়া যায়, সেইগুলি কতদূর প্রামাণিক তাহাই অবধারণ করা।

যুক্তি কাহাকে বলে? না যোগ করা। প্রজ্ঞাকে বিষয়-বিশেষে যোগ করিবার (নৈয়ায়িক ভাষায় বলিতে হইলে ব্যাপক সত্যকে ব্যাপ্য বিষয়েতে যোগ করিবার) পদ্ধতিকেই যুক্তি কহে। প্রজ্ঞা-মূলক যুক্তি কিরূপ তাহা নিম্নে প্রদর্শন করিতেছি।

সকলেই অবগত আছেন যে, একটা গোলা ক হইতে খ-য়ের দিকে (ক—খ) তাড়িত হইলে, তাহা যদি দ্বিতীয় কোন কিছু দ্বারা চালিত অথবা বাধিত না হয়, তবে তাহা সমান বেগে ক—খ এই সরল রেখায় ধাবিত হইবে। ইহার কারণ কি? কারণ এই যে, চালক অথবা বাধক বস্তুর অভাবে বেগের হ্রাস-বৃদ্ধি হইতে পারে না; কেন পারে না? না যেহেতু কারণের অভাবে কার্য্য হইতে পারে না। কারণের অভাবে কার্য্য হইতে পারে না, এই যে একটি কথা, এটি প্রজ্ঞার কথা, বিশুদ্ধ জ্ঞানের কথা; চলন্ত গোলাটি ঐ প্রজ্ঞা-তত্ত্বটির অন্যথাচরণ করিতে পারে না। কার্য্যতঃ আমরা কোন বস্তুকে অনন্ত কাল নিরবচ্ছিন্ন সমান বেগে চলিতে দেখি নাই দেখিব না। সুতরাং উপরিউক্ত সত্যটির প্রত্যক্ষ প্রমাণ অসম্ভব; প্রজ্ঞা-মূলক যুক্তিই উহার একমাত্র প্রমাণ, তদ্ভিন্ন আর দ্বিতীয় প্রমাণ সম্ভবে না।

দ্বিতীয়তঃ প্রজ্ঞা-মূলক যুক্তি দ্বারা ইহাও সমর্থিত হইতে পারে যে গোলাটি ক হইতে খ-য়ের দিকে তাড়িত হইলে দ্বিতীয় কোন চালক অথবা কোন বাধক বস্তুর অভাবে ক—খ এই সরল রেখাতেই চলিবে, বক্র রেখাতে চলিবে না। যথাঃ—

(ক⌓খ) ক এবং খ-য়ের মধ্যে একটি-বই সরল রেখা সম্ভবে না। কিন্তু ও-দুয়ের মধ্যে এই সমতল কাগজে ঐ দুটি (এবং তদ্ভিন্ন অসংখ্যটি) অবিকল সমান বক্ররেখা অঙ্কিত হইতে পারে। ক হইতে খয়ে পৌঁছিতে হইলে গোলাটির পক্ষে দুটি রেখাই ঠিক সমদূর, সম-কোণ, সমবক্র, সর্ব্বপ্রকারেই সমান; সুতরাং একটিকে ছাড়িয়া অন্যটিতে যাইবার একেবারেই কারণাভাব; কারণাভাবে কার্য্য হইতে পারে না; সুতরাং গোলাটি বক্র-রেখা-দুটির কোনটিতেই চলিতে পারে না; সুতরাং তাহা সরল রেখাতে চলিবেই চলিবে। দেখ কারণাভাবে কার্য্য হয় না, এইমাত্র প্রজ্ঞাবলেই আমরা স্থির-নিশ্চয় করিতে পারিতেছি যে, গোলাটি কথিত অবস্থায় সরল ভিন্ন বক্রপথে কখনই চলিবে না।

কমটির মতে পরীক্ষাসাধ্য ভবিষ্যৎবাণী প্রামাণিকতার প্রধান একটি লক্ষণ। প্রজ্ঞার ভবিষ্যৎবাণী পরীক্ষার প্রয়োজন রাখে না, অথচ তাহা কেমন নিশ্চিত উপরে ঐ ত দেখা গেল। একটা গোলা সমান বেগে সরল রেখায় অনন্ত কাল চলিবে, এ ব্যাপারটি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে গেলে যুগযুগান্তরেও পরীক্ষার শেষ হইবে না। এখানে পরীক্ষা থই পাইতেছে না—ইহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। "কারণ ব্যতীত কার্য্য হইতে পারে না" শুদ্ধ কেবল এই স্বতঃসিদ্ধ মূল-তত্ত্বের বলে উপরের ঐ সিদ্ধান্তটি অকাট্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে।

এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, প্রজ্ঞা হইতে যুক্তিতে অবতরণ করিয়া যে সকল সত্য উপার্জ্জন করা যায়, তাহা প্রত্যক্ষের গোচর হয় হউক, না হয় না হউক, কোন অবস্থাতেই তাহার নিশ্চয়তা এক বিন্দুও এদিক ওদিক হইতে পারে না।

আনুমানিক-সত্য যত আছে, পরীক্ষাই তাহাদের সর্ব্বস্ব। পরীক্ষার সংখ্যা যতই বৃদ্ধি হয়, তাহাদের পক্ষে ততই ভাল—ততই তাহাদের মূল দৃঢ় হয়। সর্পের পদ কেহই আমরা দেখি নাই, অথচ আমরা সাহস করিয়া এরূপ বলিতে পারি না যে, সর্পের পদ কখনই সম্ভবে না। যদি কোন বন্ধুজনের মুখে শুনি যে, অমুক দেশে পদ-বিশিষ্ট সর্প দেখা দিয়াছে, তবে এই বলি "আশ্চর্য্য কি, হইলেও হইতে পারে।" কিন্তু যদি সেই ব্যক্তির মুখে শুনি যে, অমুক দেশে কারণ-বিহীন কার্য্য দেখা দিয়াছে, তবে আমরা তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত করি যে, লোকটির মস্তকে দোষ জন্মিয়াছে। সত্য বটে যে, ভারতবর্ষীয় এত লোকের মধ্যে কেহই আমরা সর্পের

পদ একবারও দেখি নাই, তথাপি কোনও দেশে পদবিশিষ্ট সর্প আছে কি না, ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে দোষ কিছুমাত্র নাই বরং গুণই আছে, কিন্তু বিনা-কারণে কার্য্য হইতে পারে কি না, ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে যাওয়া বাতুল ভিন্ন আর কাহারো কর্ম্ম নহে। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, প্রজ্ঞার প্রমাণ পরীক্ষাধীন নহে, প্রজ্ঞা স্বতঃসিদ্ধ।

প্রত্যক্ষ-গোচর স্থূল বিষয়েতে প্রজ্ঞার প্রয়োগ করিয়া, প্রজ্ঞার বল কার্য্যে কতদূর, তাহাও আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি;—এই দেখিয়াছি যে, গোলা-একটা জড়পিণ্ড বই নয়, অথচ তাহা দুই দিকেই দুই বক্র পথ পরিত্যাগ করত সোজা পথ দিয়া ক হইতে খ-য়ে পৌঁছিতেছে। গোলাটা স্থূল, কিন্তু তাহার উপরি উক্ত কার্য্যটা অতি সূক্ষ্ম। দুই দিকের কোনদিকে না হেলিয়া ঠিক মধ্যস্থ অবলম্বন করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। পথ টি যেমন সোজা, সোজা পথে চলা টি তেমন সোজা নহে। ক এবং খ য়ের মধ্যে অসংখ্যটি বাঁকা পথ, একটি মাত্র সোজা পথ। গোলাটা প্রতি-মুহূর্ত্তে সেই সোজা পথটিই বাছিয়া লইতেছে। গোলাটা-কর্ত্তৃক এই যে সূক্ষ্ম কার্য্য একটি সম্পাদিত হইতেছে—স্থূলের মধ্যে এই যে একটি সূক্ষ্ম ব্যাপার দৃষ্ট হইতেছে—ইহার মূল কোথায়? প্রজ্ঞার এই যে বিধান যে—কারণ ব্যতিরেকে কার্য্য হইবে না, এইটিই উহার মূল, তাহার আর ভুল নাই; ইতিপূর্ব্বে তাহার প্রমাণ যথেষ্ট দেওয়া হইয়াছে।

ক্রমশঃ

THE EVIDENCE OF JESUS.

(FROM REV. CHARLES VOYSEY'S "THE SLING AND THE STONE.")

Is not my word like as a fire? saith the Lord, and like a hammer that breaketh the rock in pieces

Jer XXIII. 29.

WE have now to enter upon an examination of those passages which Jesus Christ applied from the Old Testament to himself. Before we do this, however, it will be necessary to bear in mind the untrustworthy character of the documents before us. It is by no one ever asserted that Jesus left even a scrap of writing behind him, or has in any way guaranteed the accuracy of the Gospel records, or furnished us with any test by which we can ascertain that his sayings are therein truthfully reported.

In the second place, we must remember that it is not disputed, even by the orthodox, that the three synoptic Gospels were not written till about thirty years after the events they profess to describe, whilst the fourth Gospel is admitted to have appeared much later, even if written by John the Apostle; but all critics of any weight now regard the year 160 as about the earliest time at which this Gospel was written If, then, we bear in mind the long interval between the actions and sayings of Jesus and the committal of them to writing, it is wholly impossible to believe that the written reports can be literally exact, without the intervention of a miracle.

But if we are in this state of uncertainty as to what Jesus actually *did*, how much greater must be our uncertainty as to what he actually *said*: for it is notoriously more difficult to reproduce the exact words spoken many years ago, than to record, with tolerable accuracy, events which then occurred. Without a miracle, such accurate reports of Christs' speeches are manifestly impossible. Hence it is alleged, without any warrant for the assertion in the New Testament, that the New Testament writers were infallibly inspired, and that we have before us, not only the narratives of what Jesus actually did, but the exact words spoken by him—only with this most unfortunate drawback, that they had to be translated into Greek. Still, this does not seem to afflict Christians very much. They can easily assure themselves that the translation is as infallible as the recollection of the original speeches was inspired. This orthodox view of the Gospel narratives somewhat complicates our work, and in this way. If we honestly and carefully let the Gospels speak for themselves, they bear witness to the errors, however slight, of him whom the Christians call their Divine Master. The things that should have been for their help thus

become an occasion of falling. The inspiration which was invented to guard the sanctity of the shrine turns out to be a traitor. The irresistible necessity under which they lie of accepting every word of the Gospels at last lands them face to face, not with a God man, but with a very fallible man indeed—mistaken alike in his interpretation of Old Testament Scripture, and in his own predictions, of the future. They can only save their belief in the infallibility and Godhead of Jesus, *by branding as false history the only documents by which they have any knowledge at all that such a being lived and died on earth.* And here we must press the corollary that if any error be detected in a book alleged to be Divine, the single error is enough to cast a doubt on the Divine origin of all the rest.

There is, however, another class of persons calling themselves Christians, who do not believe in the infallibility of the New Testament, or in the God-head of Christ, but who, nevertheless, regard him as so Superhuman as not to have been capable of the frailties attributed to him in the Gospels. One after another of these unpleasant lines in the narratives they strike out, as due to the ignorance or blindness of the evangelists, and will not accept from them a single statement derogatory to their Christ. This is certainly picturesque, and may have its uses in the cultivation of sentiment; but it is utterly destitute of logical basis. Moreover, it is an unconscious injustice done to some of the world's best and wisest teachers to refuse to accord to their biographies the same refining process as is applied to the life of Christ. If it be permissible to believe only the best that is reported of any one, and to disbelieve every word of his recorded mistakes or weaknesses, surely consistency demands that the same charity should be extended, without invidious distinction, to all whose names are illustrious for sublimity of character and brilliancy of moral heroism. I must, for one emphatically repudiate the sentimental theory, and take my opinion of what Jesus was from his own followers and eulogists. At all events, if I have no right to say that he was inferior to their representation, I have n right, on the other hand, to say that he was better than they represent him to be.

On turning to the Gospels, we find that Jesus has made fewer applications to himself of Old Testament Scripture than the evangelists have made for him. We are also struck by the general and vague character of some of Christs' own references to Hebrew Scripture. As example of this I will quote the following passages;

John V. 39 and 46. "Search the Scriptures, for in them ye think ye have eternal life: and they are they which testify of me" "Had ye believed Moses ye would have believed me: for he wrote of me."

In both of these passages you will observe that, while the statements *appear* definite enough, they are deficient in that very kind of precision which is needed to prove their accuracy.

He distinctly declares that the Scriptures testify of him, and even more distinctly that Moses wrote about him. But he throws the burden of discovering the passages which he thinks were written about him upon ourselves. All we can do, then, is to select some passages from the writings which is most likely to apply to him, and see if it really applies to him or to some one else. The Apostle Peter, according to the *Acts of the Apostles*, has given us a good specimen in the words (Acts III. 23), "For Moses truly said unto the fathers, the Lord thy God will raise up unto thee a prophet from the midst of thee, of thy brethren, like unto me, unto him shall ye hearken." Det. XVIII. 15. Unfortunately for the argument, it turns out that Moses did not write this Book of Deuteronomy and therefore quotation is of no value in supporting the assertion of Jesus, "Moses wrote of me." Jesus was certainly mistaken in regarding Moses as the author of the Pentateuch. It is more than doubtful that Moses ever wrote a line in the Bible at all, so the assertion by Christ before us can not be accepted.

But, assuming that Moses said these words, we find, on reviewing the contest, that he was speaking to his own people in anticipation of his own removal by death; and history tells us that a "prophet" like unto him was found in the person of Joshua the Son of Nun, who succeeded Moses as leader and teacher of the people of Israel. It is not to be credited that Moses utterly disregarded

the great needs of the people of his time and skipped over 1,500 years to predict the coming of Jesus, who would not have been of the slightest use to the children of Israel in their journey through the wilderness or in their conquest of Canaan If, then, the prophecy most likely to belong to Jesus has no reference to him whatever, we need not trouble ourselves about any minor indications, if such exist.

The general statement of Christ that the Scriptures testify of him is simply too vague to be of any value, but it loses all its alleged authority the moment he ventures to point out by name, as one who wrote about him, a person whom modern critics are absolutely compelled to exclude from the list of Old Testament writers.

As another instance of this vague adoption of Old Testament prophecy, I will quote Luke X. 24.

"I tell you that many prophets and kings have desired to see those things which ye see, and have not seen them; and to hear those things which ye hear, and have not heard them."

General and vague as these words are, nevertheless, they are deeply untrue. The things which the disciples of Jesus were daily witnessing, and the words they were daily hearing, find no parallel whatever in the recorded aspirations and expectations of the prophets and kings of the Old Testament. Could they really have heard the trump of the Roman soldiery, in the streets of Jerusalem or have seen the hopeless subjugation of their descendants beneath a foreign yoke, they would have shuddered in despair of God's mercy towards His people. Their prayers, their prophecies and their fondest hopes were, in the days of Christ, further than ever from fulfilment.

Another general application of prophecy was made by Jesus in the Garden of Gethsemane, where he rebukes Peter for drawing his sword on Malchus. In Matt. XXVI. 53,54. we read :—"Thinkest thou that I can not now pray to my Father, and he shall presently give me more than twelve legions of angels? But how, then, shall the Scriptures be fulfilled that thus it must be?" Here is a general allusion to the "Scriptures" as foretelling his death. Jesus not having given us chapter and verse, we are unable to discover the prophecy which his death was to fulfil. The last of these *general* allusions which I shall notice is to be found in Luke XXIV, which professes to give an account of a conversation held between Jesus and two of the disciples, after his resurrection With singular candour those disciples, were saying of him that they "trusted that it had been he which should have redeemed Israel" —showing that up to the last moment the followers of Jesus looked upon him as the earthly King and governor who was to deliver Israel from foreign rule, and to avenge them of their adversaries. But the reply of Jesus is: "O fools and slow of heart to believe all that the prophets have spoken! Ought not Christ to have suffered these things and to enter into his glory? And beginning at Moses, and all the prophets, he expounded unto them in all the Scriptures the things concerning himself Again, to the assembled apostles at Jerusalem, he says; "These are the words which I spoke unto you, *while I was yet with you*,* that all things must be fulfilled which were written in the law of Moses, and in the prophets, and in the Psalms, concerning me."

(To be continued.)

ভ্রমসংশোধন।

গত কার্ত্তিক মাসের পত্রিকায় দান প্রাপ্তির স্তম্ভে ভ্রম বশতঃ হরিমোন নন্দির স্থানে হরিমোহন রায় হইয়াছে।

* This is a remarkable instance of unconscious betrayal of fictitious narrative. Jesus, speaking face to face with his disciples, would not, could not, naturally speak as if he had departed from them; but this phrase shows that the speech is made up after the event, and is written under the influence of the impression on the writer's mind that Jesus was *no longer* "with them."

Registerd NO 52.

দশম কল্প

প্রথম ভাগ

৪৩৭ সংখ্যা

পৌষ ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫০

শক ১৮০১

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

বিজ্ঞাপন

পঞ্চাশ সাংবৎসরিক

ব্রাহ্মসমাজ।

---

১১ মাঘ শনিবার প্রাতঃকাল ৮ ঘণ্টার সময়ে আদি ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে এবং সায়ংকাল ৭ ঘণ্টার সময়ে শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

সাধুসঙ্গ।

"সেবেতেমাংস্তু নিয়মান্ ব্রহ্মচারী গুরৌ বসন্।
সন্নিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং তপোবৃদ্ধ্যর্থমাত্মনঃ॥"

মনুষ্য উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্ত দ্বারা অধিকতর রূপে শিক্ষিত হয়। সেই জন্য মনুষ্য যেরূপ স্বভাব ও যে প্রকার বিদ্যা-বুদ্ধি-সম্পন্ন লোকের সহিত অবস্থান করে সে অল্প কাল মধ্যে অনধিক পরিশ্রমে তদনুরূপ প্রকৃতি ও জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে। সেই নিমিত্ত সৎ-স্বভাব-প্রাপ্তি ও সদ্ভাব এবং ধর্ম্ম-ভাব শিক্ষার জন্য সাধু-সজ্জন ও পুণ্যাত্মাদিগের পবিত্র-সহবাসে অবস্থান করা সাধক মাত্রেরই বিশেষ কর্ত্তব্য কর্ম্ম। সেই কারণেই আর্য্য ঋষিগণ গর্ব্ভাষ্টম বা অষ্টম বর্ষীয় সুকুমারমতি বালকদিগের উপনয়ন-সংস্কারানন্তর গুরু-গৃহে অবস্থান-পূর্ব্বক শিক্ষা-কার্য্য সমাপনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, যথা "তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ" "পরব্রহ্মের বিশেষ জ্ঞান-লাভার্থ আচার্য্য-সন্নিধানে শিষ্য গমন করিবেন।"

বাল্য-কালে যাহা শিক্ষা হয়, সমস্ত জীবনে তাহা বিস্মৃত হওয়া যায় না। বাল্য জীবনে যে সংস্কার একবার হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়, তাহা আর কিছুতেই অপনীত হইবার নহে। সেই জন্য ক্ষুদ্রপ্রাণ গৃহস্থ-শিশু হইতে, মহা-প্রতাপশালী রাজকুমারকে পর্য্যন্ত তপোবনে ঋজুস্বভাব নিষ্কাম নিস্পৃহ ঋষিদিগের পবিত্র আশ্রমে ব্রহ্মচারীবেশে

অবস্থান করিতে হইত। সেই তপোবনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, ব্রহ্মগতপ্রাণ ঋষিদিগের ধ্যান-ধারণা, তপশ্চর্য্যা-সন্দর্শনে তাহারদের যে সকল ভাব উপার্জ্জন ও যে সমস্ত বিষয় শিক্ষা হইত, তাহা এক কালে প্রস্তর-খোদিত রেখার ন্যায় অন্তঃ-প্রবিষ্ট হইয়া যাইত। তপোবন কেবল ঋক্, যজু, সাম, অথর্ব্ব, শিক্ষা-কল্প-ব্যাকরণ, নিরুক্ত ছন্দঃ জ্যোতিষ প্রভৃতি শিক্ষার স্থান ছিল না; সেখানে সাহিত্য কাব্য, ধর্ম্মনীতি রাজনীতি, আয়ুর্ব্বিদ্যা যুদ্ধবিদ্যা অঙ্কশাস্ত্র, ন্যায় ও দর্শন প্রভৃতি বিবিধ বিদ্যার শিক্ষা হইত। কে না জানে যে সেই পুরাকালে ভারতের পূজ্যপাদ ঋষিগণ নানা বিদ্যায় পৃথ্বীগুরু হইয়া সমুদায় জনপদ মধ্যে পূজিত হইয়াছিলেন। সেই স্বাস্থ্য-নিকেতন শান্তিগৃহ ঋষ্যাশ্রমে থাকিয়া বালকেরা পূর্ণযৌবনকাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মবিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষা করিয়া, সাধু সচ্চরিত্র হইয়া সমাবর্ত্তন করিত এবং জনসমাজ-মধ্যে সেই সকল পবিত্র ভাব, বিশুদ্ধ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া সংসার-আশ্রমের উৎকর্ষ সাধন করিতে সমর্থ হইত এবং আপনারাও শিক্ষা-সাধন-গুণে পৃথিবীর আকর্ষণ প্রলোভন হইতে সুরক্ষিত হইতে পারিত। শিক্ষা ও সাধনের গুণে তাঁহারদের অনন্ত-কাল-প্রতিপাল্য ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত অকালে উদ্‌যাপিত হইত না।

যেরূপ বিষয়-ব্যাপারের মধ্যে অবস্থান করা যায়, মনের সেইরূপ বৃত্তি-সকলই স্ব স্ব বিভব প্রাপ্ত হইয়া উত্তেজিত ও পরিপুষ্ট হয়। সংযতেন্দ্রিয় সুধীর সাধু সজ্জনদিগের নিকটে অবস্থান করিলে, তাঁহারদের আচার-ব্যবহার দৃষ্টে, অল্পে অল্পে তৎপ্রতি অনুরাগ ও তদনুরূপ শিক্ষা-সাধন অভ্যাস পাইতে থাকে। যেখানে ধর্ম্মালোচনা ও ঈশ্বর-চর্চ্চা হইতেছে, সেখানে যদি নিতান্ত দুশ্চরিত্র ও অসাধু লোক গমন করে, এক দিনে না হয়, দুই দিনে, দুই দিনে না হয়, দশ দিনেও তাহার মনের ভাব-গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া ধর্ম্মে রতি ও ঈশ্বরে মতি উপস্থিত হয়। আবার যদি বিশুদ্ধচরিত্র ব্রহ্মপরায়ণ সাধু, দীর্ঘ কাল নাস্তিক পাষণ্ড দুরাচারদিগের মধ্যে অবস্থান করেন, তাহারদের সহবাস-দোষে তাঁহার হৃদয়ের উজ্জ্বল ভগবৎ-প্রেম ও ঐকান্তিক ধর্ম্মানুরাগ প্রভৃতি এককালে নির্ব্বাণ হইয়া যায়। কিছুকাল পরেই তিনিও তাহারদের মধ্যে এক জন হইয়া পড়েন। ঘোর বিদ্বান্ ব্যক্তিও যদি কিছু কাল মূর্খ-সমাজে বাস করেন, তাঁহার বিদ্যা-বুদ্ধির বিশেষ চালনা না হয়, তাহা হইলে তাঁহার সেই উপার্জ্জিত জ্ঞান-রাশি কাল-ক্রমে নিষ্প্রভ হইয়া যায়। অতএব আত্মোন্নতি-সাধন-জন্য সর্ব্বদা সাধু-সঙ্গে অবস্থান করিবে। সাধু-সঙ্গের গুণ কেহ কখনও বর্ণনা করিয়া শেষ করিতে পারে না। সাধু-সহবাসে উপার্জ্জিত জ্ঞান ও ভাব উজ্জ্বল হয়, অনুপার্জ্জিত সদাচার ও সত্য-সকল ক্রমে অভ্যস্ত এবং হস্তগত হইতে থাকে। তাঁহারদের ধ্যান-ধারণা প্রভৃতি সন্দর্শন করিলে, তাঁহারদের উপদেশ ও আলোচনা শ্রবণ করিলে নিতান্ত নীরস হৃদয়েও সেই সকল বিষয়ের অনুষ্ঠান জন্য ইচ্ছা স্পৃহা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। তদ্‌ভিন্ন তথায় অসৎ বিষয় ও অসৎ দৃষ্টান্তের অসদ্ভাব নিবন্ধন অসৎ প্রবৃত্তি সকল ক্রমে নিস্তেজ ও বলহীন হইয়া পড়ে। অতএব সর্ব্ব প্রযত্নে সাধু-সঙ্গ লাভের চেষ্টা করিবে।

আপনার অপেক্ষা জ্ঞান-ধর্ম্ম, বিদ্যা বুদ্ধি ও ঈশ্বর-প্রেম-সম্পন্ন লোকের সহবাস লাভ করিবার জন্যই বিশেষ যত্নবান্ হইবে। তদ্দ্বারা অধিকতর-রূপেই শিক্ষা

সাধন লব্ধ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। আদর্শ যত উন্নত হয়, দৃষ্টান্ত উপদেশ যত উচ্চ হয়, সাধকের পক্ষে ততই মঙ্গল। কদাচ দুশ্চরিত্র শিথিল-ইন্দ্রিয় লোকের সহবাসে থাকিবে না। তাহারদের অসৎ দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিবে না। ধর্ম্মদ্রোহী স্বেচ্ছাচারী কৃতঘ্ন লোকের সংসর্গে থাকিলে বুদ্ধিভ্রংশ হয়, অসৎ ইচ্ছা প্রবল হয়। ধর্ম্মে অনাস্থা, ঈশ্বরে অবিশ্বাস, পরলোকের অস্তিত্বে সংশয় উপস্থিত হইয়াথাকে। অতএব তাদৃশ লোকের সহবাস বিষবৎ পরিত্যাগ করিবে। "মূঢ় ব্যক্তিদিগের সহবাসে মোহের উৎপত্তি হয়, এবং প্রতিদিন সাধুসংসর্গে নিশ্চিত ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়।"

"মোহজালস্য যোনির্হি মূঢ়ৈরেব সমাগমঃ।
অহন্যহনি ধর্ম্মস্য যোনিঃ সাধুসমাগমঃ॥"

একারণ সাধুসংসর্গে অবস্থান করিবে।

জল-বায়ু-দূষিত প্রদেশে কোন সুস্থ সবল লোক গমন করিলেও যেমন তাহার অজ্ঞাতসারে তত্রত্য স্বাস্থ্যনাশক গরলরাশি অল্পে অল্পে দেহপ্রবিষ্ট হইয়া কালেতে তাহার শরীরকে রুগ্ন ভগ্ন ও অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলে, তেমনি অসৎ-সঙ্গের দোষপুঞ্জ নিঃশব্দে লোকের প্রকৃতিকে দূষিত ও কলঙ্কিত করিয়া দেয়।

সাধু-সঙ্গে ধর্ম্মবল লাভ হয়, অসাধুসঙ্গ কেবল মোহ উৎপন্ন করে। সাধু-সঙ্গ উন্নতির হেতু, অসাধু-সঙ্গ অধঃপতনের কারণ। সাধু-সঙ্গে জীবন লাভ হয়, অসাধুসঙ্গ মৃত্যুমুখে নিপাতিত করে। সাধু-সঙ্গে ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি বৃদ্ধি পায়, অসাধুসংসর্গে সংশয় ও অবিশ্বাস উৎপন্ন হইয়া মনুষ্যকে ঈশ্বর হইতে দূরে নিক্ষেপ করে। অসাধু-সঙ্গে পাপের প্রতি স্বাভাবিক ঘৃণা ও ধর্ম্মের প্রতি প্রকৃতিগত শ্রদ্ধাকে মন্দীভূত করিয়া দেয়। অতএব ধর্ম্মার্থী ব্যক্তি অসাধু-সঙ্গ পরিহার পূর্ব্বক অহরহঃ সাধু-সঙ্গ করিবেক। কিন্তু কদাচ কোন মনুষ্যকে ঘৃণা ও অনাদর করিবে না। এবং কোন সাধু সুধীরকেও এককালে সর্ব্ব-বিষয়ে অভ্রান্তমতি বলিয়া বিশ্বাস করিবে না। সাধুকে সাধু-উচিত সম্মান ও সমাদর করিবে এবং তাঁহার নিকট হইতে জ্ঞান-ধর্ম্ম-বিষয়ক উপদেশ লাভ করিয়া কৃতজ্ঞ থাকিবে। তাঁহাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিতে যত্নশীল হইবে। কিন্তু ঈশ্বরকেই বিশ্ব-গুরু জানিয়া তাঁহার সন্নিধানে চির-অবনত হইয়া থাকিবে। তাঁহাকেই জ্ঞান-ধর্ম্মের অভ্রান্ত আদর্শ জানিয়া সর্ব্ব-বিষয়ে তাঁহারই অনুকরণ করিতে অভ্যাস করিবে। তাঁহাকে পিতার পিতা, মাতার মাতা, গুরুর গুরু, রাজগণরাজা জানিয়া কায়মনোবাক্যে তাঁহার আদেশ উপদেশ সকল পালন করিবে। তাঁহার সমান বা তাঁহার পর আর কেহই নাই: "ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে" ইহা জানিয়া তাঁহাকে সমুদায় হৃদয়, সমুদায় মন, সমুদয় আত্মার সহিত শ্রদ্ধা-ভক্তি ও প্রীতি করিবে। তাঁহার নিকট চির-কৃতজ্ঞ হইয়া থাকিবে।

সাধু-সঙ্গ ও ধর্ম্ম-উপদেশ সকল ঈশ্বরলাভের সোপানমাত্র, ঈশ্বরকেই কেবল সমগ্র দেব মনুষ্যের একমাত্র স্তবনীয় সেবনীয় এবং পরমারাধ্য পরম সম্ভজনীয় জানিবে। তাঁহাকেই পাপের শাস্তা, পুণ্যের পুরস্কর্ত্তা, ইহ-লোকের পালয়িতা, পরলোকের আশ্রয়-দাতা ও অদ্বিতীয় মুক্তিদাতা জানিয়া তাঁহারই শরণাপন্ন হইয়া থাকিবে।

তিনিই কেবল জ্ঞানের একমাত্র আকর, প্রেমের অশেষ উৎস, সত্যের অনন্ত প্রস্রবণ, মঙ্গলের অসীম সমুদ্র। তাঁহা হইতেই জ্ঞান-প্রেম, সত্য মঙ্গল উৎসারিত হইয়া বিশ্ব-ভুবনকে জীবন-জ্যোতিতে, শোভা-সৌন্দর্য্যে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহারই

প্রেম শতধা বহুধা হইয়া পিতা-মাতার হৃদয়ে স্নেহ, গুরুজনচিত্তে প্রীতি, সতীর অন্তঃকরণে প্রণয়, দাতার হৃদয়ে দয়া, সমগ্র দেব মনুষ্যের আত্মাতে মঙ্গলভাবে দীপ্তি পাইতেছে। সকল শিক্ষা-সাধন, ও সাধু-সঙ্গ প্রভৃতি কেবল তাঁহাকেই লাভ করিবার জন্য। অতএব সেই গম্য স্থানের প্রতি অন্তশ্চক্ষু স্থির রাখিয়া তাঁহারই অভিমুখে ধাবিত হইবে। পথভ্রান্ত পথিকের ন্যায় অথবা সুখেচ্ছু পরিব্রাজকের মত পথের আপাতরম্য সুখ-সচ্ছন্দতায় বিমুগ্ধ হইয়া কদাচ সেই গম্য পথ বিস্মৃত হইও না। পান্থ-নিবাসের চারি-দিনের আরাম-ঐশ্বর্য্যে বিহ্বল হইয়া সেই চির-শান্তি-নিকেতনকে ভুলিয়া যাইও না। অথবা এখানকার সাধন তপস্যা-ক্লেশে অধীর ও উত্যক্ত হইয়া জীবনের পরম লক্ষ্য হইতে পরিভ্রষ্ট হইও না। ঈশ্বর বিনা আত্মার সুখ নাই, শান্তি নাই, আরাম নাই, মঙ্গল নাই। লোকে তাঁহাকে ছাড়িয়া যে সুখভোগ করে, সে দুঃখ। তাঁহা হইতে বিচ্যুত হইয়া যে মঙ্গল লাভ করে, তাহা অমঙ্গল। তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যে সম্পত্তি সম্ভোগ করে, তাহা বিপত্তি। তাঁহাকে ছাড়িয়া যে জীবন ধারণ করে, সে জীবন নয়, সেইই মৃত্যু। অতএব তাঁহাকেই লাভ করিবে, সেই অমৃতের আশ্রয়ে থাকিয়া মৃত্যু-মুখ হইতে প্রমুক্ত হইবে।

পরকাল।

৪৩৪ সংখ্যক পত্রিকার ১০৬ পৃষ্ঠার পর।

অতএব এক্ষণে দেখা আবশ্যক, মিল সাহেব প্রতিবোধ মধ্যে উক্ত তত্ত্বদ্বয়ের আগম-ক্রম নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন। কিন্তু এই আগম-ক্রম সমালোচনার পূর্ব্বে আমরা তাঁহার তদনুষঙ্গী মূল নির্দ্দেশটীর প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইলাম। অর্থাৎ আমরা ষ্টুয়ার্ট মিল প্রমুখ চিন্তাচতুর প্রামাণিক পণ্ডিতদিগের মতে সায় দিতে পারিতেছি না যে, ইন্দ্রিয়োপনীত অনুভূতি সকল ক্রমান্বয়ে কিছু কাল বোধগোচর করিয়া অভ্যাস ও সংস্কার বশতঃ আত্মেতর সত্তার ভাব আমাদের মনের উপলভ্য না হইলে, কোন প্রাথমিক অনুভূতির দ্বারা আমাদের আদিম প্রতিবোধে আত্মভাবের উদয় সম্ভব হয় না। আমরা স্বীকার করি বটে যে, আমাদের জ্ঞান আপেক্ষিক; কোন বিষয় জানিতে হইলে আমরা তাহাকে তদিতর বিষয় হইতে ভিন্ন বলিয়া না জানিলে আমাদের তৎবিষয়ক জ্ঞান সিদ্ধ হয় না; এবং জ্ঞানসিদ্ধির জন্য ন্যূনতম কল্পে দুটী বিষয়ের সদ্ভাব আবশ্যক হয়; অতএব মনে আত্ম-ভাবের উদয়ার্থ অন্য ভাবের সহযোগিতার প্রয়োজন অনিবার্য্য। স্বীকার করি—কিন্তু তাহা হইলেও আমাদের আদিম প্রতিবোধে, প্রথমোৎপন্ন অনুভূতির দ্বারা আত্মজ্ঞানের উদয় কেন যে হইতে পারে না, আমরা বুঝিতে অক্ষম। ইহাই বরং অধিকতর সম্ভব যে, প্রতিবোধের যুগ্মতা সাধন জন্য আমাদের সর্ব্বপ্রথম অনুভূতিই আত্মেতর বিষয়ের স্থানীয় হইয়া আমাদের আত্মোপলব্ধির সহায়তা করিবে। মনে কর সদ্যপ্রসূত শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়াই শীতানুভব করিল। এই প্রথমানুভূতি (শীতানুভূতি) শিশুর মনে বাহ্য জগতের ভাব উদ্দীপনে সমর্থ না হইলেও, তাহা কি তাহার চৈতন্য সম্পাদনার্থ যথেষ্ট নহে? তদর্থে কি অনুভূতির পৌনঃপুন্য দ্বারা প্রথমত আত্মেতর সত্তার অস্তিত্বজ্ঞান একান্ত আবশ্যক? কদাচ না। মনুষ্য ভূমিষ্ঠ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই যে, এই রূপে চেতনাবান হয়, মিল সাহেব বোধ হয়, ইহা অস্বীকার করিতেন না। অতএব যদি সদ্য-

প্রসূত শিশুকে চেতনাবান বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে কাজেই তাহাকে আত্মবোধবিশিষ্ট বলিয়াও স্বীকার করা হইল। কারণ আত্মবোধসম্পন্ন বুদ্ধির নামই চৈতন্য, সংজ্ঞা বা প্রতিবোধ। আত্মবোধবিহীন চৈতন্য যে কিরূপ, ইহা আমরা মনেও ধারণ করিতে পারি না। তরুণ চৈতন্য যত কেন ক্ষীণ হউক না, অতি অস্ফুট ভাবে হইলেও তাহাতে আত্মবোধ থাকিবেই থাকিবে। বস্তুতঃ এই অনতি-পরিস্ফুট প্রাথমিক চৈতন্য পরিণত হইয়া কালে মানব মনে আত্মভাবের,—স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব ভাবের দুর্জ্জয় আকার ধারণ করে।

প্রতিবাদিরা বলিবেন যে, আমাদের প্রত্যেক অনুভূতিই আমাদের চৈতন্যের ভিন্ন ভিন্ন অংশ। অনুভূতি হইতে চৈতন্য ভিন্ন-সত্তা নহে। অনুভূতি সমাহৃতির নামই চৈতন্য বা প্রতিবোধ। এবং ইহাই মন শব্দের অভিপ্রেত। অতএব আত্মবোধ প্রবুদ্ধ করিবার জন্য আমাদের কোন রূপ অনুভূতিই আত্মেতর সত্তার স্থান গ্রহণ করিতে পারে না। কেন না জ্ঞেয়ত্ব হেতুই বাহ্য সত্তার ভাব আমাদের মনে আত্মভাব উদ্বোধন করিতে সক্ষম হয়। কিন্তু অনুভূতিদের সেরূপ জ্ঞেয়ত্ব-ভাব নাই। অনুভূতিরা নিজেই জ্ঞাতা, তাহারা জ্ঞেয় হইতে পারে না। অনুভূতি অবগত হওয়া ও অনুভব করা, একই কথা। বরং অনুভূতিকে অনুভব করা বা অবগত হওয়া বলা অনাবশ্যক ও অসঙ্গত। কাজেই প্রাথমিক অনুভূতির দ্বারা যে চৈতন্যোদয় হয়, তাহাতে প্রতিবোধের যুগ্মতা সাধন হইবার, সুতরাং তাহাতে আত্মজ্ঞানের লেশ মাত্র থাকিবার, সম্ভাবনা নাই। তাহা কেবল সেই অনুভূতিরই বিকাশ মাত্র। তবে যে আমাদের বর্ত্তমান প্রতিবোধ মধ্যে আত্মভাব লক্ষিত হয়, তাহা আগন্তুক। যেহেতু তদাগমের স্বতন্ত্র আদিম ক্রম নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে।

তবে কি যথার্থই অনুভূতি সকলের অনুভূয়মান হইবার উপযোগিতা নাই? বৃদ্ধ জেমস্ মিল সাহেব যে বলেন যে, অনুভূতিকে অনুভব করা বলিলে একই ভাবের পুনরুক্তি করা হয়. ইহা কি সত্য? কখনই না। তবে যাঁহারা আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করিতে চাহেন না, এবং বর্ত্তমান প্রতিবোধে আত্মভাবের অনিবার্য্যতাকে কুসংস্কারের ফল বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন, অনুভূতির এরূপ ব্যাখ্যা তাঁহাদের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির উপযোগী হয় বটে, কিন্তু প্রকৃতার্থতঃ তাহা সত্য নহে। অনুভূতি, বোধ জ্ঞান প্রভৃতিকে আর্য্য দার্শনিকেরা জ্ঞেয় পদার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এমন কি পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য জ্ঞানেতে জড়ত্ব আরোপ করিয়াছেন। যথা—"জ্ঞানের জ্ঞেয়ত্ব হেতু জড়ত্ব আছে *" (হস্তামলক ভাষ্য)। কিন্তু তিনি "জড়ত্ব" কে অবশ্যই (non-ego) অনাত্মত্ব ভাবে প্রয়োগ করিয়াছেন সন্দেহ নাই।

আমাদের ইন্দ্রিয়বোধ কার্য্যকে দুই ভাবে দর্শন করা যাইতে পারে। এক ভাবে আত্মা বা অনুভবকারী বিষয়ীর সহিত উহার

---

* মনের জড়ত্বই আমাদের দেশীয় দার্শনিকগণের অভিপ্রেত, কিন্তু জ্ঞানের জড়ত্ব মানিতে হইলে জ্ঞানের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে হয়, এরূপ মত আমাদের দেশীয় কোন শাস্ত্র অনুমোদন করেনও নাই এবং করিতে পারেনও না, বোধ হয় লেখক চিত্ত বা মন বা ঐ পর্য্যায়ের অন্য কোন শব্দ মূলগ্রন্থে দেখিয়া থাকিবেন, তিনি প্রমাণটি উদ্ধৃত করিয়া দিলে আর কোন গোলই থাকিত না। সং

মুখ্য সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধ থাকাতেই আত্মা বাহ্য জগতের পরিচয় প্রাপ্ত হয়। অন্য ভাবে অনাত্ম বিষয়ের সহিত উহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই উভয় সম্বন্ধ চক্রকাপন্ন ভাবে সংগ্রথিত। অতএব বাহ্যানুভূতিকে কেবল শারীরিক বা কেবল মানসিক কার্য্য বলা যাইতে পারে না। প্রত্যুত এই উভয় কার্য্যের দুর্ব্বোধ্য সংযোগ দ্বারাই বাহ্যানুভূতি সমুদ্ভূত হয়। মনে কর উদীচীন বায়ু সংস্পর্শে তোমার শীত বোধ হইল। এই বোধ-কার্য্যকে দুই ভাবে কি দর্শন করা যায় না? এক শৈত্য অনুভব করা; দ্বিতীয়, শীতানুভূতি উপলব্ধি করা। একের সম্বন্ধ প্রধানতঃ বাহ্য বিষয়ের সহিত, অন্যটী প্রধানতঃ আত্মনিষ্ঠ। একটীতে বিশেষতঃ বহিঃসত্তার বা অনাত্ম ভাবের উদ্দীপনা হয়, অপরটীতে বিশেষ রূপে, আত্মভাবের উদ্দীপনা হয়। এক ভাবে শৈত্য তোমার মনের সাক্ষাৎ বিবেচ্য বিষয় অন্য ভাবে তদনুভূতিই কেবল মনের মুখ্য বিবেচ্য। এই উভয় ভাব একই ক্ষণে প্রকাশ পায়। তাহাদের মধ্যে অবিনাভাব সম্বন্ধ আছে, অর্থাৎ তাহারা পরস্পরের নিত্য সহচর। অপিচ প্রকৃত পক্ষে তাহাদের স্বতন্ত্র সত্তা নাই, তাহারা একই বিষয়ের ভিন্ন ভিন্ন পৃষ্ঠ। বোধ-কার্য্যে এরূপ দ্বিধাভাবাত্মক সম্বন্ধ স্বীকার না করিলে ও মূলে অনুভবকারী শক্তিবিশেষের অস্তিত্ব না মানিলে আমাদের কোন রূপ জ্ঞানের, অনুভূতি-বিকাশের সম্ভাবনা স্বীকার করা যায় না। কেন না ইহা নিশ্চয় যে, অনুভূতি সকলের পরস্পরের স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি না হইলে কোন রূপ একটী বিচ্ছিন্ন অনুভূতির ভাব প্রতিবোধ মধ্যে উদয় হইবার নহে। কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধিতেই প্রতিবোধের সিদ্ধি হয়। কিন্তু আমাদের অনুভূতি সকলের কাহারো নিজের এরূপ শক্তি নাই যে, সে জানিতে পারিবে সে অন্য হইতে ভিন্ন। আমাদের রূপানুভূতির এরূপ জ্ঞান থাকা সম্ভব নহে যে, সে আপনাকে রসানুভূতি প্রভৃতি অন্যান্য অনুভূতি হইতে পৃথক বলিয়া বোধ করিবে। সেই রূপ রসানুভূতিরও এরূপ বোধ-শক্তি নাই যে, সে আপনাকে রূপানুভূতি প্রভৃতি অন্যান্য অনুভূতি হইতে ভিন্ন বলিয়া জানিবে। প্রত্যুত কোন অনুভূতিরই এরূপ শক্তি থাকা স্বীকার করা যাইতে পারে না। কারণ যদি এরূপ অনুমান করা যায় যে, এক অনুভূতি অন্যের পরিচয় আদান প্রদানে সক্ষম, তাহা হইলে ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতির স্বতন্ত্র সত্তা একবারে নিষ্প্রয়োজন হয়। আর অনুভূতি সকলের সম্বন্ধে আমাদের প্রতিবোধ যে রূপ জ্ঞাপন করে তাহাও এরূপ অনুমানের সম্পূর্ণ বিপরীত। অতএব যখন রূপ, রস, গন্ধাদি ইন্দ্রিয়ার্থ সকল একত্র সমাবেশ হয় তখন তাহাদের পার্থক্য উপলব্ধি জন্য কেবল তত্তৎ অনুভূতি সকলই পর্য্যাপ্ত নহে। তদর্থে মনের শক্তি বিশেষের আবশ্যক হয়। এই শক্তি দ্বারা আমরা ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতিকে বিবিক্ত করিয়া তত্তৎ বিষয়ক জ্ঞান লাভ করি। অনুভূতি সকলের এরূপ পার্থক্য উপলব্ধ না হইলে আমাদের কোন প্রকার অনুভূতি বুদ্ধিগোচর হইত না—মন চিরকালই ভাবশূন্য, জ্ঞানশূন্য থাকিত। সুতরাং এক বোধ-কার্য্যে আমরা যেমন ইন্দ্রিয়ার্থ সকল জ্ঞানগোচর করি; তেমনি আবার তৎসহ তত্তৎ অনুভূতি সকলকেও অনুভব করিয়া থাকি। এক্ষণে তবে, অনুভূতি সকল অনুভূয়মানার্হ হইলে, কোনোরূপ প্রাথমিক অনুভূতি দ্বারা আমাদের মনে সহজে আত্মভাব

উদ্বোধিত না হইতে পারিবে কেন? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে মনের আত্মভাব উদ্বোধন জন্য আর অন্য কৃত্রিম ক্রমের আরোপণা কাজেই প্রয়োজন হয় না; এবং তাহা হইলে বর্ত্তমান প্রতিবোধে আত্মজ্ঞানের যে নিদর্শন পাওয়া যায় তাহাকে অবশ্যই প্রতিবোধের স্বাভাবিক ও বিশুদ্ধ বিজ্ঞপ্তি, বা অগৌণ জ্ঞান বলা যাইতে পারে। আর তাহা সুতরাং সন্দেহের অতীত। অতএব মিল সাহেব যে বলেন, ইন্দ্রিয়োপনীত অনুভূতি সকলকে দীর্ঘকাল বোধগোচর করিয়া অর্জ্জিত সংস্কার বিশেষ দ্বারা মনে আভ্যন্তর ভাবের উদ্ভব না হইলে, কোন রূপ আদ্যানুভূতির দ্বারা প্রতিবোধ মধ্যে আত্মভাবের উদ্বোধন হইতে পারে না, তাঁহার এ উক্তি সিদ্ধ উক্তি নহে।

আমরা উপরে প্রতিপন্ন করিয়াছি যে, আমাদের আত্মভাব বাহ্য বস্তু সন্নিকর্ষে প্রথম উদ্ভূত হয় বটে, কিন্তু তাহা বাহ্য জগতের ভাবের উপর একান্ত নির্ভর করে না। বাহ্যজগতের ভাব আমাদের মনে উদয় না হইলেও কেবল অনুভূতি মাত্রকে অবলম্বন করিয়া আত্মজ্ঞানের স্বাভাবিক প্রকাশ হইতে পারে। অতঃপর দেখা যাউক, আমাদের বর্ত্তমান প্রতিবোধ-বোধিত সে আত্মজ্ঞান কি রূপ যাহার জন্য মিল সাহেব এত কষ্ট কল্পনা করিয়া তদাগমের কৃত্রিম ক্রম নির্দ্ধারণের চেষ্টা করিয়াছেন? আত্মাকে আমরা কি বলিয়া জানি?

আমরা আত্মাকে—

"নির্বিকল্পং মনশ্চক্ষুরাদিপ্রবৃত্তৌ নিরস্তাঽখিলোপাধিরাকাশকল্পঃ।"

* * * * নিত্যবোধস্বরূপঃ মনশ্চক্ষুরাদিনা-বোধাত্মকানি।

প্রবর্ত্তন্তে আশ্রিত্য নিষ্কম্পমেকং * * * * * * ॥"

"যাহা মন চক্ষু আদি চতুর্দ্দশ ইন্দ্রিয়ের স্বস্ব ব্যাপারে নিমিত্ত স্বরূপ, সমস্ত উপাধি রহিত আকাশের ন্যায় বিশুদ্ধ, যাহা নিত্য-বোধ স্বরূপ, যাহাকে আশ্রয় করিয়া মন চক্ষু আদি অবোধাত্মক ইন্দ্রিয় সকল স্বস্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় এবং যাহা নিশ্চল ও একক"

(হস্তামলক)

এই রূপ বলিয়া জানি। বিশেষ রূপে প্রণিধান করিয়া দেখিলে সুস্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, এতদ্দ্বারা আত্মার যেরূপ স্বরূপ নির্দ্দেশ করা হইল, তাহা সাক্ষাৎ প্রতিবোধের বিষয়। আমরা প্রত্যেক ইন্দ্রিয়-বোধ-ক্রিয়াতে আত্মার এরূপ প্রকাশই অনুভব করিয়া থাকি। আমরা আপনাকে আমাদের প্রত্যেক মনন ও জ্ঞান শক্তির নিয়ন্তা এবং অনন্য একই নিত্য পুরুষ বলিয়া উপলব্ধি করি।

আমরা যে আপনাদিগকে (আমাদের আত্মাকে) আমাদের সংস্কার সকলের আশ্রয় ও কর্ত্তারূপে বর্ত্তমানে অনুভব করিয়া থাকি, ইহা মিল সাহেবও অস্বীকার করেন না। তিনি বলেন যে, আমাদের মনচক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের কার্য্যে কর্ত্তার ভাব অনুভব করা চির-অভ্যস্ত কুসংস্কারের প্রবর্ত্তনা ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। আমরা প্রথমতঃ চিরাভ্যস্ত সংস্কারের পরতন্ত্র হইয়া এরূপ কর্ত্তার অধিষ্ঠান অনুমান করিতে বাধ্য হই। এবং এই অনুমান দীর্ঘ কালের অভ্যাস দ্বারা আমাদের বিশ্বাসের সহিত এরূপ অনুস্যূত হইয়া যায় যে, পরিশেষে তাহা অপরিহার্য্য স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানবৎ প্রতীত হইয়া থাকে। প্রত্যুত এরূপ অনুমান করার কোন নির্দ্দিষ্ট কারণ নাই। আমরা যেমন ভৌতিক পদার্থের নানাবিধ গুণাভিব্যক্তি সন্দর্শন করিয়া সম্পূর্ণ রূপে অজ্ঞেয় আধার বস্তুর

(Noumena) কল্পনা করি, সেই রূপ জ্ঞান, চিন্তা, সংকল্প, বিকল্প, সুখ দুঃখ-বোধ প্রভৃতি মানসিক বিভাব সকলেরও আশ্রয়-ভূমির স্বরূপ মন বা আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সিদ্ধান্ত করিয়া থাকি। এরূপ সিদ্ধান্ত নিতান্ত অমূলক। সত্য বটে যে, উক্ত উভয়বিধ অভিব্যক্তির অধিষ্ঠানভূত কোন রূপ সৎ পদার্থে বিশ্বাস না করিয়া আমরা থাকিতে পারি না; মানব মাত্রেই তাহাতে বিশ্বাস করিয়া থাকে। কিন্তু সামান্য দার্শনিক বিচারে এই বিশ্বাস অলীক বলিয়া প্রতীত হয়।

এমন কতকগুলি পণ্ডিত আছেন যাঁহারা সকল বিষয়েই প্রমাণ অপেক্ষা করেন। এমন সহজ জ্ঞান যে আপনার স্বতন্ত্র অস্তিত্বের জ্ঞান, দেহাতীত আত্মার জ্ঞান, প্রমাণ ভিন্ন তাহারা এ জ্ঞানেও বিশ্বাস করিতে সম্মত নহেন, কুসংস্কার বলিয়া তাহা পরিহার করিতে উদ্যত। এবং তাহারা ইন্দ্রিয়-বোধনকেই প্রমাণের পরাকাষ্ঠা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তাঁহাদের মতে (Introspective philosophy) প্রত্যক্ বোধাত্মক দর্শন অসঙ্গত। সুতরাং তাঁহাদের নিকট আত্মপ্রত্যয়-মূলক জ্ঞানের গৌরব অল্প। এই স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান সকল ইন্দ্রিয়বোধন-মূলক না হইলে, তাঁহারা তৎতাবৎকে স্বাভাবিক কুসংস্কার বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। আর তাঁহাদের মতে কোন রূপ ইন্দ্রিয়বোধক্রিয়ার দ্বারা ইন্দ্রিয়াতীত আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না, অতএব আত্মার ভাব অপরিহার্য্য হইলেও ওরূপ প্রমাণ অভাবে তাহা কুসংস্কার-মূলক অসিদ্ধ বিশ্বাস, তাহা জ্ঞান শব্দের বাচ্য নহে।

অতএব দার্শনিক বিচারে মূল পূর্ব্বপক্ষ এই হইতেছে যে আমাদের জ্ঞানের সীমা কি?

আমাদের জ্ঞান দ্বিবিধ,—জড় ও মন বিষয়ক। কিন্তু এই উভয় জ্ঞানই আপেক্ষিক। আমরা অনপেক্ষ ভাবে কিছুই জানি না, জানিতে পারি না। যথা—জড় বিষয়ে আমরা কি জানি? জড় কি পদার্থ? আমাদের সম্বন্ধে উহা হয় জ্ঞেয়, না হয় অজ্ঞেয় পদার্থ। উহাকে জ্ঞেয় পদার্থ বলিলে ইহাই বুঝায় যে, যাহা আকৃতি বিস্তৃতি, গতি প্রভৃতি উপাধিতে আমাদের নিকট প্রতীত বা অভিব্যক্ত হয়, উহা তাহাই। আবার অভাবের অভিব্যক্তি আমাদের মনে কোন ক্রমে বিভাবিত হইতে পারে না, সুতরাং প্রাগুক্ত অভিব্যক্তি সকলকে কোন ভাবপদার্থে অধিষ্ঠিত বলিয়া জ্ঞান করিতেই হয়। কিন্তু এই যে কোন ভাবপদার্থ, ইহা নিজে আমাদের নিকট সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞেয়। ইহার গুণাভিব্যক্তি সকলকে পৃথক করিয়া দেও, ইহা আমাদের সম্বন্ধে শূন্য হইয়া যায়। বস্তুতঃ ঐ উপাধি-সকল-সম্পর্কেই জড় পদার্থ সকল আমাদের নিকট পরিচিত হয়, অতএব আমাদের তৎ বিষয়ক জ্ঞান আপেক্ষিক। উপাধিশূন্য দ্রব্যের ভাব আমাদের নিতান্ত অনবগম্য। আমরা তাহা চিত্তে ধারণ করিতেও পারি না। মন সম্বন্ধেও এই রূপ। মনকেও আমরা তাহার কতকগুলি বিভাব উপলক্ষে পরিজ্ঞাত হই। জ্ঞান, ইচ্ছা, বোধ ইত্যাদি কতকগুলি মানসিক বিকার* আমাদের প্রতিবোধ মধ্যে বিকাশিত হয়, মন সম্বন্ধে আমরা এই মাত্র জানি। মন যে নিজে কি, ইহা আমরা জানিতে পারি না, পারিবও না। উহা আমাদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ রূপে অনবগম্য। মানসিক ধর্ম্ম সমূহ দ্বারা আমরা মনের

---

* জ্ঞান মানসিক বিকারের দ্রষ্টা এই পর্য্যন্ত বলাই সঙ্গত হইতে পারে কিন্তু জ্ঞানকে মানসিক বিকার বলিলে জ্ঞানের একেবারেই অর্থ-বিপর্য্যয় ঘটে। সং

পরিচয় পাই, অতএব মন বিষয়ক জ্ঞানও আপেক্ষিক জ্ঞান।

আমাদের জ্ঞান নাকি আপেক্ষিক, দ্রব্যের স্বরূপ আমরা কিছুই জানি না, এই জন্য তর্কবাগীশেরা বলেন যে, কতকগুলি অনুভূতি, যাহাকে আমরা সাধারণ ভাষায় দ্রব্য-সঞ্জাত বলিয়া থাকি, সেই অনুভূতি ব্যতীত দ্রব্য সম্বন্ধে আমাদের আর কিছুই জানা সম্ভব নহে। কেবল তাহাই নহে, প্রকৃতত তাহারাই আমাদের বিশ্বাসের সর্ব্বস্ব, তদতীত অন্য সত্তায় বিশ্বাস করিবার কিছু মাত্র কারণ নাই। আমাদের বোধ-কার্য্যে কতকগুলি অনুভূতি ব্যতীত, অন্য কোন রূপ সৎ পদার্থের বিদ্যমানতা নাই। এরূপ সৎ পদার্থের ভাব আমাদের মানসিক সৃষ্টি। স্থান, বিস্তার, মূলাধার কারণ প্রভৃতি সমস্ত ভাব কোন পরিজ্ঞাত ব্যাসঙ্গনিয়ম দ্বারা আমাদের অনুভূতি সমূহ হইতে রচিত। অতএব ইন্দ্রিয়-বোধ-কার্য্যে আমরা প্রতিবোধ মধ্যে যে আত্মা ও আত্মেতর সত্তার ভাব প্রতীত করি, তাহা অর্জ্জিত, তাহা স্বাভাবিক-কুসংস্কার-প্রণোদিত।

ক্রমশঃ

বৈদিক আর্য্যসমাজ।

আমরা উপরি উক্ত প্রস্তাব লিখিতে আরম্ভ করিয়া বেদ, বেদবিভাগ, বেদব্যাখ্যা, বৈদিক ঋষিগণ এবং বৈদিক ঋষিদিগের ধর্ম্মভাবের বিষয় যথাসাধ্য বিবৃত করিয়াছি। এক্ষণে বৈদিক আর্য্যসমাজের একটি চিত্র অঙ্কিত করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। বিষয়টি অত্যন্ত দুরূহ। যদ্যপি অধুনা অস্মদ্দেশে পাশ্চাত্য সভ্যতার জ্যোতিঃ প্রকৃষ্টরূপে বিকীর্ণ হইয়াছে, তথাপি অস্মদ্দেশীয় ব্যক্তিগণ ভারতজননীর পূর্ব্বতন অবস্থার বিষয় অণুমাত্র চিন্তা করেন না। এই কথা বলিলে বোধ হয় কেহ কেহ আমাদের উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিবেন। তাঁহারা আমাদিগের আক্ষেপোক্তি স্বীকার করিবেন না। তাঁহাদিগের মত এই যে ইদানীং অস্মদ্দেশীয় ব্যক্তিরা ভারতের পূর্ব্বকালীন অবস্থা লইয়া অনেক সময় ক্ষেপণ করেন। আমাদের এরূপ অভিপ্রায় নহে যে আমরা এবিষয় একবারেই অস্বীকার করি, কিন্তু আমরা বলি যে ভারতের পূর্ব্বদশার প্রতি ভারতীয় ব্যক্তিগণের যতদূর মনোযোগ দেওয়া উচিত ও আবশ্যক, ততদূর মনোযোগ কেহই দেন না। ইহা এক প্রকার স্থির সিদ্ধান্ত বলিলেও হয় যে যৎকালে কোন জাতি অত্যন্ত অবনত এবং অধোগত হইয়া পড়ে তৎকালে ইহার পূর্ব্বকালীন অবস্থার প্রতি দৃষ্টি ও তদালোচনাই ইহার উন্নতির একমাত্র উপায়। ইউরোপস্থ জর্ম্মেণি প্রদেশ ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। জর্ম্মেণির যখন অবনতি ঘটিয়াছিল তখন জর্ম্মেণিবাসিরা ইহার প্রাচীন সাহিত্য এবং পুরাতন অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন এবং তাহারই আলোচনার দ্বারা উন্নতির পথে পুনর্ব্বার পদার্পণ করেন। তদ্রূপ ভারতবাসিরা ভারতের প্রাচীন সাহিত্য এবং পুরাতন অবস্থার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ না করিলে ভারতের উন্নতির আর কোন আশা নাই। ভারতে আর্য্যগণ কিরূপ সামাজিক অবস্থাতে বাস করিতেন তাহাই প্রদর্শন করা এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। কোন একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়াছেন যে গ্রীসদেশীয় প্রাচীন সাহিত্য ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যের ছায়া মাত্র এবং জর্ম্মেণির প্রাচীন সাহিত্য গ্রীসীয় প্রাচীন সাহিত্যের ছায়ামাত্র। বৈদিক আর্য্যসমাজ

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের আদরের পদার্থ কিন্তু ভারতবাসিদিগের যে কেন নহে তাহা বুঝিতে পারা যায় না। বৈদিক আর্য্যসমাজের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে হইলে বেদ-চতুষ্টয়, ব্রাহ্মণ-গ্রন্থ সমূহ এবং উপনিষৎ সকলের আশ্রয় লইতে হয়। বেদচতুষ্টয়ের মধ্যে ঋগ্বেদের উপযোগিতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, কারণ ঋগ্বেদসংহিতাতে বৈদিক আর্য্যসমাজের বিবরণ যতদূর প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, অন্য কোন গ্রন্থ হইতে ততদূর প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব। বৈদিক আর্য্যসমাজে সভ্যতার কতদূর শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল তাহাও এ প্রস্তাবে প্রদর্শন করা হইবে। আর্য্য-সমাজের অবতারণা করিবার পূর্ব্বে সভ্যতা-বিষয়ে দুই চারি কথা বলা একান্ত আবশ্যক। সভ্য অবস্থার নাম সভ্যতা এবং অসভ্য অবস্থার নাম অসভ্যতা। সভ্যতা যে কি পদার্থ তাহা আমাদিগকে বুঝাইতে হইবে না। অধুনা সকলেই জানেন সভ্যতা কাহাকে বলে এবং অসভ্যতা কাহাকে বলে। সমাজসংগঠন পূর্ব্বক একত্র বাস এবং পাশব প্রবৃত্তি সংযমন সভ্যতার দুইটি প্রধান লক্ষণ। মনুষ্য যতই সভ্য হইতে থাকে ততই পাশব প্রবৃত্তি সমূহের উচ্ছেদ সাধন পূর্ব্বক উন্নতির দিকে ধাবমান হয়। উন্নতিই সভ্যতার মুখ্য ভাব। সামাজিক জীবনের সম্পূর্ণতা সাধন এবং ব্যক্তিগত আন্তরিক জীবনের উন্নতিবিধান সভ্যতার প্রধান অঙ্গ। মনুষ্য এবং মনুষ্যের মানসিক ভাব ও শক্তির উৎকর্ষ বিধান সভ্যতার প্রকৃত উদ্দেশ্য। সমাজগত এবং ব্যক্তিগত উৎসাহ বিবর্দ্ধন, সমাজের ও মানবজাতির উন্নতি—সভ্যতার দুইটি পরিচায়ক লক্ষণ। সভ্যতার বিবরণ লিখিতে হইলেই সমাজ কতদূর উন্নত হইয়াছিল এবং মানবজাতির কতদূর উন্নতি হইয়াছিল এই দুইটি বিষয় অগ্রে দেখিতে হইবে। এই দুইটি বিশেষক লক্ষণ দেখিলেই সভ্যতার অস্তিত্ব ও পরিমাণ নিরূপণ করা যাইতে পারে। মনুষ্য স্বভাবতঃ উন্নতিপ্রবণ, উন্নতির দিকে ধাবমান হওয়া মানবপ্রকৃতি। মনুষ্য সর্ব্বকালেই নিজের অবস্থার অসম্পূর্ণতা দূর করিয়া সম্পূর্ণতা-বিধানে ব্যস্ত। পৃথিবীর আদিম কালে মনুষ্যের যেরূপ অবস্থা ছিল এবং এক্ষণে যেরূপ অবস্থা হইয়াছে তাহার প্রভেদ কে না জানেন? মনুষ্য আদিম কালীন অবস্থা হইতে ক্রমশঃ যে উন্নতি সাধন করেন তাহাই সভ্যতার ইতিহাস। এই উন্নতি সমস্ত মানবজাতিরও হইতে পারে এবং কোন এক বিশেষ জাতিরও হইতে পারে। সভ্যতার ইতিহাস দ্বিবিধ ভাবে এবং দ্বিবিধ আকারে আলোচিত হইতে পারে। হয় আমরা কোন এক বিশেষ সময় নির্বাচন পূর্ব্বক সেই সময়ের মনুষ্যের মনোমধ্যে প্রবেশ করিব এবং তাহার মানসিক পরিবর্ত্তন সমূহের আলোচনা ও বর্ণনা করিব; নতুবা আমরা কোন এক জাতির সামাজিক জীবনের বাহ্য ঘটনাবলী ও পরিবর্ত্তন সকল বিশেষ রূপে বিবৃত করিব। এক পক্ষে ব্যক্তিগত আন্তরিক ভাব এবং অপর পক্ষে বাহ্য সামাজিক জীবনের পরিবর্ত্তন। এক দিকে কোন একটি বিশেষ সময় নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক, সেই সময়ের মনুষ্যের মানসিক পরিবর্ত্তন এবং আন্তরিক ভাব আলোচনা করিতে হইবে এবং অপর দিকে কোন একটি জাতির সামাজিক জীবনের ঘটনাবলী এবং বাহ্য ভাব সম্যক্‌রূপে পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে। পৃথিবীর প্রথমাবস্থা হইতে এই ঊনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত সভ্যতার স্রোত সমভাবে এবং অবিচ্ছিন্নরূপে প্রবাহিত হয়

নাই। কখন সভ্যতার উন্নতি, কখন অবনতি এবং কখন বা স্থিরভাবে স্থিতি লক্ষিত হয়। যে সকল জাতি এককালে সভ্যতার অধিনায়ক ছিল, এক্ষণে তাহাদের মধ্যে নানাবিধ আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সভ্যতার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে এক জাতির পর আর এক জাতি বিস্মৃতিসাগরে নিমগ্ন হইতেছে এবং একজাতির পর আর একজাতি সমাজে প্রাধান্য লাভ করিতেছে। সভ্যতার অতিবৃদ্ধি কোন জাতিরই বাঞ্ছনীয় নহে, কারণ সভ্যতার অতিবৃদ্ধি হইতেই সভ্যতার অবনতির আরম্ভ হইয়াছে। যদ্রূপ সূর্য্য পূর্ব্বদিক্ হইতে ক্রমশঃ পশ্চিম দিকে গমন করেন এবং অবশেষে অস্তমিত হয়েন, তদ্রূপ সভ্যতার প্রবাহও পৃথিবীর পূর্ব্বদিক্ হইতে পশ্চিম দিকে চলিয়াছে। সভ্যতার জন্মভূমি ভারতবর্ষ হইতে সভ্যতার স্রোতঃ ক্রমশঃ পশ্চিমদিগভিমুখে প্রবাহিত হইয়া এক্ষণে আমেরিকা দেশে উপস্থিত হইয়াছে। যতই পশ্চিম দিকে সভ্যতার গতি প্রসৃত হইয়াছে ততই পূর্ব্বদিকে সভ্যতার হ্রাস ঘটিয়াছে। যে সকল কারণে সভ্যতার এইরূপ হ্রাস ও বৃদ্ধি ঘটে, তাহা দ্বিবিধ—আন্তরিক এবং বাহ্য। আন্তরিক কারণ মনুষ্যজাতির মধ্যে স্থিত এবং বাহ্য কারণ এই বাহ্য প্রকৃতির অন্তর্গত। কোন প্রদেশের জল ও বায়ুর ভাব, ভূমির অবস্থা, আহারের দ্রব্যাদি এবং প্রকৃতির বাহ্য আকৃতি—এই সমস্তই সভ্যতার বিকারের বাহ্য কারণ। কিন্তু এই গুলি ব্যতীত যে কারণান্তর নাই, তাহা কোন ক্রমেই বলা যায় না। যদি আমরা গ্রীস এবং রোমের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করি, তাহা হইলে আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাইব যে বাহ্য প্রকৃতির অতি সামান্য বিকৃতি ঘটিয়াছে, কিন্তু জাতিগত বিকার অত্যন্ত অধিক হইয়াছে। সুতরাং কেবল বাহ্য কারণ সকল হইতে আমরা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি না। আমাদিগকে ব্যক্তিগত এবং জাতিগত আন্তরিক কারণও দেখিতে হইবে। মনুষ্যের মনোমধ্যে যে সকল পরিবর্ত্তন ও বিকার ঘটিয়া থাকে, সভ্যতার উন্নতি, অবনতি বা স্থিতি বিশেষ রূপে তৎসাপেক্ষ। সুতরাং সভ্যতার উন্নতি ও অবনতির বিষয় পর্য্যালোচনা করিতে হইলে আমাদিগের উভয় কারণই পরীক্ষা করিতে হইবে। সমাজের উন্নতি এবং মনুষ্যজাতির উন্নতি সভ্যতার দুইটি সমুজ্জ্বল পরিচায়ক লক্ষণ। এই দুইটি লক্ষণ প্রয়োগ পূর্ব্বক সভ্যতার উন্নতি, অবনতি বা স্থিতি অনুমান করিতে হইবে। যেখানে আমরা দেখিতে পাইব যে মনুষ্যজাতির বিশেষ উন্নতিসাধন হইয়াছে এবং তৎসঙ্গে সমাজের উন্নতি হইয়াছে, সেখানেই সভ্যতার বিশেষ প্রভাব আমাদিগের অনুভূত হইবে। সভ্যতার উন্নতি এক দিনে সাধিত হয় না, ইহা বহু-দিনসাপেক্ষ। আমাদের বর্ত্তমান প্রস্তাবের বিষয় বৈদিক আর্য্যসমাজ। বৈদিক আর্য্যসমাজের কিরূপ অবস্থা ও প্রকৃতি ছিল তাহাই প্রদর্শন করা আমাদের উদ্দেশ্য। উক্ত সমাজের প্রকৃতি প্রদর্শন করিতে হইলেই উহার কতদূর উন্নতি হইয়াছিল এবং উহার অন্তর্ভূত আর্য্যগণ কতদূর উন্নত হইয়াছিলেন এই দুইটি বিষয়ই প্রদর্শন করিতে হইবে। এই দুইটি বিষয় দেখাইতে হইলেই বৈদিক আর্য্যসমাজে সভ্যতার প্রভাব কতদূর প্রসৃত হইয়াছিল তাহা স্বতঃই আসিয়া পড়িবে। ভারতীয় আর্য্যগণ ভারতবর্ষের আদিমনিবাসী কি না এবং তাঁহারা ভারতবর্ষে সর্ব্ব প্রথমে সমাজ-বন্ধ

হইয়াছিলেন কি না এই দুই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নহে। ঋগ্বেদসংহিতা হইতে আমরা জ্ঞাত হই যে ভারতবর্ষ আর্য্যদিগের আদিম নিবাসস্থান নহে। ঋগ্বেদসংহিতার প্রথম অষ্টকের ত্রিংশ সূক্তের নবম ঋকে আমরা দেখিতে পাই যে ইন্দ্র আর্য্যদিগের পুরাতন নিবাসস্থানের সর্ব্বরক্ষক প্রভু ছিলেন এবং আর্য্যগণ তাঁহাকে বহু জনের পালক বলিয়া প্রার্থনা করিতেন। এই ঋকে আর্য্যদিগের আদিম আবাসস্থানকে "প্রত্ন ওকঃ" অর্থাৎ পুরাতন বাসস্থান বলা হইয়াছে। এই স্থানে আর্য্যগণ সপ্ত পরিবারে বিভক্ত ছিলেন এবং ইন্দ্র ও বিষ্ণুর আশ্রয়ে বাস করিতেন। তদনন্তর তাঁহারা কোন অজ্ঞাত কারণবশতঃ ঐ পুরাতন বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া আর্য্যকুল পালক বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইয়া ভারতবর্ষের অভিমুখে আগমন করেন। আর্য্যগণের সপ্ত পরিবারের মধ্যে ভারতীয় আর্য্যগণ এক পরিবারের অন্তর্ভূত। ভাষাতত্ত্ব দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে যে প্রাচীনকালে আর্য্যবংশের বর্ত্তমান সপ্তবিভাগ বা সপ্তপরিবার একত্র বাস করিত। ঋগ্বেদসংহিতার প্রথমাষ্টকের ২২ সূক্তের ষোড়শাদি ঋকে আমরা দেখিতে পাই যে বৈদিক ঋষিগণ তাঁহাদিগের সপ্ত পরিবারের নিবাসস্থানবিশিষ্ট ভূপ্রদেশের কথা বলিয়াছেন এবং ঐ স্থান হইতে যে বিষ্ণু তাঁহাদিগকে লইয়া ভারতবর্ষাভিমুখে আসিয়াছিলেন তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন *। সুতরাং ইহা স্থির যে আর্য্যগণ ভারতবর্ষের আদিম নিবাসী নহেন এবং তাঁহারা তাঁহাদিগের প্রাচীন বাসস্থান হইতে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এই প্রাচীন বাসস্থান কোথায়? এই প্রশ্নের মীমাংসা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এ বিষয়ে অন্ততঃ দশবিধ মত প্রচলিত রহিয়াছে। কেহ বলেন ইহা বাহ্লীক (Balkh) প্রদেশ, কোন মতে ইহা আমু নদীর উপত্যকা, কোন মতে ইহা এসিয়া মহাদেশের মধ্যভাগে অবস্থিত ভূখণ্ড বিশেষ এবং কোন মতে ইহা ভারতবর্ষ। কেহ বলেন ইহা ককেশশ পর্ব্বতের সমীপবর্ত্তি এবং কেহ বলেন ইহা হিমালয় পর্ব্বতের উত্তরে স্থিত। হিমালয়ের উত্তরে আর্য্য-জনপদ ছিল। উত্তরকুরু, উত্তরমদ্র, কাম্বোজ, বাহ্লীক প্রভৃতি আর্য্য-উপনিবেশ হিমালয়ের উত্তরস্থিত এবং গান্ধারদেশ হিমালয়ের পশ্চিম দিকে স্থিত। কাম্বোজ বর্ত্তমান ভূখারা দেশের সন্নিহিত। অমরকোষ, শব্দরত্নাবলী প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থে ইন্দ্রালয় নামে হিন্দুকুশপর্ব্বতের উত্তরস্থিত এক স্থানের উল্লেখ আছে। জনষ্টোন সাহেবকৃত এসিয়ার মানচিত্রে "ইন্দ্রালয়" নামে একটি স্থান হিন্দুকুশ পর্ব্বতের উত্তরে দৃষ্ট হয়। এই ইন্দ্রালয়ই বোধ হয় আর্য্যদিগের আদিম নিবাসভূমি *। ইহারই বোধ হয় ঋগ্বেদে "প্রত্ন ওকঃ" নামে উল্লেখ আছে। এই প্রাচীন বাসস্থানে ইন্দ্র আর্য্যদিগকে রক্ষা করিতেন, সুতরাং ইহার নাম ইন্দ্রালয় হইয়াছে। ইন্দ্রালয় ইন্দ্র কর্তৃক রক্ষিত আর্য্যদের আদিভূমি। ইন্দ্র আর্য্যগণের রক্ষক ছিলেন বলিয়া আর্য্যগণ তাহাদিগের আদিবাসভূমির ইন্দ্রালয় নাম রাখিয়াছিলেন। বর্ত্তমান ইন্দ্রালয় প্রাচীন ইন্দ্রালয়ের প্রায় ২০০ ক্রোশ দক্ষিণে স্থিত বলিয়া অনুমিত হয়। ইহা অত্যন্ত হিমপ্রধান দেশ ছিল এবং ঋগ্বেদসংহিতা পাঠে অবগত হওয়া যায় যে আর্য্যগণ ভারতবর্ষে প্রবে-

* শ্রীযুক্ত রমানাথ সরস্বতী সম্পাদিত ঋগ্বেদ সংহিতা দেখ।

* শ্রীযুক্ত রমানাথ সরস্বতী সম্পাদিত ঋগ্বেদ সংহিতা দেখ।

শের পূর্ব্বে হিমপ্রধান দেশে বাস করিতেন এবং হিমপ্রধানদেশবাসিদিগের ন্যায় হিমঋতু দ্বারা বৎসর গণনা করিতেন। ইন্দ্রালয়ে তাঁহারা সপ্ত পরিবারে বিভক্ত ছিলেন এবং আর্য্যসমাজের ভিত্তি সংস্থাপন করিয়াছিলেন। তখন তাঁহারা এক ভাষা ব্যবহার করিতেন এবং মাংসভক্ষণ, উষ্ণ পরিচ্ছদ পরিধান প্রভৃতি না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। এই পুরাতন আলয়ে তাঁহারা গ্রীক, রোমান, কেল্‌ট, টিউটন, শ্লাভোনিক এবং পারসীকদিগের সহিত একত্র বাস করিতেন। তাঁহাদিগের জীবনস্রোত একভাবে প্রবাহিত হইত। তাঁহারা একবিধ সুখ ও দুঃখ ভোগ করিতেন, এক ভাষায় কথা কহিতেন এবং একবিধ সামাজিক অবস্থায় অবস্থিত ছিলেন। ক্রমশঃ আর্য্যসমাজ মধ্যে পরিবারের আধিক্য হইল এবং পরস্পর বিবাদ হইতে লাগিল। এক এক দল করিয়া ক্রমে ক্রমে সকলে ইন্দ্রালয় পরিত্যাগ করিলেন এবং পাঁচ দল ইউরোপে গমন করিলেন। পরে এক দল পারস্যে গমন করিল। অবশেষে ভারতীয় আর্য্যেরা ভারতবর্ষাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা সর্ব্বশেষে ইন্দ্রালয় ত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া তাহাদিগের প্রাচীন আর্য্যসমাজ-সম্পত্তির ভাগ অধিক। তাঁহাদিগের মধ্যে যত উপাখ্যান আখ্যায়িকা, ইতিহাস, গল্প প্রভৃতি দৃষ্ট হয়, তত আর কোন আর্য্যজাতির মধ্যে দৃষ্ট হয় না। এতদ্ভিন্ন ভারতীয় আর্য্যজাতি এবং অন্যান্য আর্য্যজাতির মধ্যে যতদূর সাদৃশ্য আছে, তাহাদিগের মধ্যে পরস্পর ততদূর সাদৃশ্য নাই। গ্রীক ও জার্ম্মাণ জাতিদিগের পরস্পর যেরূপ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়, হিন্দু ও গ্রীক অথবা হিন্দু ও জার্ম্মাণ জাতিদিগের পরস্পর সাদৃশ্য তদপেক্ষা অধিক। ইদানীন্তন কালে আমরা দেখিতে পাই যে যদি কোন এক বংশ এক স্থানে বাস করে এবং বংশবৃদ্ধি হইলে তদ্বংশীয়দিগের মধ্যে পরস্পর কলহবশতঃ তাহারা ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যান্য স্থানে বাস করে, তবে যাহারা সর্ব্বশেষে ঐ স্থান ত্যাগ করে তাহাদিগের প্রাচীন সম্পত্তির ভাগ যত অধিক থাকে আর কাহারও তত অধিক থাকে না। এতদ্ভিন্ন যাঁহারা শেষে প্রাচীন সাধারণ আলয় ত্যাগ করেন তাঁহাদিগের এবং যাঁহারা পূর্ব্বে ত্যাগ করিয়াছেন তাঁহাদিগের মধ্যে পরস্পর যত ঐক্য থাকে, পূর্ব্বত্যাগিদিগের মধ্যে পরস্পরের তত ঐক্য থাকে না। আর্য্যদিগেরও ঠিক তাহাই ঘটিয়াছিল। হিন্দু আর্য্যগণ প্রাচীন সাধারণ আর্য্যভাণ্ডারের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব হিন্দু আর্য্যগণ সর্ব্বশেষে ইন্দ্রালয় ত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহারা তাঁহাদিগের সাধারণ ভাষার সংস্কার করণানন্তর উহাকে সংস্কৃত নামে নামিত করেন। ইহা বৈদিক সংস্কৃত ভাষা। প্রথমতঃ পঞ্চনদ প্রদেশে তাঁহারা সমাজ সংস্থাপন পূর্ব্বক বাস করেন। এই প্রদেশই তাঁহারা বৈদিক আর্য্যসমাজের সুপ্রতিষ্ঠা করেন। পর-প্রস্তাবে আমরা বৈদিক আর্য্যসমাজের বিবরণ বিবৃত করিব।

ক্রমশঃ

রামানুজের সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত।

পূর্ব্বসাগরের পশ্চিম তটে তোণ্ডীরমণ্ডল প্রদেশে ভূতপুরী নামে কোন এক সুপ্রসিদ্ধ নগরী ছিল। তথায় হারীতবংশীয় কেশবনামে একজন ধর্ম্মশীল বাস করিতেন। তিনি নিঃসন্তান, এই জন্য সর্ব্বদাই অসুখী থাকি-

ছেন। প্রসিদ্ধি এইরূপ যে রামানুজের দৈব অংশে জন্ম হয়। একদা চন্দ্রগ্রহণকালে কেশব সস্ত্রীক পুত্রেষ্টি যাগ করেন। ভগবান হরি তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া স্বপ্নযোগে তাঁহাকে এইরূপ প্রত্যাদেশ করিলেন যে, আমিই তোমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিব।

ঐ সময় নারায়ণ দেবী লক্ষ্মীর সহিত বৈকুণ্ঠধামে উপবিষ্ট হইয়া কি উপায়ে জীবগণের সদ্গতি লাভ হইতে পারে এই বিষয় আলোচনা করিতেছিলেন। এই অবসরে নাগরাজ বাসুকি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন নারায়ণ বাসুকিকে সম্মুখীন দেখিয়া কহিলেন, নাগরাজ! আমি লোক রক্ষার্থ শঙ্খ চক্র প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র এবং বিশ্বকসেন প্রভৃতিকে ভূলোকে নিয়োগ করিয়াছি, এক্ষণে তুমিও আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত তথায় অবতীর্ণ হও। নাগরাজ নারায়ণের এই বাক্যে সম্মত হইয়া প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর কেশবের পত্নী যথাকালে অন্তর্বত্নী হইলেন। নাগরাজ তাঁহার গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষীয় পঞ্চমীতে ভূমিষ্ঠ হন। ইনিই রামানুজ, ইঁহার অপর নাম লক্ষ্মণার্য্য। রামানুজ ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমে রক্ষকাম্বা নাম্নী এক রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। বিবাহের অব্যবহিত পরে তাঁহার পিতা কেশবের মৃত্যু হয় এবং তিনি কাঞ্চীপুরে গিয়া যাদবাচার্য্যের নিকট শাস্ত্রাধ্যয়ন করেন। তৎকালে এক ব্রহ্মরাক্ষস কাঞ্চীপুরের রাজকুমারীর উপর অত্যন্ত উপদ্রব করিতেছিল। যাদবাচার্য্য এই সংবাদ পাইয়া ব্রহ্মরাক্ষসের উপদ্রব শান্তির নিমিত্ত শিষ্য সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হন কিন্তু তিনি তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। পরিশেষে রামানুজের চরণস্পর্শ মাত্রে ঐ উপদ্রব শান্তি হইয়া যায়। তখন কাঞ্চীপুরের রাজা এই ব্যাপার অবগত হইয়া উহাঁকে প্রার্থনাধিক অর্থদান করিলেন। গোবিন্দ রামানুজের মাতৃস্বস্রীয়। ঐ সময় তিনিও যাদবাচার্য্যের নিকট পাঠস্বীকার করিয়া কাঞ্চীপুরে অবস্থিতি করিতেন। একদা যাদব কোন একটি শ্রুতিবাক্যের অযথা অর্থ করিতেছিলেন। এই প্রসঙ্গে রামানুজের সহিত তাঁহার ঘোরতর বিবাদ হয় এবং রামানুজ তাঁহার সহবাস পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া যান।

ক্রমশঃ রামানুজের গুণাধিক্য যাদবাচার্য্যের অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি উহাঁর বধকামনায় পুনর্ব্বার উহাঁকে মিষ্টবাক্যে সন্তুষ্ট করিলেন এবং শিষ্যগণের সহিত যুক্তি করিয়া স্বীয় অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত প্রয়াগ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। গতিপথে রামানুজ মাতৃস্বস্রীয় গোবিন্দের পরামর্শ ক্রমে গোন্দারণ্য নামক স্থানে পলায়ন করেন। তিনি অসহায় ও প্রাণভয়ে ভীত। কিম্বদন্তী এইরূপ যে ভগবান হস্তিগিরিনাথ তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য দেবী লক্ষ্মীর সহিত ব্যাধমিথুন-বেশে তাঁহার নিকট উপস্থিত হন এবং রামানুজও তাঁহার অনুকম্পায় পুনরায় কাঞ্চীপুরে প্রত্যাগমন করেন। ঐ সময় যামুনাচার্য্য নামা কোন এক সন্ন্যাসী রঙ্গনগরে বাস করিতেন। তিনি সুলক্ষণাক্রান্ত একটি বালকের জন্য নানাদেশে শিষ্যগণকে পাঠাইয়া দেন। শিষ্যেরা রামানুজের পরিচয় পাইয়া সন্ন্যাসীকে সমস্ত জ্ঞাপন করিল। পরে যামুনাচার্য্য রামানুজের দর্শনকামনায় রঙ্গনগর হইতে কাঞ্চীপুরে গমন করিলেন। পথিমধ্যে হস্তিগিরি নগর। তথায় তাঁহার এক শিষ্য ছিল, উহার নাম কাঞ্চীপূর্ণ। যামুনাচার্য্য উহাঁকে লইয়া তথা হইতে নির্গত হইলেন। ঐ সময় যাদব হস্তিগিরিনাথের দর্শনকামনায়

পুনর্মিলিত রামানুজ প্রভৃতি শিষ্যগণের সহিত তথায় উপস্থিত হন। এই সূত্রে যামুনাচার্য্য রামানুজকে দেখিতে পান।

একদা রামানুজ যাদবাচার্য্যের সর্ব্বাঙ্গে তৈলমর্দ্দন করিয়া দিতেছিলেন, ঐ সময় তাঁহার নিকট একটী শ্রুতিবাক্যের অযথা অর্থ শুনিতে পান। তিনি ঐ শ্রুতিবাক্যের অপার্থতায় অতিমাত্র অসন্তুষ্ট হইয়া বিচারে যাদবকে পরাস্ত করিলেন। এই ব্যাপারে যাদবাচার্য্যও ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে তথা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। তখন রামানুজ অপমানিত হইয়া পুনরায় হস্তিগিরি নগরে প্রত্যাগমন করেন এবং হস্তিগিরিনাথের সেবায় নিযুক্ত হন।

একদা যামুনাচার্য্য হস্তিগিরিনাথের নিকট পাঠ করিবার নিমিত্ত কতকগুলি শ্লোক রচনা করিয়া এক শিষ্যকে পাঠাইয়া দিলেন। শিষ্য গিয়া যখন ঐ সমস্ত শ্লোক পাঠ করিতেছিলেন তখন রামানুজ তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি অনুসন্ধানে জানিলেন যামুনাচার্য্য ঐ শ্লোকের রচয়িতা। পরে তিনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তদীয় শিষ্যের সহিত রঙ্গনগরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ঐ সময় যামুনাচার্য্যও তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিবার জন্য কাবেরী নদীর তীর পর্য্যন্ত উপস্থিত হন, কিন্তু তথায় উৎকট পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া দেহত্যাগ করেন। এদিকে রামানুজ গতি-প্রসঙ্গে তথায় আসিয়া এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিলেন। তখনও যামুনাচার্য্যের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া যথাবিধি সমাহিত হয় নাই। রামানুজ দেখিলেন তাঁহার হস্তের তিনটি অঙ্গুলী সঙ্কুচিত হইয়া আছে। প্রসিদ্ধি এইরূপ যে যামুনাচার্য্য শ্রীভাষ্যাদি রচনা করিবেন তাঁহার এইরূপ অভিপ্রায় ছিল কিন্তু তাঁহার জীবিতকাল অতিসংক্ষিপ্ত হইয়া আসিলে তিনি মনে করিলেন যে রামানুজের প্রতিই এই ভারটি অর্পণ করিয়া যাইবেন। কিন্তু রামানুজের কালবিলম্ব হওয়াতে তিনি হস্তের তিনটি অঙ্গুলি সঙ্কুচিত করিয়া দেহত্যাগ করেন. পরে রামানুজ তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিয়া শ্রীভাষ্য রচনা প্রভৃতি তিনটি কর্ত্তব্য সাধনের অঙ্গীকার করিলে পর ঐ তিন অঙ্গুলি অসঙ্কুচিত হইয়া যায়।

অনন্তর রামানুজ পূর্ণাচার্য্যের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য রঙ্গনগরে গমন করেন এবং তথায় পঞ্চসংস্কারে দীক্ষিত হইয়া পুনরায় স্বগৃহে প্রতিনিবৃত্ত হন। তৎকালে পূর্ণাচার্য্যও সস্ত্রীক তাঁহার সহিত আগমন করিয়াছিলেন। রামানুজ গৃহে আসিয়া দ্রাবিড় দেশীয় শাস্ত্র সকল অনুশীলন করিতে প্রবৃত্ত হন। একদা পূর্ণাচার্য্যের ভার্য্যা কূপ হইতে জল উত্তোলন করিতে ছিলেন। ঐ সময় রামানুজ-পত্নী রক্ষকাম্বার সহিত তাঁহার কলহ হয়। এই কারণে পূর্ণাচার্য্য ভার্য্যা লইয়া পুনরায় রঙ্গনগরে প্রত্যাগমন করিলেন। রামানুজও এই সূত্রে স্ত্রীর প্রতি বীতরাগ হইয়া উঠেন।

একদা এক ব্রাহ্মণ আসিয়া রামানুজকে কহিল, আমি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত, আমাকে কিঞ্চিৎ খাদ্য সামগ্রী দেন। রামানুজ কহিলেন বিপ্র! তুমি ভোজ্য লাভার্থ আমার গৃহে গমন কর। পরে ব্রাহ্মণ উহাঁর নিদেশানুসারে তথায় উপস্থিত হন। রক্ষকাম্বা অতি কৃপণস্বভাব ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণকে অতিথিভাবে আসিতে দেখিয়া অতিশয় বিরক্ত হন এবং তাঁহাকে যথোচিত তিরস্কার করিয়া স্বগৃহ হইতে বহিস্কৃত করিয়া দেন। পরে ব্রাহ্মণ রামানুজের নিকটস্থ হইয়া তাঁহার স্ত্রীর দুর্ব্ব্যবহারের কথা জ্ঞাপন করিলেন। তখন রামানুজ কহিলেন, বিপ্র! তুমি এই হরিদ্রা-রঞ্জিত বস্ত্র এবং

একখানি লেখ্য লইয়া তাঁহার নিকট যাও। গিয়া বল তোমার পিতৃগৃহে বিবাহ-মহোৎসব হইবে। পরে ব্রাহ্মণ সেই রূপই করিলেন। রক্ষকাম্বা ব্রাহ্মণকে পিত্রালয় হইতে অভ্যাগত বুঝিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং যত্নসহকারে উহাঁর ভূরি ভোজনের আয়োজন করিয়া দিলেন। ঐ সময় রামানুজ গৃহে উপস্থিত হন। তাঁহার পত্নীও পিতৃগৃহে ভাবী বিবাহমহোৎসবের ব্যাপার তাঁহার কর্ণগোচর করেন। রামনুজ যেন এই বিষয়ের বিন্দুবিসর্গ কিছুই জানেন না, তিনি পত্নীমুখে এই সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন, এবং এই উপায়ে পত্নীকে তাঁহার পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দেন। পরে তিনি গৃহ ঐশ্বর্য্য সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া ত্রিদণ্ডাদি গ্রহণ পূর্ব্বক সন্ন্যাস আশ্রয় করেন।

ক্রমশঃ

THE EVIDENCE OF JESUS.

(FROM THE REV. CHARLES VOYSEY'S
"THE SLING AND THE STONE.")

(Continued from the last number of this journal)

IF Jesus did really make such a valuable communication to the two disciples on the road to Emmaus, and subsequently to the eleven apostles gathered in Jerusalem, it is to be regretted that so important a commentary has been lost. It is the very thing we want to get at. Amidst all these loose generalities and vague allusions, we search in vain for chapter and verse to which we can refer for the alleged predictions. At the same time, it must be noticed how the narrative betrays that the interpretation put by Christ upon Old Testament prophecies was an entirely *new* one, and quite foreign to the well-known and recognized interpretation current among the Jews in the time of Christ. We have here an unconscious testimony that, from a period ranging from about 800 years before Christ down to the very day of his death, no one ever dreamed of interpreting the prophecies in such a manner as Christ applied them to himself, and that it was only a mere fraction of the Jewish people who were ever persuaded to adopt his interpretation, instead of the other and most obviously correct one which had been universally held.

I turn now to consider some of the direct quotations made by Jesus in reference to himself. Luke IV. 16, 20. "As his custom was, he went into the Synagogue on the Sabbath day, and stood up for to read. And there was delivered unto him the book of the prophet Esaias. And when he had opened the book, he found the place where it was written, The spirit of the Lord is upon me, because he hath annoited me to preach the gospel to the poor; he hath anointed me to heal the broken hearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, to preach the acceptable year of the Lord." "And he closed the book and gave it again to the minister, and sat down; and the eyes of all them that were in the Synagogue were fastened on him. And he began to say unto them, This day is this Scripture fulfilled in your ears."

Were "the eyes of all fastened on him" because he had read so short a lesson? or was it because he had suddenly broken off at an awkward passage, which would have quite spoilt his quotations? We can not tell. But on referring to Isaiah lXI. 1—9, we do find some alterations of importance without which Jesus would have failed entirely in applying the passage to himself. Let us read it, noticing the important alterations as we go along. "The spirit of the Lord God is upon me, because the Lord hath anointed me to preach good tidings unto the meek; he hath sent me to bind up the broken hearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of "the prison to them that are bound;" (proclaiming liberty" is certainly a happier expression than "preaching deliverance" to captives, which might be only words; moreover "the opening of the prison to them that are bound" is a feature that Jesus never had any thought of adopting, not even to rescue his old friend

* Compare Mark IV. 11, 12, and Luke VIII. 10, where it is worse

and kinsman, John the Baptist, whom Herod cast into prison, so that clause is prudently omitted. Notice that the clause about "recovering of sight to the blind" is inserted by Christ and is not in the original), "to preach the acceptable year of the Lord, *and the day of vengeance of our God.*" Yes, this is the awkward passage at which Jesus stopped in his reading of the prophecy. He could only get as far as "to preach the acceptable year of the Lord." The idea of vengeance would have grated harshly upon the assembly, after "the gracious words" which had gone before. No wonder that he suddenly closed the book—finding that the rest of the prophecy manifestly would have no legitimate application to himself. Mr. T. L. Strange upon this passage observes :—

"It is the oft-recurring theme of the restoration of Israel, and their domination over the gentile nations. The "Good Tidings" proclaimed are not the 'Gospel' we are accustomed to hear announced by the followers of Jesus. They relate to positive deliverance from actual captivity, to material prosperity to national ascendency, and were not expressed by moral reformation merely, still less by a fusion of all nations into one common assemblage, such as the Christian community with equal advantages to all. The context has again been cut off to suit the occasion and a very remarkable stop placed in the middle of a sentence, where its concluding portion warred against the application to be made of it."

In short, Jesus, like Paul and other New Testament writers, treated Oid Testament Scripture with little regard to the integrity of the sense of the original, and, while thus exposing his untrustworthiness as an interpreter, discloses this fact that the prophecy quoted by him as fulfilled in himself had really no reference to him at all.

We will now place in juxtaposition with these "gracious words," another quotation of prophecy made by Christ himself. Matt XIII. 10-15. After he had recited the Parable of the Sower to a multitude of people who followed him, his disciples asked him, "Why speakest thou unto them in parables ? He answered and said unto them, Because it is given unto you to know the mysteries of the Kingdom of heaven, but to them it is not given ...... Therefore speak I unto them in parables ; because they seeing see not, and hearing they hear not, neither do they understand." * Contrast this with the gracious words spoken in the Synagogue, and recall the first sentence. "The spirit of the Lord is upon me because he hath announced me to preach the gospel to the or." po Here, however, he takes elaborate care not to preach, but to conceal it —purposely, with malice aforethought. I speak unto them to know the mysteries of the kingdom of heaven, because I intend them to hear but not to understand. Truly adorable is this wonderful Divine teacher and preacher who has been placed so high above our heads, and is said to have been the "the highest product of the human race." What will not superstitious reverence do in blinding our eyes and obliterating moral distinctions ! But we must go on with the quotation ;—

"And in them is fulfilled the prophecy of Esaias, which saith, by hearing ye shall hear and not understand, and seeing ye shall see, and shall not perceive. For this people's heart is waxed gross and their ears are dull of hearing, and their eyes have they closed . lest at any time they should see with their eyes, and hear with their ears, and should be converted, and I should heal them." The error here made by Christ is in regarding the passage in Isaiah as a prophecy at all. In Isaiah VI. 9, 10, 11, we find these words "And he said (to Isaiah), Go and tell this people, Hear ye indeed, but understand not ; and see ye indeed, but perceive not. Make the heart of this people fat, and make their ears heavy, and shut their eyes ; lest they see with their eyes and hear with their ears, and understand with their heart, and, convert and be healed." This is not even in the form of a prophecy, but of a mandate given to the prophet by Jehovah, as to what he was to do. As you can not well have a fulfilment without a prophecy. the statement of Jesus respecting this passage, is manifestly erroneous.

Though it is a deviation from our present lines, I must here remark that the evangelist, after narrating several parables in the same

* Theodore Parker, Lessons, etc., P. 246.

chapter, says (Matt. XIII. 34, 35); "All these things spake Jesus unto the multitude in parables and without a parable spake he not unto them: that it might be fulfilled which was spoken by the prophet, saying, I will open my mouth in parables; I will utter things which have been kept secret from the foundation of the world."

This is supposed to refer to Psalm LXXVIII. 1—7. "Give ear, O my people, to my law, incline your ears to the words of my mouth. I will open my mouth in a parable: I will utter dark sayings of old; which we have heard and known, and our fathers have told us. We will not hide them from their children, showing to the generation to come to the praises of the Lord, and his strength and his wonderful works which he hath done," etc., etc. So the passage goes on, and carries its meaning with transparent clearness—a determination to *make known*, to *reveal*, to *declare* some precious truth to those who knew it not. Whereas, the parables of Jesus, we are told were spoken on purpose to *hide*, *conceal*, or *disguise* the truth, "lest the hearers "should understand and be converted and their sins forgiven."

What with the historian, and what with the Divine teacher, we have a perfect network of contradictions and glaring moral anomalies.

We will close our meditations with one more example of Christ's interpretation of prophecy. He asks the multitude repeatedly concerning John the Baptist, "What went ye out into the wilderness for to see? A prophet? Yea, I say unto you and more than a prophet for this is he of whom it is written, Behold I send my messenger before *thy* face, which shall prepare *thy* way before *thee*." Jesus knowing that this was said of Elijah or Elias, says of John the Baptist, "If ye will receive it, this is Elias which was for to come." He could hardly expect *us* to receive it when John himself gives the supposition a flat contradiction. When the Jews sent messengers to ask him. "Art thou Elias? and he saith, I am not" (John I. 21), we must presume, until further evidence, that John the Baptist knew who he was better, than any one else. Yet in another place, Mathew, XVII, 11, 12, Jesus says, "Elias truly shall first come and restore all things. But I say unto you Elias is come already and they knew him not, but have done unto him whatsoever they listed"—probably alluding to John's decapitation by Herod.

But if the error of identification be overlooked, we can not pass by the fact that the prophecy in Malachi III. 1—4, and IV., 4-6, cannot be made to correspond with the pictures given as of John the Baptist in the New Testament, and therefore that the Divine teacher was in error in this case also. We will read the original and see for ourselves;—"Behold I will send my messenger and he shall prepare the way before me: and the Lord whom ye seek shall suddenly come to his temple, even the messenger of the covenant, whom ye delight in. Behold he shall come, saith the Lord of Hosts. But who may abide the day of his coming, and who shall stand when he appeareth? for he is like a refiner's fire, and like fuller's sope; and he shall sit as a refiner and purifier of silver; and he shall purify the sons of Levi, and purge them as gold and silver, that they may offer unto the Lord an offering in righteousness. Then shall the offering of Judah and Jerusalem be pleasant unto the Lord as in the days of old and in former years. Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord; and he shall turn the hearts of the children to their fathers, lest I come and smite the earth with a curse."

There is just as little and no more real parallel here between the prediction and the alleged fulfilment as that frequently pointed out by the New Testament writers.

From which we are forced to conclude that *if the New Testament be true*, Jesus had no greater capacity for interpreting the ancient Scripture than they had, and, no more reliance can be placed on his references to it than on those of his apostles and biographers.

(To be continued.)

বিজ্ঞাপন।

আগামী ১১ মাঘ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ উপলক্ষে ১১।১২।১৩ মাঘে আদি ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়স্থ বিক্রেয়

সঙ্গীত মুক্তাবলি তৃতীয় ভাগ ...	৶০
কুমারশিক্ষা	৶০
প্রশ্নমঞ্জরী	।০
প্রভাত কুসুম	৵১০
উদ্বোধনাঞ্জলি	(১০
ধর্ম্ম দীক্ষা	(১০
ব্রহ্মসাধন	/০
ব্রহ্মজ্ঞান	(১০
ব্রাহ্মজ্ঞান সূত্র তাৎপর্য্য সহিত ...	/ ১০
ব্রাহ্মধর্ম্ম ভাব প্রথম খণ্ড	(১৫
ব্রাহ্মধর্ম্ম ভাব দ্বিতীয় খণ্ড	/০
ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত জনসমাজের সম্বন্ধ ...	(১০
ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ বিষয়ক প্রস্তাব ...	(১০
উপদেশ	(৫
দুর্গোৎসব	(১০
পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত	(১০
বর্ণমালা প্রথম সংখ্যা	(৫
বর্ণমালা দ্বিতীয় সংখ্যা	(১০

	Rs	As	P.
Ontology	1		
Hindoo Theism			6
Theist's Prayer Book			6
Signs of the Times			6
Doctrine of Christian Resurrection		1	
Physiology of Idolatry		1	
Miracles or the Weak Points of Revealed Religion		4	

নির্দ্ধারিত সিকি মূল্য।

দশোপদেশ	৶ ১০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (টীকা সহিত)	/০
অনুষ্ঠান পদ্ধতি	৵০
বৃত্তি সহিত কঠোপনিষৎ (দেবনাগর অক্ষরে)	।(১০

১৭৭০ শক অবধি ১৭৯৯ শক পর্য্যন্ত (১৭৭৪ ও ১৭৮৩ শক বাদে) যে সকল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা পুস্তকালয়ে উপস্থিত আছে, তৎসমুদায়ও অর্দ্ধমূল্যে অর্থাৎ প্রতি বৎসরের একত্র বাঁধান ২।০ টাকার হিসাবে বিক্রয় হইবে।

নির্দ্ধারিত মূল্যের পুস্তক সকল অন্যূন দশ টাকার ক্রয় করিলে শতকরা ১২॥০ টাকার হিসাবে কমিসন দেওয়া হইবে।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৫ পৌষ শুক্রবার সন্ধ্যা ৭ ঘণ্টার পর বলুহাটী ব্রাহ্ম সমাজের দ্বাবিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব হইবে।

Who is Christ ? A Reply to Keshub chunder sen. A Sermon by Revd. Charles Voysey. Price one anna including postage.

আয় ব্যয়

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫০।

আশ্বিন ও কার্ত্তিক।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	৬০০ ॥ ১১
পূর্ব্বকার স্থিত ...	৩৬৪॥৶ ৯
সমষ্টি	৯৬৫ । ৮
ব্যয়	৬৯৫ (১১
স্থিত	২৭০ ৶ ৯

আয়

ব্রাহ্মসমাজ	১৬৩॥/ ৫
দান প্রাপ্তি।	
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১১৭/২
„ রমণীমোহন চৌধুরী রায়বাহাদুর	২৫
„ তারকনাথ দত্ত	১০
„ হরকুমার সরকার	২
„ হরচন্দ্র সার্ব্বভৌম	১॥৵০
„ গোপালচন্দ্র মল্লিক	১
„ বৈকুণ্ঠনাথ সেন	১
	১৫৭॥৶২
দানাধারে প্রাপ্ত	২৶৯
সঙ্গীতের কাগজ বিক্রয়	৩॥৵৬
	১৬৩॥/৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	২২৯ /৬
পুস্তকালয় ...	২৩।৶০
যন্ত্রালয় ..	১৩৬।০
গচ্ছিত ...	৪৮ ৶০
সমষ্টি	৬০০॥ ১১

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	২৯৬॥৶৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	২০২৸ ৯
পুস্তকালয়	৩৮৸০/৬
যন্ত্রালয়	১২৮॥৵৩
গচ্ছিত	২৮ (০
সমষ্টি	৬৯৫(১১

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

Registerd. NO 52.

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

বিজ্ঞাপন

পঞ্চাশ সাংবৎসরিক

ব্রাহ্মসমাজ।

---

১১ মাঘ শনিবার প্রাতঃকাল ৮ ঘণ্টার সময়ে আদি ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে এবং সায়ংকাল ৭ ঘণ্টার সময়ে শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

দার্জ্জিলিং ব্রাহ্মসমাজ।

শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্যের

উপদেশ।

১৭ কার্ত্তিক রবিবার। ৫০ ব্রাহ্ম সম্বৎ

ন তং বিদাথ যইমা জজানান্যৎ যুষ্মাকমন্তরং বভূব।
নীহারেণ প্রাবৃতা জল্প্যা চাসুতৃপউক্থশাসশ্চরন্তি॥
ঋগ্বেদ।

তাঁকে তোমরা জানিলে না, যিনি এই সমুদয় সৃষ্টি করিয়াছেন; তিনি যে তোমার-দের প্রতিজনের অন্তরে রহিয়াছেন! কি দুঃখার্ত্ত চিত্তে ঋষিরা সে সময়েও এই আ-ক্ষেপ করিয়া গিয়াছেন। যিনি বৃক্ষে পর্ব্বতে, সূর্য্যে নক্ষত্রে, যিনি হৃদয়ে থাকিয়া আমার-দের প্রতি জনের সঙ্গে সঙ্গে সঞ্চরণ করি-তেছেন; তাঁকে কেউ জানিলে না! এ চিরকালের আক্ষেপ। বিষয়-মোহে অন্ধ হইয়া যিনি আমারদের প্রভু, যিনি চিরকাল আমারদিগকে প্রেম করিয়া আসিতেছেন, তাঁকে ভুলিয়া রহিলে; বিষয়ের মোহ-নীহারে মুগ্ধ থাকিয়া বৃথা বাগ্‌জালে বদ্ধ হইয়া তাঁহাকে আর দেখিতে পাইলে না। এখানকার হিমালয় তরু লতার বিচিত্র পুষ্পে সুশোভিত হইয়া সকলের নয়ন মন হরণ করে; কিন্তু যখন আবার মেঘ ও বাষ্প ইহাকে আবৃত করে তখন ইহার আর কিছুই দেখা যায় না, এমন যে প্রতাপান্বিত সূর্য্য সে সূর্য্যও অন্তরাল হইয়া যায়— তেমনি মোহ-নীহার যখন আত্মাকে আচ্ছন্ন করে; তখন পরমাত্মা-রূপ যে সূর্য্য, তার স্বল্প আভাও ইহাতে পড়ে না। ঋষিরা পূর্ব্বে

আক্ষেপ করিয়াছেন, আমরাও এখনো আক্ষেপ করিতেছি যে এত বড় ব্রহ্মাণ্ড যাঁর সৃষ্টি, তাঁকে জানিলে না। যিনি আমারদের অন্তরে রহিয়াছেন, তাঁহা হইতে আমরা দূরে থাকি; যিনি আমারদের সঙ্গে রহিয়াছেন, তাঁহা হইতে আমরা দূরে যাই; যিনি আমারদের প্রভু, আমরা তাঁহাকে ফেলিয়া পলাই। এই মোহ-নীহার অতিক্রম করিয়া ঈশ্বরের উপাসনার জন্য এই হিমালয় পর্ব্বতে ব্রহ্ম-মন্দিরে সমাগত হইয়াছি। যদিও প্রতি দিন এখানে না আসি, প্রতি সপ্তাহেও তো এক একবার মোহ ভেদ করিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাই। এ কেবল তাঁরি কৃপা, তাঁরি কৃপা। আমরা তাঁহাকে জানিতে চাই না, কিন্তু তিনি ছাড়েন না; তিনি সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া আমারদিগকে শুভ বুদ্ধি প্রদান করিতেছেন। সেই অন্তর্যামী বিধাতা পুরুষ আমারদের সকলের অন্তরে আত্মাতে অবস্থিতি করিতেছেন। জ্ঞান-নেত্র উন্মীলন করিয়া তাঁর সেই পূর্ণ-স্বরূপ অনুভব কর। তাঁর সেই প্রেম-দৃষ্টি আমারদের সকলের উপরে নিপতিত রহিয়াছে; অনুরাগ-বলে তাঁর সেই প্রেম-দৃষ্টি অনুভব কর। যাঁর করুণা নিয়ত আমারদিগকে পালন করিতেছে, দিবসে রাত্রিতে বিপদে সম্পদে সকল সময়ে রক্ষা করিতেছে; তাঁকে কৃতজ্ঞতা-উপহার দিয়া জীবনকে সার্থক কর। তিনি ভিন্ন আমারদের গতি নাই। এই সংসারের কোলাহল-তরঙ্গে আমরা দোদুল্যমান রহিয়াছি; তিনি যদি কৃপা না করেন, তবে গতি কই? আমরা তাঁরি প্রসাদ তাঁরি নিকটে প্রার্থনা করি। তিনি আমারদিগকে পাপ-তাপ হইতে উদ্ধার করিয়া শান্তি-নিকেতনে লইয়া যাইবেন। তিনি সত্য জ্ঞান অনন্ত, তিনি আনন্দ-রূপ অমৃত. তিনি শান্ত শিব অদ্বৈত। তিনি সর্ব্বতোগত নিরাকার, শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ। তিনি কবি, তিনি মনীষী। তিনি সর্ব্বব্যাপী, স্বয়ম্ভূ বিধাতা—তিনি নিত্যানিত্য যথা-যোগ্য অর্থ সকল প্রজাদিগকে বিধান করিতেছেন। তাঁহার শাসনে সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে, অগ্নি বায়ু বৃষ্টি মৃত্যু নিয়মিত হইতেছে। তিনি আমারদের পরম গতি, তিনি আমারদের পরম সম্পদ্, তিনি আমারদের পরম লোক, তিনি আমারদের পরম আনন্দ—তাঁরি কণা মাত্র আনন্দকে লাভ করিয়া জীব-সকল জীবিত রহিয়াছে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। হরিঃ ওঁ

মিতাহার।

"ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামারোগ্যং মূলমুত্তমম্।"

সাধকের পক্ষে মিতাহার, চিত্তের একাগ্রতা-সম্পাদন বিষয়ে বিশেষ উপকারী। আহারের গুণেই শরীর সুস্থ সবল, মন শান্ত সমাহিত থাকে। আহারের দোষেই শরীর রুগ্ন ভগ্ন, চিত্ত চঞ্চল ও উদ্বেলিত হয়। আহার দ্বারাই জ্ঞান-ধর্ম্ম-সমন্বিত মনুষ্য অতি জঘন্য পশুপ্রকৃতি লাভ করে, সাত্ত্বিক মিতাহার-প্রভাবেই লোকে উচ্চ দেব-প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। অতএব সাধকের অন্নপানের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা একান্ত কর্ত্তব্য।

শরীর সুস্থ না থাকিলে মন কোনরূপেই সুস্থির থাকে না। শরীর দৃঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ না হইলে, মনুষ্য কোন প্রকারেই তপশ্চর্য্যা-জনিত কষ্ট ক্লেশ সম্ভোগে অটল থাকিতে পারে না এবং ঈশ্বর-উপাসনার প্রধান অঙ্গ-স্বরূপ তাঁহার প্রিয়কার্য্য-সাধনেও কৃতকার্য্য হইতে সমর্থ হয় না। বিশাল সংসারই মনুষ্যের কর্ম্মক্ষেত্র, শরীর-মন আত্মার দ্বারাই এখানে অহর্নিশি ঈশ্বরের আদিষ্ট ধর্ম্ম-সাধন

করিতে হয়। শরীর সুস্থ না থাকিলে কোনরূপেই সংসারধর্ম্ম প্রতিপালন করা যায় না। আত্মীয় স্বজনের, প্রতিবেশী-মণ্ডলীর, স্বদেশ ও স্বজাতির এবং সমগ্র মনুষ্য-সমাজের প্রতি আমারদের যে সকল কর্ত্তব্য কার্য্য, তাহার কোনটীই সুন্দররূপে সম্পাদিত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। শরীর অক্ষত অব্যাহত না থাকিলে, আমরা না জ্ঞান-বিজ্ঞান-শাস্ত্র অধ্যয়ন অনুশীলন দ্বারা ঈশ্বরের জ্ঞানশক্তি মহিমার পরিচয় পাইতে পারি, না দেশদেশান্তর পর্য্যটন করিয়া দেশভেদে কালভেদে, নদী-গিরি-সমুদ্রে, ওষধি বনস্পতিতে, অসংখ্য অগণ্য কীট পতঙ্গ পশু পক্ষী-সম্মিলিত বিশাল জীব-রাজ্যে, তাঁহার অতুলন শক্তি অনুপম জ্ঞান অশেষ বিজ্ঞান-কৌশল অজস্র স্নেহ প্রীতি করুণা প্রত্যক্ষ প্রতীতি করিতেই সমর্থ হই। শরীর সুস্থ না থাকিলে, না যন্ত্রাদি উদ্ভাবন ও আবিষ্কার পূর্ব্বক সৌর জগতের পরমাশ্চর্য্য শৃঙ্খলাই দেখিতে পাই, না ভূগর্ভের পরিপাটী নির্ম্মাণ-কৌশলই প্রত্যক্ষ সন্দর্শন করিতে পারি, না সংসার-কার্য্যের ও বিষয় বাণিজ্যের সুপ্রণালী প্রতিষ্ঠা করিয়া সাধন সমাধানের অবসর ও অবকাশ করিয়া লইতেই সমর্থ হই। দেহ-মন সুস্থ প্রকৃতিস্থ না থাকিলে, না সাধন-তপস্যা-লব্ধ পরমার্থ তত্ত্ব সকল প্রকাশ করিতে পারা যায়, না হৃদয়-সম্ভূত জ্ঞান-প্রেম ও সত্যভাব সকল ব্যাখ্যা করিয়া মনুষ্য, অন্যের ধর্ম্ম-স্পৃহা ও ঈশ্বর-স্পৃহাকেই উদ্দীপ্ত করিতে পারে। অতএব স্বাস্থ্যই ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ লাভের অদ্বিতীয় সাধন। "ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষানামারোগ্যং মূলমুত্তমম্।" এই সুধাময় উপদেশ স্মরণ রাখিয়া প্রাণপণ যত্নে স্বাস্থ্যরক্ষা করিবে।

সাত্ত্বিক আহারই সাধকের পক্ষে বিশেষ উপাদেয় পথ্য। মনুষ্য যে প্রকার আহার করে, তাহার প্রকৃতিও সেই রূপ হয়। মদ্য মাংসাদি পান-ভোজন করিলে, পশু-বৃত্তি সকলই যে বিশেষ প্রবল হইয়া থাকে, তাহা আর কাহাকেও বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। তাহার সহস্র সহস্র জীবিত দৃষ্টান্ত আমার-দিগের চতুর্দ্দিকেই বর্ত্তমান রহিয়াছে। অতএব প্রাণান্তেও মাদক দ্রব্য কিংবা তাদৃশ অনিষ্টকর পদার্থ সকল পান-ভোজন করিবে না। যাহাতে আসুরিক ভাব বৃদ্ধি পায়, রাক্ষস-বৃত্তি প্রবল হয়, নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল অতিমাত্র উত্তেজিত হয়, শোণিতরাশি উত্তপ্ত হয়, মস্তিষ্ক উষ্ণ হইয়া ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকলকে নিস্তেজ করিয়া দেয়, কদাচ তাহা স্পর্শও করিবে না। পরিমিতরূপে বল-পুষ্টিকর ফল মূল শস্যাদি এবং দুগ্ধ ঘৃত প্রভৃতি তেজস্কর দেবা সামগ্রী ভোজন পান দ্বারা শরীরকে দৃঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ ও কার্য্যক্ষম করিবে। অনশন ও উপবাসাদি দ্বারা কদাচ শরীরকে ক্ষীণ এবং বুদ্ধিবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তিকে নিস্তেজ করিবে না।

"বশে কৃত্বেন্দ্রিয়গ্রামং সংযম্য চ মনস্তথা।
সর্ব্বান্ সংসাধয়েদর্থানক্ষিণ্বন্ যোগতস্তনুম্॥"

"যাহাতে শরীর ক্ষীণ না হয়, এমত উপায় দ্বারা মন ও ইন্দ্রিয় সকলকে বশী-ভূত করিয়া সর্ব্বার্থ সাধন করিবেক।"

পরিমিতরূপে পান ভোজন করিবে। কদাচ লোভ-পরতন্ত্র হইয়া অতি-ভোজন করিবে না। অতিভোজন করিলে বল বৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক, তদ্দ্বারা শরীর রুগ্ন হয়, পরমায়ু হ্রাস হয়, চিত্ত অবসন্ন হয়, সাধনে অনভিরুচি জন্মে, লোকসমাজে ঔদরিক বলিয়া নিন্দিত হইতে হয়; অতএব সর্ব্ব-প্রযত্নে অতি ভোজন পরিত্যাগ করিবে।

"অনারোগ্যমনায়ুষ্যমস্বর্গ্যঞ্চাতিভোজনং।
অপুণ্যং লোকবিদ্বিষ্টং তস্মাত্তৎ পরিবর্জ্জয়েৎ॥"

সাত্ত্বিক আহার দ্বারা শরীরের বলাধান হয়, সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি পায়, চিত্ত প্রসন্ন থাকে, মস্তিষ্কের স্থৈর্য্য সম্পাদন হয়, ধর্ম্মপ্রবৃত্তি প্রবল হয়, সংক্রামক পীড়ায় সহসা শরীর আক্রান্ত হয় না। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে শ্রদ্ধায় ভোজন করিবে। কদাচ অশ্রদ্ধা বা অনভিরুচির সহিত পান ভোজন করিবে না; তদ্দ্বারা রোগ উৎপন্ন হয়, ভোজনে তৃপ্তি লাভ হয় না। সেই জনাই স্বাস্থ্য-বিধানবিৎ আর্য্য ঋষিগণ মাতা, দুহিতা, মাতৃস্বসা, মাতুলানী, ভগিনী, বনিতা প্রভৃতি যাঁহারা ভোক্তার রুচি ও প্রবৃত্তি অনুসারে তাঁহার খাদ্যাখাদ্য বিশেষ অবগত হইয়া কল্যাণ-কামনায় স্নেহ প্রীতি সহকারে যাদৃশ অন্নাদি পাক করত প্রদান করেন, তাদৃশ পান-ভোজনেরই প্রশস্ততা ও উপকারিতা এবং পরান্নভোজনের দোষ ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। যাঁহারদের ভোক্তার প্রতি স্নেহ প্রেমের সম্পর্ক নাই, যাঁহারা কেবল লোভ-ভয়েই চালিত হইয়া থাকেন, তাদৃশ স্থলে অন্ন পান গ্রহণ করা এই জনাই ধর্ম্মশাস্ত্রে নিষিদ্ধ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। পাচক পাচিকা প্রভৃতি নিঃসম্পর্কীয় লোকদিগের রন্ধন-কার্য্যে প্রভুর তুষ্টি সাধনেরই প্রতি একমাত্র লক্ষ্য থাকে। রন্ধন-পাত্রের উৎকর্ষ অপকর্ষতা, রন্ধন-উপাদানের তারতম্য নিবন্ধন যে, ভোক্তার কি অনিষ্ট অপকার হইবে, তৎপ্রতি তাহার তত দৃষ্টি থাকে না। পক্ক দ্রব্য সুদৃশ্য ও স্বাদু হইলেই, তিনি আপনাকে কৃতকার্য্য মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু তদ্দ্বারা যে ভোক্তার অজ্ঞাতসারে কি ভয়ানক অনিষ্ট সংঘটিত হয়, তাহা সহসা উপলব্ধি হয় না। "অম্ল কটু তিক্ত কষায়াদি রস-যুক্ত তীব্র অথবা সর্ব্বদা গুরুপাক দ্রব্য সেবন করিলে বীর্য্যহানি হয়, অপত্যোৎপাদন শক্তি হ্রাস হয়, অর্শ প্রভৃতি উৎকট রোগ জন্মে; এই কারণেই ধর্ম্মশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতেরা "কারুকান্নং প্রজাং হন্তি" "পাচকদিগের অন্ন ভোজন করিলে সন্তান নষ্ট হয়" বলিয়া তৎসেবন নিষিদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ভোজনবিলাসী ঐশ্বর্য্যশালী ধনাঢ্য লোকদিগের সন্তান সন্ততি না হইবার অপরাপর কারণ স্বত্ত্বেও, প্রাগুক্ত অন্ন পান ভোজনকেও একটী বলবৎ কারণ বলা যাইতে পারে। স্বাস্থ্যনাশ ধর্ম্মহানি এবং প্রজাক্ষয় প্রভৃতি নানা কারণেই ধর্ম্মপ্রিয়, আর্য্যজাতির মধ্যে ভোজন পান বিষয়ে এত সাবধানতা ও সতর্কতা দৃষ্ট হইয়া থাকে।

কদাচ উচ্ছিষ্ট অন্ন ভোজন করিবে না, অন্যকেও ভোজন-পানাবশিষ্ট দ্রব্য প্রদান করিবে না। উচ্ছিষ্ট অন্ন ভোজন করিতে প্রথমেই ঘৃণা ও অতৃপ্তি উপস্থিত হইয়া থাকে। ভোজনে অতৃপ্তি হইলে রোগোৎপত্তি হয়। দ্বিতীয়তঃ অন্যের ভোজনপানাবশিষ্ট দ্রব্য সেবন করিলে সংক্রামক পীড়াদি উপস্থিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। এজন্য সর্ব্বপ্রযত্নে তাহা পরিত্যাগ করিবে। পুনঃ পুনঃ ভোজন করিবে না, তাহাতে আহার-ইচ্ছাই প্রবল হইয়া, ক্রমে ঔদরিক হইয়া পড়িতে হয়। উচ্ছিষ্ট মুখে ভ্রমণাদি অশিষ্ট ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্ব-বিষয়ে সংযত হইবে।

"নোচ্ছিষ্টং কস্যচিদ্দদ্যান্নাদ্যাচ্চৈব তথান্তরা।
নচৈবাত্যশনং কুর্য্যান্নচোচ্ছিষ্টঃ কচিদ্‌ব্রজেৎ॥"

উচ্ছিষ্ট ভোজন দ্বারা স্বাস্থ্যনাশ, রোগ বিস্তার প্রভৃতি, নানা অপকার অনিষ্ট হয় বলিয়াই পূর্ব্বতন আর্য্য-ঋষিগণ 'তাহাকে একটি দৈহিক পাপ মধ্যে গণনা করিয়া, সাম ও যজুর্ব্বেদীয় সন্ধ্যা-বন্দনাদি নিত্যকর্ম্মে, সেই পাপমোচনের জন্য "যদুচ্ছিষ্টমভোজ্যঞ্চ" ইত্যাদি প্রার্থনা-মন্ত্র সন্নিবেশিত করিয়া দিয়াছেন যে, সাধকগণ উচ্ছিষ্ট ভোজন হইতে বিরত হইবে।

স্বাস্থ্য-রক্ষা ও বল-বৃদ্ধির জন্যই ভোজন পানের প্রয়োজন। কিন্তু তাই বলিয়াই কেবল আহার-চিন্তাতে বা আহার-আয়োজনে কিংবা ভোজ্য দ্রব্যের দোষ-গুণ-জল্পনাতেই কদাচ কালক্ষেপ করিবে না। তাহাতে মনুষ্যের কেবল পান-ভোজন-লালসা অতিমাত্র বৃদ্ধি হইয়া, তাহাকে পরমার্থ-চিন্তা হইতে বিচ্যুত করে। আহার-বিষয়ে বিশেষ রূপে সংযমী হইবে। এদেশের এক জন তত্ত্বজ্ঞানী মহা-পুরুষ বলিয়া গিয়াছেন যে "ইন্দ্রিয়-লৌল্য হইতে, রসনা-লৌল্য দ্বারা মনুষ্যকে মহা-পাপে নিক্ষেপ করে।" মনুষ্য তো পশুপক্ষী নহে, যে, দিবা-নিশি কেবল আহার আহার করিয়াই ভ্রাম্যমান হইবে? তাহার আত্মার ক্ষুৎ-পিপাসা নিবারণই প্রধান কার্য্য; সেই ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জল সংগ্রহ করাই তাহার জীবনের লক্ষ্য। অতএব সর্ব্ব-প্রযত্নে তাহারই প্রতি দৃষ্টি স্থির রাখিয়া কালাতিপাত করিবে। পার্থিব অন্নের লোভ-লালসায় কদাচ বিক্ষিপ্তমনা হইয়া ধর্ম্ম হইতে ঈশ্বর হইতে পরিভ্রষ্ট হইবে না।

ধর্ম্ম-প্রিয় স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানবিৎ আর্য্য ঋষিগণ "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং" শরীরকেই ধর্ম্মসাধনের অমোঘ উপাদান জানিয়া, সর্ব্বপ্রযত্নে তাহাকে অত্যল্প বিঘ্ন-আশঙ্কা হইতেও রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

> "ততোভোজন-বেলায়াং কুর্য্যান্মাঙ্গল্যদর্শনম্।
> তস্য প্রদর্শনং চিত্তস্থৈর্য্যকৃৎ তুষ্টিবর্দ্ধনম্॥"

আহারকালে চিত্তের স্থৈর্য্য ও সম্পাদন জন্য মাঙ্গল্য বস্তু সন্দর্শন করিবে। "আর্দ্রপাদস্তু ভুঞ্জীত।" আর্দ্র-পদে প্রহৃষ্ট হৃদয়ে কোমল আসনে সুখোপবিষ্ট হইবে। ওষ্ঠ ও কণ্ঠশোষ নিবারণ জন্য এবং রসনাকে খাদ্য দ্রব্যের প্রকৃত স্বাদগ্রহে সমর্থ করিবার নিমিত্ত ভোজনাগ্রে মুহুর্মুহুঃ জলগ্রহণ করত মুখ-বিবর প্রক্ষালন ও আর্দ্র করিবে। ইহাই আচমন-ক্রিয়া বলিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রে অভিহিত হইয়া থাকে। কদাচ আহারকালে হৃদয়ে দুশ্চিন্তা, ভয় ও ক্রোধকে স্থানদান করিবে না, বাগ্যত হইয়া ভোজন করিবে, ইত্যাকার যে সকল উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে এবং তদনুরূপ যে সকল রীতি পদ্ধতি আর্য্যসমাজে প্রচলিত আছে, তাহার নিগূঢ় তাৎপর্য্য অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে, আর্য্য ঋষিদিগের সূক্ষ্মদর্শিতার নিদর্শন সকল প্রত্যক্ষ সন্দর্শন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়।

> "হীনমাত্রমসন্তোষং করোতি চ বলক্ষয়ম্।
> আলস্যগৌরবাটোপসাদাংশ্চ কুরুতেঽধিকম্॥
> তস্মাৎ সুসংস্কৃতং যুক্ত্যা দোষৈরেতৈর্বিবর্জ্জিতম্।
> সুখাসনোপবিষ্টঃ ক্ষুৎসমুপসেবেত ভোজনম্॥
> দৌর্ম্মনস্যং ভয়ং ক্রোধং ভুঞ্জানঃ পরিবর্জ্জয়েৎ।
> প্রক্ষালয়েদঙ্ঘ্রিরাস্যং ভোজনাগ্রে মুহুর্মুহুঃ॥
> বিশুদ্ধরসনায়াস্মৈ রোচতেঽন্নমপূর্ব্ববৎ।
> তৃষিতস্তু ন চাশ্নীয়াৎ ক্ষুধিতো ন পিবেজ্জলম্॥"

ভোজনকালে হাস্য পরিহাস ও বাক্যালাপে প্রমত্ত হইলে ভোজ্য দ্রব্য গলাধঃকরণ সময়ে বিমার্গ-গতি প্রাপ্ত হইতে পারে এবং তদ্দ্বারা অসামান্য কষ্ট, এমন কি, সময় বিশেষে প্রাণ নষ্ট হওয়া অসম্ভব নহে। দুশ্চিন্তা, ভয় ও ক্রোধের সহিত পান ভোজন করিলে পরিপাক-ক্রিয়ার ব্যাঘাত হয় এবং পান-ভোজন-জনিত উপকার বা তৃপ্তি লাভ হয় না। সুতরাং অজীর্ণতা-নিবন্ধন নানা রোগ উৎপন্ন হইয়া, সাধন সমাধানে সাধককে অপটু করিয়া তোলে। তৃষ্ণার সময় আহার করিলে গুল্ম এবং ক্ষুধার সময় জলপান করিলে জলোদর রোগ জন্মিতে পারে। এই জন্যই আয়ুর্ব্বেদোক্ত নিয়মাদি স্মৃতিকারেরা সাধকের দেহরক্ষা ও ধর্ম্ম-সাধন-সামর্থ্য

লাভের জন্য, ধর্ম্মশাস্ত্র মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া দিয়াছেন। হস্ত-পদ-প্রক্ষালন ও আচমন পূর্ব্বক যে পান ভোজন এবং সন্ধ্যাবন্দনাদি করিবার ব্যবস্থা ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রদত্ত হইয়া থাকে, স্বাস্থ্যবর্দ্ধন এবং আশু বিপৎপাত নিবারণ এবং চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদনই তৎসমূহের একমাত্র উদ্দেশ্য *। আমরা সেই সকলের মর্ম্মোদ্ভেদ করিতে অসমর্থ হইয়া প্রোক্ত নিয়মপালনকে কুসংস্কার মধ্যে পরিগণিত করিয়া থাকি।

লোকে পৃথিবীর ভোগ ঐশ্বর্য্যে, আহার বিহারে উন্মত্ত হইয়া জীবন কাল বিফলে অতিবাহিত করে। ভোগের দ্রব্য সামগ্রী আহরণে অন্যকে বিব্রত করিয়া এবং আপনিও বিব্রত হইয়া পরমার্থ-চিন্তার অবকাশ ও অবসর প্রাপ্ত হয় না। অতএব ভোগ-স্পৃহাকে সংযত করিয়া আত্মার ধর্ম্ম-স্পৃহা ও ঈশ্বর-স্পৃহাকেই প্রদীপ্ত করিতে যত্নশীল হইবে। আত্মার অলঙ্কার সকল যাহাতে পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন হয়, তাহাদেরই দিব্য আলোকে যাহাতে গৃহ পরিবার, স্বদেশ ও স্বজাতি এবং সমুদয় ভূমণ্ডল উজ্জ্বল হইয়া উঠে, তাহারই চেষ্টায় নিযুক্ত থাকিবে। যাহাতে আত্মার ভোজ্য পানীয় পদার্থ-পুঞ্জে সকল স্থান পূর্ণ হয়, আত্মার নিত্য উদার সদাব্রত-দ্বার নগর গ্রামে প্রমুক্ত হয়, তাহারই তত্ত্বে জীবন-কাল ক্ষেপণ করিবে। আত্মারই পোষণের জন্য শরীর, শরীরের জন্য আত্মা নয়, ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া পান ভোজন বিষয়ে সংযমী হইবে। কদাচ আহারাদির ব্যভিচার-দোষে সংলিপ্ত হইবে না। সাত্ত্বিক আহারাদি দ্বারা বলবীর্য্য লাভ করিয়া ঈশ্বরের সাধন-সমাধানে নিযুক্ত থাকিবে এবং কায়মনোবাক্যে তাঁহার প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিবে।

* ১৭৯৪।৯৫ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় "আর্য্য ঋষিদিগের তড়িৎ-বিষয়ক জ্ঞান ও বিবিধ কার্য্যে তাহার প্রয়োগ" এই শিরোনামাঙ্কিত প্রস্তাব সকল দেখ।

আবেস্তা।

(৪৩৬ সংখ্যক পত্রিকার ১৪৮ পৃষ্ঠার পর)

চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে, কুক্কুরবধ করিলে তজ্জন্য কি প্রকার দণ্ড প্রদান করিতে হইবে, এবং কি প্রকার প্রায়শ্চিত্ত সম্পন্ন করিলে তজ্জনিত পাপ হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়, তাহা বিবৃত হইয়াছে। যে ব্যক্তি একটি কুক্কুরবধ করিয়াছে তাহাকে ঐ মহাপাপের দণ্ডস্বরূপ অশ্বতাড়নী দ্বারা দশ সহস্রবার এবং ক্রোশচরণ নামক যন্ত্র দ্বারা দশ সহস্রবার প্রহার করিবার ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে। কুক্কুর ঘাতক স্বীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য দশ সহস্র ভার শুষ্ক ও কঠিন কাষ্ঠ প্রজ্জ্বলিত করিবেন, বিংশতি সহস্র সর্প, দশ সহস্র বৃশ্চিক, দশ সহস্র গৃহ-গোধিকা, দশ সহস্র ভেক, দশ সহস্র মক্ষিকা, দশ সহস্র মশক, দশ সহস্র শস্যনাশক এবং দশ সহস্র খনক ও দংশক পিপীলিকা, এবং দশ সহস্র মূষিক হনন করিবেক, সাধু ব্যক্তিগণকে একটি ক্ষুদ্র নদী, একটি ক্ষেত্র, একটি বাসোপযোগী গোগৃহ-সংযুক্ত গৃহ, ও আপনার এক অরোগা কুমারী কন্যা কিংবা ভগিনী দান করিবেক; চতুর্দ্দশটি কুক্কুরের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিবেক, চতুর্দ্দশটি সেতু নির্ম্মাণ করিয়া দিবেক, অষ্টাদশটি কুক্কুরীর গাত্র হইতে অস্বাস্থ্যকর কীটাদি পরিষ্কার করিয়া দিবেক, এবং অষ্টাদশ জন সাধু ব্যক্তিকে মদ্য মাংস প্রভৃতি আহার করাইয়া পরিতৃপ্ত করিবেক। এতদ্ব্যতীত কুক্কুরঘাতককে স্বীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত

জন্য আরও কতকগুলি অপেক্ষাকৃত সামান্য সামান্য কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়।

পঞ্চদশ অধ্যায়ে, কি কি পাপ করিলে "পেশোতেনস" এই অবজ্ঞা-সূচক উপাধি প্রদত্ত হইয়া থাকে, তাহা এবং সতীত্ব ধর্ম্ম ও কুক্কুর ও কুক্কুরী প্রতিপালন প্রভৃতি কয়েকটি বিষয় বিবৃত হইয়াছে। জোরাস্তার জিজ্ঞাসা করিলেন, হে অহুর-মজদ! কয়টি এবং কিকি পাপ করিলে মনুষ্য "পেশোতেনস" হয়। অহুর মজদ উত্তর করিলেন "হে জোরাস্তার! পাঁচটি পাপ করিলে মনুষ্য "পেশোতেনস" হয়; সে পাচটি পাপ এই, প্রথম, এক জন সাধু ব্যক্তিকে বিধর্ম্মী করা; দ্বিতীয়, কুক্কুরকে উষ্ণ খাদ্য কিংবা অভক্ষ্য মাংস প্রদান করা, তৃতীয়, গর্ব্ভবতী কুক্কুরীকে ভয় প্রদর্শন করা কিংবা তাহার পশ্চাতে করতালি দেওয়া; চতুর্থ, ঋতুকালে উপগত হওয়া; এবং পঞ্চম, গর্ব্ভবতী স্ত্রীলোকের শয্যাস্পর্শ করা। পারসীকেরা সতীত্ব রক্ষা একটি শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করে, এবং যে রমণী সতীত্ব-রত্ন রক্ষা করিতে পারে না তাহাকে ঘোর পাপীয়সী জ্ঞান করে। পারসীকদিগের মতে পরদারাভিগমন ও বেশ্যাসক্তি মহাপাপ। পারসীকদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ বলে যে, যে ব্যক্তি একবার অগম্যাগমন করিবে সে তাহার পর চল্লিশ দিবস বুদ্ধিভ্রষ্ট ও জ্ঞানশূন্য হইয়া থাকিবেক। কুক্কুর ও কুক্কুরীগণের প্রতি বিশেষরূপে ও সাধ্যানুসারে যত্ন প্রদর্শন করা পারসীকেরা একটি প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও মহৎ ধর্ম্ম জ্ঞান করে। যদ্যপি কোন কুক্কুর কিংবা কুক্কুরী স্বেচ্ছানুসারে কোন গৃহস্থের বাটীতে উপস্থিত হয়, অতিথি উপস্থিত হইলে হিন্দুরা যেরূপ আগ্রহ ও যত্নের সহিত তাহার সৎকার করিয়া থাকে, পারসীকেরা তদনুরূপ যত্ন ও আগ্রহের সহিত সেই সমাগত কুক্কুর কিংবা কুক্কুরীর সৎকার করে। যদ্যপি কোন প্রান্তরবিহারী গর্ব্ভবতী কুক্কুরী কোন গৃহস্থের গৃহে আসিয়া সন্তান প্রসব করে তাহা হইলে গৃহস্বামী সেই কুক্কুরী ও তাহার নবপ্রসূত সন্তান সন্ততির সুখসচ্ছন্দতার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিবেন এবং ঐ কুক্কুরীকে ছয় মাস এবং তাহার সন্তান সন্ততিকে সাত বৎসর কাল পালন ও রক্ষা করিবেন। যে গৃহস্থ ইহা না করেন তাঁহাকে ঘোর পাপগ্রস্ত হইতে হয় এবং অহুর মজদ-প্রতিষ্ঠিত নিয়মানুসারে 'বোধবরস্ত' নামক দণ্ড গ্রহণ করিতে হয়। যে ব্যক্তি কোন গর্ব্ভবতী কুক্কুরীর বধ সাধন করে তাহাকে অশ্বতাড়নী দ্বারা সাত সহস্র এবং ক্রোশচরণ নামক যন্ত্র দ্বারা সাতসহস্র বার প্রহার করিবার নিয়ম আছে।

ষোড়শ অধ্যায়ে পারসীক স্ত্রীলোকেরা ঋতুকালে ও প্রসবকালে কি কি নিয়ম অবলম্বন করিবে, এবং সপ্তদশ অধ্যায়ে কি প্রকারে নখ ও কেশ ছেদন ও ক্ষৌর কার্য্য করিতে হইবে এবং তৎসময়ে কি কি নিয়ম অবলম্বন করিতে হইবে তাহাই বিবৃত হইয়াছে।

অষ্টাদশ অধ্যায়ে, অথ্রবের অর্থাৎ অহুর-মজদ-প্রতিষ্ঠিত নিয়মে নিষ্ঠাবান ব্যক্তির প্রকৃত লক্ষণ কি, পরোদার অর্থাৎ কুক্কুট পক্ষীর প্রতি পারসীকদিগের শ্রদ্ধা, মনুষ্যের প্রতি পরোদারের উপদেশ, মনুষ্যের প্রতি অগ্নির বাক্য, এবং সাধু পুরুষের সহিত অসাধু স্ত্রীর ও সাধু স্ত্রীর সহিত অসাধু পুরুষের বিবাহ সংঘটন করিয়া দিবার দোষ প্রভৃতি কয়েকটি বিষয় বিবৃত হইয়াছে। অহুরমজদ বলিলেন, হে জোরাস্তার! যে ব্যক্তি কোষ্টি * ধারণ করে কিন্তু অহুরমজদ-প্রব-

* পারসীকদিগের কোষ্টি কিয়ৎপরিমাণে আমাদিগের উপবীতের ন্যায়। সাত বৎসর বয়ঃক্রম হইতে

র্ত্তিত নিয়মরূপ কোষ্টি ধারণ করে না, সে ব্যক্তি কখনই অথ্‌ব বা নিয়মনিষ্ঠ নহে। যে ব্যক্তি শস্যনাশক ও মনুষ্যের অপকারক জন্তু সকল হননার্থ যষ্টিহস্তে ভ্রমণ করে, কিন্তু অহুরমজদ-প্রবর্ত্তিত নিয়মরূপ যষ্টি গ্রহণ করে না, হে জোরাস্তার! সে ব্যক্তি কখনই অথ্‌ব বা নিয়মনিষ্ঠ নহে। যে ব্যক্তি বিষধর সর্প বৃশ্চিকাদি বধ করিবার জন্য শাণিত-অসি-হস্তে গমনাগমন করে কিন্তু যাহার হস্তে অহুরমজদ-প্রবর্ত্তিত নিয়মরূপ তীক্ষ্ণ অসি নাই, হে জোরাস্তার! সে ব্যক্তি কখনই অথ্‌ব বা নিয়মনিষ্ঠ নহে। যে ব্যক্তি কদাপি অহুর-মজদের যশ কীর্ত্তন করে না, ধর্ম্মপুস্তক পাঠ বা শ্রবণ করে না, ধর্ম্ম-কথা উচ্চারণ করে না, ধর্ম্ম-কার্য্য সম্পাদন করে না, ধর্ম্মশিক্ষা করে না এবং অন্যকে ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান করে না, হে জোরাস্তার! সে ব্যক্তি কখনই অথ্‌ব বা নিষ্ঠাবান নামের উপযুক্ত হইতে পারে না। হে জোরাস্তার! তিনি প্রকৃত অথ্‌ব যিনি সর্ব্বদা ধর্ম্মেরই আলোচনা করেন, যে ধর্ম্ম আত্মাকে পবিত্র ও অন্তঃকরণকে প্রসারিত করে, পরলোকে আমাদিগকে পুরস্কারের অধিকারী করে, এবং পূর্ণ পবিত্রতা ও মঙ্গলের আবাস-ভূমি স্বর্গলোকে আমাদিগকে লইয়া যায়। পারসীকেরা পরোদার অর্থাৎ কুক্কুটকে একটি পবিত্র পক্ষী জ্ঞান করে। জোরোস্তারকে অহুরমজদ বলিতেছেন, হে জোরোস্তার! যে ব্যক্তি আমার নামে সাধু ব্যক্তিকে একটি পরোদার ও একটি পরোদারী দান করে, সে এক সহস্র স্তম্ভ ও দশ সহস্র গবাক্ষ বিশিষ্ট এবং এক লক্ষ দুর্গ সুশোভিত প্রকাণ্ড অট্টালিকা দান করিবার ফল প্রাপ্ত হয়, এবং যে ব্যক্তি সাধু জনকে পরোদারের শরীরের সমান এক খণ্ড মাংস দান করে আমি সে ব্যক্তিকে স্বর্গপ্রবেশ-কালে কোন ব্যাঘাত দি না। পারসীকেরা বলেন যে প্রত্যহ প্রাতঃকালে পরোদারেরা যে চীৎকার করিয়া সুপ্ত মনুষ্য-গণকে জাগ্রত করে সে চীৎকার নিরর্থক নহে, তাহারা বলে "হে মনুষ্যগণ! উত্থান কর, ধর্ম্মগুণ গান কর, দেবগণকে সংহার কর, তোমাদিগের সম্মুখে উহারা উহাদিগের দীর্ঘ হস্তবিস্তার করিয়া তোমাদিগকে পাপ-নিদ্রায় অভিভূত করিতে চেষ্টা পাইতেছে। সংচিন্তা, সংবাক্য ও সৎকার্য্য মনুষ্যের এই তিন সর্ব্বোত্তম ধন হইতে আপনাদিগকে বিচ্যুত করিও না, এবং মন্দচিন্তা, মন্দবাক্য ও মন্দ কার্য্য হইতে দূরে অবস্থিতি কর। পারসীকেরা অগ্নিকে অহুরমজদের পুত্র বলিয়া বিশ্বাস করে, এবং কুক্কুটের বাক্যের ন্যায় অগ্নিরও বাক্য আছে এরূপ প্রতীতি করে। অহুরমজদ স্বয়ং বলিয়াছেন যে, অগ্নি রাত্রির প্রথম ভাগে প্রত্যেক গৃহ-স্বামীকে বলেন "হে গৃহস্বামি! দেবগণ আসিয়া আমাকে আক্রমণ পূর্ব্বক আমাকে এই পৃথিবী হইতে বিদূরিত করিবার চেষ্টা করিতে পারে, অতএব তুমি শীঘ্র উত্থান কর, বস্ত্র পরিধান কর, হস্ত ধৌত কর, কাষ্ঠ

ইহা ধারণ করিতে হয়। ইহা শ্বেতবর্ণ পশমে পুরোহিতগণ কর্ত্তৃক প্রস্তুত হয়। ব্রাহ্মণেরা যেরূপ দিনরাত্রি উপবীত ধারণ করিয়া থাকেন, সেইরূপ পারসীকদিগকে দিনরাত্রিনির্ব্বিশেষে কোষ্টি ধারণ করিতে হয়। উপবীত ধারণের ন্যায় কোষ্টি ধারণ একটি ধর্ম্মানুষ্ঠান। কোষ্টি ধারণ কালে কতকগুলি মন্ত্রোচ্চারণ করিতে হয়, এবং প্রত্যহ উহা দুই তিন বার খুলিয়া পুনরায় ধারণকালেও মন্ত্রোচ্চারণ করিতে হয়। আমাদিগের দেশে উপবীত ধারণে কেবল পুরুষই অধিকারী, কিন্তু পারসীক পুরুষ ও স্ত্রী-লোক উভয়কেই কোষ্টি ধারণ করিতে হয়। হিন্দুদিগের মধ্যে উপবীত ধারণ ধর্ম্মানুষ্ঠান হইলেও উহা মুখ্যতঃ জাতিবিচ্ছেদার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু পারসীকদিগের মধ্যে কোষ্টি ধারণ সেরূপ নহে; উহা সম্পূর্ণরূপে ধর্ম্মসূচক, পারসীক ধর্ম্মাবলম্বীমাত্রেই কোষ্টি ধারণে সম্পূর্ণরূপে অধিকারী।

একত্রিত করিয়া আমার নিকট আনয়ন কর এবং তোমার ধৌত হস্ত দ্বারা উহা প্রজ্বলিত করিয়া আমাকে দীপ্তিমান কর।” অগ্নি রাত্রির মধ্যভাগে প্রত্যেক কৃষককে এবং রাত্রির শেষভাগে ক্রোশ নামক পরলোকবাসী অহুর মজদের সুন্দর ও পবিত্র পার্শ্বচরকে উদ্দেশ করিয়া ঐরূপ প্রার্থনা করেন। যে ব্যক্তি অগ্নির উক্ত প্রকার প্রার্থনানুসারে ধৌত হস্তে শুষ্ক বিশুদ্ধ কাষ্ঠ আনয়ন করত তাহা প্রজ্বালিত করেন, অগ্নি তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এই আশীর্ব্বাদ করেন,—তুমি বহু সংখ্যক গাভীর অধিকারী হও, বহু সংখ্যক কর্ম্মিষ্ঠ লোক তোমার কর্ম্মচারী হউক, তোমার সমস্ত মানস পূর্ণ হউক, তোমার বংশবৃদ্ধি হউক, এবং তুমি দীর্ঘজীবি হইয়া সুখে কাল যাপন কর। যে ব্যক্তি সাধু স্ত্রী ও অসাধু পুরুষ কিম্বা অসাধু পুরুষ ও সাধু স্ত্রীর সহিত, অহুরমজদে অনুরাগী পুরুষ ও অহুর মজদে বিদ্বেষী স্ত্রী কিম্বা অহুর মজদে অনুরাগী স্ত্রী ও অহুরমজদের বিদ্বেষী পুরুষের সহিত, এবং দেবগণঅবমন্তা পুরুষ ও দেবগণের উপাসক স্ত্রী কিম্বা দেবগণের উপাসক পুরুষ ও দেবগণের অবমন্তা স্ত্রীর সহিত বিবাহ সংঘটন করিয়া দেয় পারসীকদিগের মধ্যে সে মহা অপরাধী ও নিতান্ত দোষী বলিয়া বিবেচিত হয়। আবেস্তায় উক্ত হইয়াছে যে বিষধর সর্প, ও তীক্ষ্ণনখ ব্যাঘ্র অপেক্ষা সেই ব্যক্তি শীঘ্র যমসদনে প্রেরিত হইবার উপযুক্ত। অহুর মজদ বলিয়াছেন যে ঐ প্রকার অন্যায়, অনুপযুক্ত বিবাহের ঘটকেরা যে নদী কিংবা পুষ্করিণীর দিকে দৃষ্টিপাত করে তাহা জলপূর্ণ হইলে তাহার তৃতীয়াংশের একাংশ জল শুষ্ক হইয়া যায়, যে বৃক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করে, তাহা ফলপুষ্পে সমৃদ্ধ হইলে তাহার সমৃদ্ধির তৃতীয়াংশের একাংশ ক্ষয় হইয়া যায়, এবং যে মনুষ্যের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে যদ্যপি সে পবিত্রস্বভাবসম্পন্ন হয় তাহা হইলে তাহার পবিত্রতার, যদ্যপি সে বলবান হয়, তাহা হইলে তাহার বলের এবং যদ্যপি সে সকল কার্য্যে জয়শীল হয় তাহা হইলে তাহার জয়শীলতার তৃতীয়াংশের একাংশ বিনষ্ট হইয়া যায়।

ক্রমশঃ

পরকাল।

৪৩৭ সংখ্যক পত্রিকার ১৬৯ পৃষ্ঠার পর।

দার্শনিকেরা মানবীয় জ্ঞানের যেরূপ সীমা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন আমরা তাহা বিবৃত করিয়াছি। কিন্তু দার্শনিকদিগের প্রাগুক্ত সিদ্ধান্ত সাধারণ মানব মনের গ্রাহ্য হয় না। তাহারা ওরূপ দার্শনিক বিচার-অনপেক্ষ হইয়া আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্বে ও দ্রব্যসত্তার বাস্তবতাতে বিশ্বাস করে; এবং কল্যাণকামনায় ধর্ম্মানুষ্ঠানে রত ও কার্য্য-ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হয়। তাহাদের সাধারণ বুদ্ধিতে সংশয়াত্মক মত সকল শ্রদ্ধেয় হয় না; এবং দার্শনিক বিচারের এরূপ বিলোম গতি দেখিয়া তাহারা তৎপ্রতি যে এক প্রকার অটল বিশ্রব্ধ ভাবে উপেক্ষা প্রদর্শন করে, তাহাতে উক্ত দার্শনিকদিগকে অপ্রতিভ হইতে হয়। এই জন্য অনেকে তত্ত্বজ্ঞান-চর্চ্চায় হতাশ হইয়া প্রামাণিকতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। প্রামাণিকেরা ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষকেই প্রমাণের পরাকাষ্ঠা বলিয়া গ্রহণ করেন। তাঁহাদের মতে অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব অজ্ঞেয়, অতএব একবারে অননুসন্ধেয়। সুতরাং প্রামাণিকেরা মনোবিজ্ঞানের এক প্রকার বিরোধী। মিল সাহেব এই বিরোধ-মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

তিনি মনোবিজ্ঞানের সহিত প্রামাণিকতা সংযোগের প্রয়াস করিয়াছেন। কিন্তু বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে প্রতীত হইবে, তিনি শব্দ-প্রয়োগ-কৌশলে প্রামাণিকতাকে সংশয়বাদের পর্য্যায় করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি দর্শন শাস্ত্রের মধ্যে "স্থায়ী সম্ভব্য" (permanent Possibility) এই নূতন বচনটী সন্নিবেশিত করিয়া আপনাকে কৃতকার্য্য জ্ঞান করিয়াছেন বটে, ফলতঃ এক "সম্ভব্য" শব্দের সাহায্যে সহজ জ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ও প্রামাণিক বাদের সমন্বয় করিবার চেষ্টায় তিনি নিতান্ত হাস্যাস্পদ হইয়াছেন। মিল সাহেবের ন্যায় সূক্ষ্ম বুদ্ধি দ্বারা না হইলে, এরূপ অসঙ্গত চেষ্টা সঙ্গতবৎ আকার ধারণ করিত না এবং আমরাও এই ক্ষুদ্র প্রস্তাবে তাহার উল্লেখ করিতাম না। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি, মিল সাহেব তর্ক-চাতুর্য্যে আমাদের দেশীয় যুবকদিগের অনেকের বুদ্ধিকে বিপর্য্যস্ত করিয়া দিয়াছেন। অনেকে আত্মা ও বাহ্য সত্তার প্রতি সন্দিহান। তাঁহারা স্বতন্ত্র আত্মা আছে কি না, বাহ্য জগৎ আছে কি না, নিশ্চয় জানেন না; মনে কতকগুলি ভাবের উদয় হয়, অনুভূতির বিকাশ হয়, এই মাত্র জানেন। আমরা কোন কোন কৃতবিদ্য যুবকের সহিত আলাপ করিয়া দেখিয়াছি, তাঁহারা সাধারণ কথোপকথন-কালেও আত্মা শব্দ ব্যবহার করিতে সম্মত নহেন। তাঁহাদের দর্শনে আত্মার স্বাতন্ত্র্যের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। যুবকদিগের মনের এরূপ ভাব ধর্ম্মসাধনের অনুকূল নহে, তজ্জন্যই এক্ষণকার অনেক কৃতবিদ্য যুবক ধর্ম্ম ও পরলোকের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া থাকেন। পরকালের বিষয় লিখিতে হইলে ইহাঁদের প্রবোধের জন্য কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক হয়। অতএব আমরা আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে মিল সাহেবের মতের পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মিল সাহেব আমাদের আত্মার ভাবকে মুখ্য জ্ঞান বলেন না। তিনি বলেন আমাদের আত্মার ভাব উপার্জ্জিত কৃত্রিম। তাহাতে বিশ্বাস করিবার উপযুক্ত কারণ নাই। অনুভূতি সকলই আমাদের জ্ঞানের সর্ব্বস্ব, তদতিরিক্ত যাহা কিছু তাহাতে বিশ্বাস করা যায় না। তবে যে আমরা বাহ্য সত্তা ও আত্মাতে বিশ্বাস করি, তাহা কুসংস্কার-জন্য। তিনি আরো বলেন যে, বহুদর্শন দ্বারা আমরা ইহাও অবগত হইয়াছি যে, অনুভূতি উদয়ের সাম্ভব্য আছে; এবং এই সাম্ভব্য স্থায়ীও বটে। জড় বা আত্মা সম্বন্ধে অনুভূতির এই স্থায়ী সাম্ভব্যই আমাদের সাক্ষাৎ জ্ঞানের বিষয়।

অতঃপর মিল সাহেবের "অনুভূতির স্থায়ী সাম্ভব্য" কি? প্রথমতঃ ইহারই ব্যাখ্যা করা আবশ্যক হইতেছে।

মিল সাহেব বাহ্য সত্তা সম্বন্ধীয় অনুভূতির স্থায়ী সাম্ভব্যের বিচার প্রথমেই আরম্ভ করিয়া তন্নিকৃষ্ট তত্ত্ব আত্মা সম্বন্ধেও নিয়োগ করিয়াছেন। ইতর-ভেদোপলব্ধির নামই জ্ঞান, অতএব তাঁহার মতে, প্রথমতঃ বাহ্য সত্তার ভাব আমাদের মনে সংগঠিত না হইলে, আত্মজ্ঞানের উদয়-সম্ভাবনা নাই। এই জন্য তিনি প্রথমেই বাহ্য সত্তা সম্বন্ধীয় অনুভূতির স্থায়ী সম্ভাব্যের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু আমরা প্রদর্শন করিয়াছি যে, মিল সাহেবের এই মত সিদ্ধ নহে। আত্মজ্ঞানের উদয়ার্থ মিল সাহেব বাহ্য সত্তার ভাবের সাহচর্য্য যে জন্য আবশ্যক বোধ করিয়াছেন, আমরা দেখাইয়াছি আত্মানুভূতি দ্বারাই তৎকার্য্য সম্পন্ন হওয়ার কোন বাধা নাই; বরং তা-

হাই অধিকতর সম্ভব ও স্বাভাবিক। আমরা অনুভূতিকেই অবলম্বন করিয়া আত্মভাব লাভ করিতে পারি। কারণ অনুভূতি, জ্ঞান প্রভৃতির অনুভূয়মানত্ব আছে।

কিন্তু মিল সাহেব অনুভূতি, বোধ, জ্ঞান প্রভৃতি মানসিক বিকার বা অবস্থাকে স্বয়ং-সিদ্ধ বিবেচনা করিয়া বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। অতএব আমরা গৌরবের সহিত পুনরায় উল্লেখ করিতেছি, আমাদের আর্য্য দার্শনিকেরা সূক্ষ্মদর্শিতায় ইউরোপীয় দার্শনিকদিগের অপেক্ষায় অনেক দূর অগ্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন। ইউরোপীয়েরা তাঁহাদের দর্শন শাস্ত্রে প্রায়ই মন ও আত্মার পার্থক্য নির্দ্দিষ্ট করেন না, কিন্তু আর্য্য দার্শনিকেরা বলেন মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত, এই অন্তঃকরণ চতুষ্টয় অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের ন্যায় আত্মাকে আশ্রয় করিয়া স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। তাহারা নিজে অবোধাত্মক পদার্থ।

"যং মনশ্চক্ষুরাদীন্যবোধাত্মকানি প্রবর্ত্তন্ত আশ্রিত্য"

(হস্তামলক। ২

এবং বলেন জ্ঞান প্রভৃতি উৎপত্তি-বিনাশশালী অনিত্য পদার্থ এবং তাহাদের জ্ঞেয়ত্ব হেতু ঘটাদিবৎ জড়ত্ব আছে। জ্ঞান আমাদের মানসিক কার্য্যের দ্রষ্টা নহে তাহা চেতন পদার্থ নহে

"কথং বোধস্য নিত্যতা, বোধোহি নাম জ্ঞানং তচ্চ ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষাদেব সমুৎপদ্যতে, উৎপন্নঞ্চ স্বকার্য্যসংস্কারেন বিরোধিজ্ঞানান্তরেণ চ বিনশ্যতি অতউৎপত্তিবিনাশিশালিত্বাদনিত্যং ভবিতুমর্হতি ... ... ন চ জ্ঞানং চৈতন্যং, তস্য জ্ঞেয়ত্বেন ঘটাদিবৎ জড়ত্বাৎ, জ্ঞেয়ং হি ঘটজ্ঞানাংশে জাতমিত্যস্য সাক্ষাদনুভূয়মানত্বাৎ"

হস্তামলকভাষ্যং। ২।

তবে ইহাও স্বীকার করা যায় যে আর্য্য-দর্শনে স্থানে স্থানে জ্ঞানকে "নিত্য" ও "স্বয়ম্প্রভ" আদি শব্দ দ্বারা বিশেষিত করা হইয়াছে। কিন্তু অনুধাবন করিয়া দেখিলে প্রতীত হইবে যে, তৎতৎ স্থলে জ্ঞান শব্দে চৈতন্য অভিপ্রেত হইয়াছে, এবং এরূপ প্রয়োগকে ঔপচারিক প্রয়োগ বলা যায়। পরমার্থতঃ জ্ঞান কখনই জ্ঞাতা হইতে পারে না; তাহা জ্ঞাতার (আত্মার) সম্বন্ধ-বিশেষ কার্য্য-বিশেষ। আধ্যাত্মিক ক্রিয়াতে আত্মাই কর্ত্তা; অন্তরিন্দ্রিয় সকল করণ এবং জ্ঞান কার্য্য।

যাহা হউক মিল সাহেব বাহ্য সত্তার কিরূপ বিচার ও মীমাংসা করিয়াছেন, এবং ঐ বিচারক্রম আত্মা সম্বন্ধেই বা কি প্রকারে নিয়োজিত করিয়াছেন, দেখা যাউক। তিনি বলেন আমরা স্বরূপতঃ কিছুই জানি না, জানিতে পারিবও না। আর সৃষ্টিকর্ত্তা স্বয়ং ঈশ্বর বস্তুর স্বরূপ জ্ঞাত আছেন, একথা বলার কোন অর্থ নাই। তাহার জ্ঞানের জন্য ওরূপ কোন পদার্থ আছে ইহা মানব মনের উপলব্ধি হইবার কোন উপায় নাই।

("To Say that even the Creator could know it the inmost nature of Things) is to use language which to us has no meaning, because we have no faculties by which to apprehend that there is any such thing for Him to know"

কোন বস্তু বোধগোচর করিয়া আমরা কি জন্য তাহাকে আত্মেতর বাহ্য সত্তা বলি? এই জন্য যে আমরা মনে করি, বোধগম্য বস্তু আমাদের মনন-নিরপেক্ষ হইয়া পূর্ব্বে ও পরে সকল সময়েই সতন্ত্র অবস্থিতি করিয়া থাকে। আমরা তাহার বিষয় জানি অথবা না জানি, তাহাতে তাহার অস্তিত্বের কিছুই ব্যত্যয় নাই। আমাদের তদ্বিষয়ক জ্ঞান "স্বকার্য্য-সংস্কার দ্বারা ও বিরোধি জ্ঞানান্তর দ্বারা" অপসৃত হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে তাহার অস্তিত্বের অপসরণ নাই আমরা বাহ্য বস্তুকে এই ভাবেই গ্রহণ করিয়া থাকি। মানব মনে কোথা হইতে এই ভাবের

আবির্ভাব হইল, ইহা নির্ণয় করিতে যিনি পারিয়াছেন, তিনিই ভৌতিক জগতের প্রতি বিশ্বাসের মূল তাৎপর্য্য অবধারণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

"What is it we mean when we say that the object we perceive is external to us, and not a part of our own thoughts? We mean, that there is involved in our perceptions something which exists when we are not thinking of it; which existed before we had ever thought of it, and which would exist if we were anihilated; and further, that there exist things which we never saw, touched, or otherwise perceived, and things which never have been perceived by man. This idea of something which is distinguished from our fleeting impressions by what, in Kantian language, is called Perdurability; something which is fixed and the same, while our impretions vary: something which exists whether we are aware of it or not, and which is allways square (or of some other given figure) whether it appears to us square or round—constitutes altogether our idea of external substance. Whoever can assign an origin to this complex conception, has accounted for what we mean by the belief in matter."

Examination of Hamilton's Philosophy P. 192.

এস্থলে উল্লেখ করিয়া রাখা আবশ্যক হইতেছে যে, মিল সাহেব বাহ্য সত্তার যে রূপ ব্যাখ্যা করিলেন তাহা অসম্পূর্ণ রহিল। তদ্দ্বারা আমাদের সহিত বাহ্য সত্তার পার্থক্যই প্রদর্শিত হইল, আবার সে পার্থক্য কেবল সময় ও স্থান লইয়া; কিন্তু আমাদের সহিত বাহ্য সত্তার যে সম্বন্ধ আছে তাহা প্রদর্শিত হইল না। বাহ্য সত্তার কোন রূপ ভাব আমাদের মনে উদয় হওন জন্য বাহ্য সত্তার সন্নিকর্ষ যে অবশ্য প্রয়োজনীয়, আমাদের সহিত বাহ্য সত্তার এই যে এক সম্বন্ধ আছে, ইহা প্রদর্শিত হইল না।

কালনা দ্বাদশ সাম্বৎসরিক উৎসব।

১৪ কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার ১৮০১ শক।

প্রাতঃকালের বক্তৃতা।

অদ্য অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই যেন আমাদের আনন্দ ও উৎসাহ পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিতেছে। আজি ব্রাহ্মগণের কেমন প্রসন্ন ভাব! আজি চারি দিকেই নূতন শোভা ও নূতন ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। আজি সজীব নির্জীব সকলেরই যেন আনন্দের দিন। এই সমাজ-গৃহের পশ্চাদ্ভাগে সমশ্রেণী পাদপ সকল উৎসবে উন্মত্ত হইয়া শাখা প্রশাখা আন্দোলন পূর্ব্বক যেন নৃত্য করিতেছে? সম্মুখে ঐ ভাগীরথী তরঙ্গমালা বিস্তার করিয়া উৎসব সন্দর্শনার্থে ধাবিত হইতেছে! উড্ডীন পক্ষিকুল কলরবে যেন ব্রহ্মনাম কীর্ত্তন করিতেছে? বায়ুতে জয়ধ্বনি, নদীকূলে জয়ধ্বনি, অন্তরীক্ষে জয়ধ্বনি, এই সমাজ-মন্দিরে ব্রহ্মনামের জয়ধ্বনি হইতেছে। জয় জয় রবে অদ্য এই নগর পরিপূর্ণ। ব্রহ্ম নামের মহিমায়, নামের মাহাত্ম্যে সমাজ-গৃহ যেন পরিপূর্ণ। কেমন শোভা হইয়াছে! এ কৃত্রিম শোভা নহে। শোভনতম সেই সর্ব্বেশ্বরের মহিমাই ইহার মূল। ব্রাহ্মগণের আনন্দোৎফুল্ল মুখশ্রী দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন সেই জ্যোতির্জ্যোতি প্রত্যেকের হৃদয়-কন্দরে বিরাজমান। আজি কি জন্য এ উৎসব? ব্রহ্মপূজার জন্যই এই উৎসব।

অতি শোভাজনক বিষয়, অতি আনন্দের বিষয় যে আমরা অতি ক্ষুদ্র হইয়াও সেই

মহানের পূজায় প্রবৃত্ত হইতে পারিয়াছি। দেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম যতই লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইবে, ব্রাহ্মোপাসনা-পদ্ধতি যতই প্রচারিত হইবে, সত্যের যতই আদর হইবে, দেশের ততই মঙ্গল, মানবগণ ততই সুখী হইবে। দ্বাদশ বৎসর আমরা নির্ব্বিঘ্নে এই স্থানে ব্রহ্মপূজা করিতে পারিয়াছি ও ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মহিমা প্রচার করিতে পারিয়াছি বলিয়া তড়িত-সঞ্চারবৎ মনে আশার সঞ্চার হইতেছে যে, দয়াময় ঈশ্বর আবার বুঝি এই দুর্ব্বল দেশের প্রতি কৃপা-কটাক্ষ করিবেন, ধর্ম্মজ্যোতি বিকীর্ণ করিবেন, আবার বুঝি আর্য্যসন্তানগণের মুখ উজ্জ্বল করিবেন। এই সময়ে আমরা তাঁহার প্রসন্নতা লাভের জন্য যদি ব্যাকুল হইতে পারি, প্রকৃত অনুরাগী হইতে পারি তবেই আমাদের হৃদয় ধর্ম্মবলে বলীয়ান হইয়া উঠিবে, সঞ্চিত আশালতা ফলপুষ্পে সুশোভিত হইয়া উঠিবে। দাতা দান করিতে মুক্তহস্ত হইলে, আর আমরা অন্ধবৎ, উদাসীনবৎ নিশ্চেষ্ট হইয়া সেই উদার দান গ্রহণে ঔদাস্য প্রদর্শন করিলে, কখনই মঙ্গল হইবে না, কখনই বাসনা সিদ্ধ হইবে না। অতএব ব্রাহ্মগণ! প্রকৃত অনুরাগের সহিত ভক্তির সহিত সেই মহান পুরুষের কৃপাদান গ্রহণে অগ্রসর হও।

অনেকে এই ধর্ম্ম নূতন ও মনুষ্য-কল্পিত বলিয়া থাকেন। যাঁহারা এরূপ ভ্রম প্রমাদের বশীভূত হইয়া এই কথার আন্দোলন করিয়া থাকেন, তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন যে, ঈশ্বর যে ধর্ম্মের নেতা ও উপাস্য দেবতা, সত্য যে ধর্ম্মের জীবন, দয়া প্রভৃতি সদ্গুণ সকল যে ধর্ম্মের পত্তনভূমি, সেই আর্য্যকুলাচরিত পবিত্র পুরাতন ধর্ম্মকে নূতন বলিতে পারেন কি না। যে যে উপাদানে ব্রাহ্মধর্ম্ম গঠিত হইয়াছে তাহার কিছুই নূতন নহে। ঈশ্বর পুরাতন, ধর্ম্ম পুরাতন, ক্ষমা, আর্জ্জব, দয়া, সন্তোষও পুরাতন। এই সকল উপাদানে নির্ম্মিত ব্রাহ্ম ধর্ম্মকে নূতন বলিয়া তর্ক বিতর্ক করা নিতান্ত অযৌক্তিক। যে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম এক মাত্র পবিত্র পরমেশ্বরকে দেখাইয়া দেয়, যে ধর্ম্ম সেই সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বেশ্বরকে হৃদয়ে ধারণ করিতে উপদেশ দেয়, সেই শ্রেষ্ঠ, সেই ধর্ম্মই মনুষ্য-মনের উপযোগী ধর্ম্ম। সেই ধর্ম্মের আশ্রয়ে আসিতে পারিলেই মানবগণ প্রকৃত শান্তি অনুভব করিতে পারিবেন। মনুষ্যজাতির মধ্যে প্রকৃত গৌরবাস্পদ হইয়া উঠিবেন, শ্রেষ্ঠতা লাভ করিতে পারিবেন—এ বিষয়ে মনু বলিয়াছেন

> "ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠা প্রাণিনাং বুদ্ধিজীবিনঃ।
> বুদ্ধিমৎসু নরাঃ শ্রেষ্ঠা নরেষু ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ॥
> ব্রাহ্মণেষু চ বিদ্বাংসোবিদ্বৎসু কৃতবুদ্ধয়ঃ।
> কৃতবুদ্ধিষু কর্ত্তারঃ কর্ত্তৃষু ব্রহ্মবাদিনঃ॥"

এই শ্লোক পাঠ করিয়া জানা যাইতেছে যে ব্রহ্ম-উপাসনাই শ্রেষ্ঠ উপাসনা, ব্রহ্মপূজাই শ্রেষ্ঠ পূজা, জগতে ব্রহ্মবাদীরাই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া থাকেন। যে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম সেই পরব্রহ্মের পথ-প্রদর্শক, যে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম এক মাত্র ব্রহ্মের উপাসনা করিতে শিক্ষা দেন, সেই ধর্ম্মকে নূতন বলিয়া ব্যাখ্যা করা নিতান্ত ভ্রম, তাহার আর সন্দেহ নাই।

ব্রাহ্মগণ! সাবধান, আপনারা এই অদ্ভুত মতাবলম্বীদিগের ভ্রান্তিচক্রে পতিত হইয়া মহান লক্ষ্য বিস্মৃত হইবেন না। ভাগ্যক্রমে যদিই সেই অনাথনাথের শরণাপন্ন হইয়াছেন, তবে আর কালবিলম্ব না করিয়া তাঁহাকেই প্রাণ মন উৎসর্গ করিয়া দিন। তাঁহাকে প্রাণ মন উৎসর্গ করিয়া দিবার জন্য মন্ত্র মধ্যস্থাদির প্রয়োজন হয় না। আপনারা স্বয়ংই পরব্রহ্মে মন প্রাণ উৎসর্গ করিতে ক্ষমতাবান। এটী কেমন উদার ভাব।

কোন ধর্ম্মে, কোন সম্প্রদায়ে এমন উন্নত ও পবিত্র অধিকার দেখা যায় না। ব্রাহ্মগণের এ অতি উন্নত অধিকার। ব্রাহ্মধর্ম্মের এ উপদেশ অতি উদার উপদেশ। কোন অসঙ্গত ও অনুপযুক্ত যুক্তি এ ধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইতে পারে নাই বলিয়াই এ ধর্ম্মকে মনুষ্য-মনের যথার্থ উপযোগী ধর্ম্ম বলিতে পারা যাইতেছে। মনুষ্য-মন যে উপাদানে নির্ম্মিত, মনের যেরূপ ক্ষমতা, সে সেই রূপ উপাস্য দেবতা না পাইলে কখনই তৃপ্ত থাকিতে ও অচঞ্চল থাকিতে পারে না। মানব-দেহাভ্যন্তরস্থ বায়ু-যন্ত্র পরিমিত ও পরিশোধিত বায়ু গ্রহণ করিতে না পারিলে যেমন অস্থির ও চঞ্চল হইয়া উঠে, অনন্ত-ক্ষমতা-সম্পন্ন মনও তেমনি অনন্ত দেবের শরণাপন্ন হইতে না পারিলে কখনই স্থির থাকিতে পারে না। পারে না বলিয়াই ক্ষণে ক্ষণে সেই মনের গতি-বৈচিত্র্য জন্মিয়া থাকে। নূতন দেখিলেই মুগ্ধ হয়,নূতন শুনিলেই অযথাস্থানে ভক্তি-বৃত্তি ন্যস্ত করিয়া থাকে। মন যে পর্য্যন্ত সেই অনন্ত দেবের শরণাপন্ন হইতে না পারে,যে পর্য্যন্ত প্রকৃত তৃপ্তির পথে উপনীত হইতে না পারে সে পর্য্যন্ত মনের অশেষ দুর্গতি ও নানা পথে গতাগতি হয়। পথ-ভ্রান্ত পথিকবৎ মনের এরূপ দুর্গতি দেখিয়াও যাঁহারা পরব্রহ্মে প্রাণ সমর্পণ করিতে চাহেন না, ধর্ম্মে অবহেলা করিয়া থাকেন, তাঁহারা নিতান্ত কৃপাপাত্র ও অতি দীন। যিনি অসৎ হইতে সৎস্বরূপের শরণাপন্ন হইতে চাহেন, যিনি মৃত্যু হইতে অমৃতের আশ্রয়ে যাইতে চাহেন, প্রাণারাম পরমেশ্বরে প্রাণ মন উৎসর্গ করিয়া দিয়া নিত্য শান্তি সম্ভোগ করিতে বাসনা করেন, তিনি কাচ-কণাতে মুগ্ধ না হইয়া রত্নাকর জগদীশ্বরে অদ্যই মন প্রাণ উৎসর্গ করিয়া দিন, জন্ম সফল করুন।

ব্রাহ্মগণ! আপনারা পবিত্র স্বরূপের শরণাপন্ন হইয়াছেন, সাবধান, আর যেন অপবিত্র কোন ঘৃণিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া উদার ধর্ম্মের অবমাননা না করেন। আপনাদের সদনুষ্ঠানের উপর ধর্ম্মোন্নতির অনেক আশা রহিয়াছে। ধর্ম্মের পথে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিতে হইবে। সত্যের জন্য কতদূর বলবীর্য্য দেখাইতে পারিয়াছেন, ঈশ্বর-মহিমা প্রচার করিতে কতদূর যত্ন করিয়াছেন প্রতিবাসীরা তাহা দেখিবার জন্য উদগ্রীব হইয়া রহিয়াছেন। সমাজে ধর্ম্মবল দেখাইতে পারিলে, অনুরাগ দেখাইতে পারিলে তবে ধর্ম্মের উন্নতি করিতে পারিবেন। ধর্ম্মসাধন কেবল মুখের কথা নহে; প্রত্যেক কার্য্যে, প্রতিপদ-প্রক্ষেপে, ধর্ম্ম ভাবের পরিচয় দিতে হইবে; জগতকে শিক্ষা দিতে হইবে, তবে আপনাদের গৌরব ও ঈশ্বরের মহিমা জগতে প্রচার হইতে থাকিবে।

হে জগতপিতা অখিলমাতা ঈশ্বর, তোমার কৃপায়, তোমার অনুগ্রহে আমরা এইস্থানে যে দ্বাদশ বৎসর তোমার পবিত্র মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে পারিলাম সেই-জন্য আজি এই পবিত্র প্রাতঃকালে তোমাকে মনের সহিত বারবার নমস্কার করিতেছি। ত্রয়োদশ বাৎসরিক পূজার জন্য আমি তোমার উদ্দেশে বোধন সংস্থাপন করিতেছি এবং সেই জন্যই আজি এ উৎসব। দয়াময়! তুমি প্রসন্ন হইয়া আমাদের সম্বোধন শ্রবণ কর। আমাদিগকে ধর্ম্মসাধনে সম্যক বলশালী কর। শান্তি দাও, ক্ষেম দাও, এই ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি দাও। আমরা শরণাগত, তুমি শরণাগতবৎসল। আমরা আশ্রিত, তুমি আশ্রয়, আমরা পাপে তাপিত তুমি শান্তি-সলিল। দেব! অপবিত্র রজমাবৃত বালক যেমন অনুক্ষণ ও

অভয় চিত্তে মাতার ক্রোড়ে যাইতে শঙ্কিত হয় না; পাপে অপবিত্র আমরাও তেমনি তোমার পবিত্র অধিকারে উপস্থিত হইতে ভীত বা ক্ষুব্ধ হই না। পিতঃ! পিতা যেমন হস্তাবলম্বন দিয়া বালককে পাদচারণা অভ্যাস করান, তুমি সেইরূপ হস্তাবলম্বন দিয়া আমাদিগকে ধর্ম্ম-জগতে গতি-শক্তি শিক্ষা দাও। যখনই তোমার মহিমার উপর নির্ভর করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করি তখনি শুভ ফল প্রাপ্ত হই। তখনই প্রকৃত শক্তি লাভ করিতে পারি। যখনই মনুষ্যের উপর, আপনার উপর নির্ভর, তখনই অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করি, ভগ্নাশ হইয়া অশেষ দুর্গতি প্রাপ্ত হই। দেব! বিনীত ভাবে প্রার্থনা করি, সততই যেন তোমাকে মনে রাখিয়া কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে পারি। তোমার উপর নির্ভর করিয়া সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হই। রঙ্গভূমিতে নর্ত্তকী যেমন মস্তকস্থিত তৈজসাদির প্রতি মন রাখিয়া নৃত্য করিয়া থাকে, আমরা যেন সেইরূপ পরমারাধ্য পরম বস্তু তোমাকে মনে রাখিয়া, তোমাতে লক্ষ্য রাখিয়া সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারি, এই আশীর্ব্বাদ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

---

১৪ কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার ১৮০১ শক।

সায়ংকালের বক্তৃতা।

আজ সায়ংকাল আমাদিগের নয়নে যেন নূতন রূপ ধারণ করিয়াছে। সমস্ত পদার্থই যেন অপূর্ব্ব ভাব ধারণ করিয়া সেই মহান্ পুরুষের অনির্ব্বচনীয় প্রেম প্রকাশ করিতেছে। পক্ষিকুল ব্যাকুল হইয়া কলরব করিতে করিতে গমন করিয়া নিজ নিজ আবাস-বৃক্ষে আসীন হইতেছে। দেখিলে বোধ হয় যেন, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া স্ব স্ব আবাস-স্থানে বিলীন হইতেছে। এই গৃহের প্রত্যেক বস্তুতে, প্রত্যেক আলোকে সেই দেবাদিদেব পরম পুরুষের সত্তা উপলব্ধি হইতেছে। এই গৃহস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তির মুখমণ্ডলে কেমন আশ্চর্য্য আনন্দের ভাব লক্ষিত হইতেছে। এই সমাজ-গৃহ যেন একটি অপূর্ব্ব ভাবে পরিপূর্ণ হইয়াছে। ইহার কারণ কি? সেই সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের আবির্ভাবই ইহার একমাত্র কারণ।

আজ কালনা ব্রাহ্মসমাজের দ্বাদশ সাংবৎসরিক মহোৎসব। সেই উৎসব উপলক্ষেই আমাদিগের এই আয়োজন! এই উৎসবে তামসিক ব্যাপারের লেশমাত্র নাই। ইহা আধ্যাত্মিক উৎসব। আত্মোন্নতিসাধন, ধর্ম্মভাবের উদ্দীপনাই ইহার লক্ষ্য, অনুপম ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগই ইহার একমাত্র ফল। সেই ফল ভোগ সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। যাঁহারা ধর্ম্ম-পথের পথিক, যাঁহারা ঈশ্বরের প্রতি আত্ম সমর্পণ করিয়াছেন, যাঁহাদের হৃদয়ে ধর্ম্মানুরাগের বিমল জ্যোতি প্রদীপ্ত রহিয়াছে, যাঁহাদের হৃদয়ে সত্যের প্রখর প্রভা সর্ব্বদাই দীপ্যমান রহিয়াছে, যাঁহাদের হৃদয়ে পাপের মলিনতা, প্রতারণার কলুষতা ও অসদাচরণের প্ররোচনা নাই, যাঁহারা ঈশ্বর ব্যতীত আর কাহাকেও মুক্তিদাতা বলিয়া বিশ্বাস করেন না, যাঁহাদের সকল কার্য্যই ঈশ্বরের প্রীতি সাধন করে, তাঁহাদের ভাগ্যেই সেই ফলভোগ ঘটিয়া উঠে।

এই কালনা ব্রাহ্মসমাজ সেই পরম পিতা পরমেশ্বরের একমাত্র কৃপাবলে আজ ত্রয়োদশ বৎসরে পদার্পণ করিল। তিনি ভিন্ন এই হীনবল ব্রাহ্মসমাজের আর কেহই সহায় নাই। তিনিই আমাদিগের সহায়, তিনিই আমাদিগের সম্পত্তি। আমরা

যখন ইহার উন্নতি গণনা করি, তখন আমাদিগের হৃদয় একবারে অবসন্ন হইয়া পড়ে। আজ দ্বাদশ বৎসর অতীত হইল, কই ইহার উন্নতি ত লক্ষিত হয় না। কি দুঃখের বিষয়! কি আক্ষেপের বিষয়! এই সমৃদ্ধ নগরে অনেক বিদ্বান ও অনেক ধনশালী লোক আছেন। কেহই ত এই সমাজের প্রতি অনুরাগ বা আস্থা প্রদর্শন করেন না; বরং কখন কখন বিদ্বেষ ভাব লক্ষিত হইয়া থাকে। আহ্লাদের বিষয় এই যে, তাঁহাদিগের বিদ্বেষ ভাব যে এই ক্ষুদ্র সমাজের কিছু মাত্র ক্ষতি করিতে পারে নাই, সে কেবল ঈশ্বরের অনুগ্রহে; তাঁহার কৃপা ব্যতীত ইহার আর কোন বল নাই। তাঁহার কৃপাই ইহার এক মাত্র বল ও এক মাত্র সহায়।

এক্ষণে আমরা সকলের নিকট বিনীত ভাবে এই প্রার্থনা করি যে, তাঁহারা একবার এই বিশ্বজনীন ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষশূন্য পক্ষপাতহীন দৃষ্টিপাত করিয়া দেখুন। তাঁহাদিগের বুদ্ধি আছে, বিবেক-শক্তি আছে; তাঁহারা একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন। আমরা আর কিছু বলি না; আর কিছু চাহি না। তাঁহারা একবার জ্ঞাননেত্র উন্মীলন করিয়া দেখুন যে, এই সনাতন ধর্ম্মের বীজ বপন করিলে, কি প্রকার শুভ ফল প্রসব করিবে। কি স্ত্রী কি পুরুষ কি ধনী কি নির্ধন, কি জ্ঞানী কি অজ্ঞান, কি নীচ, কি মহৎ, যদি সকলেই এই ধর্ম্ম গ্রহণ করেন, যদি সকলেই হৃদয়ের সহিত অনুরাগ প্রকাশ করেন, তাহা হইলে এই দুঃখসমাকুল বিদ্বেষপূর্ণ অজ্ঞানাচ্ছন্ন নগর একবারে স্বর্গীয় ভাব ধারণ করিবে। পরস্পরদ্বেষ হিংসা প্রভৃতি পশুভাব সকল অন্তর্হিত হইবে। পাপের প্রখর স্রোত একবারে রুদ্ধ হইয়া যাইবে। সত্যের জ্যোতি প্রকাশিত হইবে; আনন্দের তরঙ্গ উত্থিত হইতে থাকিবে। কুসংস্কারের ভীষণ মূর্ত্তি দেশ হইতে পলায়ন করিবে। ভ্রমান্ধকার বিদূরিত হইয়া প্রকৃত জ্ঞানালোক চারি দিকে বিকীর্ণ হইতে থাকিবে। সত্যধর্ম্মের প্রকৃত ভাব প্রকাশিত হইলে, দেশ আনন্দময়, আলোকময় ও মধুময় হইয়া উঠিবে। সত্যধর্ম্মের কি রূপ প্রভাব তখন তাঁহারাই দেখিতে পাইবেন।

এই ব্রাহ্মধর্ম্ম বিশ্বসংসারের ধর্ম্ম; ইহা কোন দেশ, কোন সম্প্রদায় বা কোন জাতির ধর্ম্ম নহে। ইহা কোন রূপ সঙ্কীর্ণ ভাব বা কোন সঙ্কীর্ণ নিয়মে বদ্ধ নহে। ইহার উদার ভাব সকলেই দেখিতেছেন; ইহার অমৃতময় ফলও সকলে প্রত্যক্ষ করিতেছেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য সর্ব্বত্রেই নিহিত আছে। এই ধর্ম্ম কোন ধর্ম্মের প্রতি দ্বেষ করেন না; কাহারও প্রতি হেয়তা প্রদর্শন করেন না।

হে অন্তর্যামিন্, হৃদয়েশ, তোমারই অনুগ্রহে তোমারই কৃপায় এই কালনা ব্রাহ্ম সমাজ বহুবিধ বিঘ্ন বিপত্তি উল্লঘন করিয়া আজ ত্রয়োদশ বৎসরে উপনীত হইয়াছে। ইহা আমাদিগের সামান্য সৌভাগ্যের বিষয় নহে। হে অনাথশরণ, কেবল তোমারই কৃপায় ও ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মহিমায় মধ্যে মধ্যে দুই একজন যুবা এই ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন। অদ্য প্রাতঃকালে সদ্বংশজাত এক যুবক এই পবিত্র সনাতন ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া মানব জন্মের সার্থকতা লাভ করিয়াছেন। হে দীনবন্ধু, আমরা কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিতেছি যে তোমার এই বিশ্বজনীন সনাতন ধর্ম্মের মধুর উদার ভাব যেন এই নগরবাসী আবাল বৃদ্ধ বনিতা হৃদয়ে উদ্ভাসিত হয়। সকলেই যেন এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লালায়িত হইয়া এই নগরের মুখ উজ্জ্বল করেন। তোমার মহিমা যেন

এই নগরের সর্ব্বত্র অহরহ উদ্গীত হইতে থাকে। অধিক কি বলিব; তুমি সকলই জান, সকলই দেখিতেছ। আমাদিগের এই ক্ষুদ্র সমাজটি যেন চিরস্থায়ী হইয়া তোমার অনন্ত মহিমা প্রকাশ করিতে থাকে।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

মৃত মহাত্মা অমৃতলাল মিত্রের স্মরণার্থ চিহ্ন।

আমরা ভূতপূর্ব্ব তত্ত্ববোধিনী সভার গ্রন্থাধ্যক্ষ পরলোকগত অমৃতলাল মিত্র মহাশয়ের স্মরণীয় চিহ্নের নিম্নে লিখিত অনুষ্ঠান-পত্র অতি আদরে প্রকটন করিলাম। লোকে রাজপুরুষ অথবা যোদ্ধা অথবা গ্রন্থকারের স্মরণীয় চিহ্ন স্থাপন করিতে যত অগ্রসর সচ্চরিত্র ব্যক্তির স্মরণীয় চিহ্ন স্থাপন করিতে তত অগ্রসর হয় না, কিন্তু মনুষ্য চরিত্রগত সদ্গুণের যত মর্য্যাদা করিবে ততই সে প্রকৃত সভ্য-পদবীতে আরোহণ করিবে। মিত্র মহাশয় একটি সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন মহারত্ন ছিলেন সন্দেহ নাই। যে তাঁহাকে একবার দেখিয়াছে সে তাহা মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার করিবে।

বিগত পৌষ মাসের সপ্তবিংশ দিবসে বঙ্গের অঙ্গভূষণ শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল মিত্র প্রায় ৬৮ বর্ষ বয়ঃক্রমে শ্রীশ্রী৺ কাশীধামে পরলোক গমন করিয়াছেন। এতাদৃশ সর্ব্বগুণসম্পন্ন মহারত্ন জগতে অতি বিরল। যাঁহারা সে মহাপুরুষের বিষয় বিশেষ অবগত আছেন, তাঁহারা অবশ্যই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন যে, অমৃত বাবুর লোকান্তর প্রাপ্তিতে আর্য্যদেশ একটী ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। নানাবিদ্যাবিশারদ অথচ নিরভিমান, বিপুলবুদ্ধিশালী অথচ ঔদ্ধত্যবিহীন, পরহিতরত অথচ আড়ম্বরশূন্য, তেজস্বী অথচ নিরীহ, স্পষ্টবাদী অথচ সুবিনয়ী, সত্যনিষ্ঠ অথচ পরিণামদর্শী, স্বাধীনতাপ্রিয় অথচ কোমলপ্রকৃতি, উৎসাহী অথচ ধীর, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অথচ নির্ব্বিরোধী, ন্যায়পর অথচ ক্ষমাশীল, এরূপ লোক সচরাচর আর একজন দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু তিনি সর্ব্বত্র বিশিষ্ট রূপে পরিচিত নহেন। সংসারে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করা জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য বটে তত্রাচ সকলের নহে। অমৃত বাবুর যশোলিপ্সাই আদৌ ছিল না, নতুবা যশোমন্দিরে প্রবেশ করা তাদৃশ মহানুভবের পক্ষে অতি সামান্য কথা। চঞ্চল মানব-মতির প্রশংসা-ভাজন হওয়া তিনি তুচ্ছ বিবেচনা করিতেন। তাঁহার উদ্দেশ্য অতি উচ্চ ছিল, তাহা সকলের উপলব্ধি হওয়া সুকঠিন। বলিতে কি, তিনি যথার্থই বঙ্গের একটী লুক্কায়িত রত্ন ছিলেন। নির্জ্জনে বসিয়া কায়মনোবাক্যে সতত জগতের হিতসাধন করিতেন। স্বদেশ-বাৎসল্য যে কাহাকে বলে, তাহা তিনিই জানিতেন; আর যদি সেই স্বদেশ-বাৎসল্য কাহারও হৃদয়ে থাকে, তবে সে তাঁহারই অন্তঃকরণে অহর্নিশি জাজ্বল্যমান ছিল। তাঁহাকে বঙ্গের অলঙ্কার, ভারতের গৌরব, পৃথিবীর পবিত্রতা এবং জগতের আদর্শ বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। নিরালয়ে থাকিয়া মনুষ্যের মঙ্গল সাধিতে পারিলেই আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিতেন। সেই বঙ্গকুলচূড়ামণি, আর্য্যতিলক, মানব জাতির উপমাস্থল, সত্যের প্রতিরূপ পুরুষরত্ন, কান্তার-কুসুম-সদৃশ অন্ধখনি-মণির মত, অদৃশ্য ভাবে মনুষ্যের হিতসাধন করিতে করিতে শ্রীশ্রী৺ কাশীধামে এই নশ্বর মানব দেহ পরিবর্ত্তন করিয়া দেবদেহ ধারণ করিয়াছেন। অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, অমৃত বাবু কে? উত্তর জান না, জানিবে না, জানিতে পারিবে না; যিনি জানেন, তিনি কাঁদিতেছেন। বঙ্গদেশের দুরদৃষ্টবশতঃ এতাদৃশ মহাপুরুষের স্মরণার্থ চিহ্ন বিষয়ে অদ্যাবধি কোন উল্লেখ হয় নাই। আমরা নিতান্ত কৃতঘ্ন, তাই এখনও পর্য্যন্ত তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হই নাই। অমৃত বাবুর আত্মীয়বর্গের প্রতি আমার সবিনয় অনুরোধ এই যে, তাঁহারা যেন এই দুরপনেয় কলঙ্ক মোচনে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন, আর শিথিলযত্ন হওয়া কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু তাঁহারা যে প্রকারে পারেন, অমৃত বাবুর নাম চিরস্মরণীয় করুন। আমার ক্ষুদ্র হৃদয়েও একটী বাসনা উপস্থিত হইয়াছে। মৃত মহাত্মা নিজ গুণে আমাকে স্বীয় বন্ধুত্বে বরণ করিয়াছিলেন, সুতরাং আমি তাঁহার নিকট বিশেষ ঋণগ্রস্ত আছি। এক্ষণে সেই ঋণের যথাকথঞ্চিৎ পরিশোধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি। জানি না কতদূর কৃতকার্য্য হইব। একটী বৃহৎ জলাশয় অমৃত বাবুর নামে প্রতিষ্ঠিত করিতে মনস্থ করিয়াছি। উহার নাম অমৃত-সরোবর থাকিবে। যে প্রদেশে বিশেষ জলকষ্ট এইরূপ স্থলে সেই পুষ্করিণী খোদিত

হইবে। কিন্তু আত্মবন্ধুবর্গের সাহায্য ব্যতীত এবম্বিধ গুরুতর কার্য্যে কোন মতেই কৃতকার্য্য হইবার প্রত্যাশা নাই। অন্য কোন রূপ উপায় অবলম্বন না করিয়া অমৃত বাবুর স্মরণার্থ পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠায় আগ্রহ প্রকাশ করিবার বিশেষ কারণ আছে। অমৃত বাবু পীড়া প্রযুক্ত চিকিৎসকদের পরামর্শানুসারে প্রায় আজীবনই উচিতরূপ জল ব্যবহারে বঞ্চিত ছিলেন। কিন্তু মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পুনরায় তাঁহার অদৃষ্টে জীবন স্বরূপ জল ব্যবহার প্রচুর রূপে ঘটিয়াছিল। ইদানীন্তন তাঁহার মুখে প্রায়ই সেই জলের কীর্ত্তনই শুনা যাইত। সতত্ই বলিতেন মর্ম্মর (প্রস্তর) মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া কাহাকে চিরস্মরণীয় করিবার অপেক্ষা দীর্ঘিকাদি খোদিত করিয়া মৃত লোকের নামে প্রতিষ্ঠিত করা সহস্র গুণে শ্রেয়স্কর। বোধ হয়, এই পুষ্করিণীতে তাঁহার জীবাত্মার যতদূর তুষ্টির সম্ভব এমন আর কিছুতেই হইতে পারে না। অধিকন্তু তিনি বিরলে বসিয়া যেরূপ জগতের হিত সাধন করিয়াছেন, অমৃত-সরোবরও নিরালয়ে থাকিয়া অতি সামান্যরূপেও লোকের মহৎ উপকার সাধিতে পারিবে। এক্ষণে সাধ্যমতে সাহায্য দানে অগ্রসর হউন এই আমার প্রার্থনা। সাহায্যোচ্ছুক মহোদয়েরা শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বা আমার নিকট সাহায্য পাঠাইবেন।

কলিকাতা, ৭৮নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রিট, ২৮এ অক্টোবর, ১৮৭৯ সাল।

শ্রীলোকনাথ মৈত্র।
হোমিওপাথিক চিকিৎসক।

বিজ্ঞাপন

আগামী ১০ মাঘ রাত্রি ৬।।০ ঘটিকার সময় আদি ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে ব্রহ্মোপাসনা হইবে। তৎকালে ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বেদির আসন গ্রহণ করিবেন।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ।

২৩ পৌষ ৫০ ব্রাহ্ম সম্বৎ।

আদি ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহার্থে অদ্য হইতে নিম্ন-লিখিত কর্ম্মচারিগণ নিযুক্ত হইলেন। যত দিন পুনঃপরিবর্ত্ত না হয় তত দিন ইহাঁরা স্ব স্ব পদে স্থায়ী থাকিবেন।

সভাপতি।

শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু

কর্ম্মাধ্যক্ষ।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পাথুরেঘাটা)
শ্রীযুক্ত নীলমণি চট্টোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত নবগোপাল মিত্র
শ্রীযুক্ত রাজারাম মুখোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর বসু
শ্রীযুক্ত ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ দত্ত
শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ মিত্র
শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বিশ্বাস

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
ট্রষ্টী।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৫ মাঘ রবিবার দুই প্রহর তিন টার সময় আমার ভবনে ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপক মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ একটী সভা হইবেক। উক্ত সভার কার্য্য নিম্নলিখিত প্রণালী ক্রমে সম্পাদিত হইবে। ব্রাহ্ম মহাশয়গণ উক্ত সভায় আগমন করিয়া কার্য্য সুসম্পাদন করিবেন।

কার্য্য-প্রণালী।

বিষয়	বক্তা
১। রামমোহন রায়ের রচিত একটী ব্রহ্ম সংগীত।	
২। সভাপতি নিয়োগ।	

৩। সভার উদ্দেশ্য বর্ণন (রাজা রামমোহন রায়কে সাধারণ ভূমি করিয়া ব্রাহ্ম সাধারণের সম্মিলন)।	শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর।
৪। রাজা রামমোহন রায়ের মহত্ত্ব ও কীর্ত্তি সম্বন্ধীয় বক্তৃতা।	শ্রীযুক্ত বাবু বেচারাম চট্টোপাধ্যায়।
৫। রাজা রামমোহন রায়ের কোন প্রকার স্মৃতি-চিহ্ন স্থাপনের উদ্দেশে দেশস্থ সকল শ্রেণীর ভদ্র লোকের নিকট গিয়া তাহাদিগের দ্বারা একটী সর্ব্বসাধারণের সভা আহ্বান করিবার জন্য কতক গুলি ব্যক্তির প্রতি ভারার্পণ করিবার প্রস্তাব।	শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রস্তাব করিবেন। শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত পোষকতা করিবেন।

৬। রামমোহন রায়ের রচিত কয়েকটী ব্রহ্মসংগীত।

সভা ভঙ্গ হইলে সকলে আদি ব্রাহ্মসমাজে উপস্থিত হইয়া সমস্বরে ঈশ্বরবন্দনা করিবেন।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে ১১ মাঘের উৎসবে অত্যন্ত জনতা ও লোকেরা মৃতকল্প হয়, তজ্জন্য ঐ দিবসে রাত্রি কালের উপাসনার সময় উপাসনা-ক্ষেত্রের বসিবার স্থান লোকপূর্ণ হইলে প্রবেশ-দ্বার রুদ্ধ করা হইবে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

আগামী ১১ ফাল্গুন রবিবার বর্দ্ধমান ব্রাহ্ম সমাজের বিংশ সাম্বৎসরিক মহোৎসব হইবে।

শ্রীঅম্বিকাচরণ সরকার
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ১১ মাঘ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ উপলক্ষে ১১।১২।১৩ মাঘে আদি ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়স্থ বিক্রেয় পুস্তক সকল ও পুরাতন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সকল নিম্নলিখিত নগদ মূল্যে বিক্রয় হইবে।

মফস্বলের ক্রেতাগণ ১১ মাঘের মধ্যে মণিঅর্ডার বা হুণ্ডি দ্বারা পুস্তকের মূল্য ও আনুমানিক ডাক মাশুল পাঠাইলেই পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন, ডাকের টিকিট পাঠাইবেন না।

নির্দ্ধারিত মূল্য।

ব্রহ্ম বিদ্যালয়	১
প্রকৃত অসাম্প্রদায়িকতা কাহাকে বলে?	/০
জীবনের উদ্দেশ্য ও তৎসাধনের উপায়	৵০
গীতাঙ্কুর	/০
ব্রহ্মসঙ্গীত সম্পূর্ণ তাল বাঁধা ...	৷০
এতদ্দেশীয় মহিলাগণের পূর্ব্বাবস্থা	৷০
রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী ১ম হইতে ১০ম সংখ্যা পর্য্যন্ত; প্রতি সংখ্যা	৷০

	Rs.	As.	P.
A Discourse against Hero-making in religion	"	12	"
Science of Religion	"	4	"
History of the Brahmo Samaj	3	"	[illegible]
Who is Christ? A Reply to K. C. Sen. A Sermon by Rev. C. Voysey			৫

---

২৫ টাকা কমিসন বাদে নির্দ্ধারিত মূল্য।

ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান সম্পূর্ণ (নূতন সংস্করণ)	৩৸০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (লাল কাল অক্ষরে)	১৷০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (ঐ ভাল বাঁধা)	১৸৵০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (মূল ও টীকা দেবনাগর অক্ষরে ও তাৎপর্য্য বাঙ্গালা অক্ষরে)	২৷৵০
বেদান্ত প্রবেশ	৸০
বক্তৃতা কুসুমাঞ্জলি	৸০
স্মৃতি	৸০
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস ...	।৵০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা প্রথম ভাগ	।৵০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা দ্বিতীয় ভাগ	৷/০
হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা	।৵০
পৌত্তলিক প্রবোধ	๏/০
গৃহকর্ম্ম	৶০
প্রাতাহিক ব্রহ্মোপাসনা	৵ ৫

	As	P.
Defence of Brahmoism and the Brahma Samaj	3	
Brahmic Questions of the Day	4	6
Brahmic Advice, Caution and Help	2	3
Adi Brahma Samaj, its Views and Principles	1	6
Adi Brahma Samaj as a Church	2	3
A Reply to the Query; "What is Brahmoism?"	3	
Theistic Toleration and Diffusion of Theism	0	9
Reply to Bishop Watson's Apology for the Bible	4	6

নির্দ্ধারিত অর্দ্ধ মূল্য।

ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান—প্রথম প্রকরণ	।০
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান—দ্বিতীয় প্রকরণ	।০
মাসিক ব্রাহ্মসমাজের উপদেশ ...	।০
ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ ও আমাদিগের আধ্যাত্মিক অভাব	৵০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (দেবনাগর অক্ষরে)	।০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম	৵০

বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম দ্বিতীয় খণ্ড ... ৴০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম তাৎপর্য্য সহিত ... ৷০
মাঘোৎসব ৷৷০
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ... ৵০
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ৵০
কাশীশ্বর মিত্রের বক্তৃতা ... ... ।০
বেহালা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ... ৵০
ভবানীপুর সাংবৎসরিক সমাজের বক্তৃতা (১০
বোয়ালিয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনা ও উপদেশ ৷৷০
তত্ত্ববিদ্যা দ্বিতীয় সংস্করণ ... ৸০
ধর্ম্মতত্ত্ব দীপিকা প্রথম ভাগ ... ৷৷০
ধর্ম্মতত্ত্ব দীপিকা দ্বিতীয় ভাগ ৷৷০
ধর্ম্মতত্ত্ব দীপিকা প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রে ১
অধিকারতত্ত্ব ... ... ।০
হিন্দুধর্ম্মনীতি ৷৷০
ধর্ম্ম ও জ্ঞানের মীমাংসা ৴১০
তত্ত্বপ্রকাশ ৴১০
ধর্ম্মতত্ত্বালোচনা ৴১৫
ব্রহ্মোপাসনা ... ... (১০
ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতি ... ... (১০
ব্রহ্ম-স্তোত্র ... ... (১৫
ধর্ম্ম-শিক্ষা ৴০
প্রবচন সংগ্রহ ... ... (১৫
ব্রহ্ম-সঙ্গীত চতুর্থ ভাগ ৴০
ব্রহ্ম-সঙ্গীত পঞ্চম ভাগ ৴০
সঙ্গীত মুক্তাবলী ১।২ ভাগ একত্রে ... ৵০
সঙ্গীত মুক্তাবলি তৃতীয় ভাগ ... ৵০
কুমারশিক্ষা ৵০
প্রশ্নমঞ্জরী ... ... ।০
প্রভাত-কুসুম ৶১০
উদ্বোধনাঞ্জলি ... ... (১০
ধর্ম্ম দীক্ষা ... ... (১০
ব্রহ্মসাধন ৴০
ব্রাহ্মজ্ঞান সূত্র তাৎপর্য্য সহিত ... ৴১০
ব্রাহ্মধর্ম্ম ভাব প্রথম খণ্ড ... ... (১৫
ব্রাহ্মধর্ম্ম ভাব দ্বিতীয় খণ্ড ৴০
ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত জনসমাজের সম্বন্ধ ... (১০
ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ বিষয়ক প্রস্তাব ... (১০
উপদেশ ... ... (৫
দুর্গোৎসব ... ... (১০
পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত (১০
বর্ণমালা প্রথম সংখ্যা ... ... (৫
বর্ণমালা দ্বিতীয় সংখ্যা ... (১০

	Rs	As	P.
Ontology	1		
Hindoo Theism			6
Theist's Prayer Book			6
Signs of the Times			6
Doctrine of Christian Resurrection		1	
Physiology of Idolatry		1	
Miracles or the Weak Points of Revealed Religion		4	

নির্দ্ধারিত সিকি মূল্য।

দশোপদেশ ৶১০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (টীকা সহিত) ৴০
অনুষ্ঠান পদ্ধতি ৵০
বৃত্তি সহিত কঠোপনিষৎ (দেবনাগর অক্ষরে) (১০

১৭৭০ শক অবধি ১৭৯৯ শক পর্য্যন্ত (১৭৭৪ ও ১৭৮১ শক বাদে) যে সকল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা পুস্তকালয়ে উপস্থিত আছে, তৎসমুদায়ও অর্দ্ধমূল্যে অর্থাৎ প্রতি বৎসরের একত্র বাঁধান ২৷৷০ টাকায় হিসাবে বিক্রয় হইবে।

নির্দ্ধারিত মূল্যের পুস্তক সকল অন্যূন দশ টাকার ক্রয় করিলে শতকরা ১২৷৷০ টাকার হিসাবে কমিসন দেওয়া হইবে।

আয় ব্যয়

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫০।

অগ্রহায়ণ।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	... ...	১৭২ (১৫
পূর্ব্বকার স্থিত	...	২৭০ ৶ ১৫
সমষ্টি	... ...	৪৪২ । ১০
ব্যয়	... ...	২৮৬ ৷৷৴৫
স্থিত	... ...	১৫৫ ৷৷ ৶৫

আয়

ব্রাহ্মসমাজ	৯ ৸৴০
দান প্রাপ্তি।	
শ্রীযুক্ত রামসুন্দর রায় (খেতুপাড়া)	৬
" দেবেন্দ্রদেব দাস	২
	৮
সঙ্গীতের কাগজ বিক্রয়	১৸৴০
	৯৸৴০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৩৩ ।০
পুস্তকালয় ...	২৭ ৷৷৴ ৫
যন্ত্রালয় ...	৯২ ।০
গচ্ছিত ...	৯ ৶ ১০
সমষ্টি	১৭২ (১৫

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	৬৫ । ১৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা... ...	১০১ ৷৷৶ ৫
পুস্তকালয়	১৮ ৷৷৴ ১৫
যন্ত্রালয়	৭৯ ৷৷৶ ১৫
গচ্ছিত	২১ ৶ ১৫
সমষ্টি	২৮৬ ৷৷৴৫

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

Registerd NO 52.

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

পঞ্চাশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

৫০ ব্রাহ্ম সম্বৎ ১১ মাঘ শনিবার।

প্রাতঃকাল

শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ গড়গড়ির বক্তৃতা

সেই চির রজনীর অন্ধকার ভেদ করিয়া তেজঃপুঞ্জ তপন যখন প্রথমে আকাশ-আসনে উপস্থিত হইল, তখন অবধিই এই ব্রহ্মোৎসবের সৃষ্টি। তখন মনুষ্য কাহার মহিমা সেই প্রতাপান্বিত সূর্য্যে দেখিয়াছিল; তাঁরই মহিমা যাঁহার সৌন্দর্য্যের কণামাত্র লইয়া সূর্য্য আপনার স্রষ্টার বরণীয় শক্তি নিঃশব্দে প্রকাশ করিয়াছিল। সেই উৎসবের পবিত্র স্রোত অদ্যাবধি প্রবাহিত হইয়া দিক্‌বিদিককে শান্তি-সলিলে অভিষিক্ত করিতেছে। তাঁহাকে লইয়াই মনুষ্যের উৎসব ও আনন্দ। তাঁহাকে ছাড়িয়া কে কোথায় উৎসব করিয়াছে, ও করিতে পারে? সত্য বটে এই উৎসবের স্রোত সর্ব্বকালে সর্ব্বস্থানের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে—কিন্তু যেখানে ইহা স্বর্ণ-রেণু-পূর্ণ খাত দিয়া প্রবাহিত হয় সেই স্থানেই ইহার বিশেষ শোভা। সেই শোভা আমরা কেবল স্বর্ণ-ভূমি ভারতের উপরেই দেখিতে পাই। আজ নয়ন ভরিয়া সেই শোভা দেখিতেছি। আজি সেই উৎসব। সেই আদি দিনের উৎসব যেন অবিকৃতই রহিয়াছে। আজ সেই পবিত্র ব্রহ্মোৎসব। একথা স্মরণমাত্রেই শরীর পুলকিত ও মন উদাস ভাব প্রাপ্ত হইতেছে। সকল শোভার যিনি আগার, সকল সৌন্দর্য্যের যিনি সার, স্নেহ ও প্রেমের যিনি আকর, তিনি যে উৎসবের প্রাণ, তিনি স্বয়ং যে উৎসবের প্রেরয়িতা ও সৃষ্টিকর্ত্তা সে উৎসব কাহার প্রাণ মন না হরণ করিতে পারে? প্রাণসম ব্রাহ্মগণ! জ্ঞান-নেত্র উন্মীলন করিয়া একবার এ মহোৎসবের মহিমা দেখ। সেই প্রেমদাতা আমাদের সম্মুখে আজ প্রেমের সাগররূপে বিরাজ করিতেছেন। এস একবার আমরা সেই প্রেম-নীরে অবগাহন করিয়া এ শোক-দগ্ধ পাপ-জর্জ্জরিত আত্মাকে শীতল করি। পুরাকালে সপ্তর্ষিমণ্ডল যেমন ব্রহ্ম-মুহূর্ত্তে মানস-সরোবরে অবগাহন করিয়া মানস-মন্দিরে সেই আদি-দেব দেব-দেবের আরাধনায় নিযুক্ত হইতেন, এস আমরা তাঁহার অতি হীন মলিন পুত্র হইয়াও তাঁরি

কৃপায় সেই অমৃত-সাগরে অবগাহন পূর্ব্বক তাঁহার অর্চ্চনা করি। এস আমরা একহৃদয় হইয়া বলি,

"তাঁর নাম স্মরণে পুলকিত মনে সুখে কেমন যায় জীবন।

স্বর্গের সুধারাশি, বহে রাশি রাশি, সে জলেতে ভাসি আনন্দ কেমন ॥

চলে মনের তরি—বিশ্বাসে নির্ভর করি, সংসারেরি পার সেই শান্তিনিকেতন ॥"

তিনি যেমন আজ আমাদিগকে প্রেম-নীরে অভিষিক্ত করিতেছেন, আমরাও কি তেমনি আজ তাঁহাকে প্রেমাশ্রু উপহার দিতে পারিব না? আমাদের আর কি আছে যে তাঁর পবিত্র চরণে উপহার দিয়া কৃতার্থ হইতে পারি। যদি তাঁর নাম স্মরণে এক বিন্দুও অশ্রু তাঁহাব পদতলে পতিত হয়, তাহা হইলেও সকল শোক সকল দুঃখ ও সকল পাপ-তাপ দূরে যায়। নেত্রলাভ সকল ও মনুষ্য-জন্ম সার্থক হয়। এই প্রেমেই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব ও দেবতার দেবত্ব। যে খানে এই প্রেম বিরাজমান সেই স্থানই স্বর্গ। আর যে খানে এই প্রেম নাই সেই স্থানই শ্মশান। এই প্রেমই আমাদের প্রকৃত বন্ধু—এই প্রেমই আমাদের গতি মুক্তির কারণ।

এই প্রেম যদি পিতা ও পুত্রের গুরু ও শিষ্যের স্বামী ও স্ত্রীর সখা ও সখার মধ্যবর্ত্তী হয়, তাহা হইলে পিতৃভক্তি গুরু-ভক্তি বাৎসল্য দাম্পত্য সৌহৃদ্য কি আশ্চর্য্য আকার ধারণ করে; কি অমৃতই ক্ষরণ করে! এক মধুময় আত্মা যখন অপর মধুময় আত্মার সহিত মিলিত হয়, আর সেই মিলনের মধ্যে যদি ঈশ্বর-প্রেমকে রাখা যায়—তবে তাহাতে কি অপার আনন্দ! আবার সেই প্রাণসম বন্ধু যখন জন্মের মত এই পৃথিবী হইতে বিদায় লয়—তাহার সস্নেহ দৃষ্টিপাত অবলোকন করিয়া যখন হৃদয় ভগ্ন হয়—তাহার মৃত শরীরোপরি অশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে যখন দিক্‌দশ অন্ধকার দেখিতে হয়—তখনও সেই প্রেম আসিয়া আমাদিগকে অতি পবিত্র বৈরাগ্য শিক্ষা দিয়া সান্ত্বনা প্রদান করে। শেষের সে ভয়ঙ্কর দিনে, যখন মনুষ্য ইহ লোক হইতে পরলোকে গমন করে—যখন অন্যে কথা কহিতে থাকে আর সে নিবৃত্ত হইয়া থাকে, যখন তাহার কলেবর হিম—দৃষ্টিহীন—ও নাড়ীক্ষীণ হয়—যখন গৃহে হায় হায় শব্দ—যখন সম্মুখে স্বজন স্তব্ধ হইয়া থাকে—তখনও সেই প্রেম তাহার আত্মাকে ভয় ও মৃত্যু-জ্বালা হইতে বিমুক্ত করে। অদ্যকার উৎসবে তাঁহার প্রেম-স্বরূপ কেমন স্পষ্ট প্রস্ফুটিত হইতেছে। ব্রাহ্মগণ! ভক্তি-ভরে তাহা অনুভব কর এবং গাঢ় অনুরাগ সহকারে তাহা হৃদয়ে স্থান দিয়া পোষণ কর যাহা সম্পদে বিপদে সুখে দুঃখে সজনে নির্জনে জীবনে ও মরণে আমাদের সঙ্গের সঙ্গী হইয়া আমাদিগকে জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মধামে লইয়া যাইবে।

হে প্রেম-স্বরূপ! আজ এই উৎসবের দিনে তোমাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া—তোমার প্রেম গান করিয়া যেমন আনন্দরসে আপ্লাবিত হইতেছি—চির দিন যেন এমনি তোমাকে হৃদয়-সিংহাসনে আসীন দেখিয়া পরমানন্দ লাভ করি। তুমি নাথ আমাদের হৃদয়কে কৃপা করিয়া অধিকার করিয়া থাক তাহা হইলে এ উৎসবের আর বিরাম হইবে না—এ জীবন উৎসবময় হইয়া যাইবে। নাথ! তুমি যে আমাদেরি—আর আমরা যে নাথ তোমারি; তোমার পদতলের সুশীতল স্থান ব্যতীত আমাদের আর শান্তি কোথায়! তুমি তোমার শান্তি-সুধা

আমাদের মধ্যে বিস্তার কর। ইহাই আমার তোমার নিকটে কামনা। তুমি কৃপা করিয়া আমার এই নির্ম্মল কামনা পূর্ণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায়ের বক্তৃতা।

প্রাতঃকাল

রসো বৈ সঃ।

সেই পরমাত্মা রস-স্বরূপ তৃপ্তি-হেতু।

আনন্দময়ের এই বিশাল বিশ্বরাজ্য দিন যামিনী কেবল আনন্দ-রসেই পরিপূর্ণ। ইহার ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল পদার্থই আনন্দসাজে সুসজ্জিত হইয়া রহিয়াছে। আলোক অন্ধকারের মধ্য হইতে সকল সময়েই সমান রূপে আনন্দ-চ্ছটা বিকীরিত হইতেছে। এই ভূমণ্ডল যে এখনই কেবল সূর্য্যকিরণে আনন্দ-বেশ ধারণ করিয়াছে—এখনই যে সূর্য্যোদয়ে চারি দিকে আনন্দ-কোলাহল উত্থিত হইয়াছে, তাহা নহে, রজনীর অন্ধকারের মধ্যে—সেই নিস্তব্ধ অবস্থার অভ্যন্তরেও ইহা অনুপম আনন্দ-সাজে সজ্জিত ছিল, ইহা মনুষ্যের আনন্দ-রবে না হউক, বিবর-গহ্বরশায়ী জীব-জন্তু কীট পতঙ্গ সকলের অন্তস্ফূর্ত্ত আনন্দ-নিনাদে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। মর্ত্ত্যের গিরি-গুহা, বন-উপবন, নগর গ্রাম সকল বিবিধ জীবের আনন্দ-লীলায় পূর্ণ ছিল। এই যে বিচিত্র কৌশল-পূর্ণ সুগন্ধি কুসুম-রাজি, এখন আমারদের চক্ষুর তৃপ্তি সাধন করিতেছে, হৃদয়ে অভূত-পূর্ব্ব আনন্দ বর্ষণ করিতেছে, ইহারা সেই রজনীর অন্ধকারের মধ্যেই প্রস্ফুটিত হইয়া আনন্দ-ভার বহন করিতেছিল। এই ওষধি বনস্পতি সকল, যাহারা এখন আপনাপন রূপ লাবণ্য বিস্তার করিয়া আমারদের আনন্দ-বর্দ্ধন করিতেছে, ইহারা সেই অন্ধকারের মধ্যেই আনন্দ-ভূষণে বিভূষিত থাকিয়াই দীপ্তি পাইতেছিল। সূর্য্য কেবল সেই কাল-যবনিকা অন্তরিত করিয়া দিয়া পৃথিবীর সেই আনন্দমূর্ত্তি—আনন্দময়ের সেই আনন্দ-পূর্ণ সৃষ্টি-কৌশলই আমারদের সন্নিধানে প্রকাশ করিতেছে।

সুধার আধার চন্দ্রমা কি অপূর্ব্ব আনন্দ-উপাদানেই নির্ম্মিত! তাহার প্রত্যেক অংশ, প্রত্যেক রশ্মিই কি অজস্র আনন্দই বিকীর্ণ করে। চন্দ্রের সৌম্য মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিলে রোগীর রোগ-যন্ত্রণার লাঘব হয়, শোকার্ত্তের সন্তপ্ত হৃদয় শীতল হইয়া থাকে, প্রেমিকের প্রেমসিন্ধু উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। মাতৃ-ক্রোড়শায়ী দুগ্ধপোষ্য শিশুও চন্দ্রদর্শনে আনন্দ-বেগ সম্বরণ করিতে অসমর্থ হইয়া আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে। উজ্জ্বল-হীরক-খণ্ড-সদৃশ গ্রহ-তারা সকল অসীম গগনে ভাসমান থাকিয়া কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-কণাই বিস্তার করে। প্রকৃতির মূলে আনন্দের উৎস নিহিত না থাকিলে অধ ঊর্দ্ধ আনন্দ রসে কেন অভিষিক্ত থাকিবে?

এই পবিত্র প্রাতঃকালে একবার বহির্জগতের প্রতি নেত্র উন্মীলন করিয়া দেখ, ইহার চারিদিক্ হইতে কেবল আনন্দেরই উৎস উৎসারিত হইতেছে। ইহার প্রত্যেক পদার্থ—প্রতি ঘটনা, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা কর, দেখিবে সকলই আনন্দ-রসে অভিষিক্ত—সকল বস্তুই আনন্দ উদ্গীরণে প্রবৃত্ত রহিয়াছে। সূর্য্যের প্রত্যেক রশ্মিই আনন্দ-কণা বিকীর্ণ করিতেছে, বায়ুর প্রতি হিল্লোলই আনন্দ বহন করিতেছে, গায়ক বিহঙ্গের প্রত্যেক সঙ্গীত-আলাপই আনন্দ বর্ষণ করিতেছে। এই পবিত্র প্রাতঃকালে পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ, জীবজন্তু সকলেই আপনাপন শ্রীসৌন্দর্য্যে, ক্রিয়াকাণ্ডে কেবল আ-

নন্দই বিস্তার করিতেছে। মর্ত্ত্য-ভূষণ তত্ত্ব-দর্শী মানববৃন্দ প্রকৃতির সেই চির-সজ্জিত আনন্দ-উৎসব-ক্ষেত্রে ঈশ্বরের মহত্তর নিগূঢ়-তর আনন্দ-খনি প্রাপ্ত হইয়া আজ্ এই মঙ্গল মহোৎসবে প্রবৃত্ত হওত আনন্দ-রবে দিগ্ বিতান প্রতিধ্বনিত করিতেছে। মনুষ্য আনন্দ-রাজ্যের প্রজা, আনন্দ-ধামের যাত্রী না হইলে, সেই আনন্দের অশেষ উৎসের প্রতি কেন তাহার দৃষ্টি নিপতিত হইবে?

শীত গ্রীষ্ম, বর্ষা-বসন্ত প্রভৃতি ছয় ঋতু, পর্য্যায়ক্রমে প্রকৃতির অঙ্গে কেবল নবতর আনন্দ-পরিচ্ছদ প্রদান করিতেছে, তরু লতা সকলকে নবীন পত্রে, নূতন ফুল-ফলে স-জ্জিত করিয়া জীব-জগতে কেবল আনন্দ-প্রবাহ বিস্তার করিতেছে। আনন্দই সৃষ্টি-কৌশলের প্রাণ না হইলে, কেন ইহার চতু-র্দ্দিক হইতে কেবল আনন্দ-প্রভা বিনির্গত হইতেছে?

জড় উদ্ভিদ্-রাজ্য, প্রাকৃতিক নিয়মের একান্ত দাস; সেই মঙ্গলময় আনন্দ-বিধা-তার নিতান্ত অনুগত। সৃষ্টির ভূষণ স্বা-ধীন-আত্মা মানবজাতির প্রকৃতি-পদ্ধতি আলোচনা করিয়া দেখ, আনন্দ তাহারদের জড় শরীরের আপাদ মস্তক পর্য্যন্ত অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছে। তাহারদের প্রাণন মনন-ক্রিয়াতে কেবল অহর্নিশি আনন্দলহরী উত্থিত হইতেছে। তাহারদের অর্জ্জিত জ্ঞান-বিজ্ঞান-সিদ্ধান্তে কেবল অদৃষ্টপূর্ব্ব নিগূঢ় আনন্দ-খনি সকল আবিষ্কৃত হইয়া সংসারের আনন্দমাত্রা বৃদ্ধি করিতেছে। সদ্য-ভূমিষ্ঠ শিশু-শরীর অবলোকন কর, তাহার সেই নবীন কমল-কলিকা-সদৃশ মুখ-মণ্ডলে হৃদয়ের অব্যক্তআনন্দব্যঞ্জক হাস্য দেখিতে পাইবে। তাহার ক্রীড়া কৌতুকে এত অনির্ব্বচনীয় আনন্দ বিকীরিত হয়, যে পিতামাতা, ভ্রাতা ভগিনী, আত্মীয় স্বজন—এমন কি দর্শক মাত্রেই তদ্দর্শনে আনন্দ প্রকাশ না করিয়া স্থির থাকিতে পারেন না। জনক-জননী সেই স্নেহের পুত্তলিকা আন-ন্দের ছবি শিশু-সন্তানকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া গৃহকে উৎসব-ভূমি আনন্দ-ক্ষেত্র করিয়া তোলেন। সাধু সজ্জন-সকল সেই আনন্দ-স্বরূপ পরমেশ্বরকে হৃদয়-আসনে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া "এস ব্রহ্মলোকঃ" ইহাকেই ব্রহ্মলোক বলিয়া উপলব্ধি করেন।

মনুষ্যের আত্মা তো আনন্দময় অখিল-বিধাতারই প্রতিবিম্ব। আনন্দ-স্বরূপই তাহার জনক-জননী, আনন্দই তাহার অন্ন-পান, শুদ্ধ আনন্দই তাহার অনন্ত জীবনের উপজীবিকা। মনুষ্য, বিপুল বিষয়-বিভব, ধন-সম্পদের মধ্যে অবস্থান করুক, সে শত সহস্র লোকের দ্বারা সম্মানিত ও প্রপূজিত হউক কিন্তু সে আনন্দেরই ভিখারী। কেন না তাহার প্রকৃতি নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ-মূলক, তাহার আত্মা আনন্দের উপাদানেই বিনি-র্ম্মিত। জড় যেমন স্বজাতীয় পরমাণুর সহিত মিলিতে চায়, পশু পক্ষী যেমন স্বজাতির সঙ্গ-লাভের জন্য ধাবিত হয়, আত্মা তেমনি চির-আনন্দ-স্বরূপ ঈশ্বরের সহবাস-লাভের জন্য উৎসুক হইয়া থাকে। সেই আনন্দ-স্বরূপের গুণব্যাখ্যানেই তাহার আনন্দ, তাঁহার ধ্যান-ধারণাতেই তাহার বল-বুদ্ধি স্ফূর্ত্তি পায়, তাঁহার সহবাস-লাভেই সে দেবত্ব অমরত্ব লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়। শিশুর অন্তরে সেই অপরিস্ফুট আনন্দের আদর্শ রহিয়াছে বলিয়াই সে চন্দ্র-সূর্য্য, গ্রহ-তারা দেখিয়া আনন্দে নৃত্য করে, সে সুরঞ্জিত সুগন্ধি কুসুম-গুচ্ছ দেখিলে সহাস্য বদনে তাহা গ্রহণ করিবার জন্য হস্ত বিস্তার করিয়া থাকে। মনুষ্য আনন্দের ভিখারী বলিয়াই সে কৌমার-যৌবনে শত সহস্র বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আগ্রহের

সহিত জ্ঞান-বিজ্ঞান-বলে সেই আনন্দঘন অমৃত-ধন উপার্জ্জন করিতে ধাবিত হয়, বার্দ্ধক্যে অকর্ম্মণ্য-দেহ, শিথিল-ইন্দ্রিয় হইয়াও সেই আনন্দের আকর ঈশ্বরকে লাভ করিয়াই বৃদ্ধ, সকল অভাব পূরণ করে; মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে সেই উন্নততম শ্রেষ্টতম আনন্দলাভের প্রতি স্থির-নিশ্চয় হইয়াই অকাতরে স্ত্রী পুত্র পরিবার, বহু-আয়াস-অর্জ্জিত ধন-সম্পদ পরিত্যাগ করিয়া সহাস্যবদনে আনন্দলোকে গমন করিতে উদ্যত হয়। মনুষ্যের আত্মা হইতে আনন্দ-স্পৃহা অন্তরিত কর, তাহার সকল উদ্যম উৎসাহ নির্ব্বাণ হইবে, জ্ঞান-বিজ্ঞান স্পৃহা তিরোহিত হইয়া যাইবে, তাহার সমুদয় কার্য্যই স্থগিত হইবে। আনন্দ-লাভই তাহার উদ্দেশ্য বলিয়া, মনুষ্য এখানে সংসারের প্রতিস্রোতে, প্রবৃত্তির প্রতি-কূলে গমন করিতে সাহসী হয়, আনন্দই তাহার জীবন বলিয়া, সে এখানকার জ্বালা-যন্ত্রণা কষ্টক্লেশের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করিয়া জীবনের উদ্দেশ্যসাধনে দৃঢ়ব্রত হইয়া থাকে, অটল অনুরাগ, অপরাজিত উৎসাহ সহকারে চরিত্রশোধনে, জ্ঞান-বিজ্ঞান-অর্জ্জনে এবং ধর্ম্মসাধনে অনুরক্ত হয়। যদি মনুষ্য তাহার সকল দুঃখের প্রশমন, সকল কার্য্যের একমাত্র পুরস্কার, তাহার তৃষ্ণার জল, আরাম-স্থল সেই আনন্দ স্বরূপ ঈশ্বরকে প্রাপ্ত না হইত, তাহা হইলে কে বা শরীর-চেষ্টা করিত, কে বা জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিত। "কোহ্যে বান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দোন স্যাৎ।" প্রাণ বিয়োগ হইলে যেমন শরীর মন ইন্দ্রিয় বিকল হয়, তেমনি আত্মার প্রাণ আনন্দকে অন্তরিত করিলে সকলই স্তব্ধীভূত হইয়া যায়, সংসার নিরানন্দময় হইয়া পড়ে। আনন্দলাভেই তাহার জীবন, আনন্দ সম্ভোগেই তাহার উন্নতি। আজ যে মর্ত্ত্যে এই মঙ্গল-মহোৎসব-দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে, ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখ, পার্থিব আনন্দ-উপকরণ ইহার মধ্যে কিছুই নাই, কেবল আনন্দ স্বরূপ ঈশ্বরই এই উৎসবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা-রূপে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার সেই মঙ্গল রূপ——আনন্দ স্বরূপ সন্দর্শন করিয়া এই অসংখ্য আত্মা আনন্দ-রসে দ্রবীভূত হই-তেছে। সেই আনন্দ-জ্যোতিতেই সাধক-দলের মুখ-মণ্ডল জ্যোতিষ্মান্ হইয়াছে, সক-লেই আনন্দামৃত পান করত প্রেম-বিস্ফারিত হৃদয়ে একতানে এই মধুময় আনন্দ-গীত গান করিতেছে "রসোবৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দীভবতি।" "সেই পরমাত্মা রস-স্বরূপ তৃপ্তি-হেতু। সেই রসস্বরূপ পর-ব্রহ্মকে লাভ করিয়া জীব আনন্দিত হয়েন।" বহির্জগৎ ও জীব রাজ্য হইতে, আমরা অহ-র্নিশ যে সকল আনন্দ সম্ভোগ করি, তাহা সেই অতুল আনন্দের ছায়া মাত্র, ঈশ্বরই আনন্দের আকর, আনন্দের অশেষ সমুদ্র, অনন্ত প্রস্রবণ। তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে— তাঁহাকে লাভ করিতে পারিলে, আর আর আনন্দ, আনন্দ বলিয়াই পরিগণিত হয় না। এই আনন্দ স্বরূপ যাঁহার হৃদয়ের জ্যোতি, আত্মার আলোক হইয়া বিরাজ করেন, তাঁহার আর কোন ভয়, কোন আশঙ্কাই থাকে না। তিনি সকল বিঘ্ন বিপত্তি, বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া নির্ভয় হয়েন।

"আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।"

হে সাধু সজ্জন-সকল! তোমরা সেই ভয়-বিপদের নিরাপদ অভয় দুর্গ স্বরূপ আনন্দময় ঈশ্বরকে লাভ করিয়া নির্ভয় হইয়াছ, এখন অকুতোভয়ে আনন্দমনে সেই আনন্দময়েরই যশ কীর্ত্তন কর, সকলে মিলে, জীবন-ধন সকলই তাঁহাকে উৎসর্গ করিয়া

মর্ত্ত্যের মহত্ত্ব, জীবনের সার্থক্য সম্পাদন কর। যে আনন্দ-রস পান করিয়া তোমা-রদের তৃষিত আত্মা শীতল হইয়াছে, শুষ্ক হৃদ্-পদ্ম বিকসিত হইয়াছে, যাহাতে সমুদয় মনুষ্য-জাতি এই অমৃত-সাগরে অবগাহন করিয়া কৃতার্থ হয়, সমগ্র ভূমণ্ডল এই আনন্দ-ধারায় অভিষিক্ত হয়, তজ্জন্য কায়-মনোবাক্যে সেই আনন্দময় ঈশ্বরের সন্নিধানে প্রার্থনা কর।

হে আনন্দময় অখিলবিধাতা! তুমি য আনন্দের উৎস প্রমুক্ত করিয়া দুর্ব্বল মলিন বঙ্গবাসী যে আমরা, আমারদিগকে কৃতার্থ করিয়াছ, সেই আনন্দে তুমি সমস্ত মানব-জাতিকে আনন্দিত কর। রোগ-শোক-রোদন-বিলাপ-পূর্ণ, ধন-হীন পরাধীন বঙ্গ-ভূমিতে, তুমি যে স্বর্গীয় উৎসব-দ্বার উদ্ঘা-টিত করিয়া দিয়া বঙ্গের প্রকৃত প্রাণ-সঞ্চার করিতেছ, সমুদয় ভূমণ্ডল-মধ্যে এই মঙ্গল-মহোৎসব বিস্তার করিয়া সমুদায় নর-নারীকে জীবন-উৎসাহে, আশা-আনন্দে পূর্ণ কর। এই আমারদের প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

পঞ্চাশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ

সায়ংকাল

শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায়ের বক্তৃতা।

"আবিরাবীর্মএধি।"

"হে স্বপ্রকাশ! আমার নিকট প্রকা-শিত হও।" সৃষ্টিকাল হইতে অদ্যাবধি মানব-আত্মা কেবল এইই প্রার্থনা করিতেছে। ঈশ্বর মনুষ্যের আত্মার প্রিয় ধন—নিতান্ত প্রাণধন বলিয়াই চির কালই মনুষ্য কাতর স্বরে ব্যাকুল অন্তরে ঈশ্বর-সন্নিধানে এই আকাঙ্ক্ষা করিতেছে যে, তুমি আমার সন্নিধানে আত্ম-স্বরূপ প্রকাশ কর, যে আমার প্রাণ শীতল হউক, ইচ্ছা চরিতার্থ হউক, প্রার্থনা পূর্ণ হউক। মনুষ্যের এমন প্রার্থনার বিষয় আর দ্বিতীয় নাই। তাহার এমন ব্যাকুলতা কাতরতা আর কোন বস্তুর জন্যই দৃষ্ট হয় না। এক জন নয়, সমুদয় আত্মা, এক দেশ নয় সমগ্র ভূমণ্ডলস্থিত সকল দেশ প্রদেশ-বাসী সমস্ত নরনারীরই কেবল এই একমাত্র প্রার্থনা। কেবল পুরাকালে নয়, বর্ত্তমানের জ্ঞান-বিজ্ঞান-জ্যোতির মধ্যে মনুষ্যের এই একই কামনা। এমন একতা—এমন এক লক্ষ্য আর কোন বিষয়ের জন্যই দেখিতে পাওয়া যায় না। এমন ঐকান্তিক যত্ন চেষ্টা আর কোন উদ্দেশ্যসাধনেই পরিদৃষ্ট হয় না। পিতা মাতার নিকটে পুত্র কন্যা কত পদার্থই প্রার্থনা করে, বিদ্যালয়ে এক গুরুর সন্নিধানে ছাত্রগণ কত বিভিন্ন বিষয় শিক্ষার অভিলাষী হয়, এক রাজার সমীপে প্রজাবৃন্দ কত শত সহস্র পদার্থের প্রার্থী হইয়া থাকে. কিন্তু এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের নিত্য উদার সদাব্রত হইতে বিভিন্ন-রুচি বিভিন্ন-প্রকৃতি নরনারীগণ সমস্ত সুখের আভরণ প্রাপ্ত হইলেও, তাহারদের সকলের আত্মার কেবল এই একই প্রার্থনা যে "তুমি আমার নিকট প্রকাশিত হও।"

ঈশ্বরকে প্রার্থনা করে না, তাঁহাকে চাহে না, এমন একটি আত্মাও এই পৃথিবীতে বর্ত্তমান নাই। ঈশ্বরের ভিখারী আস্তিকগণ যাঁহাকে নাস্তিক বলিয়া অবজ্ঞা করেন, তিনি কেবল আত্মার প্রকৃতি, ঈশ্বরের স্বরূপ নি-র্দ্দেশে অসমর্থ হইয়া পথভ্রান্ত হইয়াছেন মাত্র, অথবা অপ্রসিদ্ধ উপায়ে কিছুকাল প্রার্থনা করত নিরাশ হইয়াই নিশ্চেষ্ট রহি-য়াছেন, তথাচ তাঁহারও প্রাণ, সম্পদে না হয় বিপদে, সুস্থতায় না হয় রোগেতে, জা-গ্রদবস্থায় না হয় নিদ্রাবেশে, জীবনে না

হয় মৃত্যুকালেও ঈশ্বরের জন্য কাঁদিয়া উঠে। তিনি বিহিত-শিক্ষা-সাধন উপদেশ দৃষ্টান্তের অভাবে, যদিও ঈশ্বরের সৃষ্টি-কৌশলে অপর্য্যাপ্ত জ্ঞান প্রেম মঙ্গল ভাব দেখিয়া পরিতৃপ্ত থাকুন কিন্তু একবার তাঁহার বিকৃত আত্মা প্রকৃতিস্থ হইলে সকল কৌশলের কর্ত্তা, সকল জ্ঞান প্রেম মঙ্গল ভাবের একায়তন, সকল কার্য্যের মূল কারণকে তিনি সর্ব্বত্রই দেখিতে সমর্থ হয়েন, একবার ঈশ্বর তাঁহার মোহান্ধ হৃদয়ে বিদ্যুতের ন্যায় প্রকাশিত হইলে, তিনি তাঁহার সন্নিধানে স্বীয় অপরাধ স্বীকার করত প্রার্থনা না করিয়া সুস্থির থাকিতে পারেন না। তাঁহার অপসিদ্ধান্ত অন্তরিত হইলে, তাঁহার অনুসন্ধান-পদ্ধতি পরিবর্ত্তিত করিয়া দিলে,—তাঁহার প্রকৃত গম্য পথ প্রদর্শন করিলে তিনিও ঈশ্বরকে লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারেন। সেই কৃপাপাত্র দুই চারিটী মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, সমুদয় ভুবন ব্রহ্মলাভের জন্য আকুল, সমুদায় আত্মা ব্রহ্মদর্শনের প্রার্থী হইয়া অহর্নিশি চাতকের ন্যায় কেবল "আবিরাবীর্ম্মএধি" "হে স্বপ্রকাশ! আমার নিকট প্রকাশিত হও" এই প্রার্থনা করিতেছে। সৃষ্টিকাল হইতে ব্রহ্ম-দর্শন-স্পৃহা চরিতার্থ করিবার জন্য মানবজাতি কত কষ্ট ক্লেশ সহ্য করিয়াছে, কত উপায়-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া আসিতেছে। মনুষ্য গহ্বর বিবরে বা অরণ্য কুটীরে কিম্বা রাজপ্রাসাদে যেখানেই অবস্থান করুক, এই যে অনিবার্য্য ব্রহ্মদর্শন-স্পৃহা তাহাকে চিরকালই উত্তেজিত করিতেছে, চিরদিনই তাহাকে কল্যাণ-পথ নির্ব্বাচন করিয়া লইবার জন্য, নানা উপায় অবলম্বনে উৎসাহিত করিয়া আসিতেছে। সে অরণ্যে অরণ্যে পশু পক্ষীর পশ্চাতেই ধাবিত হউক, অথবা কুটীরবাসী হইয়া কৃষিকার্য্যেই সংলিপ্ত থাকুক, কিম্বা বিস্তৃত বিষয় বাণিজ্যে ব্যাপৃত হইয়া দেশ দেশান্তরেই পর্য্যটন করুক, সকল অবস্থাতেই তাহার চিত্ত সেই অমৃতধন লাভের পন্থাই অন্বেষণ করিতেছে। সকল কালেই সে আপনার বিদ্যা বুদ্ধি, শিক্ষা সাধনের তারতম্য নিবন্ধন কোন না কোন উপায় অবলম্বন করিয়া, ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। পৃথিবীর পুরাবৃত্ত পাঠে প্রবৃত্ত হইলে. জনসমাজের ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিরীক্ষণ করিলে, ব্রহ্মদর্শন-স্পৃহা-প্রভাবে ভূমণ্ডলে যে কতশত প্রকার ধর্ম্মমত প্রচারিত হইয়াছে, তাহা অবগত হইয়া বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। কোন সময়ে মনুষ্যসমাজ তেজোময় সূর্য্য চন্দ্র, প্রভাবশালী নদী সিন্ধু, বিদ্যুৎ বজ্রাদিকে ঈশ্বরের দেদীপ্যমান মূর্ত্তি বিবেচনা করিয়া তাহাদেরই সন্নিধানে মস্তক অবনত করিয়াছে; কখনও বা তাহাতে অতৃপ্ত হইয়া হৃদয়ের উত্তেজনায় উত্তেজিত হওত মহাপ্রতাপান্বিত বীর যোদ্ধাকে, কুত্রাপি দয়া ধর্ম্মের উজ্জ্বল আদর্শ স্বরূপ কোন সুধীর সাধু সজ্জনকে তাহাদের প্রার্থিত দেবতা বোধে প্রেমালিঙ্গন প্রদানে প্রবৃত্ত হইয়াছে; কোন সময়ে বা হৃদয়-নিহিত ঐশ্বরিক ভাবের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহাকেই সন্দর্শন করিয়া মনস্কামনা পূর্ণ করিবে বলিয়া নানাবিধ সুদৃশ্য প্রতিমা প্রস্তুত করিয়াছে। কখন বা দেশভেদে, স্থানভেদে তাঁহার আবির্ভাব অধিষ্ঠানের সংবাদ পাইয়া, গৃহ পরিবারে জলাঞ্জলি দিয়া ভিখারিবেশে নানাস্থান পর্য্যটন করিয়াছে। কোন কালে বা কোন বিশুদ্ধ-চরিত্র সাধুর শরণাপন্ন হইয়া তাঁহারই পুণ্য-বলে সেই প্রাণ-বল্লভ হৃদয়-রঞ্জন ঈশ্বরের দর্শন লাভের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়া কত কষ্ট ক্লেশ সহ্য করিয়াছে। এই রূপে যে কালে, যে

দেশে যত প্রকার ধর্ম্মমত প্রচারিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে কেবল আত্মারই সজীবতা আত্মারই জাগ্রত জীবন্ত ব্রহ্ম-দর্শন-লালসা মুদ্রিত রহিয়াছে।

আত্মা যেমন চির কালই ব্রহ্মদর্শনের জন্য লালায়িত, ঈশ্বরও তেমনি আত্মাতে প্রকাশিত হইবার নিমিত্ত চির দিনই সমুৎসুক রহিয়াছেন। পাছে জীবাত্মা পথভ্রষ্ট হইয়া তাঁহা হইতে দূরে নিপতিত হয়, পাছে সে অপাত্রে শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি অর্পণ করিয়া বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে, পাছে সে ঈশ্বরবোধে অন্য কোন পদার্থকে আপনার দর্শনীয়, সেবনীয় বা পরম সম্ভজনীয় জানিয়া মৃগের ন্যায় জলভ্রমে মরীচিকায় নিপতিত হইয়া প্রকৃত লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, এই জন্য তিনি প্রত্যেক আত্মাতে স্বীয় নিষ্কলঙ্ক মহান্ মঙ্গল স্বরূপ দুরপনেয় অক্ষরে মুদ্রিত করিয়া রাখিয়াছেন। ঈশ্বরের সেই অনুপম দয়াগুণেই কোন দেশে কোন কালে কোন মনুষ্যসমাজই ব্রহ্ম-দর্শন বিষয়ে নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে না। এই কারণেই মনুষ্য আপনার ক্ষীণ বিদ্যা বুদ্ধির সিদ্ধান্তে,কল্পনা-কুহকে কদাচ চিরবদ্ধ হইয়া থাকিতে সমর্থ হয় না এবং অন্যের প্রদর্শিত কুটিল বর্ত্মে পদ বিপেক্ষ করিতে সহসা সাহসী হয় না। যখনই সে ব্রহ্ম-দর্শন-লালসায় আকুল হইয়া চন্দ্র সূর্য্য, বিদ্যুৎ বজ্রকে ঈশ্বরবোধে দর্শন করিতে যায়, অমনি যেন তাহার অন্তর হইতে কে বলিয়া উঠে যে, এই নির্জীব জড় পদার্থ তোমার উপাস্য নহে, অমনি আত্মা কুণ্ঠিত হইয়া পথান্তর অবলম্বন করে। আবার হৃদয়ের উত্তেজনায় যখন সে কোন মহাদোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ বীর যোদ্ধাকে অথবা দয়াধর্ম্মশীল সুধীর সাধুকে ঈশ্বরবোধে পূজার্চ্চনা করিতে যায়, অমনি আত্মার অভ্যন্তর হইতে কে যেন "নেতি নেতি" এই উপদেশ প্রদান করে যে "ইহা নহে ইহা নহে" অমনি আত্মা সঙ্কুচিত হইয়া উঠে। আবার যখন আত্ম-নিহিত ঐশ্বরিক ভাবকে আদর্শ করিয়া মনুষ্য কোন প্রতিমানির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হয়, অমনি যেন কে হৃদয়-কন্দর হইতে বলিয়া উঠে যে,

> নৈনমূর্দ্ধং ন তির্য্যঞ্চং ন মধ্যে পরিজগ্রভৎ।
> ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদযশঃ

হে মানব! কি করিতেছ? অধ ঊর্দ্ধ, তির্য্যক মধ্য, কোন দেশে কেহ কখন যাঁহাকে দর্শন করে নাই, সেই মহদ্যশ অনন্ত অপ্রতিম ঈশ্বরের তুমি আবার কি প্রতিমা নির্ম্মাণ করিবে? অমনি আত্মা ক্ষুব্ধ হইয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হয়। আপনাকে দীন হীন দুর্ব্বল বিবেচনা করিয়া, মনুষ্য যখনই কোন অসামান্য বিদ্যা-বুদ্ধি-সদ্গুণ-সম্পন্ন লোককে আশ্রয় করিয়া ঈশ্বরের নিকটে যাইতে— তাঁহাকে সন্দর্শন করিতে ধাবিত হয়, তৎক্ষণাৎ যেন আত্মার অভ্যন্তরে এই মহাবাক্যের গম্ভীর প্রতিধ্বনি হইতে থাকে যে,

> শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসোমনোযদ্বাচোহবাচম্।
> স উ প্রাণস্য প্রাণশ্চক্ষুষঃ চক্ষুঃ॥"

যিনি তোমার শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, বাক্যের বাক্য, প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু হইয়া তোমার অভ্যন্তরে বিরাজ করিতেছেন তাঁহাকে দেখিবার জন্য কাহার হস্ত ধারণ করিতেছ, কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিতে যাইতেছ? তখনই আত্মার সেই মোহ-নিদ্রা ভঙ্গ হয়, নিমীলিত চক্ষু উন্মীলিত হয়, তখনই তাহার অন্তর্দৃষ্টি উজ্জ্বল হইয়া উঠে। অমনি আপনার অন্ধতা, ঈশ্বরের প্রসন্নতা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়া কাতর স্বরে প্রার্থনা করিতে থাকে, "আবিরাবীর্ম্মএধি" "হে স্বপ্রকাশ! আত্মার অন্তরাল হইতে যে তোমারই মধুময় বাক্য শুনিতেছি, আর কতকাল লুকায়িত থাকিবে, তুমি প্রকাশিত হও।"

তুমি আত্মার অন্তরে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছ, আমি তোমার দর্শন-লালসায় আকুল হইয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছি। তুমি দর্শন দাও যে, ব্যাকুলতার শান্তি হউক, প্রাণ শীতল হউক, আশা চরিতার্থ হউক, আমার চির-জীবনের প্রার্থনা পূর্ণ হউক।

সেই ব্রহ্ম-দর্শন-স্পৃহা-প্রভাবেই, মনুষ্য এই উন্নত অবস্থাতে উত্থিত হইয়াছে, সেই জগতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে আত্মাতে সন্দর্শন করিয়াই, মাঘের এই পবিত্র একাদশ দিবসে এই উদার মঙ্গল মহোৎসবের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়াছে। সেই আনন্দ স্বরূপ পরমেশ্বরই এই উৎসবের প্রাণ। তিনিই ইহার একমাত্র আকর্ষণ। সূর্য্যের আকর্ষণে যেমন গ্রহ, তারা, চন্দ্র, পৃথিবী আকৃষ্ট হইয়া, তাহারই চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করত শ্রী সৌন্দর্য্য লাভ করিতেছে, তেমনি সেই এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের আকর্ষণেই অযুত অগণ্য আত্মা শত সহস্র বিঘ্ন বিপত্তি অতিক্রম করিয়া ক্রমে তাঁহার সন্নিহিত হইয়া জ্ঞান বিজ্ঞানে, আশা উৎসাহে, প্রেম আনন্দে পূর্ণ হইতেছে। এখনই দেখ, শত সহস্র আত্মা তাঁহারই আনন্দামৃতের আস্বাদ পাইয়া একতানে "আবিরাবীর্ম্মএধি" এই প্রার্থনা করিতেছে। এমন এক-লক্ষ্য এক-বাক্য, এক-ইচ্ছা, এক-কামনা কি মনুষ্য-সমাজের আর কোন উদ্দেশ্য-সাধনে দৃষ্ট হইয়া থাকে? যদি কখন ঈশ্বরের অসংখ্য পুত্র কন্যা এক পরিবারে আবদ্ধ হয়, তবে সে ঈশ্বরেরই জন্য। যদি কখন পৃথিবী হইতে দ্বেষ মৎসরতা, বিবাদ-কলহ, দ্বন্দ্ব বিচ্ছেদ তিরোহিত হয়, তবে সে ঈশ্বরেরই প্রার্থী হইলে। যদি কখন দুর্ব্বল বঙ্গবাসিগণ একসূত্রে আবদ্ধ হইয়া ভূমণ্ডল মধ্যে বল-বীর্য্যে, জ্ঞান-ধর্ম্মে প্রাধান্য লাভ করিতে পারেন, তবে তাহা এই ব্রহ্ম-সাধন প্রভাবেই। যদি তাহাই ঈশ্বরের অভিপ্রেত না হইবে, তবে এত দেশ থাকিতে কেন দুর্ব্বল-মলিন বঙ্গদেশেই সর্ব্বপ্রথমে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের অভ্যুদয় হইবে? যদি তাহাই ঈশ্বরের উদ্দেশ্য না হইবে, তবে পৃথিবীর সমুদয় মনুষ্য জাতির ঐক্য-ভূমি সম্মিলন-স্থল এক অরূপী অশরীরী অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরের উপাসনার জন্য আদি ব্রাহ্মসমাজ রূপ জয়স্তম্ভ, বিবাদ-বিচ্ছেদ-পূর্ণ বঙ্গের বক্ষেই সর্ব্বপ্রথমে কেন প্রতিষ্ঠিত হইবে? অতএব হে বঙ্গবাসী——ভারত-নিবাসী নরনারিগণ! তজ্জন্য সর্ব্বপ্রথমে সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে তোমরাই সেই অভয়-দাতা মঙ্গল-বিধাতাকে প্রণিপাত কর।

হে স্বপ্রকাশ পরমেশ্বর! তোমারই জন্য ত্রিভুবন আকুল হইয়া রহিয়াছে। অহর্নিশি সমুদয় নর-নারী তোমাকেই প্রার্থনা করিতেছে। এক জন নয়, দুই জন নয়, এখনই এখানে শত সহস্র আত্মা "আবিরাবীর্ম্মএধি" এই মহামন্ত্র উচ্চারণ করিয়া গগন ভেদ করত তোমাকেই কাতরস্বরে ডাকিতেছে; তুমি প্রকাশিত হও যে তোমাকে দেখিয়া সকলেই কৃতপুণ্য হই, তোমাকে লাভ করিয়া আমরা সকল লাভ করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

বৈদিক আর্য্যসমাজ।

সমাজ সংস্থাপন!

৪৩৭ সংখ্যার ১৭৩ পৃষ্ঠার পর।

আর্য্যগণ পশ্চিম দিক হইতে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া পঞ্চনদ প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। পঞ্চনদ প্রদেশে তাঁহারা নানাবিধ জাতি দেখিতে পাইলেন। ইহারা ঐ প্রদেশের আদিম নিবাসী। আর্য্যগণ সেখ

ইহাদিগকে দস্যু, রাক্ষস, অসুর, পিশাচ প্রভৃতি নামে উল্লেখ করিয়াছেন। ঋগ্বেদে ইহাদিগের অশ্রাদ্ধ, অযজ্ঞ, অযজ্ব, অকর্ম্মা, অব্রত, অন্যব্রত, কৃষ্ণযোনি, আমাদ, দাস প্রভৃতি কতকগুলি বিশেষণ দৃষ্ট হয়। সায়ণাচার্য্য দস্যু শব্দের আর্য্যদিগের শত্রু,যজ্ঞের বিঘ্নকারক এবং আর্য্যদিগের প্রতি উপদ্রবকারী অর্থ করিয়াছেন। নিরুক্তকার যাস্ক বলেন যে দস্যুগণ যজ্ঞসাধন সোমলতা প্রভৃতি নষ্ট করিত এবং যজ্ঞানুষ্ঠান প্রভৃতি সৎকর্ম্মের ব্যাঘাত করিত বলিয়া দস্যু নামে অভিহিত হইয়াছে। আর্য্যদিগের প্রতি ইহাদের কোন শ্রদ্ধা ছিল না। ইহারা কোন যাগ যজ্ঞ ব্রত বা সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিত না! ইহারা কৃষ্ণবর্ণ ছিল এবং আম মাংস ভক্ষণ করিত। এই সকল কারণে ইহাদিগের পর্ব্বোক্ত বিশেষণে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ইহারা আর্য্যদিগের ইন্দ্রাদি দেবগণকে মানিত না বলিয়া বৈদিক ঋষিরা ইহাদিগকে অদেব, অনিন্দ্র প্রভৃতি শব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহারা ভারতবর্ষের আদিম নিবাসী অনার্য্য জাতি ছিল বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বেদের কুত্রাপি ইহাদিগকে অনার্য্য জাতি কিম্বা আদিম নিবাসী বলিয়া উল্লেখ করা হয় নাই। ইহাদের বাসস্থান নগর গ্রাম এবং অস্ত্র শস্ত্রাদির উল্লেখ দেখিয়া ইহাদিগকে সমৃদ্ধ আদিম নিবাসী বলিয়া অনুমান করা যায়। কেহ কেহ বলেন যে "ইহারা দেবযোনি, ভূতযোনি প্রভৃতি হইতে পারে। যদি ইউরোপের অধুনাতন সভ্যসমাজে এত আধুনিক সময়ে স্পিরিটেরা বাদ্যাদি বাদন এবং অন্যান্য কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে, তবে কি প্রাচীন বৈদিক আর্য্যসমাজে রাক্ষস পিশাচাদি দেবযোনি এবং ভূতযোনি আর্য্যদিগের অনুষ্ঠান-ব্যাঘাত করিতে পারিত না? ইহা আমরা বলিতে পারি না যে আর্য্যগণ দেবযোনি, ভূতযোনি প্রভৃতিতে বিশ্বাস করিতেন না।" এবিষয়ে যখন কোন বিশেষ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তখন আমরা নিশ্চিতরূপে কোন মীমাংসাই করিতে পারি না। তবে আমরা বলি যে ঋগ্বেদসংহিতা সমাহিত চিত্তে পাঠ করিলে ইহাই প্রতীতি হয় যে অনেক স্থলেই দস্যুগণ ভারতবর্ষের তৎকালের লোক। আমরা জানি না ইহাদের পূর্ব্বে কাহারা ভারতবর্ষে বাস করিত, সুতরাং ইহাদিগকে আদিম নিবাসী বলিয়াছি।

এই দস্যুগণ আর্য্যদিগকে বাধা দিয়াছিল এবং আর্য্যদিগের উপর নানা প্রকার অত্যাচার করিত। সুতরাং আর্য্যগণ ইহাদিগকে দমন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং তজ্জন্য বারম্বার ইন্দ্রদেবের এবং অগ্নিদেবের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এই সমস্ত প্রার্থনাপূর্ণ স্তব দ্বারা ঋগ্বেদসংহিতা পরিপূরিত। কি প্রকারে দস্যুগণ নিবারিত হইবে, কিরূপে তাহাদের সর্ব্বনাশ হইবে এবং কি উপায়ে তাহাদিগকে দূরীভূত করা যাইবে এই নিমিত্তই আর্য্যগণ ব্যাকুল, এ নিমিত্তই তাঁহারা অহরহ ইন্দ্রাদি দেবগণের স্তব ও আনুকূল্য প্রার্থনা করিয়াছেন ঋগ্বেদে দেখিতে পাই ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, ব্রহ্মণস্পতি, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ আর্য্যদিগের রক্ষার্থ ও স্থিতিসাধনার্থ সর্ব্বদা যত্নবান। ইন্দ্রাদি দেবগণ দস্যুদিগকে বিনাশ করিয়া অথবা তাড়াইয়া দিয়া আর্য্যদিগকে আশ্রয় ও ভূমি দান করিয়াছিলেন। বৃত্রাসুর, শম্বরাসুর প্রভৃতি বহুসংখ্যক অসুরদিগকে ইন্দ্রদেব বধ করিয়াছিলেন। ইন্দ্রদেবের সাহায্যে আর্য্যগণ অসংখ্য রিপুদমন এবং বিপুল সুখ শান্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইন্দ্রদেবের প্রসাদে তাঁহারা কুশলে বাস করিতেন বলিয়া বৈদিক ঋষিরা ইন্দ্রদেবকে নিবাস-কারণ বলিয়াছেন। ঋগ্বেদের এক

স্থানে দেখি যে বলনামক অসুর দেবগণের কতকগুলি গো অপহরণ করিয়া কোন দুর্গম গুহাতে লুক্কায়িত করিয়া রাখিয়াছে এবং ইন্দ্রদেব সসৈন্যে গিয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়াছেন। আবার একস্থানে দেখি যে ইলীবিশ এবং শুষ্ণ নামে বৃত্রাসুরের দলস্থ দুইজন অসুর,ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। ইলীবিশের দৃঢ় দুর্গ ও শুষ্ণের নানাবিধ আয়ুধ ছিল। শুষ্ণ অত্যন্ত মায়াবী ছিল এবং বিবিধ ছল প্রয়োগ পূর্ব্বক আর্য্যদিগের উপর উৎপাত করিত। ইন্দ্রদেব ইহাদিগকে বজ্রপ্রহার দ্বারা বধ করিয়াছিলেন। অন্য এক স্থলে পাঠ করি যে কুলিতরাসুরের পুত্র শম্বরাসুরের অধীনে নবনবতি সংখ্যক নগর ছিল। এই সকল নগর দৃঢ়রূপে রক্ষিত। শম্বরাসুর প্রভূত-ঐশ্বর্য্য-বিশিষ্ট ছিল। ইহার সহিত দিবোদাসাত্মজ অতিথিগ্ব নামক জনৈক আর্য্য উপাসকের শত্রুতা জন্মে। তিনি ইন্দ্রদেবের সাহায্যে শম্বরের সমস্ত নগর আক্রমণ ও ধ্বংস করিয়া একটি নগর নিজের বাসার্থ রাখিয়াছিলেন। কুৎস নামক জনৈক ঋষির নিমিত্তও ইন্দ্রদেব অনেক অসুর নিপাত করিয়াছিলেন। তৎকালের ঋষিরা কেবল তপস্যাদি ধর্ম্মাচরণে রত থাকিতেন না; তাঁহারা আবশ্যকমত যুদ্ধে গমন করিয়াও নিজ বীরত্ব প্রদর্শন করিতেন। তাঁহারা লৌকিক ব্যবহারে নিপুণ ছিলেন। ঋগ্বেদের চতুর্থ মণ্ডলের এক স্থলে লিখিত আছে যে অসুরেরা অত্রিনামক ঋষিকে মারিবার জন্য এক শতদ্বারযুক্ত যন্ত্রে নিক্ষেপ করিয়াছিল এবং ইন্দ্র তাঁহাকে সেই চক্রব্যূহ হইতে নির্গত হইবার পথ প্রদর্শন না করিলে, তিনি সহজে আত্মরক্ষা করিতে পারিতেন না। চতুর্থ মণ্ডলের আর এক স্থলে দেখিতে পাই যে ইন্দ্র এক শত্রুনাশক দুর্দ্ধর চক্র দ্বারা বিংশতি সংখ্যক জনপদের অধিপতিকে ও তাহাদের ষষ্টি সহস্র নবনবতি সংখ্যক অনুচরবর্গকে শমন-সদনে প্রেরণ এবং নমুচি নামক অসুরকে নমী নামক উপাসকের উপকারার্থ নিপাত করিয়াছিলেন। নমুচি কতকগুলি স্ত্রী-সৈন্য লইয়া ইন্দ্রের জয়ের জন্য উদ্যত হইয়াছিল কিন্তু আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয় নাই। এতদ্ভিন্ন অপরাপর কত অসুরের যে নাম আছে তাহার সংখ্যা করা যায় না। আমরা কেবল বৃত্রাসুরের কথামাত্র বলিব। বৃত্রাসুর আর্য্যদিগের ঘোর শত্রু ছিল এবং তাহার উপদ্রবে আর্য্যসমাজ যেন বিপদের তিমিরে আবৃত হইয়াছিল। তাহার অনুচরগণ নানাবিধ মায়াধারণ পূর্ব্বক আর্য্যদিগের অনিষ্ট করিত এবং আর্য্যসমাজকে শিথিলবন্ধন করিয়া ছিন্নভিন্ন করিবার চেষ্টা দেখিত। ইন্দ্রদেব বৃত্রাসুরের উৎপাত নিবারণ না করিলে আর্য্যসমাজ স্থির থাকিত কি না সন্দেহ। আর্য্যগণ এবং বৃত্রাসুরের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম বাধিয়াছিল। অবশেষে ইন্দ্রদেবের সহায়তায় আর্য্যগণ বৃত্রাসুরকে পরাজিত এবং সবংশে নিপাতিত করিলেন। এই উপকারের জন্য বৈদিক ঋষিগণ ইন্দ্রদেবের বৃত্রঘ্ন উপাধিতে অসংখ্য স্তুতি করিয়াছেন। বৃত্রাসুরকে এক স্থলে দেব বলা হইয়াছে[১]। ভাষা-তত্ত্বের আলোকে এবং আসিরিয়া দেশীয় শঙ্কুসন্নিভ তাম্রশাসনপত্র পাঠে (Cuneiform inscriptions of Assyria) জানা গিয়াছে যে বৃত্রাসুর এক জন আসিরিয়া দেশীয় দলপতি ছিলেন। পারস্য-গ্রন্থ আবেস্তা হইতেও ঋগ্বেদের উপর অনেক আলোক প্রতিফলিত হইয়াছে। আসিরিয় জাতিরা আর্য্য-পরিবার-ভুক্ত ছিল না। সুত-

---

১ ঋগ্বেদসংহিতা ১ মণ্ডল ৩২ সূক্ত ১২ ঋক। শ্রীরমানাথ সরস্বতী সম্পাদিত ঋগ্বেদের উক্ত স্থলের টীপ্পনী দেখ।

রাং ইঁহাদের ও আর্য্যদিগের মধ্যে ঘোর বিবাদ ঘটিয়াছিল। জেন্দআবেস্তাতেও ইন্দ্রকে বেরেত্রঘ্ন নামে স্তুতি করা হইয়াছে। পারস্য ভাষায় দেবশব্দে ভূত, দৈত্য প্রভৃতি বুঝায় এবং অসুর শব্দে অনুগ্রহকারী দেবতা বুঝায়। অতএব পারস্য ভাষায় বৃত্রাসুরকে দেব বলা যাইতে পারে। প্রত্নতত্ত্ব আলোচনা করিলে অসুর ও দেব শব্দের উপর একটি স্বতন্ত্র প্রস্তাব লিখিতে হয় এবং ইহা লইয়া অনেক কথা বলিলে বর্ত্তমান প্রস্তাবে অসঙ্গত হইবে। আমরা এই পর্য্যন্ত বলিব যে অসুর ও দেব শব্দের আর্য্য-ব্যবহার ও পারসীক-ব্যবহার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আর্য্যগণ যাহাদিগকে অসুর ও দেব বলিতেন তাহা আর বিরত করিতে হইবে না। পারস্য-ভাষার রীতি ও ব্যাকরণ অনুসারে সংস্কৃত স স্থানে হ হইয়া থাকে; যথা সপ্তাহ হপ্তা, সপ্তসিন্ধু হপ্তহিন্দু, সোম হোম, সোতা হোতা, অসুর অহুর। পারসীকেরা অনুগ্রাহক দেবতাকে অসুর আখ্যা প্রদান করেন। তাহাদিগের "অহুর মস্ত" সৎস্বরূপ সর্ব্বপ্রধান দেবতা বিশেষ। অহুর মস্ত (Ahur Mazd) সংস্কৃত হইলে 'অসুরোমহান্' হইত। উভয় জাতিই "প্রত্নোকে" একত্র বাস করিতেন। সুতরাং পূর্ব্বে উভয়েই অসুর শব্দ এক অর্থে প্রয়োগ করিতেন। বৈদিক ঋষিরা ভারতবর্ষে আসিয়াও পূর্ব্ব অভ্যাস একেবারে পরিহার করিতে পারেন নাই। অতএব আমরা ঋগ্বেদের অনেক স্থলে ইন্দ্র,বরুণ, বায়ু প্রভৃতি আর্য্যদেবগণের প্রতি অসুর শব্দ প্রযুক্ত দেখিতে পাই। আবার অসুর শব্দের অপর অর্থে প্রয়োগও ভূরি ভূরি দৃষ্ট হয়। বৃত্রকেও অসুর বলিয়াছেন এবং ইন্দ্রকেও অসুর বলিয়াছেন[২]। সায়ণাচার্য্য এরূপ স্থলে কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই। অসুর শব্দের অভিনব ব্যুৎপত্তি এবং বৃত্রাসুরের বধের বৃত্তান্ত প্রথমতঃ ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশিত করিয়াছেন[৩]।

বৃত্রাসুরের প্রসঙ্গক্রমে আমরা অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। অসুর, রাক্ষস প্রভৃতিরা যাহাই হউক না কেন, আর্য্যগণ যে তাহাদের হইতে যৎপরোনাস্তি উত্যক্ত ও উৎপীড়িত হইয়াছিলেন তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ইন্দ্রাদি দেবগণ কি রূপে আর্য্যদিগের সাহায্য করিতেন তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। অনেক স্থলে ইন্দ্রাদি দেবগণকে কবচ পরিধান করিতে দেখা যায়। এই বৈদিক দেবতত্ত্ব প্রস্তাবান্তরে আলোচনা করিবার বাসনা রহিল।

এইরূপে বহুদিন উপদ্রুত হইয়া আর্য্যগণ ক্রমশঃ স্বশত্রুদিগকে অভিভূত করিয়া তাড়াইয়া দিলেন এবং পঞ্চনদ প্রদেশে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। যতদিন না শান্তি সংস্থাপন হইয়াছিল ততদিন তাঁহারা সর্ব্বদা শঙ্কিত হইয়া থাকিতেন এবং কিরূপে সমাজের বন্ধন দৃঢ়তর করিবেন তাহাই চিন্তা করিতেন। তাঁহারা সমাজের উন্নতিসাধনে মনোনিবেশ করিলেন এবং কৃষিকর্ম্ম ও পশুপালন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা অগ্নিসংযোগ দ্বারা অনেক অরণ্যানী ভস্মীভূত করিয়া আর্য্যসমাজের পরিসর বৃদ্ধি করিলেন। ঋগ্বেদে পঞ্চনদ প্রদেশের নদী সকলের ও তত্তীরে আর্য্যদিগের অবদান সমূহের অনেকত্র উল্লেখ দৃষ্ট হয়। আর্য্যগণ আর্য্যধর্ম্মের বলে বলবান এবং ইন্দ্রের আশ্রয়ে ভীতিরহিত। যতই পঞ্চনদ প্রদেশ শান্তির ছায়াতে সুশীতল হইতে লাগিল ততই আ-

২ ঋগ্বেদসংহিতা ১ মণ্ডল ২৪ সূক্ত ১৪ ঋকের টীপ্পনী। শ্রীরমানাথ সরস্বতী সম্পাদিত ঋগ্বেদসংহিতা দেখ।

৩ Rev K. M. Banerjeas "Rigveda" and "Arian Witness ?"

র্য্যদিগের সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতি সমাজকে উন্নত করিতে লাগিল। আর্য্য-ঋষিগণ লোক-ব্যবহার নিপুণ ছিলেন পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। তাঁহারা কিরূপে সমাজ-সংস্কার করিতে হয় তাহা জানিতেন। তাঁহারা দেখিলেন যে আর্য্যসমাজের একটি অভাব রহিয়াছে, আর্য্যসমাজের কেহ নেতা নাই। যে সমাজের শাসন-শক্তি কাহারও হস্তে নিহিত না থাকে, সে সমাজের উন্নতি হয় না; যে হেতু সে সমাজে সকলেই প্রধান হইয়া আধিপত্য করিতে চাহে এবং তাহা হইতে নানা প্রকার বিশৃঙ্খলা ঘটে। সুতরাং আর্য্যসমাজের আধিপত্য কোন ব্যক্তি-বিশেষের বা সম্প্রদায়-বিশেষের হস্তে নিহিত করা উচিত। আর্য্যসমাজ তখন কতকগুলি আর্য্য-পরিবারের সমষ্টিমাত্র। তখন তাঁহা-দিগের সংখ্যা অল্প। এই পরিবার সকলের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ ছিল না। সকলেই একত্র শান্তি সহকারে বাস করিতেন, কেহ কাহার উপর কোন অত্যাচার করিতেন না। প্রতি পরিবারের অন্তর্গত ব্যক্তিগণ একজন কর্ত্তার অধীনে থাকিতেন, এই কর্ত্তাই তাঁহা-দিগের প্রধান ছিলেন এবং তাঁহাদিগকে শাসন করিতেন। অনেক পরিবারের নেতৃ-গণই পুরোহিতের কার্য্য করিতেন, অর্থাৎ যেমন সামাজিক বিষয়ে সেই পরিবারের অন্তর্ভূত ব্যক্তিগণকে শাসন করিতেন, তদ্রূপ ধর্ম্ম বিষয়েও তিনি সকলকে উপদেশ দিতেন ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের পথ প্রদর্শন করিতেন। ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের ভিন্ন ভিন্ন নাম ছিল। তখন আর্য্যদিগের কেহ রাজা ছিলেন না।

ক্রমশঃ

উপদেশ।

১০ মাঘ ৫০ ব্রাহ্ম সম্বৎ।

শ্রীযুক্ত ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতা

তথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়প্রসাদলেশানুগৃহীতএব হি। জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নোনৈকোপি শাস্ত্রাণি চিরং-বিচিন্বন্॥

"তথাপি হে দেব, কেবল তোমার পদ-কমলের লেশ মাত্র প্রসাদের দ্বারা অনুগৃহীত হইলে তোমার মহিমা লোকে জানিতে পারে, বহুকাল সমস্ত শাস্ত্র অনুসন্ধানেও পারে না।"

অদ্য রজনী প্রভাতে ব্রাহ্মসমাজের বয়ঃক্রম পঞ্চাশৎ বর্ষ পরিপূর্ণ হইবে; কল্য নবসূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মসমা-জের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে প্রাতঃসমীরণ প্রীতি-স্বরে মঙ্গল বাদ্যে প্রতিধ্বনিত হইয়া শুভ বার্ত্তা ভক্তজন-হৃদয়ে, গৃহে গৃহে, দেশে দেশে বহন করিতে থাকিবে; বঙ্গদেশ আনন্দোৎসবে মগ্ন হইয়া ব্রহ্মনাম-গানে ও জয়ধ্বনিতে সমুদয় আকাশ পরিপূরিত ক-রিবে। যে ধর্ম্ম আমাদিগের এক মাত্র জীবন, বঙ্গদেশ সর্ব্বপ্রকারে হীনবল রুগ্ন ও শো-কার্ত্ত হইলেও কেবল একমাত্র যে ব্রহ্মবল তাহাকে সজীব সুস্থ ও সবল রাখিয়াছে, অর্দ্ধ শতাব্দী গত হইল যে পবিত্র ব্রহ্মনাম বঙ্গ-দেশে পুনরুদ্দীপ্ত হইয়া মুমূর্ষু বঙ্গবাসীদিগের অন্তরে জীবন সঞ্চার করত তাহাদিগের প্রকৃত বল এবং আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্য সাধনের প্রথম সূত্রপাত করিয়াছে, আর্য্য ঋষিদিগের অনুষ্ঠিত প্রাচীন একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্মের উপাসনার ভস্মাবশেষ হইতে যে সাধন-প্রণালী পুনরুদ্ধৃত হইয়া পথভ্রান্ত বঙ্গ-বাসীদিগকে সৎপথে আনিবার জন্য সোপান স্বরূপ বর্ত্তমান রহিয়াছে, বঙ্গভূমি সম্পূর্ণরূপে পরাধীন হইলেও যে ধর্ম্ম তাহাকে আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছে, বঙ্গদেশে ব্রাহ্ম-

সমাজ সংস্থাপনই তাহার মূল; লুপ্তপ্রায় সনাতন ধর্ম্মের পুনরুদ্দীপনই তাহার কারণ; পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয়েই আমরা সর্ব্বপ্রকার শোকতাপ হইতে মুক্ত হইয়া আধ্যাত্মিক স্বাতন্ত্র্য লাভের এবং প্রকৃতরূপে অমৃতের অধিকারী হইবার পথ প্রাপ্ত হইয়াছি। পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বে যে শুভ দিনে এই সমস্ত মঙ্গলের কারণ পবিত্র ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছিল, সেই শুভ দিনকে চিরস্মরণীয় করিবার জন্য প্রতি বৎসর মাঘ মাসের একাদশ দিবসে ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত ও প্রতিপালিত হয়। একই ধর্ম্ম-গ্রন্থিতে বদ্ধ থাকিয়া কোন এক প্রবল ঐশী সূত্রের আকর্ষণে আকর্ষিত হইয়া ব্রাহ্ম ভ্রাতৃগণ দেশ বিদেশ হইতে আগমন করত সকলে একত্রিত হইয়া এই মহোৎসবে যোগ দেন। এই সমস্ত বিষয় আমরা সকলেই বিশেষ রূপে অবগত আছি; তৎসমুদায় সকলেই বর্ষে বর্ষে প্রত্যক্ষ করিতেছি। কিন্তু সেই শুভ দিন উপস্থিত হইতে না হইতেই আমরা অদ্য এখানে কি নিমিত্ত একত্রিত হইয়াছি, আমাদিগের অদ্যকার সমাগমের সহিত সেই মহোৎসবের কি সংস্রব? উপস্থিত মহোৎসবের সহিত অদ্যকার সমাজের বিশেষ যোগ; সেই মহোৎসব উপলক্ষেই অদ্যকার এই সমাজ। যদি আমাদিগের সাম্বৎসরিক উৎসব কেবল বহির্জ্জগতেই বদ্ধ থাকিত, যদি কেবল বাহ্য শোভা সন্দর্শন এবং ইন্দ্রিয়সুখের চরিতার্থতাসাধনই তাহার উদ্দেশ্য হইত, যদি ইহার কোন উচ্চতর মহান্ লক্ষ্য না থাকিত তাহা হইলে অদ্যকার এই সমাজের আবশ্যকতা কিছু মাত্র উপলব্ধি হইত না। কিন্তু উপস্থিত মহোৎসব সম্পূর্ণরূপে আধ্যাত্মিক বিধায় অদ্যকার এই সমাজের বিশেষ প্রয়োজন। প্রাত্যহিক উপাসনাদি নিত্য কর্ম্ম এবং তদনুরূপ নিয়মিত কার্য্যাদি ব্যতিরেকে, আর্য্যদিগের মাঙ্গলিক কার্য্য অথবা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ক্রিয়াকলাপ মাত্রেরই অবতরণিকা স্বরূপ তন্নিমিত্ত প্রস্তুত হইবার জন্য কোন না কোন প্রকার নিয়ম পালনের বা সৎকার্য্য অনুষ্ঠানের প্রথা আবহমান প্রচলিত আছে। পূজা আরাধনাদির পূর্ব্বে বোধন বা অধিবাস প্রভৃতি, ব্রতধর্ম্মাদির পূর্ব্বে সংযম বা উপবাস ইত্যাদি পুরাকাল হইতে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে এবং সেই নিয়মের অনুকরণেই উপস্থিত মহোৎসবের পূর্ব্বে তাহার সূচনা স্বরূপ অদ্যকার এই সমাজ সমাহৃত হইয়াছে। ইহাতে কেহ এরূপ মনে করিবেন না যে আমরা কেবল মাত্র ধারাবাহিক প্রথার পক্ষপাতী বা কোন প্রকার কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া এখানে সমাগত হইয়াছি। এ প্রকার সমাগমের উদ্দেশ্য ও ফলের বিষয় বিশেষরূপে বিবেচনা করিলে এরূপ নিয়ম প্রতিপালনের উপকারিতা ও উপযোগিতা সম্যক প্রকারে উপলব্ধ হইবে। আমরা সকল বিষয়েই দেখিতে পাই যে পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত না থাকিলে আমরা প্রায় কোন কার্য্যেই সুফল লাভ করিতে সমর্থ হই না। অনেক সময়ে কেবল পূর্ব্বানুষ্ঠানের অভাবে আমরা আমাদের উদ্দেশ্য লাভে বঞ্চিত হই। উপস্থিত মহোৎসবের নিমিত্তও পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত না হইলে আমাদিগের সমুদায় আশা বিফল হইবে, সমস্ত উদ্যম নষ্ট হইবে। এই নিমিত্ত সেই মহোৎসবে যাহাতে আমরা সম্যক রূপে যোগ দিতে পারি, যাহাতে তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তাহার গূঢ় তত্ত্ব সমস্ত হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হই, যাহাতে আমাদিগের কার্য্যদোষে বা বুদ্ধির অভাবে সেই সদনুষ্ঠান কলুষিত বা কলঙ্ক-

স্পৃষ্ট না হয় তজ্জন্য সকলেরই বিশেষ সচেষ্ট হওয়া আবশ্যক।

কিন্তু এই সমস্ত বিষয়ে কৃতকার্য্য হইবার জন্য, সেই উৎসব কি, তাহা কি নিমিত্ত অনুষ্ঠিত হয়, এবং তজ্জন্য প্রস্তুত হইতে হইলে কি করা কর্ত্তব্য তাহা স্মরণ রাখা সকলেরই পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। বহু-কাল হইতে বঙ্গদেশ ভিন্ন জাতীয়দিগের অধিকৃত থাকায় বঙ্গবাসিগণ যেমন সামাজিক ও রাজনৈতিক সর্ব্বপ্রকার স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হইয়া দিন দিন নিস্তেজ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেছিল, সেইরূপ নানাবিধ কাল্পনিক ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবে এবং পৌত্তলিক-তার প্রবলতায় তাহাদিগের আধ্যাত্মিক স্বাতন্ত্র্যেরও ক্রমে হ্রাস হইয়া আসিতে ছিল। বঙ্গবাসীদিগের সেই আধ্যাত্মিক স্বাতন্ত্র্যের অভাব মোচন ও তাহাদিগকে ধর্ম্মবলে বলীয়ান করিবার নিমিত্ত ব্রাহ্ম-সমাজ সংস্থাপিত হয়; এবং তাহার সংস্থা-পনের সময় হইতে অদ্য পঞ্চাশৎ বৎসর পরিপূর্ণ হইল। এই সার্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে আমরা ব্রহ্মবলে কত দূর বলীয়ান হইয়াছি, কি পরিমাণ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছি সে বিষয়ে আত্মপরীক্ষা সকলেরই পক্ষে আবশ্যক। এবং যদিও তাহা প্রতি দিনের, প্রতি মুহূর্ত্তের কার্য্য তত্রাচ যাঁহারা সেই প্রকার পরীক্ষা বিষয়ে সম্যকরূপে কৃত-কার্য্য হইতে না পারেন তাঁহাদিগকে অন্ততঃ বৎসরান্তে একবার তজ্জন্য সচেষ্ট করিবার নিমিত্ত ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক মহোৎসব সর্ব্ববিধায়ে বিশেষ রূপে উপযোগী। নিতান্ত অনাবিষ্ট বা কেবল মাত্র বাহ্য-আমোদ-প্রিয় না হইয়া, স্থির চিত্তে আন্তরিক প্রকৃত গভীরতার সহিত উপস্থিত মহোৎসবের বিষয়ে চিন্তা করিলে, এবং তাহার নিমিত্ত প্রস্তুত হইবার জন্য সচেষ্ট হইলে কাহার মনে অন্ততঃ একবার এই প্রশ্নের উদয় না হয় যে "আমি ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারি-য়াছি কি না?" তাহাতে যদিও চিত্ত-দৌ-র্ব্বল্য বশতঃ আশার মোহিনী মূর্ত্তিতে নিতান্ত মুগ্ধ হইয়া আমরা ঈশ্বর-জ্ঞান লাভ করিয়াছি বলিয়া মনকে স্তোভ দিই; কিন্তু প্রকৃত তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তি মাত্রেই সহসা সেরূপ উত্তর প্রদানে যে কেবল সঙ্কুচিত হয়েন তাহা নহে; তাঁহারা ইহা নিশ্চয় জানেন যে তাঁহারা ব্রহ্মকে জানিতে পারেন নাই; তাঁহারা যত প্রকার জ্ঞানলাভ করিয়াছেন তন্মধ্যে এই নীতিগর্ভ সার বাক্যের অর্থ তাঁহারা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন যে "যদি এমন মনে কর যে আমি ব্রহ্মকে সুন্দররূপে জানিয়াছি তবে নিশ্চয় তুমি ব্রহ্মের স্বরূপ অতি অল্পই জানিয়াছ।" ঈশ্বর নিত্য নিরঞ্জন নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের পিতা বিশ্ববিধাতা অনন্ত স্বরূপ, তিনি বাক্য মনের অগোচর, তাঁহার সম্যক্ জ্ঞান লাভ সম্বন্ধে ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ প্রভৃতি সমুদায়ই অশ্রেষ্ঠ বিদ্যামধ্যে পরি-গণিত হইয়াছে; আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মে দেখি-য়াছি যে "অনেক উত্তম বচন দ্বারা বা মেধা দ্বারা অথবা বহু শ্রবণ দ্বারা এই পরমাত্মাকে লাভ করা যায় না;" যত ইচ্ছা শাস্ত্র অধ্যয়ন কর তোমার মনোবৃত্তি স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইবে, তোমার বুদ্ধিবৃত্তি সমস্ত মার্জ্জিত হইবে, পৃথিবীর অন্যান্য অনেক বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিবে, সৃষ্টির সমুদায় পদার্থ জানিবার নিমিত্ত সোৎসুক নয়নে সুকৌশলসম্পন্ন বিশ্বরাজ্যের অলৌকিক শোভা নিরীক্ষণ করিবে; এবং তৎসমুদয় সন্দর্শনে তোমার হৃদয় মন বিস্ময়ে পরিপূরিত হইবে; কিন্তু অমৃতধনকে জানিতে না পারিয়া, বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে বিশ্বস্রষ্টাকে দেখিতে না পাইয়া প্রখর

বুদ্ধি হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিবে। এবং যদিও এপ্রকার জ্ঞানালোকের দ্বারা পরমাত্মার জ্ঞান কখনও কিছু মাত্র লাভ করা যায়, তাহা হইলেও তাহা ক্ষণপ্রভার মুহূর্ত্তস্থায়ী জ্যোতির ন্যায় নিমেষ মধ্যে নির্ব্বাপিত হয়। বিশেষ প্রণিধান করিয়া দেখিলে আরও দেখা যাইবে যে এপ্রকার জ্ঞান যে কেবল ক্ষণস্থায়ী তাহা নহে, তাহা চিরদিন স্থিরভাবে থাকিলেও তদ্দ্বারা সাধকের মন কখন তৃপ্তি লাভ করে না। সে প্রকার শুষ্ক নীরস ব্রহ্মজ্ঞান হৃদয় ও আত্মাকে পরিতৃপ্ত করিতে সমর্থ হয় না। যে পরমানন্দের কণা মাত্র আনন্দ উপভোগ করিয়া জীব সকল চরিতার্থ হয়, এরূপ শুষ্ক নীরস জ্ঞানের দ্বারা সেই পরমানন্দ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বিশেষতঃ প্রকৃত সাধক কেবল ঈশ্বরজ্ঞানের প্রার্থী নহেন, ভক্ত-হৃদয় পরমাত্মজ্ঞান লাভ অপেক্ষা পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইবার জন্য বিশেষ লালায়িত। কি স্ত্রী কি পুরুষ ভক্ত মাত্রেই অন্তরের সহিত এই কথা বলেন যে "যাহার দ্বারা আমি অমর না হই তাহাতে আমি কি করিব।" তবে কি রূপে তাঁহাকে লাভ করিতে পারি, কি উপায় দ্বারা পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়? "আত্মা গুহায়াং নিহিতোঽস্য জন্তোঃ" তিনি প্রাণিগণের হৃদয়ে বাস করেন, অথচ আমরা এ প্রকার অন্ধ যে তাঁহাকে হৃদয়মধ্যে সর্ব্বদা দেখিতে পাই না, তাঁহার সত্তা সকল সময়ে অনুভব করিতে সমর্থ হই না, তাহার কারণ কি? তিনি আমাদিগের এত নিকটে থাকিতেও কি জন্যই বা তাঁহাকে এত দূরের বস্তু বোধ হয়? প্রকৃত উপায় অবলম্বন না করাই তাহার কারণ। "তমক্রতুং পশ্যতি বীতশোকোধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমীশং" বিগতশোক ব্যক্তি সেই ভোগাভিলাষবর্জ্জিত ঈশ্বরকে ও তাঁহার মহিমাকে তাঁহারই প্রসাদে দৃষ্টি করেন। ঈশ্বর-প্রসাদ পরম পিতা পরমেশ্বরের করুণাই তাঁহাকে জানিবার একমাত্র উপায়। ঈশ্বর-প্রীতি ব্যতিরেকে আমরা কখনই তাঁহাকে পাইতে পারি না। প্রীতি-শূন্য জ্ঞান-নেত্রের দৃষ্টি এবং ভক্তজনের প্রেমপূর্ণ-হৃদয়-বিস্ফারিত-লোচনের দর্শন, এই দুয়ের মধ্যে অনেক প্রভেদ। একের সাহায্যে ঈশ্বরজ্যোতিঃ ও তাঁহার নিরূপম অনন্ত তেজোরাশির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে গিয়া অনেক সময়ে তেজোদগ্ধ নয়নের দৃষ্টি ক্ষীণতা-জনিত-অন্ধতা-প্রাপ্তবৎ হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসি; কিন্তু অন্যের সাহায্য অর্থাৎ পূর্ণ প্রীতি সহকারে ভক্তি-নেত্রে উন্মীলন করত তাঁহার অপার করুণা এবং সর্ব্বমঙ্গল স্বরূপ সর্ব্বত্র বিরাজিত দেখিয়া এবং স্বীয় আত্মাতে তাঁহাকে ধারণ করিয়া জীবনের সার্থকতা লাভ করি; তাঁহার লেশমাত্র করুণা দ্বারা অনুগৃহীত হইয়া হৃদয় মন আত্মাকে ভক্তিরসে পরিপূর্ণ করি; এবং পাপতাপশূন্য শুদ্ধ শান্ত হৃদয়ে তাঁহারই প্রসাদে তাঁহার মহিমাকে দৃষ্টি করিয়া বিগতশোক হই।

ব্রাহ্ম ভ্রাতৃগণ, যাহাতে আন্তরিক প্রকৃত ভক্তি দ্বারা পরমাত্মাকে আত্মস্থ করিয়া প্রত্যক্ষ করিতে পারেন; যাহাতে প্রতি নেত্রে সেই পবিত্র প্রেমধারাকে নিজের পিতা, নিজের মাতা, নিজের সখা, নিজের সর্ব্বস্ব ধন বলিয়া সকল সময়ে সকল অবস্থাতে দেখিতে পারেন; যাহাতে আপনাদিগের সমস্ত চিন্তায় এবং সমস্ত কার্য্যে "আমার" শব্দ লুপ্ত হইয়া কেবল "তাঁহার" শব্দ আবহমান দেদীপ্যমান থাকে তজ্জন্য সচেষ্ট হউন্; এবং উৎসাহিত চিত্তে প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহারই প্রিয়-কার্য্য-সাধনে চিরজীবন অনুক্ষণ রত থাকিয়া প্রকৃত ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করুন। ভ্রাতৃগণ করুণা-

ময়ের করুণার অভাব নাই, তিনি শান্তিসুধা বিতরণার্থ স্নেহময়ী জননীর ন্যায় সর্ব্বদা ক্রোড় প্রসারিত করিয়া রহিয়াছেন এবং সন্তানগণের নিমিত্ত অজস্র করুণা বর্ষণ করিতেছেন, অতএব আমরা যেন এরূপ সুযোগকে উপেক্ষা করিয়া সেই স্নেহময়ী বিশ্বজননীর প্রেমপূর্ণ ভক্তজন-শান্তি-প্রদায়ক বিশ্বপ্রসারিত ক্রোড় হইতে বঞ্চিত না হই; এবং যেন অভ্রান্ত অটল বিশ্বাসের সহিত তাঁহাকে "প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন" এবং আমাদিগের একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া জানি। তাঁহাকে প্রাপ্তিই যেন আমাদিগের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়; যেন সকল সময়ে সকল অবস্থাতেই ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহার নিকট হইতে কেবল তাঁহাকেই পাইতে ইচ্ছা করি; এবং "আবিরাবীর্ম্মএধি" হে স্বপ্রকাশ! আমার নিকট প্রকাশিত হও,এই প্রার্থনাই যেন আমাদিগের চির জীবনের একমাত্র প্রার্থনা হয়, এবং তাঁহাকে পাইবার জন্য ঐকান্তিক ইচ্ছা ও যত্ন এবং তাঁহাকে প্রাপ্তির আশাই যেন আমাদিগের সকল প্রকার হীন লালসা এবং প্রকৃত ভক্তজনানুচিত আশাকে বিলুপ্ত করে।

যিনি জীবের অনন্যগতি, এবং নিরাশ্রয়ের একমাত্র আশ্রয়, সেই সর্ব্বসিদ্ধিদাতা করুণাময় পরমেশ্বর আমাদিগকে শুভবুদ্ধি প্রদান করুন; এবং আমাদিগের আশাকে ফলবতী এবং আত্মাকে ভক্তিপ্রবণ করিয়া ভক্ত হৃদয়ে চিরদিন বিরাজিত থাকুন।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

অশুদ্ধ শোধন।

২১৬ পৃষ্ঠার ২ স্তম্ভ ২৫ পংক্তিতে " প্রতি " স্থলে প্রীতি এবং ঐ পৃষ্ঠা ঐ স্তম্ভ ২৬ পংক্তিতে "প্রেমধারা" স্থলে প্রেমাধার পঠিত হইবে।

THE EVIDENCE OF JESUS.

FROM THE REVD. CHARLES VOYSEY'S "THE SLING AND THE STONE."

(Continued from the last number of this journal.)

"THEY that run after another God shall have great trouble."————Psalm XVI. 4.

We must continue this morning our examination of the passages from the Old Testament which Jesus applied to himself. After what was said last Sunday, I grant that it is quite superfluous to go on citing instances of error because, as I have so frequently insisted, one well-proved instance is enough to overthrow the superhuman claims made by the Christians on behalf of their New Testament and their Christ. Why, then, continue a discussion which is extremely unpleasant in itself and not directly edifying to our own souls? My answer is this: There yet remain a number of passages, quite as firmly relied upon by the orthodox in proof of their theory as those we have already examined and exposed. A few weapons are still left in their hands, and those we must take from them. Moreover the more evidence we can bring forward in disclosing the errors of the Divine teacher himself, the less need there is for exposing the errors of his apostles and biographers. If what the Master says is so fallible, we cannot wonder at the fallibility of his followers.

In Matthew XXII. 41-46 we read:—"While the Pharisees were gathered together, Jesus asked them saying, what think ye of Christ (i.e.,) the Messiah. Whose son is he? They say unto him, The Son of David. He saith unto them,How then doth David in spirit call him Lord, saying, the Lord said unto my Lord, Sit thou on my right hand, till I make thine enemies thy footsool? If David then call him Lord, how is he his son? And no man was able to answer a word, neither durst any man from that day forth ask him any more questions." First I notice that the last words of this passage are slightly inappropriate. In this case the Pharisees had not been asking Jesus any question, but Jesus had been *questioning them.* Secondly, I notice that if we may believe Matthew himself, some men did ask

Jesus questions after this occasion, for his own disciples asked him, "When shall these things be, and what shall be the sign of thy coming and of the end of the world?" (Matt. XXIV. 3). In the fourth Gospel are recorded several questions put to him by various persons, notably by Caiaphas and Pilate, and relating to himself, just before his crucifixion. Therefore the assertion of Matthew is untrue. I notice next that to Jesus most mysterious quotation from Psalm CX "no man was able to answer him a word." Indeed, it was like a riddle which has no answer. If David called Messiah "Lord," how could he consistently be his son? or, to make it plainer by inversion, if Messiah were the son of David, how could David call him Lord? The Christians see it plainly enough, and have found an answer:—Messiah was to be Almighty God as well as David's son, and so in that case David would acknowledge his superiority and call him Lord. We say, then, to them, Do you really mean this? Will you stand to your own interpretation? And is this what you believe Jesus himself had in his own mind as an answer to his own puzzle. Then I must remind you that you elsewhere effectually bar off Jesus from being the Messiah expected by the Psalmist who calls him Lord; for your own inspired book tells you in the narrative of his birth and in the genealogies, (which, by the way, are mutually destructive) that Jesus was *not the son of David*; that he had no paternal descent at all, and that Mary, his only parent, belonged not even to David's tribe much less to his family, but belonged to the tribe of Levi. If David was speaking in Psalm CX., of a Messiah who was to be his son, then at all events he was not referring to Jesus, who was not one of his descendants at all. Only by abandoning the story of the miraculous birth of Jesus can you possibly connect him with the family of David.

Moreover you can only establish any reasonable connection between this passage in Matthew and the 110th Psalm, by supposing that Jesus intended to prove by it that he was not the son of David. There is not a single word in the Psalm about the *Son-ship* though it may have reference to a *Messiah*, So it is just possible that Jesus wished the Pharisees to infer that he was the Messiah, though not descended from David. This ofcourse the Christian will not allow, because over and over again the Messiah is foretold to be the son of David, "of the very fruit of his loins, according to the flesh." Now that we have got so far in our search for an answer to Christ's own unanswerable question, we will go a little further and give an answer which he certainly did not expect, and which comparatively recent criticism alone enables us to give. *David*, in this Psalm at all events, did not call Messiah Lord. It is a mistake to suppose that the words quoted by Jesus were written by David at all. Dr. Davidson says that the Davidic authorship the 110th Psalm can not be sustained. Dr. Knenen says the same. It is the composition of a poet addressing a King and speaking of that king. The opening words, when translated properly so as to convey the sense of the original, are these:—"Jehovah said unto my Lord (adonai, or master) Sit thou on my right hand until I make thy foes thy footstool." If they refer at all to a Messiah it is only to an earthly Monarch, full of war, vengeance and slaughter. He was to raise up Zion and his people, and to trample down the nations. But here are the words:—

"The Lord shall send the rod of thy strength out of Zion, rule thou in the midst of thine enemies. Thy people shall be willing in the day of thy power, in the beauties of holiness from the womb of the morning: thou hast the dew of thy youth. Jehovah hath sworn and will not repent. Thou art a priest forever after the order of Melchi Sedek. The Lord (or master) at thy right hand shall strike through kings in the day of his wrath. He shall Judge among the heathen, he shall fill the places with the dead bodies; he shall wound the heads over many centuries, He shall drink of the brook in the way; therefore shall he lift up his head." I say again, if Christians will have it so, they are welcome to this Psalm as a prophecy of their Christ; but there is hardly a parallel to be found for it in all the Old Testament for wild bood-thirstiness.

We now turn to another quotation from

the Psalms made by Jesus in Matt. XXI. 42 "Jesus saith unto them, Did ye never read in the scriptures, the stone which the builders rejected, the same is become the head of the corner: this is the Lord's doing and it is marvellous in our eyes?" If we refer to the context in Psalm CXVIII, 5-25, we find such passages as the following, which show how entirely inappropriate the quotation is:—

"I called upon the Lord in distress, and the Lord heard me at large. The Lord is on my side, I will not fear what man can do unto me. The Lord taketh my part with them that help me, therefore shall I see my desire upon mine enemies. The Lord hath chastened me sore, but he hath not given me over unto death." All this is the very opposite of the story told of Christ. He was dreadfully afraid of what men would do unto him. Three times did he cry in an agony of bloody sweat, "My father, if it be possible let this cup pass from me," and not a prayer was heard or answered. God did *not* take his part; God did *not* let him see his desire upon his enemies; God *did give him over unto death.* Bursting with grief and disappointment, he moans from the cross, "My God my God, why hast thou forsaken me"

In no one feature has Jesus Christ become the head-stone of the corner. He is refused now by his own people, as he was refused then; and we cannot blame his contemporaries for rejecting as their Messiah, one who had not a single characteristic which their prophets had led them to expect.

In Matt. XXVI. 31,32, we find; "Then saith Jesus unto them, All ye shall be offended because of me this night: for it is written, I will smite the Shepherd and the sheep of the flock shall be scattered abroad" This is how it is really written in Zech, XIII. 1-9; "Awake, O Sword, against my shepherd and against the man that is my fellow, saith the Lord of Hosts: I will smite the Shepherd and the sheep shall be scattered; and I will turn mine hand upon the little ones. And it shall come to pass, that in all the land, saith the Lord, two parts therein shall be cut off and die: but the third part shall be left therein." Further quotation of this Psalm is unnecessary. You will find nearly all the references by Jesus to Old Testament Scripture bear the same characteristics, which I have designated "erroneous and untrustworthy."

The next case I shall put before you illustrates not merely the error of Jesus, if he spoke the words attributed to him, but the contradictory nature of the Gospels, if he did not speak them.

Matt. XXI. 1-5, makes Jesus say to two of his disciples: "Go into the village over against you, and straightway ye shall find an ass tied, and a colt with her: loose them, and bring them unto me. And if any man say ought unto you, ye shall say, the Lord hath need of them; and straightway he will send them. All this was done that it might be fulfilled which was spoken by the prophet, saying, Tell ye the daughter of Zion, behold thy King cometh unto thee, meek and sitting upon an ass and a colt, the foal of an ass. And the disciples went and did as Jesus commanded them, and brought the ass and the colt, and put on *them* their clothes and sat him thereon."

Remember, we are dealing with inspired books, and with the words of one who was God as well as man. We must therefore be very careful in our quotations. In Mark XI, 2, we find the master tells his disciples only to bring one animal, viz., a colt. "Ye shall find a colt tied whereon never man sat: loose him and bring him." Luke XIX also makes Jesus say, "Ye shall find a colt tied whereon yet never man sat: loose him and bring him hither." Not one word in Mark or Luke about the second ass: though both evangelists are supposed to be giving, with Matthew, an inspired version of Christ's very words. Of course every one knows how Matthew or Christ as he reports him, fell into the mistake. It was due to an entire ignorance of the Hebrew idiom, in which the same object is twice named, and in varied phraseology, for the sake of emphasis. "Upon an ass, and upon a colt the foal of an ass," in Zech. XI. 8-10, meant *only one* animal—equivalent to saying, "ass's colt," i.e, a young ass. Mark and Luke knew this, and did not fall into the error made by Christ, according to Matthew. Ofcourse such a mis-

take is of no consequence in ordinary books and on ordinary subjects; but if a preposterous claim of Divine origin be put forth, or insisted on, we have no choice but to expose even trifling errors. For God we are never forced to apologize.

(To be Continued.)

THE ANNIVERSARY FESTIVAL OF THE AHMEDABAD PRARTHANA SAMAJ.

THE eighth Anniversary of this Samaj passed off successfully. It was celebrated with the usual rejoicings, for five days continuously. A ladies' prayer meeting was held, for the first time at Ahmedabad on the opening day of the festival. The sermon on this occasion was delivered by the younger daughter of Rao Bahadur Bholanath Sarabhai, President of the Samaj. On Sunday, the 15th Instant, the service was conducted by Mr. Ranchoolal Chotalal, in the course of which, he, after giving a short sketch of the Theistic movement in Guzarat, read an excellent discourse on the duties of the members of the Samaj. The following day, which was specified for Puran, Rao Bahadur Bholanath Sarabhai read the Vidur Niti from the Mahabharat. The report for the past year was read on Tuesday evening, after which, the members were regaled with tea, sweatmeats and flower-bouquets at Rao Saheb Mahipatram's house, On Wednesday, the anniversary of the Samaj service was held both in the morning and in the evening. Rao Saheb, Lalsaukar Rumashankar, who takes a lively interest in the progress of Theism, preached in the morning when hymns specially composed for the occasion were sung and prayers offered to the Merciful Father of the Universe. The Mandir was lighted up in the evening and the President of the Samaj read a discourse on Divine Love and delivered a sermon on the cosmopolitan character of true religion and its urgent call to mankind for purity of conduct. Hymns were chanted by the vast concourse of people who had assembled to witness the ceremony. The whole proceeding ended with the celebrated *Arti* (আরতি) which is now recited all over the land on Sunday evenings.'

আয় ব্যয়

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫০ ।

পৌষ ।

আদি ব্রাহ্মসমাজ ।

আয়	... ...	২১৫৸/৫
পূর্ব্বকার স্থিত	...	১৫৫॥৶৫
সমষ্টি	... ...	৩৭১॥ ১০
ব্যয়	... ...	২৪৬৸/ ০
স্থিত	... ...	১২৪ ॥৶১০

আয়

ব্রাহ্মসমাজ		২৮৶১০
দান প্রাপ্ত ।		
শ্রীযুক্ত গগেন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৫	
" গিরিশচন্দ্র দাস ঘোষ	১	
	২৬	
সঙ্গীতের কাগজ বিক্রয়	২৶১০	
	২৮৶১০	
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৩৯।/১০
পুস্তকালয়	...	১৩।/১০
যন্ত্রালয়	...	১২৫ ৶০
গচ্ছিত	...	৯৸ ১৫
সমষ্টি		২১৫৸/৫

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	... ...	৬৭৸৶৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা..	...	৮৬।০
পুস্তকালয়	... ...	১৮ /০
যন্ত্রালয়	... ...	৬৩॥ ১৫
গচ্ছিত	... ...	১১ /০
সমষ্টি		২৪৬৸/০

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সম্পাদক।

Registerd NO 52.

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

দার্জ্জিলিং ব্রাহ্মসমাজ।

২৪ কার্ত্তিক রবিবার। ৫০ ব্রাহ্ম সংবৎ

শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্যের উপদেশ।

ব্রাহ্মের শ্রেষ্ঠ অধিকার এই যে অন্তরে আমরা ব্রহ্মকে দেখিতে পাই। আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম লাভ করিয়া এই সৌভাগ্য অধিকার করিয়াছি যে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ঈশ্বরের নিকটে যাইতে পাইতেছি—এত নিকটে যে তত নিকটে আর কিছুই নাই, আর কেহই নাই; হৃদয়-বন্ধুও সেখানে যাইতে পারে না। তিনি সাক্ষাৎ সত্য সনাতন পুরুষ নির্ব্বিকল্প। তাঁকেই আপনার অন্তরে আত্মাতে দর্শন করিতেছি, আমরা তাঁহার সাক্ষাৎ আদেশ শুনিতেছি, এবং প্রার্থনা বাক্য তাঁরি শ্রুতি-গোচরে উচ্চারণ করিতেছি। আমারদের আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার সঙ্গে কোন ব্যবধান নাই, আমারদের অন্তরে তাঁহার স্থান কেহ অধিকার করিতে পারে না—আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে এই উপদেশ পাইয়াছি। যখন আমরা তাঁকে অন্তরে দেখিলাম, তখনি শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি প্রকাশ হইল—আমরা পবিত্র হইলাম। সেই শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি যখন প্রস্ফুটিত হইল, তাই লইয়া তাঁর উপাসনা তাঁর পূজা করিলাম এবং আমারদের জীবনকে সার্থক করিলাম। দেখ আমরা এখনি এখানে সব সুহৃদে মিলে হৃদয়ের মধ্যে পবিত্র মঙ্গল-স্বরূপ ভুবনেশ্বরকে ধারণ করিয়া পূজা করিতেছি। আমরা যে অমৃত বেলার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম, এখন সেই বেলা উপস্থিত। আমরা সকল ব্রাহ্মে মিলিয়া সেই পরম পিতার প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি অর্পণ করিয়া পূজা করিব, এই জন্য উৎসাহ সহকারে এই সময়ের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম, সেই সময় উপস্থিত হইয়াছে। এখন হৃদয়কে পবিত্র করিয়া তাঁর নিকটে উপস্থিত হইয়াছি, তাঁহাকে সম্মুখে দেখিতেছি, তাঁর অনুরাগ তাঁর প্রেম-দৃষ্টি আমারদের সকলের উপরে এখনি নিপতিত রহিয়াছে। তিনি বাহিরে এই জ্যোতির জ্যোতি, তিনি অন্তরে আত্মার অন্তরাত্মা—তাঁহাকে সাক্ষাৎ অনুভব করিতেছি, হৃদয়ভার ভক্তিপুষ্প তাঁর চরণে অর্পণ করিয়া জীবনকে সার্থক করিতেছি। এ দৃশ্য কি মনোহর দৃশ্য। পৃথিবীর ক্ষুদ্র জীব হইয়া দেবতার

দেবতাকে আরাধনা করিতেছি, এই অধোলোকে থাকিয়া আমরা ব্রহ্মলোকে গমন করিতেছি, ব্রহ্মকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া পূজা করিতেছি—দেবতাদেরও এ মনোহর দৃশ্য। যিনি এই সম্মুখস্থ উচ্চতুষার-মণ্ডিত ধবল গিরিকে বিদ্যুৎ বজ্রঝঞ্ঝা হইতে রক্ষা করিতেছেন, তিনিই আমারদিগকে সংসার-সমুদ্রের তরঙ্গের মধ্যে তাঁর পথে রক্ষা করিতেছেন। যদিও চতুর্দ্দিকে বিপদ্ ক্রন্দন শোক কলহ তথাপি শোক তাপের মধ্যে তিনি আমারদিগকে রক্ষা করেন। সেই ঈশ্বর সর্ব্বদা আমারদের হৃদয়ে রহিয়াছেন, আমরা সেই অন্তর্যামী পুরুষকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া পূজা করিতেছি। জ্ঞানের সহিত প্রেমের সহিত ধর্ম্মের সহিত যোগ করিয়া তাঁহার পূজা করিতেছি। জ্ঞান যখন প্রেমের সহিত যুক্ত হয়, তখনি ধর্ম্ম-ফল প্রসূত হইয়া পরস্পরের ভাব বন্ধন আরো দৃঢ় করে। জ্ঞান যখন হৃদয়ের রসে রসার্দ্র হয়, তখনি আমরা নম্র হৃদয়ে পরমাত্মার প্রতি গমন করি। জ্ঞানে প্রেমে যুক্ত হইয়া শুভকর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া নম্রভাবে পরমাত্মার প্রতি গমন করি এবং তাঁহাকে আপনার পিতামাতা সখারূপে দেখিতে পাই। এখন আমরা এই আত্মাতে আমারদের প্রাণসখাকে দর্শন পাইয়াছি, বসন্ত কালের ন্যায় এ সকলি মধুর বেশ ধারণ করিয়াছে। এই হিমালয় পর্ব্বতের উপত্যকা হইতে অধিত্যকা পর্যান্ত সর্ব্বত্র সেই প্রেমরূপের আবির্ভাব দেখিতেছি। এখানে এই ব্রহ্মপরায়ণ সাধুভক্তদিগের প্রেমরঞ্জিত আনন্দ-মূর্ত্তি। ইহার চতুর্দ্দিকে শ্বেত-কুটীর-মণ্ডিত জন-কোলাহল-পূর্ণ শ্যামায়মান চা-ক্ষেত্র, তদুপরি পর্ব্বতের স্তরে স্তরে বনস্পতি ও নির্ঝরের শোভা, সকলের ঊর্দ্ধে শুভ্রফেন-সদৃশ সূর্য্য-কিরণ-রঞ্জিত হাস্যময় রজত-শৃঙ্গ—সকলি সেই আনন্দময়ের আনন্দময় আবির্ভাব। আমরাও বাহিরে সেই আনন্দময়ের আবির্ভাব দেখিয়া, আবার অন্তরে সেই আনন্দময়কে প্রত্যক্ষ দেখিয়া, তাঁর প্রেমানন্দে মগ্ন হইতেছি। তিনি আমারদের যেমন সখা সুহৃদ, তেমনি পিতামাতা। তিনি পিতামাতার ন্যায় প্রতিদিন আমাদের অন্নপান প্রয়োজন সকল বিধান করিতেছেন, এবং তিনি গুরুর ন্যায় জ্ঞানধর্ম্ম প্রেরণ করিয়া তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিতেছেন। তিনি আমারদিগকে আদেশ করিতেছেন—শরীর মন আত্মাকে পবিত্র করিয়া আমার নিকটে এস, আমি তোমারদের পূজা গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ করিব।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

অজ্ঞতাবাদ সমালোচন।

দর্শন অতি প্রাচীন শাস্ত্র। মনুষ্য যখন আদৌ ভূমিষ্ঠ হইল, এবং ভূমিষ্ঠ হইয়াই যখন চক্ষু উন্মীলন করিল, তখনই সে দর্শনশাস্ত্রের প্রথম সূত্র শিখিতে আরম্ভ করিল—শিখিতে আরম্ভ করিল, আমি এক, আর এই যে কি (পৃথ্বী) আমার শরীরে প্রতিহত হইতেছে, ইহা আর এক; এবং ঐ যে কি (আলোক) আমার চক্ষু ঝলসিতেছে, উহা আর এক (উভয়ত্র আমি ভিন্ন অন্য বুঝিতে হইবে)। এই সত্য লাভে সে যে কোন দার্শনিক জ্ঞান লাভ করিল, ইহা সে জানিল না বটে; কিন্তু তথাপি তাহার জ্ঞানের দার্শনিকত্ব বিষয়ে কোন সংশয় হইতে পারে না; কারণ, দর্শন মানব মনের প্রকৃতি-বিষয়ি জ্ঞানসমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই নহে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে দর্শন ও মানবের জন্ম সমসাময়িক হইলেও আজি পর্য্যন্ত মনুষ্যের দর্শন অর্থাৎ জ্ঞানসীমা অবি-

সংবাদিতরূপে নিরূপিত হইল না, নিরূপিত হইল না, আমরা যাহাকে দর্শনের প্রথম সূত্র বলিয়াছি তাহা সত্য কি অসত্য; অর্থাৎ মনুষ্যের জ্ঞান কি শুধু অহং বিষয়ক না শুধু অহমিতর বিষয়ক *, না অহং এবং অহমিতর এতদুভয়বিষয়ক; নিরূপিত হইল না, বিজ্ঞান-বিষয়ীভূত দৃশ্যমানের (phenomenon) সমস্থিতি এবং অনুস্থিতি সমূহ (coexistences and successions) † অতিক্রম করিয়া ধর্ম্ম বিষয়ীভূত তৎপশ্চাদ্‌বর্ত্তী অনন্ত কারণ আমরা দেখিতে পাই কি না। আজি আমরা এই বিসংবাদিত প্রশ্নের সমালোচন করিব। প্রসিদ্ধ দার্শনিক হারবর্ট স্পেন্‌সর তাঁহার First principles নামক গ্রন্থে এই বিষয়ের সবিস্তার আলোচনা করিয়াছেন। আধুনিক দার্শনিকগণের মধ্যে অনেকেই তাঁহার সহিত একমত। সুতরাং আমরা এই প্রবন্ধে প্রধানতঃ স্পেনসরের মতেরই পরীক্ষা করিব। এই পরীক্ষাকার্য্যে আমরা কোন সুপণ্ডিত য়ুনানী দার্শনিকের নিকট হইতে বহু সাহায্য গ্রহণ করিব।

মনুষ্যের সার্ব্বভৌমিক অজ্ঞতামত (Doctrine of universal nescience) আধুনিক। ইতিপূর্ব্বে প্রকৃতি সম্বন্ধে তিনটী দার্শনিক মত প্রচলিত ছিল:—প্রথম, প্রকৃতির কর্ত্তা ঈশ্বর; দ্বিতীয়, প্রকৃতির কোন ঐশ্বরিক কর্ত্তা নাই, এবং তৃতীয়, প্রকৃতি স্বয়ং ঐশ্বরিক ও আপনার কর্ত্তা। প্রথমমতাবলম্বীরা আস্তিক, দ্বিতীয় মতাবলম্বীরা নাস্তিক, এবং তৃতীয় মতাবলম্বীরা অদ্বৈতবাদী (Pantheist) উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই বিভিন্নমতাবলম্বী দার্শনিকগণের প্রত্যেকেরই বিশ্বাস ছিল যে, এই প্রশ্নের মীমাংসা মনুষ্য-জ্ঞানের অতীত নহে, এবং প্রত্যেকেই সেই বিশ্বাসে সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর করিয়া উক্ত প্রশ্নের মীমাংসা চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কেন না, যদি সে বিশ্বাস না থাকিবে, তবে কেন তাঁহারা উক্তরূপ অর্থশূন্য চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইবেন? যেখানে জ্ঞান অসম্ভব, সেখানে তাহার অন্বেষণ-প্রবৃত্তিও অসম্ভব। আমরা দেখিতে পাই, মনুষ্যের চক্ষু আছে, আবার সঙ্গে সঙ্গে দেখিতে পাই সে চক্ষুর সার্থকতার জন্য মনুষ্যের দিব্য মুখমহিমা, তরঙ্গায়িত ধান্যক্ষেত্র, জলধির সে অনন্ত নীলিমা, গিরির সে অনির্ব্বচনীয় গাম্ভীর্য্য, রজনীর সে লক্ষহীরকশোভিত চন্দ্রাতপ রহিয়াছে। আমরা দেখিতে পাই মনুষ্যের কর্ণ

---

* অহং বিষয়ক জ্ঞানকে আত্মীয়, আত্মসম্বন্ধীয়; এবং অহমিতর বিষয়ক জ্ঞানকে অনাত্মীয় অথবা পরকীয় সংজ্ঞা প্রদান করা যাইতে পারে। ইংরেজী ভাষায় প্রথম প্রকারের জ্ঞানকে subjective ও দ্বিতীয় প্রকারের জ্ঞানকে objective কহে।

† প্রাণী, অপ্রাণী, তাহাদিগের কার্য্য, যাহা কিছু আমরা দেখিতে পাই সে সকলকেই দৃশ্যমান (phenomenon) সংজ্ঞা প্রদান করিলাম। দৃশ্যমানের অগ্র পশ্চাৎ অথবা সমকালস্থায়িত্ব নির্ণয় করাই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। আমরা সাধারণ ভাষায় যাহাকে কারণ বলিয়া থাকি, প্রকৃত-পক্ষে তাহা কোন দৃশ্যমানের মৌলিক কারণ নহে। মৌলিক কারণকে অজ্ঞতাবাদীরা অজ্ঞেয় বলিয়া থাকেন; আমরা জগদীশ্বরকেই সমস্ত দৃশ্যমানের এক মাত্র মৌলিক কারণ বলিয়া স্বীকার করি। দৈনিক ভাষায় আমরা বলি, মেঘ বৃষ্টির কারণ, এখানে কারণ শব্দের অর্থ কি?—না, মেঘ চিরকাল, অর্থাৎ যত কাল মনুষ্য বৃষ্টি দেখিয়াছে, সর্ব্বদাই বৃষ্টির পূর্ব্বগামী যেখানে মেঘ পূর্ব্বে জন্মিল না, সেখানে পরে বৃষ্টি হইল না। এখানে বিজ্ঞান মেঘের পূর্ব্বস্থায়িত্ব ও বৃষ্টির অনুস্থায়িত্ব নির্ণয় করিয়াই সুখী হইল। আবার দেখ বৃষ্টি হইতেছে, এমন সময়ে সূর্য্যও কিরণ বিস্তার করিতেছে। কি হইল?—ইন্দ্রচাপের সৃষ্টি হইল। ইহা হইতে আমরা কি শিক্ষা করিলাম?—না, যখন সূর্য্যালোক ও বৃষ্টি এক সময়ে থাকিবে, শুধু তখনই ইন্দ্রচাপের সৃষ্টি হইবে। এখানে বিজ্ঞান ইন্দ্রচাপ সম্বন্ধীয় বৃষ্টি ও সূর্য্যরশ্মির সমকালস্থায়িত্ব রূপ সত্যে উপনীত হইয়া সন্তুষ্ট হইল। তাই বলিয়াছি, দৃশ্যমানের সমস্থিতি ও অনুস্থিতি নির্ণয়ই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য।

আছে. আবার সঙ্গে সঙ্গে দেখিতে পাই, তাহার সার্থকতা-কারণে মনুষ্যের অতুল কণ্ঠ, বিহঙ্গের মধুমাখা গীতি, বজ্রের ভীম গর্জ্জন, নির্ঝরিণীর সুমধুর কল্লোল রহিয়াছে। মনুষ্যের নাসার পরিতৃপ্তির জন্য শিশির-স্নাত নবকুন্দদল হইতে পার্থিব পারিজাত গোলাপ পর্য্যন্ত কতশত মধুবাহী তৃণ পুষ্পই না অহর্নিশ সৌরভ বিকীর্ণ করিতেছে। মনুষ্যের রসনা-তৃপ্তির জন্য নির্ম্মল গঙ্গাবারি হইতে আঙ্গুর ও আম্র পর্য্যন্ত কতই না স্বাদু পদার্থ অমৃত বর্ষণ করিতেছে। যখন শারীরিক সর্ব্বপ্রকার তৃষ্ণাশান্তিরই বিধান রহিয়াছে, তখন কি জ্ঞান-তৃষ্ণা-শান্তির কোন বিধান নাই? যদি ঐশ্বরিক জ্ঞান অসম্ভব হইবে, তবে সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে আজি পর্য্যন্ত প্রতি মনুষ্য-মনে ঐশ্বরিক জ্ঞান-তৃষ্ণা অহোরাত্র জ্বলিতেছে কেন? যাঁহারা বলিতেছেন ঐশ্বরিক জ্ঞান অসম্ভব, তাঁহারাই বা কেন তবে অবিচ্ছেদে দিবানিশি শরীর ক্ষয় করিয়া ঐশ্বরিক জ্ঞান সম্ভব কি অসম্ভব,এই প্রশ্নের মীমাংসা-চেষ্টায় প্রবৃত্ত রহিয়াছেন? যে বিষয়ে আমাদের তৃষ্ণা আছে, সে বিষয়ে আমাদের তৃষ্ণা-শান্তিরও উপায় আছে। ঐশ্বরিক তত্ত্বানুসন্ধান মনুষ্যমনের একটী অবিযোজ্য ধর্ম্ম, সুতরাং ঐশ্বরিক তত্ত্বলাভও মনুষ্য মনের একটী অবশ্যম্ভাবী কার্য্য। স্পেন্সর সৃষ্টি সম্বন্ধীয় পূর্ব্বোক্ত পরস্পর বিরোধী মতত্রয়ের বৈশ্লেষিক পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে উহাদিগের অন্বেষণের বিষয় জ্ঞানসীমার বহির্দ্দেশবাসী। তবে এখন পাঠক দেখিতে পাইতেছেন যে, স্পেন্সর কার্য্যতঃ জ্ঞান যেখানে অসম্ভব, তাহার অন্বেষণ-প্রবৃত্তিও সেখানে অসম্ভব, এই পূর্ব্ব-প্রমাণিত সরল সত্যটির মস্তকে পদাঘাত করিয়াছেন। স্পেন্সর আরও বলেন, যাহারা নাস্তিক তাহারা ভ্রান্ত, যাহারা আস্তিক তাহারাও ভ্রান্ত; উভয়েরই অবলম্বিত মতের অভ্যন্তরে প্রকৃত সত্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে; সেই সাধারণ সত্য নাস্তিক এবং আস্তিক উভয় কর্ত্তৃকই উপেক্ষিত হইয়াছে। উক্ত সাধারণ সত্য অজ্ঞতাবাদ ব্যতীত আর কিছুই নহে। স্পেন্সর নাস্তিকতা এবং আস্তিকতা হইতে ধর্ম্মবিষয়ী অজ্ঞতামতরূপী সাধারণ সত্য সংগ্রহ করিয়াছেন, অর্থাৎ তিনি "হাঁ" এবং "না" এই মূলতঃ বিরোধী বিষয়ের মধ্যে সাধারণত্ব দেখিয়াছেন। একথা আমাদিগের পাঠকগণকে বুঝাইতে হইবে না যে এবংপ্রকার মূলতঃবিরোধী মতের মধ্যে সাধারণত্ব থাকিতে পারে না। থাকিতে পারিলে সত্য এবং অসত্যের মধ্যে, আলোক এবং অন্ধকারের মধ্যেও সাধারণত্ব দেখা যাইত।

স্পেন্সর যেরূপে তাঁহার অজ্ঞতামত সমর্থন করিয়াছেন, তাহা এস্থলে বিবৃত হইতেছে। এখানে তিনি মেন্‌সেলের অনুসরণ করিয়া বলেন, যদি তুমি ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার কর, তবে তোমার একদিকে তাঁহাকে নিরবলম্ব (Absolute) ও অনন্ত বলিতে হইবে, অপরদিকে তাঁহাকে কারণ মানিতে হইবে। যদি একথা স্বীকার কর দেখিতে পাইবে যে এই গুণত্রয় (Attributes) পরস্পর-বিরোধী। যিনি নিরবলম্ব তিনি একাকী, তিনি সম্বন্ধহীন, যিনি কারণ তিনি কার্য্যের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট, সুতরাং একই ব্যক্তি (Being) নিরবলম্ব ও কারণ হইতে পারেন না। আবার দেখ যিনি অনন্ত, সমস্তই তাঁহা হইতে অবিচ্যুত (unexcluded), নূতন কোন কিছুই তাঁহাতে যুক্ত হইতে পারে না, কেন না যিনি অনন্ত সমস্তই তৎকর্ত্তৃক ব্যাপ্ত, সমস্তই তাঁহার অন্তর্গত; অপরদিকে যিনি কারণ

তিনি উৎপাদনশীল,সুতরাং তিনি অস্তিত্বের অথবা অস্তিত্বের ক্রিয়াসমষ্টির বর্দ্ধন করেন; তিনি উৎপাদনশীল, সুতরাং উৎপাদন করেন, সুতরাং উৎপন্ন পদার্থ তাঁহাতে নবযুক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু তিনি অনন্ত, অনন্তে কিছুই নবযুক্ত হইতে পারে না। সুতরাং যিনি অনন্ত তিনি কারণ হইতে পারেন না। স্পেন্‌সর এই শব্দের খেলা খেলিয়া ঈশ্বরের অজ্ঞেয়ত্ব নিরূপণ করিয়াছেন। তিনি আরও বলেন, চিন্তার প্রকৃতিই আমাদিগকে অন্তবিশিষ্ট-বিষয়-প্রাঙ্গণে বদ্ধ রাখিয়াছে। চিন্তা নিত্য-দ্বিত্ব-বাহিনী (Always carries duality with it) অর্থাৎ শুধু কোন একটি বিষয়ের চিন্তা হইতে পারে না। তখনই তুমি একটি বিষয়ের চিন্তা করিতে পার, যখন তুমি সেই বিষয়টীর সঙ্গে সঙ্গে অপর একটি অথবা বহু তৎসহ সম্বন্ধবিশিষ্ট বিষয়ের চিন্তা কর; অতএব চিন্তা তৌলিক অথবা আপেক্ষিক, স্বাধীন নহে। আচ্ছা, কলিকাতার জলবাহী কলের সম্বন্ধে তুমি একবার চিন্তা কর দেখি। কি ভাবিতেছ?—ভাবিতেছ,"কি আশ্চর্য্য! প্রতিদিন কত জলই ভাগীরথী হইতে আসিতেছে! কোথায় পল্‌তা আর কোথায় কলিকাতা!—যিনি প্রথম এই কল নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাঁহার কত বুদ্ধি, কত চেষ্টা ব্যবহৃত হইয়াছিল! আহা এখন কলিকাতার লোকগুলি কতই না উপকার পাইতেছে!" আরও এই রকম পাঁচ শত চিন্তা করিতে পার, কিন্তু দ্বিতীয় কোন বস্তুর চিন্তা ছাড়িয়া কলিকাতার জলবাহী-কলের বিষয়ে অণুমাত্র চিন্তাও করিতে পারিবে না। সর্ব্ববিষয়িনী চিন্তা সম্বন্ধেই এই কথা। তাই স্পেন্‌সর বলিতেছেন, চিন্তা নিত্যদ্বিত্ববাহিনী। এক হইতে অন্যের নির্দ্দেশনের নামই চিন্তা—কর্ত্তা হইতে কর্ম্ম, স্থানের অনন্ত বিস্তৃতি হইতে পদার্থ (Body, form space) বস্তু হইতে গুণ ইত্যাদি। তৌলিক শব্দ ছাড়িয়া দিলে চিন্তার জন্য যে কোন পদার্থ দেখাইবে তাহাই অ-পদার্থ হইবে, যে কোন বিষয় নির্দ্দেশ করিবে তাহাই অ-বিষয় হইবে। সুতরাং যখন আমরা কোন বিষয়ের চিন্তা করিলেই তাহাকে অপর কোন বিষয়ের সহিত তুলিত করি, তখন চিন্তা কখনও অসীম অনন্তের চিন্তা করিতে পারে না; কেন না, অসীম অনন্তকে কাহার সহিত তুলিত করিবে? আবার চিন্তা যখন চিন্তনীয় বিষয়ের গুণ নিরূপণের নামান্তর মাত্র, তখন ইহা নিরবলম্ব অর্থাৎ সম্বন্ধহীনের বিষয়ে সম্পূর্ণ অক্ষম; কারণ গুণ কখনও অনাপেক্ষিক অথবা অসম্বন্ধ হইতে পারে না। একথাটা বোধ হয় পরিষ্কার হইল না। তোমার সম্মুখে একখানা গৃহ আছে, তুমি বলিলে এই গৃহখানা বড়। ইহার অর্থ কি? তুমি উহা অপেক্ষা শত শত ক্ষুদ্র গৃহ দেখিয়াছ, তাই বলিতেছ এই গৃহখানা বড়। যদি তুমি উহা অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর গৃহ না দেখিতে, তবে কি তুমি গৃহ শব্দের পরে 'বড়' এই বিশেষণ পদ ব্যবহার করিতে? না। এই রূপ গুণনির্ব্বাচক শব্দ মাত্রই আপেক্ষিক অথবা সম্বন্ধনির্ণায়ক। সুতরাং সিদ্ধ হইল যে নিঃসম্বন্ধ ঈশ্বর বিষয়ে সম্বন্ধ-বাচক শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে না। ইতি পূর্ব্বে প্রমাণিত হইয়াছে যে সর্ব্বপ্রকার চিন্তাই নিত্যসম্বন্ধনির্দ্ধারিণী, সুতরাং চিন্তা কখনও নিঃসম্বন্ধ ঈশ্বর-বিষয়ে চিন্তা করিতে পারে না। এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হইল যে ঈশ্বর মনুষ্য-চিন্তার অগম্য।

যাহা হউক, স্পেন্‌সর এক বিষয়ে জ্ঞানের শক্তি স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলেন যে নিরবলম্বের অস্তিত্ব নিশ্চিত।

কারণ যদি সেই নিঃসম্বন্ধ, নিরপেক্ষ, না থাকিতেন, সম্বন্ধ-বিশিষ্ট কোন কিছুই থাকিতে পারিত না, অথবা থাকিলেও আমাদিগের চিন্তনীয় হইত না; যেহেতু, সম্বন্ধবিশিষ্টের ভাব শুধু নিঃসম্বন্ধের বিপরীত বলিয়াই চিন্তনীয় (i. e. the related can be grasped by thought only as opposed to the unrelated) চিন্তা দ্বিত্ববাহিনী ; সম্বন্ধ বিশিষ্ট এক, সুতরাং নিঃসম্বন্ধ ব্যতীত সম্বন্ধবিশিষ্টের চিন্তা অসম্ভব। যদি নিঃসম্বন্ধের অস্তিত্ব অস্বীকার কর, তবে সম্বন্ধবিশিষ্ট বিষয়ই একাকিত্ব নিবন্ধন নিঃসম্বন্ধ হইয়া দাঁড়ায় ; সুতরাং চিন্তার সীমা অতিক্রম করে, কেননা চিন্তা নিত্য-সম্বন্ধ-নির্দ্ধারিণী বলিয়া নিঃসম্বন্ধ-চিন্তনে অক্ষমা। অতএব নিঃসম্বন্ধের অস্তিত্ব মানিতে হইবে। কিন্তু এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া স্পেন্সর কি লাভ করিলেন? আমরা বলি, কিছুই না। মানিলাম, নিঃসম্বন্ধকে দূরে রাখিয়া আমরা সম্বন্ধবিশিষ্টের চিন্তা করিতে পারি না। কিন্তু সম্বন্ধবিশিষ্টের চিন্তা করিতে হইলেই যদি নিঃসম্বন্ধের ভাব মনে স্থান দিতে হয়, তবে তাঁহার নিঃসম্বন্ধত্ব রহিল কোথায়? তবে ত তিনি সম্বন্ধবিশিষ্ট হইলেন, তবেত তিনি চিন্তনীয়, সুতরাং জ্ঞেয় হইলেন। কেননা যে বিষয়ে জ্ঞান অসম্ভব, সে বিষয়ে তাহার অন্বেষণ-প্রবৃত্তিও অসম্ভব। চিন্তা ও জ্ঞানান্বেষণ প্রবৃত্তি অভিন্না, সুতরাং যেবিষয়ে জ্ঞান অসম্ভব, সেবিষয়ে চিন্তাও অসম্ভব। অতএব যিনি চিন্তনীয়, তিনি জ্ঞেয়। স্পেন্সরের যুক্তি অবলম্বন করিয়াই আমরা দেখাইয়াছি যে ঈশ্বর চিন্তনীয়, এখন দেখাইলাম, যিনি চিন্তনীয় তিনি জ্ঞেয়, সুতরাং সিদ্ধ হইল যে ঈশ্বর জ্ঞেয়।

এইক্ষণ আমরা ক্রমে স্পেন্সরের পূর্ব্বোক্ত অপর যুক্তি গুলির পরীক্ষা করিব। আমরা দেখিতে পাইতেছি যে এই বহুবাগাড়ম্বরপূর্ণ অজ্ঞতাবাদের অর্থ এই মাত্রঃ—আমরা ঈশ্বরকে সর্ব্বসম্বন্ধবিবর্জ্জিত রূপে জানিতে পারি না; তাঁহার বিশ্বের সহিত, আমাদিগের সহিত, তাঁহার যে সম্বন্ধ, তাহা পরিত্যাগ করিয়া আমরা তাঁহার চিন্তা করিতে পারি না। না পারিলাম, ক্ষতি কি? কে বলিল যে তাঁহাকে সর্ব্বসম্বন্ধবিরহিত মনে করিতে হইবে?—যিনি সর্ব্ব সম্বন্ধের প্রস্রবণ, যাহা স্পেন্সর ইতি পূর্ব্বেই স্বীকার করিয়াছেন—তাঁহাকে কেন নিঃসম্বন্ধ মনে করিব? স্পেন্সর বলেন, "যদি ঈশ্বর মান, তবে তাঁহাকে নিরবলম্ব (Absolute) স্বীকার করিতে হইবে।" আমরা একথা মানিলাম। কিন্তু তিনি নিরবলম্ব (Absolute) শব্দের যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা আমরা মানিব না। তাঁহার মতে যিনি নিরবলম্ব, তিনি সম্বন্ধবিশিষ্ট হইতে পারেন না। আমরা বলি, ঈশ্বরের নিরবলম্বত্ব অথবা একাকিত্ব শক্তিগত (Potential), অর্থাৎ তিনি ইচ্ছা করিলে নিঃসম্বন্ধরূপে, সৃষ্টি না করিয়া, থাকিতে পারেন; সুতরাং সৃষ্টি করিলে তাঁহার শক্তিগত নিঃসম্বন্ধত্বের কোন বিকার হয় না। আমি ইচ্ছা করিলে এই মুহূর্ত্তে সেক্সপিয়র পড়িতে পারি, ইচ্ছা করিলে না পড়িয়া শুইয়া থাকিতে পারি; যদি সেক্সপিয়র না পড়িয়া আমি শয়ন করি, তবে কি তুমি এই সিদ্ধান্ত করিবে যে আমার সেক্সপিয়র পাঠের ক্ষমতা নাই? ঈশ্বরও তদ্রূপ ইচ্ছা করিলে নিরবলম্ব ভাবে, সৃষ্টি না করিয়া, থাকিতে পারেন; ইচ্ছা করেন বলিয়া সাবলম্ব ভাবে—সৃষ্টি করিয়া—বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার অনন্তত্ব সম্বন্ধেও এই কথা। স্পেন্সর বলিয়াছেন, যিনি অনন্ত সমস্তই তাঁহা হইতে অবিচ্যুত। সৃষ্টি করিলে যখন নূতন একটী দৃশ্যমান জন্মগ্রহণ করিল, তখন ত সমস্তই—ঐ সমস্ত যাহা

সৃষ্ট হয় নাই, কিন্তু হইতে পারে কিংবা হইবে—ঈশ্বর হইতে অবিচ্যুত হইল না। এই যুক্তির অভ্যন্তরে ভ্রান্তি লুক্কায়িত রহিয়াছে। যে দৃশ্যমান আজি নূতন জন্মগ্রহণ করিল,তাহা মনুষ্যের পক্ষে যেন নূতন, সৃষ্টি ব্যাপার সম্বন্ধে মনুষ্যের যে কল্পনা আছে, তাহার পক্ষে যেন নূতন যুক্ত হইল; কিন্তু ঈশ্বর সম্বন্ধে তাহা নূতন নহে। তাঁহার অনন্তত্ব-সাগরে—অনন্তশক্তিসাগরে উক্ত নব-সৃষ্ট দৃশ্যমান চিরকালই বিরাজ করিতেছিল, শুধু আমাদিগের নিকট অপ্রকাশিত ছিল। যদি ঈশ্বরের শক্তি-সাগরে উহা নিমজ্জিত না রহিত, তবে কি তাহা কখনও সৃষ্ট হইতে পারিত? যাহা ঈশ্বরের শক্তিতে নাই, তাহার সৃষ্টি অসম্ভব। সৃষ্টি করা, না করা, সম্পূর্ণই তাঁহার ইচ্ছাধীন। সৃষ্টি করিলেও কোন কিছু নূতন তাঁহাতে যুক্ত হইল না, সৃষ্টি না করিলেও তাঁহাতে কোন কিছু বিযুক্ত রহিল না। সুতরাং সিদ্ধ হইল যে সৃষ্টি দ্বারা ঈশ্বরের অনন্তত্বের কোন বিকার হয় না।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

বৈদিক আর্য্যসমাজ।

সমাজ সংস্থাপন।

৪৩৯ সংখ্যার ২১৩ পৃষ্ঠার পর।

এই প্রকারে আর্য্যসমাজ দিন দিন পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। আর্য্যসমাজের সংখ্যা ও পরিবার বৃদ্ধি হইল। সমাজের পরিসর ক্রমশ বিস্তৃত হইয়া পড়িল। আর্য্যগণ সুতরাং নানা নগরী ও পুরী নির্ম্মাণে নিযুক্ত হইলেন। এক এক পরিবার বা বংশের লোকেরা এক এক নগর বা পুর নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রত্যেকেই নিজ প্রয়োজনানুসারে সকল বিষয় প্রস্তুত করিলেন এবং নিজ নগরের বা পুরের মঙ্গলসাধনে যত্নশীল হইলেন। যে সকল ভয়ঙ্কর অরণ্যমধ্যে সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি শ্বাপদগণ অকুতোভয়ে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিত, তৎসমুদায় আর্য্যদিগের বাসস্থান হইয়া উঠিল। যে সকল প্রদেশে ব্যাধ ও শাকুনিক প্রভৃতি ব্যতীত মনুষ্যের সমাগম হইত না, তথায় ক্রমশঃ আর্য্যনগর সকল প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। যে সকল স্থান ভয় ও বিপদের কেন্দ্র ছিল, তাহা শান্তি ও সুখের আবাস হইল। অসুরদিগের নগর ছিল আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। শম্বরাসুরের নগর সকল প্রস্তর-নির্ম্মিত ছিল। ক্রমে ক্রমে আর্য্যসমাজে গ্রাম, নগর, পুর প্রভৃতির উৎপত্তির সহিত সমাজের আকৃতি ও প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইল। সমাজের উন্নতির সহিত শাসন-প্রণালীর উন্নতি হইয়া থাকে। আর্য্যসমাজ পরিবারের সমষ্টি, লোকের সমষ্টি নহে। কেবল লোকের সমষ্টি হইতে সমাজ নির্ম্মাণ হইতে পারে না। কতকগুলি লোকের সমষ্টি হইলে একটি পরিবার হয়। তৎপরে কতকগুলি পরিবারের সমষ্টি হইলে একটি সমাজের সূত্রপাত হইয়া থাকে। সমাজ-বন্ধন না হইলে লোকের বাসস্থানের স্থিরতা থাকে না। যে সকল জাতির মধ্যে সমাজ-বন্ধন হয় নাই, তাহারা একত্র সকলে মিলিয়া থাকিতে পারে না। তাহারা আজ এস্থানে রহিয়াছে, কল্য ও স্থানে যাইবে। 'আর্য্যসমাজে এরূপ কিছু ছিল না। আর্য্যগণের স্থির বাসস্থান ছিল। তাঁহারা সকলে মিলিয়া একত্র বাস করিতেন এবং পরস্পরের সাহায্যে সমাজের উপকার করিতে সচেষ্ট থাকিতেন। তাঁহারা নগরাদি নির্ম্মাণ করিয়া স্থির শাসন-প্রণালী সংস্থাপনে উদ্যত হই-

লেন এবং আপনাদিগের মধ্য হইতে বিচক্ষণ ও কার্য্যদক্ষ ব্যক্তি সকল নির্ব্বাচন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে আপনাদিগের শাসনক্ষমতা অর্পণ করিলেন। ইহাঁরাই আর্য্যসমাজের রাজা হইলেন। অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপিত হইল। বৈদিককালীন ঋষিগণ রাজাদিগের উপদেশক হইলেন। তাঁহারা সর্ব্বসম্মতিতে এরূপ ব্যবস্থা সকল প্রবর্ত্তিত করিলেন, যে তৎসমুদায় যিনি অমান্য করিবেন তিনি সেই ব্যবস্থার অনুসারে দণ্ডনীয় হইবেন। ঋগ্বেদ সংহিতার এক স্থলে সপ্ত দণ্ডনীয় নূতন নগরের কথা আছে। আর ঋগ্বেদের অনেক স্থলে দৃষ্ট হয় যে রাজগণ সুশাসন পূর্ব্বক প্রজা পালন করিতেন। রাজারা হস্তীতে আরোহণ করিয়া মন্ত্রিগণের সহিত নগর পরিভ্রমণ করিতেন এবং প্রজাদিগের হিতসাধনে যত্নবান্ থাকিতেন। সমাজে কোন শান্তিভঙ্গ বা অত্যাচারের নিমিত্ত রাজা দায়ী ছিলেন। তিনি দুষ্টদমন এবং শিষ্টপালন করিতেন। উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে দান করিতে তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না। প্রজাদিগের অন্যান্য অভাব মোচনের ভার মন্ত্রিবর্গের উপর নিহিত থাকিত। প্রজারা যাহাতে সুখে স্বচ্ছন্দে নির্ভয়ে বাস করিতে পারে এবং নগরের বাহ্য আকৃতি যাহাতে শোভন হইতে পারে, সে সকল বিষয় মন্ত্রিরা দেখিতেন। প্রজারা রাজাকে দেবতার ন্যায় শ্রদ্ধা ও সম্মান করিত। রাজার প্রতি দেবোচিত শ্রদ্ধা সমাজের উন্নতির মূল কারণ। যে সমাজে প্রজারা রাজাকে মানে না, সে সমাজে শান্তি ও সুশৃঙ্খলার সম্ভাবনা কোথায়? সে সমাজে বলবান্ দুর্ব্বলকে পীড়ন করে এবং ধনবান্ ব্যক্তিরা নির্ধনদিগের উপর আধিপত্য করে। যদি রাজার প্রতি ভক্তি না থাকে তবে রাজার প্রবর্ত্তিত ব্যবস্থা সমূহের কোন ফল হয় না। তাহাতে সমাজ শিথিলবন্ধন ও পরিশেষে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। প্রজারা বৈদিক রাজাকে দেবত্ববিশিষ্ট বলিয়া মনে করিত এবং তাঁহার বিধি ব্যবস্থা দ্বিরুক্তি না করিয়া শিরোধার্য্য করিত। অতএব বৈদিক আর্য্যসমাজে উন্নতির গতিরোধ হয় নাই।

দস্যুগণ এতদূর বিতাড়িত হইয়াও আর্য্যসমাজের উপর অত্যাচার করিতে ক্ষান্ত হয় নাই। তাহারা আর্য্য গ্রাম, নগর প্রভৃতি হঠাৎ আক্রমণ করিত এবং পরাজিত হইয়া পলায়ন করিত। এ নিমিত্ত আর্য্যগণকে সর্ব্বদাই সতর্ক থাকিতে হইত। শত্রুনিবারণ জন্য আর্য্যগণ রথ নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন এবং নানাবিধ ধাতুনির্ম্মিত অস্ত্র প্রস্তুত করিলেন। যুদ্ধের নিমিত্ত অশ্ব সকল ও হস্তি সকল শিক্ষিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং প্রজাদিগকে সামরিক বিদ্যা ও রণ-কৌশলে অভিজ্ঞ করিয়া তুলিলেন। আর্য্যসমাজে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের উৎপত্তি হইল। সমাজের প্রথমাবস্থায় ক্ষুদ্র রাজ্যই সভ্যতা ও উন্নতি বৃদ্ধি করিবার বিশেষ উপযোগী। অনেকের মত এই যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যেই প্রজাদিগের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য থাকিতে পারে। কিন্তু ইহা সকল সময়ে খাটে না। সমাজের উন্নতি ও সভ্যতার বৃদ্ধি হইলে পর বৃহৎ সাম্রাজ্যই ভাল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যে যে সভ্যতার বৃদ্ধি ও সমাজের উন্নতি হয় তাহার প্রমাণ গ্রীস ও ইটালীর ইতিহাস। বৈদিক আর্য্যসমাজেও তাহাই ঘটিয়াছিল। বেদে দেখিতে পাই রাজাদিগের দূতগণ রাজসংক্রান্ত নানা কার্য্যসাধনে ইতস্ততঃ গমনাগমন করিতেছে। অভ্যাবর্ত্তী এবং প্রস্তোক নামে দুই জন আর্য্যনৃপতি ইন্দ্রদেবের সাহায্যে বারশিখ ও বসুর নামে দুই অনার্য্যজাতিকে পরাভূত

করেন এবং তাহাদিগকে পার্ব্বতীয় প্রদেশে আশ্রয় লইতে বাধ্য করেন। ইহারা হরিযুপিয়া নদীর পূর্ব্বতীরে বাস করিত। রসুমজাতির কতকগুলি লোক আর্য্যসমাজের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল। এইরূপ পঞ্চনদপ্রদেশের বহুবিধ জাতি ও নদীর নাম বেদে দৃষ্ট হয়, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে তাহাদিগের স্থাননিরূপণের কোন সম্ভাবনা নাই। বৈদিক ভারতের ভৌগোলিক বৃত্তান্ত এবং পৌরাণিক ভারতের ভৌগোলিক বৃত্তান্ত দুইটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থ। আর্য্যগণ যে সকল রথ ব্যবহার করিতেন, তাহা লৌহ, পিত্তল ও তাম্র এই তিন ধাতু দ্বারা নির্ম্মিত; তিন চক্রের উপর চলিত এবং তাহাতে তিনটি মাত্র আসন থাকিত। এক এক আসনে অনেক ব্যক্তি বসিতে পারিতেন। তাঁহারা যুদ্ধকালে হস্তে খড়্গ ও খেটক (ঢাল) ধারণ করিতেন এবং স্কন্ধদেশে বর্শা প্রভৃতি রাখিতেন। আর্য্যগণ সমর-তন্ত্রের যেরূপ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, তাহাতে দস্যুদিগকে শীঘ্রই উপদ্রব হইতে নিরস্ত হইতে হইয়াছিল। অদৃষ্ট-চক্র ক্রমাগত আবর্ত্তন করিতেছে। কেহ ইহার উপরে উঠিতেছেন, আবার কিছু দিন পরে নিম্নে আসিয়া পড়িতেছেন। কেহ বা নিম্ন হইতে উপরে যাইতেছেন। এইরূপ জগতে নিয়ম। কোন কবি বলিয়াছেন,

নীচৈর্গচ্ছত্যুপরি চ দশা চক্রনেমিক্রমেণ।"

যেমন রথচক্রের প্রান্তভাগ কখন [illegible] গামী কখন বা নিম্নগামী; তদ্রূপ লোকের অবস্থাও কখন উন্নত, কখন অবনত। আর্য্যদিগের দুর্দ্দিন কাটিয়া গেল, দস্যুদের দুর্দ্দিন উপস্থিত হইল। আর্য্য-প্রতাপে দস্যুগণ ভীত হইয়া দূরে প্রস্থান করিলে পর, আর্য্যসমাজ শান্তিলাভ করিল এবং উন্নতি-পথে ধাবমান হইতে লাগিল।

ক্রমশঃ

জাতিত্বের উপাদান ও বাঙ্গালী জাতি।

জাতিত্বের কতকগুলি উপাদান আছে। কোন মনুষ্যজাতির জাতিরূপে পরিগণিত হইতে গেলে সেই উপাদান গুলি থাকা আবশ্যক। সে সকল উপাদান এই;

(১) দেশ
(২) শারীরিক লক্ষণ
(৩) মানসিক ও নৈতিক গুণ
(৪) রাজনৈতিক অবস্থা
(৫) ধর্ম্ম
(৬) আচার ব্যবহার
(৭) পরিচ্ছদ
(৮) ভাষা
(৯) অতীত পুরাবৃত্ত

প্রথমতঃ একটি জাতি হইতে গেলে অবস্থিতির জন্য দেশ আবশ্যক। অসভ্যতম জাতি হইতে সভ্যতম জাতি পর্য্যন্ত প্রত্যেকে এক একটি দেশে বাস করে এবং সেই দেশীয় জাতি বলিয়া খ্যাত হয়। দেশ সম্বন্ধে অসভ্য ও সভ্যজাতির মধ্যে বিশেষ তারতম্য লক্ষিত হয়। অসভ্য জাতির দেশ হিংস্রশ্বাপদ-পূর্ণ বন দ্বারা সমাকীর্ণ। উহাদিগের বাস বৃক্ষকোটর বা পর্ণকুটীর, গমনাগমনের জন্য অপরিষ্কৃত অপ্রশস্ত দুর্গম পথ। কিন্তু সভ্য জাতির দেশে হিংস্রজন্তুপূর্ণ বন নাই, তৎপরিবর্ত্তে তথায় সুন্দর সুন্দর নগর নগরী ও গ্রাম সকল বিদ্যমান, তাহাদিগের বাসস্থান জন্য সুরম্য হর্ম্ম্য, গমনাগমনের জন্য শোভন সুপ্রশস্ত রাজমার্গ, এবং পরিব্রজনের জন্য নানা প্রকার শকট এবং দূরদেশ ভ্রমণার্থ বাষ্পীয় শকট ও বাষ্পীয় পোত প্রস্তুত রহিয়াছে।

জাতিত্বের দ্বিতীয় উপাদান শারীরিক লক্ষণ। প্রত্যেক জাতির কতকগুলি ভিন্ন

ভিন্ন শারীরিক লক্ষণ আছে। কোন কোন জাতির দীর্ঘকায়ত্ব ও গৌরবর্ণত্ব শারীরিক লক্ষণ, কোন কোন জাতির খর্ব্বকায়ত্ব ও কৃষ্ণবর্ণত্ব শারীরিক লক্ষণ। কোন কোন জাতির সুদীর্ঘ নাসিকা একটি শারীরিক লক্ষণ, কোন কোন জাতির খর্ব্ব নাসিকা একটি শারীরিক লক্ষণ। কতকগুলি বিশেষ বিশেষ শারীরিক লক্ষণ থাকিলে সভ্য, এবং কতকগুলি বিশেষ বিশেষ শারীরিক লক্ষণ থাকিলে অসভ্য জাতি বলিয়া অবধারিত হইবে এরূপ কোন নিয়ম নাই। কিন্তু শারীরিক লক্ষণের বিভিন্নতা জাতিত্বের একটি উপাদান। সকল জাতির এক প্রকার শারীরিক লক্ষণ হইলে এক জাতীয় লোককে অন্য জাতীয় লোক হইতে চিনিবার কোন উপায় থাকিত না।

জাতিত্বের তৃতীয় উপাদান মানসিক ও নৈতিক গুণ। ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন প্রকার মানসিক ও নৈতিক গুণ দেখা যায়। কোন জাতি সাহসিক, কোন জাতি ভীরু। কোন জাতি স্বভাবত চতুর, কোন জাতি স্বভাবত নির্ব্বোধ। কোন কোন জাতির জ্ঞান-পিপাসা, শ্রমশীলতা, সতীত্বের প্রতি আদর প্রভৃতি মানসিক ও নৈতিক গুণ দেখা যায়, কোন কোন জাতির সতীত্বের প্রতি অনাদর, অজ্ঞানপ্রিয়তা, আলস্য প্রভৃতি গুণ সকল পরিলক্ষিত হয়। যে জাতির মধ্যে যত অধিক শ্রেষ্ঠ মানসিক ও নৈতিক গুণ বর্ত্তমান আছে সেই জাতি তত উন্নত ও শ্রেষ্ঠ এবং যে জাতির মধ্যে ঐ সকল গুণের যত অভাব সেই জাতি তত অনুন্নত ও অশ্রেষ্ঠ। যে জাতির মধ্যে সাহস, স্বাধীনতাপ্রিয়তা, স্বদেশানুরাগ, দীর্ঘদর্শিতা, জ্ঞান-পিপাসা, উৎসাহ, অধ্যবসায়, ন্যায়পরতা প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ মানসিক ও নৈতিক গুণ সকল পরিলক্ষিত হয় সেই সকল জাতি উন্নত ও শ্রেষ্ঠ এবং যে সকল জাতির মধ্যে ঐ সকল গুণের যত অভাব দেখা যায় সেই সকল জাতি ততদূর অশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হয়। মানসিক ও নৈতিক গুণ কতক পরিমাণে দেশের প্রাকৃতিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। ইহার স্পষ্ট প্রমাণ এই যে শীত-প্রধান দেশের লোকেরা সচরাচর অধ্যবসায়ী ও কর্ম্মঠ, এবং গ্রীষ্ম-প্রধান দেশের লোকেরা অলস ও বিশ্রামপ্রিয় হয়। যে দেশ নাতিউচ্চ নাতিনিম্ন পর্ব্বতমালা, ও সুন্দর বন উপবন দ্বারা সুশোভিত, সে দেশের লোক শোভন কল্পনা-শক্তি-সম্পন্ন এবং সৌন্দর্য্যপ্রিয় হয়, আর যে দেশে অত্যুচ্চ বিশাল পর্ব্বত, বৃহৎ বৃহৎ নদী ও সমুদ্র আছে সে দেশ-নিবাসীদিগের কল্পনা-শক্তি উচ্চ ও মহৎ আকার ধারণ করে। যে দেশ উর্ব্বর হয় সে দেশের লোকেরা আলস্য-পরায়ণ হয়, এবং যে দেশ পর্ব্বত অথবা বালুকাময় মরুভূমি বেষ্টিত ও অনুর্ব্বর সে দেশের লোকেরা পরিশ্রমী ও বলিষ্ঠ হয়।

জাতিত্বের চতুর্থ উপাদান রাজনৈতিক অবস্থা। পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার রাজনীতি প্রচলিত দেখা যায়। কতকগুলি দেশে সাধারণের উপর রাজ্য-শাসনের ভার অর্পিত, কতকগুলি দেশে রাজা কিংবা রাজ্ঞী প্রজাবর্গের পরামর্শ লইয়া রাজকার্য্য সম্পন্ন করেন, এবং কোন কোন দেশের রাজা কিংবা সম্রাট নিরঙ্কুশ আধিপত্য করেন। এইরূপ প্রত্যেক জাতির মধ্যে কোন না কোন প্রকার শাসন-প্রণালী প্রচলিত আছে। কোন প্রকার শাসন-প্রণালী প্রচলিত না থাকিলে জাতিবন্ধন হওয়া দুষ্কর। যে দেশে কোন প্রকার শাসন-প্রণালী প্রচলিত না থাকে সে দেশবাসীরা একটি জাতির পদে আরোহণ করিতে

পারে না, তাহাদিগের মধ্যে নানা প্রকার গণ্ডগোল ও বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে ঘোর অবনতির গর্ভে নিক্ষেপ করে। এই নিমিত্ত নিউজিলাণ্ড কিংবা মধ্য-আফ্রিকা-নিবাসী ঘোর অসভ্য জাতিদিগের মধ্যেও কোন না কোন প্রকার শাসন-প্রণালী প্রচলিত দেখা যায়।

জাতিত্বের পঞ্চম উপাদান ধর্ম্ম। প্রত্যেক জাতিরই এক একটি ধর্ম্ম আছে। ধর্ম্মশূন্য জাতি এপর্য্যন্ত দেখা যায় নাই। কোন কোন পর্য্যটক কতকগুলি অসভ্য জাতির কোন ধর্ম্ম নাই এই রূপ স্থির করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদিগের ঐ মত যে ভ্রমাত্মক তাহা বর্ত্তমান কালীন অন্যান্য পর্য্যটকেরা প্রমাণ করিয়াছেন। ধর্ম্ম মানব-জীবন ও মানব চরিত্র গঠন করিতে যেরূপ সাহায্য করে, অন্য কোন বস্তুই সেরূপ করে না। যে জাতির ধর্ম্ম যেরূপ তাহার সামাজিক জীবনও তদনুরূপ। ধর্ম্ম-সম্বন্ধে উন্নত, শ্রেষ্ঠ ও পরিমার্জ্জিত মত চরিত্র ও জীবনকে উন্নত ও মার্জ্জিত করে অতএব ধর্ম্ম যে জাতিত্বের একটি প্রধান উপাদান তাহার আর সন্দেহ নাই।

জাতিত্বের ষষ্ঠ উপাদান আচার ব্যবহার। ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার আচার ব্যবহার দৃষ্টিগোচর হয়। কোন কোন জাতির মধ্যে শবদাহ-প্রথা প্রচলিত, কোন কোন জাতির মধ্যে মৃত শরীর সমাধি করাই নিয়ম। কোন কোন জাতির মধ্যে শ্যালিকা বিবাহ করা দোষাবহ নহে, কোন কোন জাতির মধ্যে উহা গর্হিত ও নিন্দনীয়। কোন কোন জাতির মধ্যে নমস্কার করা ও প্রণিপাত করা, আর কোন কোন জাতির মধ্যে করস্পর্শ ও মস্তকাবরণ উন্মোচন করা সম্বর্দ্ধনা ও সম্মানের চিহ্ন। কোন কোন জাতির স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে কৃত্রিম উপায়ে কটিদেশ সূক্ষ্ম করা, ও কোন কোন জাতির স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে পদদ্বয় ক্ষুদ্র করা সৌন্দর্য্যের চিহ্ন। কোন কোন দেশে নাসিকা আকর্ষণ সম্মানের চিহ্ন, কোন কোন দেশে উহা অপমানের চিহ্ন। কোন কোন দেশে পূজনীয় ও সম্মানার্হ জনের অভ্যর্থনা করিবার জন্য গাত্রোত্থান করা আর কোন কোন দেশে উপবিষ্ট থাকাই নিয়ম। কোন জাতির আচার ব্যবহার সেই জাতির মানসিক ও নৈতিক গুণ-প্রসূত। যে জাতির মত গুলি শ্রেষ্ঠ মানসিক ও নৈতিক গুণ আছে সেই জাতির আচার ব্যবহার তদনুরূপ সুমার্জ্জিত, উন্নত ও সুসভ্য হইবে তাহার সন্দেহ নাই।

জাতিত্বের সপ্তম উপাদান পরিচ্ছদ। পরিচ্ছদ আচার ব্যবহারের অন্তর্গত বলিলে চলিতে পারে। দেশের প্রাকৃতিক অবস্থানুসারে পরিচ্ছদের বিভিন্নতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। যে জাতি শীত-প্রধান দেশে বাস করে, যেরূপ পরিচ্ছদ পরিধান করিলে শীত নিবারণ হয়, তাহারা সেই রূপ পরিচ্ছদ ব্যবহার করে। যে জাতি গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে বাস করে, যেরূপ পরিচ্ছদ পরিধান করিলে গ্রীষ্মে কষ্টানুভব না হয় তাহারা সেই রূপ পরিচ্ছদ ব্যবহার করিয়া থাকে। আবার গ্রীষ্ম-প্রধান অথবা শীত-প্রধান এক প্রকার নৈসর্গিক-প্রকৃতি-সম্পন্ন-দেশবাসী জাতিদিগের মধ্যেও পরিচ্ছদ বিষয়ে বিভেদ দৃষ্ট হয়। বস্তুতঃ মনুষ্য জাতির মধ্যে পরিচ্ছদ বিষয়ে যেরূপ বৈচিত্র্য দৃষ্ট হয় এমন আর কিছুতে নহে। এক জন ইংরাজ ও একজন বঙ্গদেশবাসী ভট্টাচার্য্যের পরিচ্ছদ কত ভিন্ন! দেশের প্রাকৃতিক অবস্থানুযায়ী যে পরিচ্ছদ ব্যবহৃত হয় তাহার উৎকর্ষ ও সৌন্দর্য্য সাধন করা সভ্য জাতির নিয়ম এবং তাহা না করা অসভ্য জাতির নিয়ম।

জাতিত্বের অষ্টম উপাদান ভাষা। প্রত্যেক জাতির এক একটি ভাষা আছে। প্রত্যেক জাতির কথা দূরে থাকুক, এক জাতির মধ্যেই ভাষার তারতম্য দেখা যায়। আমাদিগের দেশে "যোজনান্তর ভাষা" এই বাক্য প্রচলিত আছে। এই বাক্য অনেক পরিমাণে যথার্থ। এক দেশে পঞ্চাশ ক্রোশের মধ্যে এক ভাষারই তারতম্য দেখা যায়। পশ্চিম বাঙ্গলায় যেরূপ বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত পূর্ব্ববাঙ্গলার ভাষা তাহা হইতে কিয়ৎ পরিমাণে পৃথক। এই রূপ প্রায় প্রত্যেক দেশেই দেখা যায়। সকল জাতিরই ভাষা আছে, কিন্তু সভ্য জাতির ভাষা হইতে অসভ্য জাতির ভাষা বিভিন্ন প্রকৃতির। অসভ্য জাতিগণের ভাষা সচরাচর অপরিপুষ্ট, ঐ সকল ভাষায় সকল ভাব প্রকাশ করিবার উপযুক্ত বাক্য নাই, এবং সকল বস্তুর নাম নাই; ঐ সকল ভাষায় ব্যাকরণ কিংবা ভাষা লিপিবদ্ধ করিবার নির্দ্দিষ্ট নিয়মাবলী নাই, কিন্তু সভ্য জাতিদিগের তাহা আছে।

জাতিত্বের নবম উপাদান অতীত পুরাবৃত্ত। প্রত্যেক জাতির লিখিতাকারে অথবা প্রবাদাকারে এক একটি পুরাবৃত্ত আছে। কিন্তু সকল জাতির পুরাবৃত্ত এক প্রকারের নহে। কোন কোন জাতির পুরাকালীন অবস্থা বর্ত্তমান অবস্থা অপেক্ষা উন্নত, কোন কোন জাতির অবনত, আবার কোন কোন জাতির ঐ দুই অবস্থাই প্রায় সমান। ইংরাজ, ফরাস, জার্ম্মেন, জাপান এই সকল জাতির বর্ত্তমান অবস্থা তাহাদিগের পুরাকালীন অবস্থা অপেক্ষা অনেক উন্নত; গ্রীক হিন্দু প্রভৃতি জাতিগণের বর্ত্তমান অবস্থা পুরাকালীন অবস্থা অপেক্ষা অনেক অবনত, এবং তাতার, চীন, ব্রহ্মদেশীয় প্রভৃতি জাতিগণের বর্ত্তমান ও পুরাকালীন অবস্থা প্রায় সমান। যে সকল জাতির বর্ত্তমান অবস্থা তাহাদের পুরাকালীন অবস্থা অপেক্ষা হীন ও অবনত, সেই সকল জাতির পক্ষে স্ব স্ব অতীত পুরাবৃত্তের মহিমা ও গৌরব স্মরণ করা তাহাদিগের সভ্যতা ও উন্নতির মঞ্চে আরোহণ করিবার একটি বিশেষ সহায়। অতীত মহিমা ও গৌরব স্মরণ করিয়া কোন জাতি যে উন্নতি ও সভ্যতার পথে অগ্রসর হইতে পারে তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। জার্ম্মেনি যখন রাজকীয় অবনতির গভীর গর্ভে নিমগ্ন ছিল তখন সে তাহার অতীত পুরাবৃত্তের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই আপনার উন্নতি সাধনের জন্য উৎসাহ ও বল পাইয়াছিল। বর্ত্তমান ইটালী ও গ্রীস, স্ব স্ব অতীত পুরাবৃত্তের গৌরব ও মহিমা স্মরণ পূর্ব্বক আশান্বিত হইয়া উন্নতি-পথে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছে। আজ কাল ভারতবর্ষীয়েরাও তাহাদিগের অতীব মহিমান্বিত ও গৌরবান্বিত অতীত পুরাবৃত্তের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আপনাদিগের বর্ত্তমান অবনতির অবস্থা হইতে উদ্ধার হইতে চেষ্টা পাইতেছে।

জাতিত্বের এই নয়টি উপাদানের মধ্যে কয়েকটি মুখ্য এবং কয়েকটি গৌণ। মুখ্য উপাদান গুলি জাতিত্ব সম্পাদনের জন্য নিতান্ত আবশ্যক; ঐ গুলি না থাকিলে কোন জাতির জাতিত্ব থাকে না। সে গুলি প্রথম শারীরিক লক্ষণ, দ্বিতীয় মানসিক ও নৈতিক গুণ, তৃতীয় আচার ব্যবহার, চতুর্থ ভাষা, পঞ্চম অতীত পুরাবৃত্ত। প্রত্যেক জাতির শারীরিক লক্ষণ ভিন্ন ভিন্ন। সম্পূর্ণরূপে এক প্রকার শারীরিক লক্ষণ বিশিষ্ট দুই জাতি দেখা যায় না। এই ভারতবর্ষের মধ্যে কাছে কাছে যে সকল জাতি বাস করিতেছে তাহাদিগের মধ্যেও শারীরিক লক্ষণের বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। বাঙ্গালা, আসামী

উৎকলবাসী, হিন্দুস্থানী প্রভৃতি জাতির শারীরিক লক্ষণের বিভিন্নতা আছে তাহা সকলেই অবগত আছেন। অতএব জাতিত্ব সম্পাদনের জন্য শারীরিক লক্ষণ একটি মুখ্য অর্থাৎ অত্যাবশ্যক উপাদান। দ্বিতীয়, মানসিক ও নৈতিক গুণ। প্রত্যেক জাতির বিশেষ বিশেষ মানসিক ও নৈতিক গুণ আছে। প্রত্যেক জাতির মধ্যে মানসিক ও নৈতিক গুণের বিভেদ দৃষ্ট হয়। ইংরাজদিগের কার্য্যকুশলতা ও অধ্যবসায়, স্কচদিগের জ্ঞানানুরাগ, ফরাসীদিগের সৌজন্য ও আমোদপ্রিয়তা, জার্ম্মেনদিগের দর্শন শাস্ত্রানুরাগ,ইতালীয়দিগের শিল্প বিষয়ে সুকল্পনাশক্তি, এই সকল বিশেষ বিশেষ মানসিক গুণ আছে। এমন কি একটি দেশবাসী ভিন্ন ভিন্ন জাতির বিভিন্ন মানসিক ও নৈতিক গুণ দৃষ্ট হয়। এই ভারতবর্ষনিবাসী প্রত্যেক জাতির এক একটি বিশেষ মানসিক গুণ লক্ষিত হয়, যেমন বাঙ্গালীদিগের ভীরুতা, হিন্দুস্থানীদিগের সাহসিকতা, রাজপুতদিগের ঔদার্য্য ও মহত্ত্বানুরাগ এবং বোম্বাইনিবাসী পারসীকদিগের বাণিজ্যপ্রিয়তা। মানসিক প্রকৃতির বিভিন্নতা জাতিত্বের একটি অত্যাবশ্যক উপাদান। তৃতীয় আচার ব্যবহার। প্রত্যেক জাতির আচার ব্যবহার ভিন্ন ভিন্ন। এক প্রকার আচার ব্যবহার বিশিষ্ট দুইটি জাতি দেখা যায় না। ইউরোপে যে কয়টি জাতি বাস করে তাহারা সকলেই প্রায় এক প্রকার পরিচ্ছদ পরিধান করেন, এক ধর্ম্মে বিশ্বাস করেন, কিন্তু কোন একটি জাতির আচার ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে আর একটি জাতির আচার ব্যবহারের অনুরূপ নহে। ভারতবর্ষে মহারাষ্ট্রীয়, হিন্দুস্থানী, বাঙ্গালী প্রভৃতি যে কয়টি জাতি বাস করে তাহাদিগের মধ্যেও আচার ব্যবহার ভিন্ন তাহা সর্ব্বজন-বিদিত। অতএব জাতিত্ব সম্পাদন জন্য আচার ব্যবহার আর একটি মুখ্য অর্থাৎ আবশ্যক উপাদান। তৃতীয় ভাষা। প্রত্যেক জাতির ভাষা ভিন্ন ভিন্ন। এক ভাষা দুই জাতির মাতৃভাষা এরূপ দেখা যায় না। ভাষা সর্ব্বাপেক্ষা জাতিত্বের অত্যাবশ্যক উপাদান। যে জাতির মাতৃভাষা লোপ পায় সে জাতির আর জাতিত্বের কোন চিহ্নই থাকে না। ভাষা লোপ পাইলে জাতিত্ব সম্পূর্ণরূপে লোপ পায়। পঞ্চম, অতীত পুরাবৃত্ত। কোন দুইটি জাতির পুরাবৃত্ত এক প্রকারের নহে। সকল জাতির পুরাবৃত্ত ভিন্ন ভিন্ন। কোন দুইটি দেশে এক সময়ে একই প্রকার ঘটনাবলী ঘটিতে পারে না, অতএব দুইটি জাতির অতীত পুরাবৃত্ত এক প্রকারের হইতে পারে না। অতএব অতীত পুরাবৃত্ত জাতিত্ব সম্পাদনের একটি মুখ্য উপাদান। দেশ, পরিচ্ছদ, রাজনৈতিক অবস্থা ও ধর্ম্ম যে জাতিত্ব সম্পাদনের গৌণ উপাদান তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে। এক দেশে দুই তিন জাতি দেখিতে পাওয়া যায়। অষ্ট্রিয়াদেশে জর্ম্মেণি, মেগিয়ার, স্ল্যাব প্রভৃতি জাতি বাস করিতেছে। ইহুদিজাতি পৃথিবীর সকল দেশে পুরুষানুক্রমে বাস করিতেছে। বোম্বাই প্রদেশে মহারাষ্ট্রীয় ও পারসীকেরা একত্রে বাস করিতেছে। অতএব দেশ জাতিত্বের একটি মুখ্য উপাদান নহে। পরিচ্ছদ জাতিত্ব সম্পাদনের গৌণ উপাদান। ইউরোপে ইংরাজ, ফরাসী, প্রসিয়ান, হুঙ্গেরিয়ান,ইটালীয়ান প্রভৃতি জাতি বাস করিতেছে,কিন্তু ঐ সকল জাতির পরিচ্ছদ প্রায় একই প্রকার। রাজনৈতিক অবস্থা জাতিত্বের আর একটি গৌণ উপাদান। এক প্রকার রাজনৈতিক অবস্থা অনেক জাতির মধ্যে প্রচলিত দেখা যায়। সাধারণ-তন্ত্র-প্রণালী ফরাসী সুই-

আয়রলণ্ড, ইউনাইটেড ষ্টেট্স প্রভৃতি দেশে প্রচলিত; নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র রুশিয়া, ইউরোপীয় তুর্ক, পারস্য প্রভৃতি দেশে প্রচলিত। জাতিত্বের চতুর্থ গৌণ উপাদান ধর্ম্ম। এক ধর্ম্মাবলম্বী অনেক জাতি দেখিতে পাওয়া যায়। প্রায় সমস্ত ইউরোপীয় জাতিগণ খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী, ভারতবর্ষ-নিবাসী প্রায় সকল জাতি হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী; চীন, তাতার, সিংহল দ্বীপ, শ্যাম প্রভৃতি দেশীয় জাতিরা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী।

মনুষ্য-জীবনের প্রধান তিন ভাগের ন্যায় প্রত্যেক জাতির জীবনের তিন অবস্থা আছে। প্রত্যেক জাতির জীবনে বাল্য, যৌবন ও বৃদ্ধত্ব এই তিন অবস্থা দেখা যায়। ইতিহাস এই বাক্যের যথার্থতার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। অতি পুরাকালীন এসিরিয়ান, বেবিলোনিয়ান, ফিনিসিয়ান জাতিগণের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে উঁহারা বাল্য, যৌবন ও বৃদ্ধত্ব এই তিন অবস্থা অতিক্রম করিয়া পরিশেষে মনুষ্য যেমন মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয় সেই রূপ উঁহারা বিনষ্ট হইয়াছে। ঐ সকল জাতি যে যে দেশে বাস করিত সেই সেই দেশে অন্যান্য জাতি আসিয়া বসতি করিয়াছে। পূর্ব্ব-নিবাসীদিগের চিহ্ন মাত্র নাই। পৃথিবীর সকল জাতিই এই রূপ তিন অবস্থা অতিক্রম করিবে। কোন কোন জাতি আবার অবনত অবস্থা হইতে উন্নতাবস্থায় পুনরারোহণ করিতেছে। কোন জাতি অতি আদিম কাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত সমান রূপে উন্নতি প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে এরূপ দৃষ্টান্ত ইতিহাসে নাই।

সমস্ত মানব জাতি এক জাতি না হইয়া যে ভিন্ন ভিন্ন জাতি হইয়াছে ইহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত। ঈশ্বরের সকল কার্য্যের ন্যায় তাঁহার এই কার্য্যেরও গূঢ় মঙ্গল উদ্দেশ্য আছে তাহার সন্দেহ নাই। ভিন্ন ভিন্ন জাতি ঈশ্বর-প্রদত্ত নিজ নিজ স্বাভাবিক গুণ দ্বারা পৃথিবীর উপকার করিতে সক্ষম হয়। ভিন্ন ভিন্ন জাতি থাকার জন্য মনুষ্যের স্বজাতির প্রতি অনুরাগ জন্মে। ঈশ্বর মঙ্গলাভিপ্রায়ে স্বজাতির প্রতি এই অনুরাগবৃত্তি মনুষ্যের হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন। এই অনুরাগ বশতঃ মনুষ্য সহস্র কষ্ট স্বীকার করিয়াও স্বজাতির উপকার সাধনে প্রবৃত্ত হয়, এমন কি, তজ্জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত অর্পণ করে।

প্রত্যেক ব্যক্তির স্বজাতির প্রতি কর্ত্তব্য আছে। স্বজাতির যাহাতে মঙ্গল হয় স্বজাতির গৌরব যাহাতে বৃদ্ধি হয় প্রত্যেক ব্যক্তির তাহা করা কর্ত্তব্য। এই স্বজাতির প্রতি কর্ত্তব্য স্বজাতির প্রতি অনুরাগ-প্রসূত। স্বজাতির প্রতি কর্ত্তব্য সাধন আত্মীয় কুটুম্বদিগের প্রতি কর্ত্তব্য সাধন অপেক্ষা পবিত্র ও শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। যথার্থ কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ব্যক্তিরা আত্মীয় কুটুম্বের প্রতি কর্ত্তব্য সাধন করিয়া ক্ষান্ত থাকেন না। তাঁহারা নানা বিঘ্ন বিপদ ও প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া স্বজাতির প্রতি কর্ত্তব্য সাধন করিয়া থাকেন।

প্রত্যেক মনুষ্যের যেমন স্বজাতির সহিত সম্বন্ধ আছে তেমনি প্রত্যেক জাতির সাধারণ মনুষ্য জাতির সহিত সম্বন্ধ আছে। ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হইলেও সমস্ত মানব জাতি ভ্রাতৃবন্ধনে বদ্ধ। প্রত্যেক ব্যক্তির স্বজাতির মঙ্গল সাধনে তৎপর হওয়া যেরূপ কর্ত্তব্য তেমনি প্রত্যেক জাতিরও অন্যান্য সকল জাতির মঙ্গল সাধনে তদনুরূপ তৎপর হওয়া কর্ত্তব্য। পারস্য কবি সাদি বলেন যে "সমস্ত মনুষ্য একটি শরীর ও জাতি সকল তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্বরূপ, একটি অঙ্গে ব্যথা লাগিলে সমস্ত

শরীর ব্যথিত হয়।” এই কথাটি অতি যথার্থ। বর্ত্তমান সময়ে জাতির প্রতি জাতির সহানুভূতি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে ইহা অত্যন্ত শুভ চিহ্ন বলিতে হইবে। এক্ষণে এক জাতির দুঃখের ও বিপদের সময় অন্য জাতি সাহায্য ও আনুকূল্য করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ ঘটিলে কিম্বা জলপ্লাবন হইলে ইংলণ্ড ও আয়রলেণ্ড প্রভৃতি দেশীয় লোকেরা ঐ সকল দৈবঘটনা হইতে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদিগকে বিশেষ সাহায্য করিতেছেন, আবার আয়রলেণ্ড কিম্বা ইংলণ্ডে ঐ সকল বিপদ ও দুর্ঘটনা ঘটিলে ভারতবর্ষবাসীরা ঐ সকল দৈবঘটনা হইতে ক্ষতি ও বিপদগ্রস্ত লোকদিগের দুঃখ মোচনার্থ বিশেষ সাহায্য করিতে ত্রুটি করিতেছেন না। অন্য কোন জাতির মধ্যে কোন অত্যাচার ঘটিলে কিম্বা তাহাদিগের কষ্ট ও দুঃখের কথা শুনিলে আমরা ব্যথিত হইয়া থাকি এবং তাহাদিগের উপকার সাধনে প্রবৃত্ত হই। এই রূপ জাতির প্রতি জাতির সহানুভূতি এবং পরস্পর আনুকূল্য ও সাহায্য প্রদান যতই বৃদ্ধি পাইবে ততই মানবজাতির মধ্যে ভ্রাতৃভাব ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইয়া জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিবে।

ক্রমশঃ

তত্ত্বজ্ঞান কতদূর প্রামাণিক।

৪৩৬ সংখ্যার ১৫৮ পৃষ্ঠার পর।

এস্থলে এইটি যেন মনে থাকে যে, যদিও প্রজ্ঞার মূলতত্ত্ব-গুলিকে দেশকালে প্রয়োগ করিয়া দেখিলে সহজেই তাহার (প্রজ্ঞার) প্রামাণিকত্ব আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয়, তথাপি প্রজ্ঞার প্রকৃত প্রমাণ যুক্তি হইতে পাওয়া যায় না—স্বতঃসিদ্ধতাই প্রজ্ঞার প্রকৃত প্রমাণ। দীপ-শিখা যেমন আপনাকে প্রকাশ করে, এবং তাহার কিরণ প্রবাহ যেমন অন্যকে প্রকাশ করে, প্রজ্ঞা সেই রূপ গোড়ায় আপনাকে প্রমাণ করে, এবং তাহার যুক্তি-প্রবাহ বিষয়ান্তর প্রমাণ করে। দীপের কিরণই দীপশিখাকে অপেক্ষা করে, যুক্তিই প্রজ্ঞাকে অপেক্ষা করে। প্রজ্ঞা প্রামাণিক বলিয়াই যুক্তি প্রামাণিক, ইহার উল্টা সম্ভবে না। বিশেষ একটি অভিব্যক্তি অথবা প্রত্যক্ষ ঘটনার উপরে প্রজ্ঞার প্রয়োগ যাহা উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা সেই-প্রজ্ঞার প্রয়োগ, যে-প্রজ্ঞার নিকট পৃথিবীও যা, সৌরজগৎও তাই, সৌরজগৎও যা, নাক্ষত্রিক জগৎও তাই, আতাফলও যা, দ্যুলোক ভূলোকও তাই। অতএব প্রজ্ঞা সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্মতম ব্যাপকতম এবং বলবত্তম প্রমাণ।

পূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি যে, আরোহপ্রণালী অনুসরণ করিয়া সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর ততোধিক সূক্ষ্মতর, এরূপ করিয়া চলিলে, যে জন্য চলা, তাহা সফল হয় না, ধ্রুব সত্যে পৌঁছান যায় না, সূক্ষ্মতমে পৌঁছান যায় না। আরোহ-প্রণালী যেখানেই থামে সেইখানেই “এ নয় ইহা অপেক্ষাও সূক্ষ্মতর” এই কথাটি স্পষ্টাক্ষরে দেখিতে পায়। মূল সত্য সম্বন্ধে আরোহ প্রণালী “ইহা নহে ইহা নহে” ইহাই ক্রমাগত বলিতে থাকে। ইহা যদি নহে তবে কি?—আরোহ প্রণালীর মুখে আর কথা নাই।

প্রজ্ঞা আপনার জ্যোতিতে আপনি প্রকাশ,—প্রজ্ঞা বলেন “আমিই সূক্ষ্মতম সার্ব্বভৌমিক সার্ব্বকালিক মূলসত্য যাহা তুমি চাহিতেছ। আমা দ্বারাই সমস্তের সহিত প্রত্যেকের, পূর্ব্বের সহিত পশ্চাতের অনাদি নিয়মের সহিত অনন্ত ঘটনার যোগ রক্ষিত হইতেছে। আমিই সেই সূক্ষ্মতম যোগ-সূত্র যাহা আকাশের রোমে রোমে এবং কালের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছে।” প্রজ্ঞা এক জনের আত্মাতে নহে, কিন্তু প্রতি জনের আত্মাতে অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছে। আমরা প্রতিজনে যেমন একই সূর্য্য বাহিরে অবলোকন করি, সেইরূপ প্রতিজনে একই প্রজ্ঞা অন্তরে উপলব্ধি করি। চক্ষু যেমন কর্ণ হইতে ভিন্ন, এক জীবাত্মা তেমনি অন্য জীবাত্মা হইতে ভিন্ন। আবার, যে মন চক্ষুর অভ্যন্তরে থাকিয়া দেখিতেছে, সেই মনই কর্ণের অভ্যন্তরে থাকিয়া শুনিতেছে, এ যেমন, তেমনি যে প্রজ্ঞা এক জীবাত্মার অভ্যন্তরে থাকিয়া ধ্রুব সত্য প্রকাশ করিতেছে, সেই প্রজ্ঞা অন্য জীবাত্মার অভ্যন্তরে থাকিয়া ধ্রুব সত্য প্রকাশ করিতেছে। চক্ষেতে কর্ণেতে প্রভেদ আছে কিন্তু চক্ষের ভিতরকার মনেতে (দ্রষ্টাতে) আর কর্ণের ভিতরকার মনেতে (শ্রোতাতে) কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। সেই রূপ আমাতে তোমাতে প্রভেদ আছে সত্য কিন্তু আমার ভিতরকার প্রজ্ঞাতে আর তোমার ভিতরকার প্রজ্ঞাতে

কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। চক্ষু-ব্যবচ্ছেদে বা কর্ণ-ব্যবচ্ছেদে যেমন মনের ব্যবচ্ছেদ হয় না, সেইরূপ শরীর ব্যবচ্ছেদে প্রজ্ঞার ব্যবচ্ছেদ হয় না; মনের অবস্থান্তরেও প্রজ্ঞার অবস্থান্তর হয় না। সকল ইন্দ্রিয়ই যেমন মন হইতে চেতন পায়, সকল আত্মাই সেইরূপ প্রজ্ঞা হইতে জ্ঞান পাইতেছে। যুক্তি-কুশল পণ্ডিতগণ প্রজ্ঞাকে নানা বিষয়ে প্রয়োগ করিতে জানেন. অনভিজ্ঞ লোকে তাহা জানে না; তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ প্রজ্ঞাকে অস্থির মনো-বৃত্তি সকল হইতে বাছিয়া লইতে জানেন, অনভিজ্ঞ লোক তাহা জানে না, প্রজ্ঞাকে কেহ বা চিনিয়াছে কেহ বা চিনে নাই,—আছেন তিনি সর্ব্বত্র। প্রজ্ঞা সকল-প্রভেদ অগ্রাহ্য করিয়া, সকল বাধা অতিক্রম করিয়া সকল ব্যবধান দূর করিয়া, সকল শূন্য পূর্ণ করিয়া সমান বলে সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান। আমাদের আত্মার অভ্যন্তরে ঐ যে স্বপ্রকাশ জ্যোতিঃস্বরূপ প্রজ্ঞা, যাহাতে করিয়া সমুদায়ের সহিত প্রত্যেকের, কারণের সহিত কার্য্যের, অসীমের সহিত সসীমের যোগ রক্ষিত হইতেছে, তাহাতে করিয়াই আমরা পরমাত্মাকে জানিতে পাই যে, তিনিই বিশুদ্ধ-জ্ঞান-স্বরূপ, তিনিই প্রজ্ঞান-ঘন, সমুদায়ের এবং প্রত্যেকের তিনিই অন্তরাত্মা তিনিই এক অদ্বিতীয় পরমাত্মা। এক্ষণে প্রজ্ঞামূলক যুক্তিকে সহায় করিয়া সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং প্রকরণ বিষয়ে যাহা আমাদের বলিবার আছে তাহাতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

ক্রমশঃ।

সমালোচন।

নীতি-পদ্য। বালক বালিকাদিগের নিমিত্ত রচিত। দ্বিতীয় সংস্করণ। কলিকাতা, রায়যন্ত্র। ১৮০১ শক।

এই ক্ষুদ্র পুস্তকটিতে বালকদিগকে অতি সহজ ভাষায় অমূল্য হিতোপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। বালকদিগকে নীতি বিষয়ক পদ্য মুখস্থ করাইলে ভবিষ্যতে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ সময়ে, যে উপদেশ সেই সকল পদ্যে প্রদত্ত হইয়াছে তাহা স্মরণ হইয়া তাহাদিগের কি পর্য্যন্ত উপকার সাধন করে তাহার দৃষ্টান্ত শিক্ষকেরা বিলক্ষণ অবগত আছেন। সে বিষয়ে আমাদিগের অধিক বলা বাহুল্য। এই পুস্তকটি বিদ্যালয়ে গৃহীত হইলে আমরা পরম আহ্লাদিত হইব। এক জন ইংরাজি কবি বলিয়াছেন যে, পদ্য যেমন সহজে বালকেরা শিক্ষা করে এমন অন্য বস্তু আর কি আছে? সরল ও উৎকৃষ্ট পদ্যে লিখিত হওয়াতে এই পুস্তকটি বালকদিগের নীতি শিক্ষার্থ বিলক্ষণ উপযোগী হইয়াছে।

REVIEW.

We beg to acknowledge with thanks the receipt of a copy of the Report of the Ahmedabad *Prarthana Sanaj* for the year 1879. It gives us a lucid argumentative exposition of the views and opinions of the members of that Samaj on some doctrines promulgated as the doctrines of Brahmoism by a certain Section of the Brahmo Samaj, which, as an eminent Theist of England remarks, has published a "spacious edition" of that religion. The doctrines alluded to are Man worship, Great Men, Divine Dispensation, Special Providence and Inspiration. We are glad to see that our friends of the "Prarthana Samaj" hold perfectly reasonable views about these doctrines and are in no way prepared to accept them as they are preached by the missionarries of the Brahmo Samaj of India. The Adi Brahmo Samaj have all along protested against the introduction of these doctrines in an extravagant and distorted form into the Brahmo Church, and it gives us sincere pleasure to find that the Brahmo Community of Ahmedabad are at one in this respect with the Adi Brahmo Samaj. We are also highly glad to see that the members of the "Prarthana Samaj" think it proper and reasonable that the "theistic movement should conform to Hinduism in spirit and form." Towards the conclusion of the Report we read ;—" It is time that we should maintain a conciliatory attitude towards all religions but we should especially be so towards Hinduism as it is the accepted Faith of the land. We should be conciliatory towards it as it is a stationary religion, but we should maintain a preventive policy towards Christianity as it is growing religion. We should conciliate the one because it is a standing force, we should oppose the other as it is an advancing force, By all justifiable means we should Hinduize and not Christianize Theism." These are exactly the views of the Adi Brahmo Samaj and we can not do more than send our hearty congratulations to the members of the Prarthana Samaj on its assuming such a wise attitude towards Hinduism, which will no doubt strengthen its position and increase its adherents among the Hindu community of theBombay Presidency.

LETTER FROM A BENGALI PROFESSOR OF EUROPE.

NOVEMBER 27TH, 1880.

DEAR FRIEND,

* * * * * *

MAX MULLER'S "SACRED BOOKS of the EAST—Vol. I—UPANISHADS" reached me a few days ago. I have in my spare moments gone through the greater part of this beautifully got-up volume. But what a difference between the original and the translation! So much indeed might be lost in a translation! As I read on, I sometimes compare the translations with the texts which I possess and I am very much struck with the difference between the two. The translation at certain places is quite unintelligible to me while the text is as clear as the day. Besides I must say, inspite of all respect I have for the worthy translator, that he has sometimes misunderstood, at others failed to catch the spirit of the original and at others again have discovered subtleties in it where they do not exist. One amongst many: he says for instance that he cannot "connect any definite thoughts" with those sublime words of the Chhandogya Upanishad which begin with; " এতদাত্ম্যম্ ইদম্ সর্ব্বম্, তৎসত্যম্ স আত্মা, তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" I think there are very few Hindus who would find any difficulty at all in finding out what these words truly mean. English is perhaps the language least fitted to translate the poetical and philosophical words of Sanskrit. French is no better. Italian much better as well as German but perhaps Russian is the best of all. * * * * * *

I am not much surprised to learn that Babu K. C. Sen and his followers are leaning more than ever towards Christ and Christianity. It sems to me that the best things in Christianity (its high moral principles) are derived directly or indirectly from Buddhism. In the Continuation,* it will be my endeavour to prove the statement from the researches of men like Lassen, Weber &c. I have collected my authorities with no mean diligence. As to the religious dogmas of Christianity as of the other two Semitic religions, I have no very great respect for them. They seem to me to have been means for a sufficiently lower stratum of the religious life to satisfy the infantile religious aspirations of Humanity. With Schopenhauer I have no hesitation to affirm that a more intimate acquaintance with the Hindu Philosophy and Theology, (including also the Buddhistic which is certainly *our own*, and let me add, a greater progress in Science shall by and by either destroy Christianity in Europe or at least shear it entirely off its puerile dogmas which as soon as a man begins to think, dissipate as darkness before the sun. I have now been travelling in almost all the chief countries and cities of Europe and I must say that there is very little of religion or Christianity in civilised Europe. In the daily concerns of life, not one in a million cares a sous for their religion. I doubt whether there is one young European male or female who has the aver-

in any sense. Disease, Misfortune, Old Age Panic or Coventionality is the chief or sole motive of their religion. Almost without exception they in their youth lead lives of immorality which we have no idea of which the society permits, or at best smiles at and which are to say the least in total disseverance from the teachings of their religion. And these youths are not much to blame nor the parents who regard their failures as natural youthful pranks for the dogmas which they must believe are often so curious, not to say more discourteously, that they reject the whole system in practice in despair of being in a position to accord with even the very small part of it. Christianity as a religion has failed in Europe. It could still hold its name if it would consent to make large accomodations to Science, Philsophy and Philology and thus be deprived of the greater part of its Jewish limitations. And indeed in casting even a superficial glance on the historical development of the whole Indo-European races, what do we find? Do we not find that the wisest and the best of our Family have been all more or less Hindus—the greatest of the Persians, the greatest of the Greeks, the Romans, the Germans, the French, and the English? It would be hard to name, one great name in Art or

---

* Of an essay previously published in this journal, Ed. T. P.

Science in the whole Indo-European Family who was not a worshipper of the same *Atma* which Sanatkumar so eloquently explained to Narada :—

"পশ্চাদাত্মা পুরস্তাদাত্মা দক্ষিণত
আত্মোত্তরত আত্মৈবেদম সর্ব্বমিতি ॥"

,,ছান্দোগ্য ৭।২৫।২ ।

I think I have written enough for to-day. Hoping this will find you and the rest in good health and beneficent activity,

I am very respectfully,
Yours

বিজ্ঞাপন।

বর্ষশেষের ব্রাহ্মসমাজ আগামী ৩০ চৈত্র রবিবার সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকার সময়ে আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহে হইবে,

এবং

নববর্ষের ব্রাহ্মসমাজ আগামী ১ বৈশাখ সোমবার প্রত্যূষে ৫ ঘটিকার সময়ে শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে হইবেক।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার গ্রাহক মহাশয়দিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি, যে উক্ত পত্রিকার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা, পশ্চাদ্দেয় বার্ষিক মূল্য ৩॥০ টাকা, ডাক মাশুল ।৵০ আনা। ছয় মাসের মধ্যে এক কালে অগ্রিম মূল্য না দিলে পশ্চাদ্দেয় হিসাবে ৩॥০ গৃহীত হইবে।

যে সকল গ্রাহক মহাশয়ের নিকট তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য বাকি আছে তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক প্রেরণ করিবেন ও যাঁহাদিগের অগ্রিম মূল্য নিঃশেষিত হইয়াছে তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক আগামী বৎসরের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া উপকৃত করিবেন।

মফস্বলস্থ যে সকল ব্রাহ্মসমাজ ও বিশেষ ব্যক্তিকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বিনা মূল্যে প্রদত্ত হয় তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক আগামী বৎসরের প্রারম্ভে ডাক মাশুল পাঠাইয়া দিবেন।

আয় ব্যয়

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫০।

মাঘ।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	... ...	৫৫৯৸৵১৫
পূর্ব্বকার স্থিত	...	১২৪ ॥৶১০
সমষ্টি	... ...	৬৮৪॥৵ ৫
ব্যয়	... ...	৩৯১ ॥/১৫
স্থিত	... ...	২৯৩(১০

আয়

ব্রাহ্মসমাজ		১৬৩ ৵১০
দান প্রাপ্তি।		
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০০	
,, গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০	
শ্রীমতী ত্রৈলোক্যমোহিনী দাসী	৫	
শ্রীযুক্ত গোকুলকৃষ্ণ সিংহ	২	
,, দয়ালচন্দ্র শিরোমণি	২	
,, নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস (খিদিরপুর)	১	
,, ক্ষেত্রমোহন বিশ্বাস ঐ	১	
,, কান্তিচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১	
,, দিননাথ অধোতা	১	
,, গঙ্গাধর চক্রবর্ত্তী	১	
,, রাখালরাজ রায়	১	
,, মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় (গঙ্গাটিকুরি)	১	
,, ক্ষেত্রমোহন ধর	১	
	১২৭	
দানাধারে প্রাপ্ত	৩৩৸৶৫	
সঙ্গীতের কাগজ বিক্রয়	২ ৶৫	
	১৬৩৵১০	
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৯৯ / ০
পুস্তকালয়	...	৯৮৸৵১৫
যন্ত্রালয়	...	৩৬
গচ্ছিত	...	১৬২৸ ১০
সমষ্টি		৫৫৯৸৵১৫

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	... ...	১০১৵
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	... ...	১০৬॥৶ ৫
পুস্তকালয়	... ...	২৫।/ ১৫
যন্ত্রালয়	... ...	৭৬৵ ৫
গচ্ছিত	... ...	৮৫॥ ১০
সমষ্টি		৩৯১॥/১৫

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।